উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান

২

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান

২য় খন্ড

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ

আকরাম ফারূক

আবদুস শহীদ নাসিম

মুনীরুদ্দীন আহমদ

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা–চট্টগ্রাম–খুলনা

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন-২৫ ১৭ ৩১

আঃ প্রঃ ১৯৪

২য় সংস্করণ

রবিউল আউয়াল	১৪১৮
শ্রাবণ	১৪০৪
জুলাই	১৯৯৭

বিনিময় : ১৬০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

تحریک ازادی هند اور مسلمان حصہ دوم -এর বাংলা অনুবাদ

UPAMOHADESHER SHADHINATA ANDOLON-O- MUSOLMAN
by Sayyed Abul A'la Maudoodi, Translated in Bengali by Akram Faruque.
Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price: Taka 160.00 Only.

আমাদের কথা

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মর্দে মুজাহিদ ও দুরদৃষ্টি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাশীল এবং রাজনীতিবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (র) আলোড়ন সৃষ্টিকারী "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশ্‌মকাশ্‌" শীর্ষক প্রবন্ধাবলী ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তাঁর মাসিক তর্জুমানুল কুরআন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে এবং তা পরে তিন খন্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ তিন খন্ডের সাথে তাঁর প্রাসঙ্গিক আরো লেখা সংযোজন করে প্রফেসর খুরশীদ আহমদ গ্রন্থটিকে "তাহরীকে আযাদীয়ে হিন্দ আওর মুসলমান" নামে বৃহৎ দু'খন্ডে সংকলন করেন। সে গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ "উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান" নামে প্রকাশিত হলো বলে আল্লাহ্‌ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি।

ইংরেজী ১৯৩৫ সালের পর থেকে এ উপমহাদেশের মুসলমান যে রাজনৈতিক ঘূর্ণিপাকের আবর্তে পড়ে দিক্‌ ভ্রান্ত হয়েছিল তখন মাওলানার "সিয়াসী কাশ্‌মকাশ্‌" শীর্ষক সময়োপযোগী প্রবন্ধগুলো তাদেরকে পথের সন্ধান দিয়েছিল।

যাঁরা মাওলানাকে নিছক রাজনৈতিক বিদ্বেষবশত পাকিস্তান বিরোধী বলে অখ্যায়িত করেন তাঁদের এ গ্রন্থটি নিরপেক্ষ মন নিয়ে পড়ে দেখা উচিত। এ গ্রন্থের এক স্থানে তিনি বলেনঃ

"মুসলমান হিসেবে আমার কাছে এ প্রশ্নের কোনই গুরুত্ব নেই যে ভারত অখন্ড থাকবে না দশ খন্ডে বিভক্ত হবে। সমগ্র পৃথিবী এক দেশ। মানুষ তাকে সহস্র খন্ডে বিভক্ত করেছে। আজ পর্যন্ত পৃথিবী যতো খন্ডে বিভক্ত হয়েছে তা যদি ন্যায়সংগত হয়ে থাকে, তাহলে আরও কিছু খন্ডে বিভক্ত হলেই বা ক্ষতিটা কি? এ দেব প্রতিমা খন্ড বিখন্ড হলে মনঃকষ্ট হয় তাদের যারা একে দেবতা মনে করে। আমি যদি এখানে একবর্গ মাইলও

এমন জায়গা পাই যেখানে মানুষের উপর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো প্রভুত্ব কর্তত্ব থাকবে না, তাহলে এ সামান্য ভূমিখন্ডকে আমি সমগ্র ভারত থেকে অধিকতর মূল্যবান মনে করবো।" – (সিয়াসী কাশ্‌মকাশ্‌–৩য় খন্ড)

বাংলাভাষায় অনূদিত গ্রন্থটি সকল বাংলাভাষী ভাইদেরকে পড়ে দেখার জন্যে আবেদন জানাই।

ঢাকা
২২ শে অক্টোবর, ১৯৮৯

আব্বাস আলী খান
চেয়ারম্যান
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা

কে কতটুকু অনুবাদ করেছেন

আকরাম ফারূক

অধ্যায় : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৯।

আবদুস শহীদ নাসিম

অধ্যায় : ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২২।

মুনীরুদ্দীন আহমদ

অধ্যায় : ২৭, ২৮।

সূচীপত্র

অধ্যায়—২৭

অধ্যায়—২৮

অধ্যায়—২৯

অধ্যায়—৩০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিছু কথা

আমার এই গ্রন্থের প্রথম খন্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খন্ডে মূলত নিম্ন লিখিত তিনটি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছিলঃ

১–"মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ (মুসলমান ও চলমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব) প্রথম খন্ড", নামে আমার যে প্রবন্ধগুলো ১৯৩৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং কিছুকাল যাবত ঐ নামেই পুস্তক আকারে প্রকাশিত হতে থাকে।

২–১৯৩৮ সালে যেসব প্রবন্ধ "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ দ্বিতীয় খন্ড" নামে আমি প্রকাশ করেছিলম এবং তাও অনেকদিন যাবত ঐ নামেই প্রকাশিত হতে থাকে।

৩–আমার "মাসয়ালায়ে কাওমিয়াত" (ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ) নামক পুস্তকের কিছু অংশ যা ১৯৩৯ সালে লেখা হয়েছিল। এ সমস্ত লেখারই বক্তব্য ছিল, সারা ভারতের অধিবাসীদেরকে একই জাতি ধরে নিয়ে একটা ধর্মহীন গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত করে দেয়াতে ভারতের মুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি, এবং পৃথক জাতীয় সত্তার ওপর যে বিপদ ও ক্ষতি আপতিত হবার আশংকা ছিল, সে সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়া। যদিও এখন সে যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে এং পরিস্থিতি পাল্টে গেছে, তথাপি এই নিবন্ধগুলোর একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল। তাই এ নিবন্ধগুলোকে "তাহরীকে আযাদীয়ে হিন্দ আওর মুসলমান" (উপমহাদেশের

স্বাধীনাত আন্দোলন ও মুসলমান) প্রথম খন্ড নামে নতুন করে প্রকাশ করা হয়েছে।

এখন এ পুস্তকেরই দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ করা হচ্ছে। এ পুস্তকের দুটো অংশ রয়েছেঃ

১– ১৯৩৯ সালের মে মাস থেকে, ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমার লেখা প্রবন্ধসমূহ—যা 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ' তৃতীয় খন্ড নামে সেই সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল। এর প্রতিটি প্রবন্ধের প্রকাশের তারিখ লিখে দেয়া হয়েছে। এতে জানা যায় যে, কি পরিস্থিতিতে কি বক্তব্য রাখা হয়েছিল।

২– সিয়াসী কাশমাকাশ তৃতীয় খন্ড প্রকাশিত হবার পর একই বিষয়ে যেসব প্রবন্ধ ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত লেখা হয়েছিল; এ সব প্রবন্ধ যদিও তরজুমানুল কুরআন পত্রিকায় যথা সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল, তবে তা কোথাও একত্রে সংকলণ করা হয়নি। এখন প্রথম বারের মত সেগুলো সংকলণ করে এই পুস্তকে সংযোজিত হয়েছে। এরও প্রতিটি প্রবন্ধের প্রকাশকাল লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যাতে প্রত্যিটি কথাকে তার ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিবেচনা ও অনুধাবন করা সম্ভব হয়।

যেহেতু এ প্রবন্ধগুলো–বিশেষত এই পুস্তকের প্রথমাংশের প্রবন্ধগুলো বহু বছর যাবত আমার বিরুদ্ধে বিদ্বেশাত্মক অপপ্রচারের কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর বিভিন্ন বক্তব্যকে পূর্বাপর বক্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার উদ্ভট অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে। তাই আমি সংকলণ ও সম্পাদনার সময় সেই সব বক্তব্যের ভাষায় কোন পরিবর্তন করিনি। যদি কোন জিনিসের বিশ্লেষণ কিংবা সংযোজনের প্রয়োজন অনুভব করে থাকি, তবে তা পাদটীকার আকারে লিপিবদ্ধ করেছি। আবার নতুন ও পুরনো পাদটীকায় পার্থক্য করার সুবিধার্থে বন্ধনীর মধ্যে 'নতুন' অথবা 'পুরনো' শব্দ লিখে দিয়েছি, যাতে করে কোন ভুল বুঝাবুঝিরও অবকাশ না থাকে এবং কেউ এ কথা বলার সুযোগ না পায় যে, আপত্তিকারীদের আপত্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বক্তব্যের ভাষায় রদবদল করা হয়েছে।

এ পুস্তক একটা ঐতিহাসিক দলীল। এ থেকে জানা যাবে যে, দেশ বিভাগের সময় আমি ভারতীয় মুসলমানদেরকে কি বলেছি, আর দেশ

বিভাগের পর আমি ইসলামের প্রকৃত ও মূল লক্ষ্যের দিকে পাকিস্তানের মুসলমানদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ১৯৪৮ সালে কিভাবে চেষ্টা সাধনা শুরু করি। দেশ বিভাগের পর বিগত ২৫ বছরে উদ্ভূত ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি দিলে যে কোন ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে যে, সে সময়ে আমি যা যা বলেছিলাম তা সঠিক ছিল কিনা। আপত্তিকারীরা পূর্বাপর বক্তব্য—এমনকি ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে বিকৃত উদ্ধৃতি পেশ করেছে, তা কাউকে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত মতামত পোষণে সাহায্য করতে সক্ষম নয়। আমার আসল বক্তব্যগুলো পূর্ণ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা সহকারে হুবহু এ পুস্তকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হলো। পাঠকবর্গ এগুলো পড়ুন এবং যে অভিমত পোষণ করতে চান করুন।

আবুল আ'লা
লাহোর
১লা নভেম্বর, ১৯৭২

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

"মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ" (মুসলমান ও চলমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব) নামে আমার দু'টি প্রবন্ধসমষ্টি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।[১] এখন সেই সিরিজেরই এই তৃতীয় প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করা হচ্ছে। দৃশ্যত প্রথম দুটো সংকলন এবং এই তৃতীয় সংকলনটির মধ্যে ব্যবধান এত বেশী যে, আপাত দৃষ্টিতে যে কোন ব্যক্তির কাছে মনে হবে যে, আমি দ্বিতীয় খন্ডের পর সহসা নিজের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে ফেলেছি এবং নিজের ইতিপূর্বে প্রদত্ত অনেক বক্তব্যকে নিজেই খন্ডন করতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এ তিনটে সংকলনেই একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাঠকদের মনে যাতে কোন ভুল বুঝাবুঝির উদ্ভব না ঘটে সে জন্য ধারাবাকি অগ্রগতির ঐ প্রক্রিয়াটার এখানে বিশ্লেষণ করতে চাই।

এ-কথা সামান্য চিন্তা ভাবনা করলেই যে কেউ বুঝতে পারে যে, একটা নতুন আন্দোলনের সূচনা করার চাইতে একটা পুরনো অধোপতিত ও বিপর্যস্ত আন্দোলনকে পুণরুজ্জীবিত করা অনেক বেশী কঠিন ও জটীল কাজ। নতুন আন্দোলন গঠনকারীর পথ থাকে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। তার একমাত্র প্রতিপক্ষ থাকে সেই সব লোক যারা ঐ আন্দোলন সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং তার সাথে কোন সংশ্রব রাখে না। আপন আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার করা ছাড়া তার আর কিছু করতে হয় না। প্রচারের ফলে, হয় লোকেরা তার দাওয়াত গ্রহণ করে, নতুবা প্রত্যাখান করে। কিন্তু যে ব্যক্তি এক পুরোনো আন্দোলনকে

১· বর্তমানে এই দু'টো সংকলন "তাহরীকে আযাদীয়ে হিন্দ আওর মুসলমান" (উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান) প্রথম খন্ড নামে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া "মাসালায়ে কাওমিয়াত" (ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ) আলাদা পুস্তক আকারে পাওয়া যায়। (নতুন)

অধোপতিত ও বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে পুনরুজ্জীবিত করতে চায়, তাকে শুধু অজ্ঞ ও সংশ্রবহীন লোকদের কাছে দাওয়াত পেশ করলেই চলে না, বরং তাকে ঐ আন্দোলনের সাথে পরিচিত ও সংশ্রবযুক্ত লোকদেরকেও বিবেচনায় আনতে হয়। যারা আগে থেকেই ঐ আন্দোলনের সাথে জড়িত এবং অন্ততপক্ষে অজ্ঞ ও সংশ্রবহীন লোকদের তুলনায় তার প্রতি ঘনিষ্ঠতর, তাদেরকে সে কোনক্রমেই উপেক্ষা করতে পারে না। তাকে সর্বপ্রথম এটা খতিয়ে দেখতে হয় যে, এ সব আপন লোকদের মধ্যে অধোপতন কতটুকু সংক্রমিত হয়েছে এবং পুরনো আন্দোলনের প্রভাবই বা তাদের মধ্যে কতটুকু বহাল আছে। তারপর তাকে এ চিন্তা করতে হয় যে, তারা আসল পথ হারিয়ে বিপথে যতদূর গিয়েছে সেখান থেকে আর যেন দূরে সরে না যায় এবং যেটুকু ভালো প্রভাব তাদের মধ্যে এখনো অবশিষ্ট আছে, তা যেন বহাল থাকে। ঐ আন্দোলনের জন্য তারা শেষ সম্বল স্বরূপ। যে শেষ সম্বল অবশিষ্ট রয়েছে, তাও হাতছাড়া হয়ে যাক–এটা কোন বুদ্ধিমান মানুষ মেনে নিতে পারে না। তাই এটা তার পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে, ঐ আন্দোলনের প্রতি মানুষের যেটুকু সংশ্রব ও আনুগত্য আপাতত রয়েছে তাকে অন্তত ঐ পর্যায়েই বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং তাকে আরো নির্জিবতা ও ক্ষয়িষ্ণুতার কবল থেকে রক্ষা করতে হবে। সংরক্ষণের এই চেষ্টায় কোনমতে সাফল্য অর্জনের পর তাদেরকে বর্তমান অবস্থায় থেমে থাকতে না দিয়ে মূল আন্দোলনের দিকে তাদেরকে টেনে আনার চেষ্টা করা এবং ঐ আন্দোলন ছাড়া অন্য কোন জিনিসকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ ও নিজেদের তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করতে না দেয়া তার অবশ্য করনীয় হয়ে দাঁড়ায় এতগুলো ধাপ অতিক্রম করার পরই শুধু তার জন্য সর্বাত্মক দাওয়াত দেয়ার পথ উন্মুক্ত হয় এবং সে নতুন আন্দোলন সংগঠনকারীর কাজ যেখান থেকে শুরু হয়, সেখানে গিয়ে উপনীত হয়।

যেহেতু ইসলামী আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনই আমার লক্ষ্য, তাই ওপরে যে পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেছি, সেই প্রক্রিয়ায় আপন লক্ষ্য পথে আমাকেও অগ্রসর হতে হবে। মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মধ্যে যেসব রকমারি গোমরাহীর উদ্ভব ঘটেছে, তার লাগাম টেনে ধরা এবং ইসলাম থেকে প্রতিনিয়ত তাদের যে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে, তাকে থামিয়ে রাখার চেষ্টাতেই মাসিক তরজুমানুল কুরআনের প্রকাশনার প্রথম চার বছর

অতিবাহিত হয়।[১] এ চেষ্টা-সাধনা চলতে থাকাকালেই আকস্মিকভাবে ১৯৩৭ সালে এরূপ আশংকা দেখা দেয় যে, সারা ভারতে স্বদেশী জাতীয়তাবাদের যে আন্দোলন প্রচন্ড ঝড় তুফানের আকারে চালু হয়ে গেছে, ভারতের মুসলমানরা তার শিকার হয়ে যেতে পারে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমরা বর্তমান নিপীড়নমূলক শাসন ব্যবস্থার[২] যতই বিরোধী হইনা কেন এবং তার কবৃজা থেকে নিষ্কৃতি লাভের আকাঙ্খা আমাদের মধ্যে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের চেয়েও প্রবল হোক না কেন; তথাপি আমরা এটা কিছুতেই বরদাশত করতে পারি না যে, যারা তখনো কিছু না কিছু ইসলামের আনুগত্যের ওপর বহাল রয়েছে তাদেরকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন——স্বীয় গণসংযোগ, বরোদা পরিকল্পনা ও বিদ্যামন্দির পরিকল্পনার কূটকৌশলের মাধ্যমে এবং নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের জোরে হিন্দু জাতীয়তার মধ্যে বিলীন করে দিক। আর এভাবে তাদের আদর্শগত ও বাস্তাব জীবনধারাকে এতদূর বিকৃত করে দিক যে, একটি দু'টি প্রজন্মের পর ভারতের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম–আমেরিকা ও জাপানের মতই অপরিচিত ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে।[৩] এ আশংকা আরো উদ্বেগজনক আকার ধারণ করেছিল এই জন্য যে, কেবলমাত্র ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি লাভের অভিলাসে মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সর্বাধিক প্রভাবশালী একটি গোষ্ঠী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সহযোগী হয়ে গেল এবং তারা ইংরেজ বিরোধিতার অন্ধ আবেগে এতটা মত্ত হয়ে গেল যে, ঐ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসার ভারতে ইসলামের ভবিষ্যতকে কিভাবে প্রভাবিত করবে সে ব্যাপারে একেবারেই চোখ বুজে রইল।[৪] তাই এ আশংকার প্রতিরোধের নিমিত্ত আমি "মুসলমান ও চলমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব" শীরোনামে ধারাবাহিকভাবে কতিপয় নিবন্ধ ১৯৩৭ সালের শেষাংশে এবং আরো কতগুলো নিবন্ধ ১৯৩৮ সালের শুরুতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করি।

---

১. আমার পুস্তক "তানকিহাত" (ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব) এই চেষ্টারই ফল।

২. অর্থাৎ তৎকালীন গোটা উপমহাদেশের ওপর জেঁকে বসা বৃটিশ সরকার। (নতুন)

৩. এ বক্তব্যের পটভূমি অনুধাবনের জন্য আমার রচিত "উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান" প্রথম খন্ড পড়ে দেখুন। (নতুন)

৪. অর্থাৎ তৎকালে আলেমদের যে গোষ্ঠীটি কংগ্রেসের সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

এ নিবন্ধমালায় আমার উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু ছিল যে, মুসলমানরা অন্তত তাদের মুসলমানিত্বের বর্তমান স্তর থেকে নীচে নেমে না যেতে পারে এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র হারিয়ে না বসে। এ জন্য আমি তাদের মধ্যে ইসলামী জাতীয়তার অনুভূতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করি। এক জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতে যে গণতান্ত্রিক ধর্মহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছিল, তার ক্ষতিসমূহ সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করি এবং যে শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচ ও "মৌলিক অধিকার" এর ওপর নির্ভর করে মুসলমানরা সেই ধ্বংসাত্মক গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের ফাদে আটকা পড়তে প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছিল, তার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করি। অধিকন্তু তাদের সামনে আমি "আধা ইসলামী আবাসভূমি"[১] গঠনের লক্ষ্য তুলে ধরি যাতে আদৌ কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে না থাকার কারণে চিন্তা ও কর্মের যে বিশৃংখলা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তাও দূরীভূত হয়। আবার তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য এমন একটা কেন্দ্রবিন্দুও হস্তগত হয়, যা প্রকৃত ইসলামী বৈশিষ্ট্য থেকেও বঞ্চিত নয়, আবার এত উঁচু স্তরেরও নয় যে, তার উচ্চতা দেখে তারা ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ে।

সে সময় যেহেতু রক্ষাকবচের ব্যাপারটাই ছিল অগ্রগণ্য, তাই আমি স্বাধীনতা, জাতীয়তা, জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টি, স্বায়ত্ব শাসিত সরকার, সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে কোন কিছু বলা থেকে স্বেচ্ছায় বিরত থেকেছি এবং এ সব শব্দের যে অর্থ সাধারণ মানুষের মনে বদ্ধমূল ছিল, তা হুবহু মেনে নিয়ে সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষাতেই বক্তব্য পেশ করেছি। অনুরূপভাবে আমরা আসলে যা চাই তা নিয়ে আলোচনা করার পরিবর্তে আমি বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যেই আলোচনা সীমিত রাখাকে অধিকতর সমিচীন মনে করেছি, যাতে এক সাথে উভয় জিনিস উত্থাপন করাতে মানুষের মগজে জট পাকিয়ে না যায় এবং এক লাফে দূরবর্তী লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টার ফলে নিকটতর লক্ষ্যও ব্যর্থ হয়ে না যায়।

যে উদ্দেশ্যে এ কাজ করা হয়েছিল, আল্লাহর অনুগ্রহে বিগত দু'তিন বছরে তা সফল হয়েছে। এখন আর এ আশংকা নেই যে, ভারতের মুসলমানরা

---

১. অর্থাৎ ভারতকে যদি একটা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আবাসভূমিতে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর না হয় তা হলে তাকে অন্তত ইসলামী আবাসভূমির অনুরূপ একটা দেশে পরিণত করা দরকার যাতে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র বজায় থাকে। (নতুন)

নিজেদেরকে কোন স্বাদেশিক জাতীয়তায় বিলীন করে দেবে কিংবা এক জাতিতত্ত্ব ভিত্তিক কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শামিল হয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার বিলোপ ঘটাবে। এ সাফল্যটুকু কোন মানবীয় চেষ্টার ফলে নয়, বরং কেবলমাত্র আল্লাহর মেহেরবানীতে অর্জিত হয়েছে। আল্লাহরই অনুগ্রহে এমন কয়েকটি উপকরণ সৃষ্টি হয়ে গেল, যার বদৌলতে মুসলমানরা এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। এ ব্যাপারে তিনি যাকে বিস্তর অবদান রাখবার সুযোগ ও সামর্থ দিয়েছেন, তাদের গর্ব নয়, বরং শোকর আদায় করা কর্তব্য।

যাহোক, এ স্তর অতিক্রম করার পর আমার সামনে পরবর্তী যে প্রশ্ন দেখা দিল, তা ছিল এই যে, যেটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তাই নিয়েই কি মুসলমানদের পরিতৃপ্তও হতে দেয়া উচিত, না তাদের মধ্যে আরো অতৃপ্তি অস্থিরতার সৃষ্টি করে তাদেরকে ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়? পাশ্চাত্য জাহিলিয়াত থেকে শেখা রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা সংক্রান্ত ভ্রান্ত মতবাদ সমূহের ঘূর্ণাবর্তেই কি মুসলমানদের পড়ে থাকতে দেয়া উচিত হবে, না তাদের সামনে ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদকে শুধু তাত্ত্বিকভাবেই নয় বরং একটি কার্যকর ও বাস্তব লক্ষ্য হিসেবেও পেশ করা কতব্য? মুসলমানদেরকে কি শুধু তাদের স্বাতন্ত্র শামাল দেয়ার কাজেই নিয়োজিত থাকতে দেয়া উচিত, না তাদেরকে এ কথাও বলা দরকার যে, তোমাদের স্বাতন্ত্রই শুধু চূড়ান্ত অভীষ্ট বস্তু নয়; বরং একটা মহত্তর লক্ষ্যের খাতিরেই তা কাম্য? এ প্রশ্ন যে মুহূর্তে আমার সামনে উদিত হয়েছে, ঠিক সে মুহূর্তেই আমার বিবেক চূড়ান্তভাবে রায় দিয়েছে যে, প্রথম কথাটা ভুল এবং একমাত্র নিয়োগ করেছি, তা না করে আমার গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত এর আরো দু'টো কারণ এমন দেখা দিল, যার দরুন বিগত নিবন্ধ সমষ্টি প্রকাশের অব্যবহিত পর বর্তমান নিবন্ধমালা লিখতে বাধ্য হলাম এবং সেটাই পাঠকবর্গের সামনে পেশ করা হলো।

প্রথম কারণটি ছিল এই যে, এই নয়া আন্দোলনের পরিচালনা কালে সাধারণ মুসলমানদের নেতৃত্ব এমন একটি গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হলো, যারা ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং নিছক জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ জাতির পার্থিব কল্যাণের জন্য তৎপর। এ গোষ্ঠীতে ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী অতি নগণ্য সংখ্যক লোক থাকলেও নেতৃত্বে তাদের কোন

স্থান নেই। একটা ভ্রান্ত রাজনৈতিক আচরণের ওপর আলেম সমাজের অব্যাহত জিদ ধরার কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, ভারতে ইতিপূর্বে আর কখনো সাধারণ মুসলমানরা আলেমদের ওপর আস্থা হারিয়ে এমন প্রচন্ড ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র বিবর্জিত নেতৃবৃন্দের ওপর আস্থা স্থাপন করেনি। আমার দৃষ্টিতে এ অবস্থাটা ইসলামের জন্য স্বদেশী জাতীয়তার আন্দোলনের চেয়ে কোন অংশে কম বিপজ্জনক নয়। ভারতের মুসলমানরা যদি (তুর্কী ও ইরানের মত[১]) ধর্মহীন লোকদের নেতৃত্বে একটা বেদীন জাতি হিসেবে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়ও, তবে তাদের এভাবে বেঁচে থাকা এবং কোন অমুসলীম জাতীয়তায় বিলীন হয়ে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্যটা কি? হীরক যদি হীরকত্বই হারিয়ে ফেলে, তাহলে তা পাথরের আকারে টিকে থাকুক অথবা ছিন্নছিন্ন হয়ে মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাক, তাতে রত্নকারের কি এসে যায়?[২]

দ্বিতীয় কারণ এই ছিল যে, আমি এই আন্দোলনের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণার চাইতে জাতীয়তাবাদী প্রেরণাকেই অনেক বেশী সক্রিয় দেখতে পেয়েছি। যদিও ভারতের মুসলমানদের কাছে ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ অনেক দিন যাবত তালগোল পাকিয়ে জগাখিচুড়ী হয়ে রয়েছে কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এই জগাখিচুড়ীতে ইসলামের উপাদান এত কম এবং জাতীয়তাবাদের উপাদান এত বেশী হয়ে গেছে যে, আমার আশংকা, ভবিষ্যতে এতে হয়তো জাতীয়তাবাদ ছাড়া আর কোন উপাদানই অবশিষ্ট থাকবে না। এ অবস্থাটা এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে, একজন উঁচুদরের বিশিষ্ট নেতা একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, বোম্বে ও কোলকাতার ধনী মুসলমানরা এ্যাংলো ইন্ডিয়ান বারবনিতাদের কাছে যায়। অথচ মুসলিম বারবনিতারা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার বেশী হকদার। এমন চরম পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পর এই মুসলিম জাতীয়তাবাদকে আর উদার মনোভাব দেখানো আমার মতে মহাপাপ। এটা জানা কথা যে, অটুট সামষ্টি জীবন গড়ে তোলার জন্য সমাজের লোকদের মধ্যে একটা না একটা অভিন্ন আনুগত্য সৃষ্টি করা যথেষ্ট, চাই সেটা আল্লাহর আনুগত্য হোক, অথবা জনগণের কিংবা মাতৃভূমির আনুগত্য হোক। কাজেই যারা কেবলমাত্র সামষ্টিক জীবনের অটুট

---

১. এ নিবন্ধের রচনাকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটেই এ কথা লিখিত হয়েছিল। (নতুন)

২. এ কথা লেখার সময় অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এখন ১৯৭২ সালের পাকিস্তানে যে অবস্থা বিরাজমান, তা কারোই দৃষ্টির অগোচর নয়। (নতুন)

সংঘবদ্ধতা চায়, তাদের এ উদ্দেশ্য যদি আল্লাহর পরিবর্তে জাতির প্রতি অভিন্ন আনুগত্য পোষণ দ্বারা অর্জিত হয়, তা হলে তাদের আর কোন দুশ্চিন্তার কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখি, তারাও যদি আল্লাহ ছাড়া আর কারো অভিন্ন আনুগত্যের ওপর আল্লাহর বান্দাদেরকে একত্রিত হতে দেখে চুপ থাকি, তাহলে আমরা কোন্ মাটির ওপর কোন্ আকাশের নীচে আশ্রয় নেবো?

এ সব জিনিসই আমাকে বর্তমান সংকলনের নিবন্ধসমূহ লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এসব নিবন্ধে আমি মুসলমানদের বিভিন্ন সংগঠনের এবং কোথাও কোথাও মুসলিম নেতৃবৃন্দের সুস্পষ্টভাবে সমালোচনা করেছি। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী যে, কোন ব্যক্তিত্ব অথবা সংগঠনের সাথে আমার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। আমি শুধু সত্যের বন্ধু এবং বাতিলের দুশমন। যে জিনিসকে, আমি সত্য মনে করেছি, তার সত্য হওয়ার পক্ষ্যে যুক্তি–প্রমাণ দিয়েছি। আর যে জিনিসকে বাতিল বিবেচনা করেছি, তার বাতিল হওয়ার পক্ষেও যুক্তি–প্রমাণ দিয়েছি। যদি কেউ আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করে এবং যুক্তি–প্রমাণ দিয়ে আমার মতামতের ভ্রান্তি প্রমাণ করে দেয় তাহলে আমি নিজের মতামত প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত। তবে যারা তাদের দল বা প্রিয় ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়েছে দেখেই ক্রোধে দিশাহারা হয়ে যায় এবং যে কথা বলা হয়েছে, তা সত্য না মিথ্যা তাও যাচাই করে না, সে সব লোকের রাগের আমি কোন পরোয়াই করি না। আমি তাদের গালিরও জবাব দেবো না এবং নিজের অনুসৃত পথও বাদ দেবো না।

আবুল আ'লা
লাহোর
ফেব্রুয়ারী ১৯৪১

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিচয়

প্রকৃতির সকল নিয়ম চিরন্তন, বিশ্বজনীন এবং সার্বজনীন। এতে কোন ব্যতিক্রম নেই। বাতাস আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে যে বিধান মেনে চলতো, আজও তা মেনে চলে এবং কেয়ামত পর্যন্ত মেনে চলবে। যুগ জামানার আবর্তন ও বিবর্তনে তাতে কোন পরিবর্তন আসে না। আলো ও তাপের জন্য যে আইন পৃথিবীর এক অংশে চালু আছে, অপরাপর অংশেও সেই আইনই চালু রয়েছে। কখনো এমন হয় না এবং হতে পারেও না যে, প্রাচ্যে তাপের প্রকৃতি ও ধরন এক আর পাশ্চাত্যে আর এক রকমের হবে এবং উত্তরে আলোর গতি এক রকমের হবে আর দক্ষিণে আর এক রকমের। বস্তুনিচয়ের ভাঙ্গা, গড়া, হ্রাস, বৃদ্ধি, জন্ম ও ক্ষয় প্রাপ্তির জন্য যেসব আইন নির্দিষ্ট রয়েছে তা সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে কোনো রকমের শৈথিল্য, রাখঢাক বা পক্ষপাতিত্ব হয় না। প্রকৃতির কোন আপন পর নেই। সে কারো বন্ধু এবং কারো শত্রু নয়। কারো ওপর সদয় এবং কারো ওপর নিষ্ঠুর নয়। আগুনে যে-ই হাত দিক, পুড়বে। বিষ যে-ই খাবে, মরবে। খাদ্য যে-ই খাবে, শক্তি ও পুষ্টি লাভ করবে। প্রকৃতির রাজ্যে এটা আদৌ সম্ভব নয় যে, দিয়াশলাই কাঠি ঘষলে কারো জন্যে আগুন এবং কারো জন্য পানির ধারা ছুটে বেরুবে।

সমগ্র বিশ্ব যে প্রকৃতির রাজত্বের অধীন, মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতিও সেই প্রকৃতিরই অংশ বিশেষ। তাই মানুষের প্রকৃতির নিয়ম-বিধিও বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম-বিধির মতই শাশ্বত, বিশ্বজনীন এবং নিরপেক্ষ। যুগের পরিবর্তনে বাহ্যিক রূপ বৈশিষ্ট্যে যতই পরিবর্তন সংঘটিত হোক, মূল প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তন আসে না। জ্ঞান এবং অন্ধ, কুসংস্কার ও আন্দাজ অনুমানে যে পার্থক্য আজ থেকে ১০ হাজার বছর আগে ছিল, আজও তাই আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। যুলুম ও ন্যায়বিচারের ব্যাপারে যে নিগূঢ় সত্য খৃষ্টপূর্ব

দু'হাজার সালে ছিল, দু'হাজার খৃষ্টাব্দেও তাই থাকবে। যা সত্য, তা চীনে যেমনসত্য, আমেরিকাতেও তেমনি সত্য। আর যা বাতিল বা অসত্য, তা শ্বেতাঙ্গের বেলায় যেমন সত্য, তেমনি কালো মানুষের বেলায়ও সত্য। মানুষের সুখ ও দুঃখ সাফল্য ও ব্যর্থতার ব্যাপারে প্রকৃতির আইন সকল ভেদাভেদ ও পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে। কোন ব্যক্তি, কোন জাতি, এবং কোন প্রজন্মের সাথে তার কোন বৈষম্যমূলক সম্পর্ক নেই। সুখ-সমৃদ্ধির উপকরণ এবং দুঃখ-দুর্দশার উপকরণ সকলের জন্যই সমান। যে ব্যক্তি দুঃখ-দুর্দাশার উপকরণ সংগ্রহ করবে, সে কেবল কোনো বিশেষ দেশ, জাতি বা প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুবাদেই সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে যাবে—এটা অসম্ভব। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সুখ-সমৃদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ করবে, সে শুধুমাত্র অমুক প্রজন্মের সাথে সংশ্লিষ্ট কিংবা অমুক নামে খ্যাত হওয়ার কারণেই আপন উপার্জনের সুফল থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে-তা হতে পারে না।

মানব প্রকৃতির এই চিরন্তন, বিশ্বজোড়া ও বৈষম্যমুক্ত বিধানেরই আর এক নাম "ইসলাম"। যিনি সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টা এবং যিনি মানুষের ও সমগ্রদ বিশ্বজগতের স্বভাব প্রকৃতির নির্মাতা, তিনিই এই বিধান-তথা ইসলামকে মানুষের সামনে উন্মোচন করেছেন। এটা এমন কোন জাতীয়তাবাদীর খেশখেয়াল নয় যে, সারা পৃথিবীকে নিজ জাতির স্বার্থ ও কল্যাণের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এটা এমন কোন শ্রেণীভিত্তিক নেতার চিন্তাধারাও নয় যে, প্রতিটি ব্যাপারে কেবল একটি বিশেষ শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকেই দৃষ্টি দিয়ে থাকে। মোট কথা, ইসলাম কোন মানুষের চিন্তা-গবেষণার ফসল নয় যে, কোন বিশেষ যুগ, বিশেষ পরিবেশ, বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর রুচী ও পসন্দের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। আসলে এটা হলো স্বয়ং বিশ্বজগতের মালিক ও মনিব আল্লাহর হেদায়াত বা পথনির্দেশ থেকে সংগৃহীত। আর বিশ্বজাতের মনিব হচ্ছেন এমন এক সত্তা, যার দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। মানুষকে তিনি মানুষরূপেই দেখেন, ভারতীয়, জার্মান এবং ইটালিয়ান হিসেবে নয়, অথবা শ্রমিক, কৃষক বা পুঁজিপতি হিসেবে নয়। ব্যক্তি ও জাতি বিশেষের প্রতি তার কোন আকর্ষণ বা টান নেই। তাঁর যা কিছু আকর্ষণ, তা কেবল মানুষের প্রতি। তাই তিনি সততা, নৈতিকতা ও উন্নত সামাজিক জীবনের যতগুলো মূলনীতি দিয়েছেন, তার সবই সকল ধরনের সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। সামগ্রিকভাবে সকল মানুষের কল্যাণ ও সুখসমৃদ্ধি এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সাফল্য এনে দেয়াই এ

মূলনীতিসমূহের লক্ষ্য। বিশ্ব প্রকৃতির অন্য সকল নিয়ম-বিধির মতই এগুলো সারা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত। কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা জাতির সাথে তার এমন কোন আত্মীয়তা নেই, যা অন্যান্য জাতি বা ব্যক্তির সাথে থাকতে পারে না। এ সব মূলনীতিকে গ্রহণ করে তদনুযায়ী কাজ যেই করুক, সে সাফল্যমন্ডিত হবে। চাই সে রোমক হোক, কিংবা নিগ্রো, আর্য হোক কিংবা সিমেটিক, আমেরিকার বাসিন্দা হোক কিংবা এশিয়ার। আর যে-ই এ সব মূলনীতি ভ্রষ্ট হবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, চাই সে কোন নবীর সন্তানই হোক না কেন। ইসলামের এ বিশ্বজনীন আদর্শ অনুযায়ী মানব জীবনকে পূণর্গঠন করা ইসলামের সত্যতা ও সঠিকতায় বিশ্বাস স্থাপনকারী মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি, তাই এটাই আমাদের সকল চেষ্টা-সাধনার আসল উদ্দেশ্য।

কিন্তু যখন আমরা বলি যে, সর্বপ্রথম নিজেদের দেশকে এবং তারপর সারা দুনিয়াকে "দারুল ইসলাম" (ইসলামের আবাসভূমি) বানানোই আমাদের উদ্দেশ্য, তখন একথা শুনে অজ্ঞ লোকেরা এরূপ ভুল ধারণায় লিপ্ত হয় যে, প্রত্যেক আবেগময় জাতীয়তাবাদী যেমন পৃথিবীতে আপন জাতির বিজয় ও প্রতিষ্ঠা দেখতে উৎসুক হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি মুসলমানরাও স্বীয় জাতিকে বিজয়ী ও শাসকরূপে দেখতে প্রবলভাবে আগ্রহী। তারা "মুসলমান" জাতির সন্তান বলেই "মুসলিম সরকার" তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ লোকেরাই যদি হিন্দু সমাজে জন্ম নিত, তাহলে তারা মুঞ্জে ও সাভারকর[১] ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো তারা যদি জার্মানীতে জন্ম নিত, তাহলে হিটলারও গোয়েরিং এর রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতো। আর যদি ইটালির সন্তান হতো, তাহলে নির্ঘাত মুসোলিনীরূপে আবির্ভূত হতো।

এ ভুল বুঝাবুঝির উৎপত্তির একমাত্র কারণ এই যে, "ইসলামের আবাসভূমি" বা ইসলামী রাষ্ট্রকে "মুসলমানদের আবাসভূমি" বা মুসলিম রাষ্ট্রের সমার্থক মনে করা হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ দু'টোতে বিরাট পার্থক্য বিরাজমান। যারা কালেমায়ে তৈয়েবার মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে ইসলামের গন্ডীর মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং সামাজিকভাবে মুসলমান গণ্য হয়ে থাকে, তারা যদি অনৈসলামিক পন্থায় দেশ শাসন করে, তবে তাদের

---

১. এরা দু'জন তৎকালে কট্টর সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতা ছিলেন (নতুন)

শাসনাধীন রাষ্ট্রকে মুসলমান রাষ্ট্র তো অবশ্যই বলা যাবে। কেননা ঘটনাক্রমে কালেমা উচ্চারণকারীরা তার শাসন কর্তারূপে বর্তমান। তবে এ ধরনের রাষ্ট্র কোনো ক্রমেই ইসলামী রাষ্ট্র নয় এবং তার ক্ষেত্রে "ইসলামের আবাসভূমি" কথাটাও সঠিক অর্থে প্রযোজ্য হতে পারে না। এ ধরনের "মুসলিম রাষ্ট্র" কায়েম করা কখনো আমাদের অভিপ্রায় নয়। আমরা যদি এ উপায়ে আমাদের জাতির বড়াই প্রতিষ্ঠা করতে চাই এবং নিছক সামরিক শক্তির জোরে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে দেশের সম্পদ ও শাসন কর্তৃত্বের দাপট আপন জাতির জন্য নির্দিষ্ট করা আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তা হলে স্বয়ং ইসলামই সবার আগে সামনে এগিয়ে এসে আমাদেরকে যালেম ও নৈরাজ্যবাদী ঠাওরাবে। কেননা তার স্পষ্ট উক্তি এই যে ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا-(القصص:٨٣)

"আখেরাতে সম্মান ও মর্যাদা শুধু তাদেরই জন্য আমি নির্দিষ্ট করে রেখেছি যারা পৃথিবীতে আপন বড়াই প্রতিষ্ঠা করতে চায় না এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির অভিলাসী নয়।" (আল কাসাসঃ ৮৩)

বস্তুত আমরা আসলে মুসলমানদের শাসন নয় ইসলামের শাসন চাই। সততা, নৈতিকতা ও উন্নত সামাজিক জীবনের বিশ্বজনীন নীতিমালার সমষ্টি যে ইসলাম, সেই ইসলামেরই শাসন চাই। এ ইসলাম আমাদের বা অন্য কারোর বাপ–দাদার পরিত্যক্ত সম্পত্তি নয়। কারো সাথে তার কোন ভিন্ন সম্পর্ক নেই। যে ব্যক্তি এ সব নীতিমালার ওপর ঈমান আনবে এবং তদনুসারে কাজ করবে, সে–ই ইসলামের পতাকাবাহী। সে যদি বংশানুক্রমিকভাবে মুচি মেথরও হয়, তবু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলিফার আসনে অধিষ্ঠিত হবার অধিকার তার আছে। সে নাক কাটা হাবশী গোলামও হয়, তবু আরব ও অনারব নির্বিশেষে সারা দুনিয়ার সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সরদার বা নেতা হতে পারে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির বংশে সাড়ে ১৩ শো বছর ধরে ইসলামী জীবনধারা চালু রয়েছে, সে যদি ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়, তবে ইসলামে তার কোন স্থান থাকে না। আর যে ব্যক্তি কাল পর্যন্তও হিন্দু, খৃষ্টান অথবা অগ্নি উপাসক ছিল, শির্ক, মূর্তিপূজা, মদখোরী,

সুদখোরী ও জুয়াবাজীতে লিপ্ত ছিল, সে যদি আজ ইসলামের স্বভাগত সত্য আদর্শকে মেনে নিয়ে বাস্তবেও তার অনুসরণ করে, তবে ইসলামে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চতম স্থানগুলোতে পৌছবার পথ তার জন্য উন্মুক্ত।

এ সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, আমাদের উদ্দেশ্য এক জাতির ওপর অন্য জাতির প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, আমাদের ঈমান ও বিবেকের দৃষ্টিতে যে নীতিমালা বিশুদ্ধ ও নির্ভুল, তার আলোকে আমাদের গোটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবকাঠামোকে বিন্যস্ত করা। এতে যদি কেউ ভ্রুকুঞ্চিত করে, তবে আমি বুঝে উঠতে পারি না যে, তার আপত্তির কারণটা কি।

এটা সবার জানা যে, যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোন মতাদর্শকে সমালোচকের দৃষ্টিতে অথবা গবেষকের দৃষ্টিতে পড়াশুনা করার পর নিশ্চিত হয় যে, এতে মানবতার মুক্তি ও সাফল্য এবং মানবীয় সম্পর্ক ও আচরণের সর্বোচ্চ উৎকর্ষের ব্যবস্থা রয়েছে; তখন যে সমাজের সাথে তার জীবন ও মরণ এক সূত্রে গাথা এবং যে মানবগোষ্ঠীর সাথে সে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, সেই সমাজ ও সেই মানব গোষ্ঠীর জীবন কাঠামোকেই সবার আগে সেই মতাদর্শ অনুসারে গড়ে তোলার চেষ্টা–সাধনা করার ইচ্ছা তার মনে স্বাভাবিকভাবেই জন্মে। তার মনোনীত উক্ত মতাদর্শের বিশুদ্ধতা ও উপকারিতা সম্পর্কে তার বিশ্বাস যতই দৃঢ় হবে এবং তার অন্তরে মানব প্রেম অথবা দেশপ্রেমের ভাবধারা যত প্রবল ও তীব্র হবে, ততই সে তার স্বজাতিকে তাদের সাফল্য, সুখ ও সমৃদ্ধির উৎস ঐ সত্য মতাদর্শ দ্বারা উপকৃত করার জন্য ব্যাকুল ও উদগ্রীব হবে এবং ঠিক ততখানি তীব্রতার সাথেই সে সেই সব মতাদর্শের কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের বিরোধী হবে, যাকে সে পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে ক্ষতিকর ও ভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করে। এটা মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণ স্বাভাবিক দাবী এবং এতে দেশপ্রেমের পরিপন্থী কিছু নেই। বরঞ্চ কোন মানুষ যে আদর্শকে পূর্ণ সততার সাথে মুক্তি ও সমৃদ্ধির নিশ্চিত উপায় বলে মনে করে, তাকে নীরবে আপন মনে লুকিয়ে রাখবে অথবা তা নিয়ে ঘরের কোণে বসে থাকবে আর যেসব পন্থা ও পদ্ধতিকে সে সততার সাথে ক্ষতিকর মনে করে, তাকে স্বজাতির ঘাড়ের ওপর জেঁকে বসতে দেবে, এটাই হলো দেশপ্রেম বিরোধী কাজ।

পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যারা অধ্যয়ন করেছে এবং তাকে সঠিক বলে অনুধাবন করেছে, তারা আজ চেষ্টা করছে কিভাবে ভারতের সাংস্কৃতিক অবকাঠামোকে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের নমুনা অনুসারে গঠন করা যায়। যারা

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে পড়াশুনা করেছে এবং তাকে সঠিক বলে উপলব্ধি করেছে, তারা ভারতের সামাজিক পুনর্গঠনের (Social Reconstruction) কাজটা মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের পদ্ধতিতেই সম্পন্ন করতে সচেষ্ট। এর কারণ কি? এটা তাদের আকীদা ও বিশ্বাসের দাবী, এ ছাড়া এর স্বপক্ষে আর কিইবা যুক্তি-প্রমাণ দর্শানো সম্ভব? তাদের এই উদ্যোগকে কি কেউ দেশপ্রেম অথবা মানব হিতৈষণার বিরোধী বলে আখ্যায়িত করতে পারবে? যে মতাদর্শকে তারা স্বজাতির সুখ ও সমৃদ্ধির নিশ্চিত উপায় বলে জানে, তার প্রচলন ও বাস্তবায়নের চেষ্টা না করা এবং যে মতাদর্শ তাদের বিশ্বাস অনুসারে দেশবাসীর পশ্চাদপদতা ও দুঃখ-দুর্দশা ডেকে আনে, তাকে আপন দেশবাসীর ঘাড়ে সওয়ার হতে দেয়া কি তাদের পক্ষে সততার পরিচায়ক হবে? ধরা যাক, যদি দেশের স্বাধীনতা এবং বিশ্বের অন্যান্য জাতির চোখে স্বদেশবাসীর গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা কোন একনায়কতন্ত্র মূলক শাসন প্রতিষ্ঠা অথবা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল থাকাতেই নিহিত থাকে, তা হলে কি কোন সত্যিকার গণতন্ত্রকামী অথবা কোন নিষ্ঠাবান সমাজতন্ত্রীকে আবেদন জানানো যাবে যে, দেশের স্বাধীনতা ও মর্যাদার খাতিরে তারা নিজ নিজ আদর্শ ত্যাগ করে একনায়কত্ব অথবা পুঁজিবাদকে বরণ করে নিক? আর এই উভয় আদর্শের বাহকদের কি এ ধরনের আবেদন শুনে আপন আদর্শ পরিত্যাগ করা উচিত?

আমরা ভারতীয় মুসলমানরা আজ ঠিক এ অবস্থারই সম্মুখীন। যে প্রেরণা অন্যান্যদেরকে 'গণতন্ত্র' ও 'সমাজতন্ত্র' এর ধুয়া তুলতে উদ্বুদ্ধ করছে, ঠিক সেই প্রেরণাই আমাদেরকে 'ইসলামী আবাসভূমি'র দাবী তুলতে বাধ্য করছে। আমরা দীর্ঘকাল ব্যাপী ইসলামকে তত্ত্বানুসন্ধান ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করেছি। আমরা তার বিশ্বাস ও চিন্তাগত ভিত্তি, তার জীবন দর্শন, তার চারিত্রিক মূলনীতি, তার সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা, তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা, তার রাজনীতি ও প্রশাসন সংক্রান্ত বিধান—এক কথায় তার প্রতিটি জিনিস যাচাই ও পরখ করে দেখেছি। আমরা দুনিয়ার অন্যান্য যাবতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মতবাদ সমূহ তন্ন তন্ন করে পর্যালোচনা করে দেখেছি এবং ইসলামের সাথে তার তুলনা করেছি। এই সমস্ত অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা দ্বারা আমরা এ ব্যাপারে আরো বেশী করে নিশ্চিত হয়েছি যে, মানুষের সত্যিকার মুক্তি ও সৌভাগ্য যদি কোন কিছুতে নিহিত থেকে থাকে, তবে তা কেবল ইসলামেই রয়েছে। এর তুলনায় প্রতিটি

মতাদর্শই অসম্পূর্ণ ও ক্রটিপূর্ণ। অন্য কোন মতাদর্শের নৈতিক ভিত্তি সুষ্ঠু ও স্থির নয়। অন্য কোন মতাদর্শে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের (Development of Personality) পূর্ণ সুযোগ নেই। অন্য কোন মতাদর্শে সামাজিক সুবিচার (Social Justice) এবং আন্তমানবিক সম্পর্কের ভারসাম্য (Balance) রক্ষিত হয়নি। মানব প্রকৃতির সকল দিকের সুষম ও যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও যত্নের ব্যবস্থা অন্য কোন মতাদর্শে নেই। পৃথিবীতে ইসলাম ছাড়া আর কোন জীবন ব্যবস্থা এমন নেই, যা মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনতায় অভিষিক্ত করে। তাকে সম্মান ও গৌরবের উচ্চতর মার্গের দিকে নিয়ে যায় এবং এমন পরিবেশের সৃষ্টি করে, যার অধীন প্রতিটি ব্যক্তি আপন ক্ষমতা ও যোগ্যতা (Capacity) অনুসারে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত উন্নতির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে পারে এবং সেই সাথে আপন জাতির অন্যান্য লোকদের জন্যও একই ধরনের উন্নতি অর্জনের সহায়ক হয়।

এই নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জনের পর আমাদের জন্য সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতার দাবী কি দাঁড়ায়? আমাদের গণতন্ত্রকামী ও সমাজতন্ত্রকামী স্বজাতীয়দের বেলায় যা হয়, আমাদের বেলায় কি তা থেকে পৃথক কিছু হওয়া সম্ভব? যে সামাজিক ব্যবস্থাকে আমরা পূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠতা সহকারে মানবজাতির জন্য কল্যাণকর মনে করি, আমাদের দেশ ও জাতির সামগ্রিক জীবনকে সে অনুযায়ী সংগঠিত করার চেষ্টা করা কি আমাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় না? যা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকামীদের ক্ষেত্রে সত্য, আমাদের ক্ষেত্রে তা অসত্য হবে কেন?

আমরা মুসলিম পরিবারে জন্মেছি এবং ইসলামের প্রতি আমাদের একটা জন্মগত টান আছে বলেই যে আমরা এ মত পোষণকারী, তা নয়। আমার অন্যান্য সাথীদের সম্পর্কে তো বলতে পারি না যে, তারা কি মনে করে। তবে আমার নিজের কথা বলতে পারি যে, আমি নিজের পারিপার্শিক মুসলিম সমাজে ইসলামকে যে আকারে পেয়েছি, আমার তার প্রতি কোনই আকর্ষণ ছিল না। পর্যালোচনা ও তত্ত্বানুসন্ধানের যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়ার পর আমি সর্বপ্রথমে যে কাজটি করেছিলাম, তা এই যে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাণহীন ধার্মিকতার নামাবলী খুলে দূরে ছুড়ে মেরেছি। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে যে ধর্মের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়, প্রকৃতপক্ষে তারই নাম যদি ইসলাম হতো, তা হলে হয়তো বা আমিও আজ নাস্তিক ও ধর্মহীনদের দলভুক্ত হয়ে যেতাম। কেননা আমার মধ্যে নাৎসী দর্শনের প্রতি কোন ঝোঁক

নেই যে, নিছক জাতীয় জীবনের খাতিরে বাপ–দাদার পূজা করতে থাকবো। কিন্তু যে জিনিসটি আমাকে নাস্তিকতার পথে পা বাড়ানো কিংবা অন্য কোন সামাজিক মতাদর্শ গ্রহণ থেকে রক্ষা করেছিল, সেটি ছিল কুরআন ও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন চরিত অধ্যয়ন। এ অধ্যয়নই আমাকে নতুন করে মুসলমান বানায় এবং মানবতার প্রকৃত মূল্যমান সম্পর্কে অবহিত করে। এ অধ্যয়ন থেকেই আমি স্বাধীনতার সেই নিগূঢ় তত্ত্ব জানতে পেরেছিলাম, যার উচ্চতা ও মহত্ত্বের কল্পনা করাও দুনিয়ার বড় বড় উদারনৈতিক ও বিপ্লবী মনীষীদের পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত সৎ চরিত্র ও সামাজিক ন্যায়নীতির এমন এক অনুপম চিত্র এ অধ্যয়নের ফলে আমার সামনে প্রতিভাত হয়েছে, যার চেয়ে উত্তম চিত্র আমি আর কখনো দেখিনি। এ অধ্যয়ন থেকে আমি মানব জীবনের জন্য যে নির্বাচিত কর্মসূচী (Scheme of life) পেয়েছি, তাতে এমন উঁচু স্তরের ভারসাম্য দেখতে পাওয়া যায়, যেমন ভারসাম্য একটি পরমাণুর বন্ধন থেকে শুরু করে মহাকাশের গ্রহ উপগ্রহের আকর্ষণের বিধান পর্যন্ত গোটা বিশ্বজগতের নিয়ম–শৃংখলায় বিদ্যমান। আর এই জিনিসটা থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি যে, এই ইসলামী বিধানও সেই মহাবিজ্ঞানী রচিত, যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে পরম সত্য ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে আমি একজন নয়া মুসলমান। সূক্ষ্ম যাঁচাই পরখের পরই আমি সেই মতাদর্শের ওপর ঈমান এনেছি যার সম্পর্কে আমার বিবেক ও মন সাক্ষ্য দিয়েছে যে, মানুষের পরিশুদ্ধি ও কল্যাণের এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। আমি শুধু অমুসমিদেরকে নয় বরং মুসলমানদেরকেও ইসলামের দিকে দাওয়াত দেই। এ দাওয়াত দ্বারা ইসলামের পথ থেকে দূরে সরে যাওয়া তথাকথিত মুসলিম সমাজকে টিকিয়ে রাখা ও তার সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার দাওয়াত এই যে, এস পৃথিবী যে যুলুম ও হঠকারিতার করাল গ্রাসে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে তার উচ্ছেদ ঘটাই, মানুষের ওপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম করি এবং কুরআনের দেয়া রূপরেখা অনুসারে এমন এক নতুন পৃথিবী গড়ে তুলি, যেখানে মানুষের জন্য সত্যিকার মানবোচিত সম্মান ও মর্যাদা থাকবে, সাম্য ও স্বাধীনতা থাকবে, ন্যায়নীতি ও সদাচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে ভারতের পরিস্থিতি এমন আকার ধারণ করেছে যে, ইসলাম প্রচারের নাম শুনতেই একজন মানুষের ভোটের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং

রাজনৈতিক বিজয় ও আধিপত্য লাভের আকাংখা এবং এ ধরনের অন্যান্য বহু জিনিস জেগে ওঠে। এক দিকে গণতান্ত্রিক ধাঁচের শাসন ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে রাজনৈতিক শক্তি এবং তার যাবতীয় আনুসঙ্গিক সুবিধা একমাত্র ভোটের সংখ্যাধিক্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অপরদিকে মুসলমানদের অবস্থা এখানে এরূপ যে, তাদের পক্ষ থেকে আপন আদর্শ বিস্তারের যে কোন চেষ্টা পরিচালিত হলেই তাদের সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ পোষণ করা হয় যে, এ উচ্চাভিলাসী জাতিটা এ পথ ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার মতলব এটেছে। এ সন্দেহকে প্রবলতর করার ব্যাপারে খোদ মুসলমানদেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাদের ভুল প্রতিনিধিত্বকারী কিছু লোক এমনভাবে তাবলীগের ধুয়া তুলেছে, যেন তা একটা রাজনৈতিক কৌশল এবং তা এ গণতান্ত্রিক যুগে শুধুমাত্র আপন সংখ্যাস্বল্পতা ঘুচানোর উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এর ফলে ইসলামের পথে বিদ্বেষের এক দুলংঘ্য প্রাচীর অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজতন্ত্র, কমুনিজম, ফ্যাসিবাদ অথবা অন্য কোন মতবাদ প্রচার করা হলে লোকেরা কেবল প্রচারকের ব্যক্তিগত গুণাগুণের আলোকে তার বিচার বিবেচনা করে। তা যদি তাদের বিবেককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয় তবে তা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ইসলামকে যখন নিছক একটি রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে পেশ করা হয়, তখন মানুষ ভাবতে শুরু করে যে, এটা তো ইতিপূর্বে এ দেশের শাসক ছিল—এমন একটি জাতির মতাদর্শ এবং এ গণতান্ত্রিক যুগে নিজেদের ভোটের স্বল্পতা ঘুচিয়ে প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদ সমূহের আসন ও চাকুরী দখল করার উদ্দেশ্যেই এর প্রচার চালানো হচ্ছে। এ চিন্তা-ভাবনা মাথায় সওয়ার হওয়া মাত্রই মন-মগজের ওপর ঘৃণা ও বিদ্বেষের তালা ঝুলে পড়ে এবং ব্যক্তিগত গুণাগুণের আলোকে যাচাই-বাছাই করার প্রশ্নই অবান্তর হয়ে পড়ে।

আমাদেরকে এ পরিস্থিতি চরম ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করতে হবে। সত্য ও ন্যায়ের পথে সব সময়ই নানা রকমের সমস্যা অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে। শয়তানের পথ সহজগম্য এবং হকের পথ চিরদিনই দুর্গম। কেবল ধৈর্য, অবিরত চেষ্টা ও সাধনা এবং খালেছ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে আমরা মুসলিম অমুসলিম উভয়েরই মন জয় করতে পারি। যখন আমাদের চেষ্টা-সাধনায় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানব জাতির হীতকামনা ছাড়া কোন দুনিয়াবী স্বার্থের লেশমাত্রও থাকবে না, তখন মানুষের মন স্বতস্ফূর্তভাবে এ সত্য উপলব্দি করতে পস্তুত হয়ে যাবে যে, ইসলাম কোন বিশেষ জাতি-

গোষ্ঠীর পুরুষানুক্রমিক সম্পদ নয় বরং তা একটা মানবীয় আদর্শ। সকল মানুষের সাথে বাতাস ও পানির যেমন মুক্ত ও অবাধ সম্পর্ক, ইসলামের সাথেও তেমনি সকল মানুষের অবাধ সম্পর্ক। এ আদর্শের আওতায় প্রতিটি মানুষ অপরাপর মানুষের সাথে সমান অংশীদার হতে সক্ষম। এটা যেমন মুসলমানদের সম্পদ, তেমনি তোমাদেরও সম্পদ হতে পারে। বরঞ্চ সততা, পরহেজগারী ও আল্লাহর আইনের আনুগত্যে তোমরা যদি পুরুষানুক্রমিক মুসলমানদেরকে অতিক্রম করতে পার তা হলে তোমরাই পাবে নেতৃত্ব, অগ্রাধিকার, সম্মান ও মর্যাদা, তোমরাই হবে খেলাফতের অধিকারী এবং পুরুষানুক্রমিক মুসলমানরা তোমাদের পেছনে পড়ে থাকবে। এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বর্ণবাদ নেই যে, সম্মান, মর্যাদা, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ওপর কোন গোষ্ঠীবিশেষের চিরকাল একচেটিয়া অধিকার থাকবে। এখানে এক জাতির ওপর আর একজাতির আধিপত্যের প্রশ্নই ওঠে না। ইসলাম প্রচারের ব্যাপারটা অচ্ছুত উদ্ধারের[১] মত নয় যে, একটি জাতিকে নিছক অন্য জাতির ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তার অঙ্গীভূত করা হবে, অথচ জীবনের উপকরণাদি ভোগ করার ক্ষেত্রে তাকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না।[২] ইসলামে তো শুধু সমান অধিকার নয় বরং ব্যক্তিগত গুণাবলীর বিচারে কোনো ব্যক্তি বাড়তি অধিকারও ভোগ করতে পারে। এখানে জন্মগতভাবে মানুষে মানুষে কোনো বৈষম্য নেই। পেশা বা জাতীয়তার কারণে কারো উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয় না। তুমি নিজের চরিত্র ও কর্মের বলে যত উর্ধে খুশী উড্ডয়ন করতে পার। ভূ–পৃষ্ঠ থেকে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত তোমার উন্নতির পথে কোন অন্তরায় নেই।

কারো কারো মনে এরূপ খট্‌কাও আছে যে, ইসলাম ১৩/১৪ শো বছর আগের ধর্ম। একে আজ একটা দার্শনিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের আকারে পুনরুজ্জীবিত করার অবকাশ কোথায়?

যারা দূর থেকে কোন জিনিসকে ভাসাভাসাভাবে দেখে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাদের সিদ্ধান্ত সাধারণত ভুল হয়ে থাকে। এ লোকেরা ঠিক সেই ধরনের

১· অর্থাৎ অস্পৃশ্য জাতিগুলোকে নীচতা থেকে ওপরে তোলার চেষ্টা। (নতুন)

২· ভারতের কোটি কোটি অচ্ছুত যাতে হিন্দু জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়, সে জন্য তৎকালিন হিন্দু নেতৃবৃন্দ এ আন্দোলন চালিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যত সেই মজলুম লোকদের যে মর্যদা হিন্দু জাতিতে ছিল, তা অপরিবর্তিতই থেকে গিয়েছিল। (নতুন)

ভুলই করে যাচ্ছে। তারা গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করেনি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ওপরও তারা অনুসন্ধানী দৃষ্টি দেয়নি। এ জন্য নিছক আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইসলাম হলো এখন থেকে ১৩ শো বছর আগেকার একটা ধর্মীয় আন্দোলন। সেই ধর্মীয় আন্দোলন তৎকালীন বিশেষ সামাজিক পরিবেশে উপকারী প্রমাণিত হয়েছিল, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। এ যুগের পরিস্থিতি ও পরিবেশে সেই প্রাচীন আদর্শ দ্বারা কোনোই উপকার সাধিত হবে না। এ ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি ও বদ্ধমূল হওয়ার পেছনে স্বয়ং মুসলমানদের কার্যকলাপেরও অবদান কম নয়। তারা নিজেরাও ইসলামের প্রতি সুবিচার করেনি। তারা ইসলামকে একটি আন্দোলনের পরিবর্তে নিছক পূর্বপুরুষদের আমলের একটা পবিত্র উত্তরাধিকার বানিয়ে রেখেছে। অথচ বিকারমুক্ত বিবেকের অধিকারী কোনো ব্যক্তি যদি মন থেকে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক গোড়ামী এবং পূর্বনির্ধারিত ধারণা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ইসলামকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করে, তা হলে সে সহজেই বুঝতে পারে যে, ইসলাম কোনো বিশেষ যুগের এবং বিশেষ স্থান ও কালের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ ধর্মীয় আন্দোলন নয় বরং তা এমন কতকগুলো নীতি ও আদর্শের সমষ্টি যার ভিত্তি মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির চিরন্তন বৈশিষ্ট্যের ওপর জন্মগত স্বাভাব সর্বাবস্থায় একই রকম থাকে। যুগ যামানার যতই উত্থান-পতন হোক, প্রাকৃতিক জগতের বাস্তবতা ও তার নিয়ম নীতির কোনো পরিবর্তন হয় না। সুতরাং যে স্বাভাবিক নীতি ও আদর্শ নূহ আলাইহিস্ সালামের মহাপ্লাবনের সময় মানব জীবনের জন্য কল্যাণকর ছিল, আজকের এই বিংশ শতাব্দীতেও সেই নীতি ও আদর্শই কল্যাণকর। আর ৫ হাজার খৃষ্টাব্দেও মানুষকে সুখ ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে সেই আদর্শই যথেষ্ট হবে। পরিবর্তন যেটুকু হবে, তা এই স্বভাবগত আদর্শে নয়, বরং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে তার বাস্তবায়নেই (Application) হবে ইসলামের পরিভাষায় এরই নাম হলো 'ইজতিহাদ।' অর্থাৎ মূলনীতিকে সঠিকভাবে বুঝে নিয়ে আইনের মূল ভাবধারা অনুসারে নতুন পরিস্থিতে তার বাস্তবায়ন। বস্তুত এ ইজতিহাদই ইসলামী জীবন বিধানকে একটি গতিশীল ও চালিকা শক্তি সম্পন্ন বিধানে পরিণত করে থাকে এবং তার আইন বিধিকে পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের দাবী অনুসারে বিন্যস্ত করতে থাকে।

(তরজুমানুল কুরআন, জুলাই, ১৯৩৯)

৪

ইসলামী আন্দোলনের অধোগতি

পৃথিবীতে যখন কোনো নৈতিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোনো আন্দোলন পরিচালিত হয়, তখন একমাত্র সেই সব লোকই তাতে শরীক হয়, যাদের মন–মগজ ঐ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যাদের স্বভাব–প্রকৃতি ঐ আন্দোলনের মেজাজের সাথে সংগতিশীল হয়। যাদের মন সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র এ আন্দোলনই সঠিক ও যুক্তিসংগত এবং যারা পূর্ণ আগ্রহ–উদ্দীপনা নিয়ে তাকে এগিয়ে নিতে ও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রসর হয়। তারা ছাড়া অন্য সবাই প্রথম সুযোগেই তাকে প্রত্যাখ্যান করে। কেননা তাদের জন্মগত স্বভাব–প্রকৃতিই ঐ আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এ আন্দোলনে যারা আসে, তাদেরকে ধরে আনতে হয় না বরং আপনা থেকেই আসে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর–জবরদস্তি করে কেউ তাদেরকে আন্দোলনে ঢুকিয়ে দেয় না, কিংবা একজন অন্ধকে কেউ জঙ্গলে এনে ছেড়ে দিলে সে যেমন বুঝতেই পারে না যে, সে কোথায় এসেছে এবং কি জন্য তাকে আনা হয়েছে, তেমনিভাবে কোনো ব্যক্তিকে কেউ এ আন্দোলনে ধরে এনে ছেড়ে দিতে পারে না। যারাই এ আন্দোলনে আসে, ভালো মত যাচাই–পরখ করে, স্বেচ্ছায়, সচেতনভাবে ও বুঝে সুঝেই আসে। আর যখন আসে তখন আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে নিজেদের উদ্দেশ্যে পরিণত করে। কেননা ঐ উদ্দেশ্যই তাদের মন–মগজকে আকৃষ্ট করে থাকে। তারা ঐ আন্দোলনের নীতি ও আদর্শকে আপন নীতি ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। কেননা এ সব নীতি ও আদর্শকে সত্য ও নির্ভুল জেনেই তারা আন্দোলনে শামিল হয়ে থাকে। তাদের জন্য এ আন্দোলন পরিচালনা করা জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কেননা তাদের অন্তরাত্মা এ মতাদর্শকে সত্য ও সঠিক বলে স্থির করার কারণেই তারা তাদের পূর্বতন মতাদর্শ ত্যাগ করে

এবং এই নতুন মতাদর্শকে গ্রহণ করে। আসলে এ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তারা মহাসত্যকে চিনতে পারে। এ চিনতে পারার কারণেই তারা এ আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হয়। সত্যকে জানতে ও চিনতে পারার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তা মানুষকে জানা ও চেনার পূর্ববর্তী অবস্থানে স্থির থাকতে দেয় না, বরং তা তাকে যে দিকে সত্যের আলো প্রতিভাত হয়, সেদিকেই টেনে নিয়ে যায়। এ জন্যই যারা কোনো আন্দোলনকে সত্য ও সঠিক বুঝে গ্রহণ করে তাদের জীবনই পাল্টে যায়। তারা আগে যেমন ছিল, তার সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়। তাদের দ্বারা এমন সব কাজ সম্পন্ন হয়, যা স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের কাছ থেকে আশাই করা যায় না। তারা আদর্শের জন্য বন্ধুত্ব এবং রক্ত হৃদয়ঘটিত সম্পর্ক পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। তারা নিজেদের ব্যবসায়, সম্মান ও মর্যদা এক কথায় সব কিছুর ক্ষতি স্বীকার করে, এমনকি জেল-যুলুম ও ফাঁসির ঝুঁকি পর্যন্ত গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এটা এমন এক সর্বাত্মক বিপ্লবের আকার ধারণ করে যে, তার প্রভাবে তাদের আদত-অভ্যাস, চাল-চলন ও স্বভাব-চরিত্র পর্যন্ত পাল্টে যায়। এমনকি তাদের চেহারা, পোশাক, খাদ্য এবং সাধারণ জীবন ধারার ওপরও তার এমন সুস্পষ্ট প্রভাব পড়ে যে, পারিপার্শ্বিক লোকজনের মধ্য থেকে তাদেরকে তাদের প্রতিটি চলন বলন দ্বারা পৃথক করে চিনে নেয়া যায়। প্রত্যেকেই তাদেরকে দেখেই বলে দিতে পারে যে, ঐ যে যাচ্ছে অমুক আন্দোলনের কর্মী।

প্রত্যেক আন্দোলনেরই সূচনা ঘটে এভাবে। এ আন্দোলন এমন লোকদের দ্বারাই গড়ে ওঠে যারা তা পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর থাকে। এর উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিজেই চারপাশে ছড়ানো সমাজের হাজারো মানুষের ভীড়ের মধ্য থেকে নিজের চাহিদামত লোক বেছে বেছে বের করে এবং এ আন্দোলনের নীতি ও আদর্শের সাথে যাদের মিল আছে, কেবল তাদেরকেই এ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করে।

এরপর আর একটা যুগ আসে। যারা এ আন্দোলনে শামিল হয় তারা স্বভাবতই কামনা করে যে, যে আদর্শকে তারা নিজেরা সত্য ও সঠিক জেনে গ্রহণ করেছে সে অনুসারে তাদের সন্তানেরাও গড়ে উঠুক। এ উদ্দেশ্যে তারা তাদের নতুন বংশধরের ওপর শিক্ষা-দীক্ষা, পারিবারিক জীবন এবং বাইরের পরিবেশ দ্বারা এমন প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে, যাতে তাদের চিন্তাধারা, চরিত্র, আদত, অভ্যাস ও চাল-চলন সব কিছু ঐ আন্দোলনের প্রেরণা ও

আদর্শের ছাঁচে তৈরী হয়। এ কাজে তাদের কিছুটা সাফল্য লাভ হয়। কিন্তু সেটা খুবই সীমতি আকারের। পূর্ণ সাফল্য অর্জিত হওয়া অসম্ভব। এ কথা নিসন্দেহে সত্য যে, শিক্ষা–দীক্ষা, সমাজিক পরিবেশ এবং পারিবারিক ঐতিহ্য মানুষের স্বভাব–চরিত্র গড়ে তোলার ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রেখে থাকে। কিন্তু জন্মগত স্বভাব–প্রকৃতি, মস্তিষ্কের গঠন এবং মেজাজের সহজাত অবস্থানও একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। বাস্তবিক পক্ষে দেখতে গেলে এটাই মৌলিক জিনিস। জন্মগতভাবে পৃথিবীতে সর্ব প্রকারের মানুষ, বিচিত্র স্বভাব, বিচিত্র গড়ন ও প্রবণতার মানুষ সব সময়ই পয়দা হয়ে আসছে। ঐ আন্দোলনের আবির্ভাবকালে যেমন সকল ধরনের মানুষ দুনিয়ায় বিরাজমান ছিল এবং তারা সকলে তা গ্রহণ করেনি, বরং মানসিকভাবে তার সাথে যাদের মিল ছিল কেবল তারাই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। অনুরূপভাবে পরবর্তীকালেও আশা করা যায় না যে, এ আন্দোলনের সমর্থকদের বংশোদ্ভূত প্রতিটি মানুষেরই এর সাথে মিল থাকবে। তাদের মধ্যে আবু জেহেল আবু লাহাবও থাকবে, আবু বকর, ওমর, খালেদও থাকবে। আজরের ঘরে যেমন তওহীদবাদী ইবরাহীম (আ) জন্ম গ্রহণ করতে পারে তেমনি নূহের (আ) ঘরে "দুষ্কর্মা"ও জন্মগ্রহণ করতে পারে এবং করেছে[১] প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে এটা অবধারিত সত্য যে, ঐ সামাজের বাইরে জন্মগ্রহণকারী কিছু লোক মেজাজ ও স্বভাব–প্রকৃতির দিক দিয়ে উক্ত আন্দোলনের সমমনা এবং ঐ সমাজের ভেতরে জন্মগ্রহণকারী কিছু লোক তার প্রতি বিরূপভাবাপন্ন হবে। কাজেই এটা জরুরী নয় যে, শিক্ষা–দীক্ষার যে ব্যবস্থা আন্দোলনের প্রথম ধারক বাহকগণ পরবর্তী বংশধরের জন্য কায়েম করে রেখে যান, তা তাদের নতুন বংশধরদের সকলকে তাদের আদর্শের সঠিক অনুসারী বানাবেই।

এ আশংকার প্রতিরোধ এবং আন্দোলনকে তার মৌলিক নীতিমালা ও আদর্শের ওপর বহাল রাখারা জন্য দু'টো কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকেঃ

প্রথমত, যারা শিক্ষা–দীক্ষা ও সামষ্টিক পরিবেশের প্রভাবাধীন থাকা সত্ত্বেও তা থেকে বিচ্যুত ও ভ্রষ্ট হয়, তাদেরকে পথভ্রষ্ট ঘোষণা করার

১. পবিত্র কুরআনে হযরত নূহ (আ)–এর পুত্রতে দুষ্কর্মা বলে অভিহিত করা হয়েছে। (সূরা নূহ, আয়াত ৪৬)

মাধ্যমে[১] দল থেকে বহিষ্কার করা এবং দলকে অবাঞ্ছিত লোকদের খপ্পর থেকে মুক্ত করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, অব্যাহত প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমে দলে সমমনা, সমভাবাপন্ন এবং দলের আদর্শ ও মূলনীতির প্রতি প্রথম অনুসারীদের মতই আকৃষ্ট হবার মত নতুন লোকজন ভর্তি করার ধারা চালু রাখতে হয়।

একমাত্র এ দু'টো পন্থার সাহায্যেই যে কোন আন্দোলনকে অবক্ষয় থেকে এবং কোন দলকে অধোপতন থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু কার্যত এরূপ হয়ে থাকে যে, ক্রমে ক্রমে লোকেরা এ উভয় কর্মপন্থার গুরুত্ব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যেতে থাকে। দলের বাইরে থেকে নতুন লোক দলভুক্ত করার চেষ্টা করে যেতে থাকে। দলের পরিসর বৃদ্ধির জন্য পুরোপুরিভাবে নির্ভর করা হয় বংশ বৃদ্ধির ওপর। আর যারা এভাবে দলের ভেতরে জন্ম লাভ করে, তাদের মধ্য থেকে আদর্শচ্যুত ও নীতিভ্রষ্ট লোকদেরকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে রক্ত সম্পর্ক, সামাজিক বন্ধন ও পার্থিব স্বার্থ ও কল্যাণের খাতিরে ঔদাসিন্য দেখানো হয়। হরেক রকমের বাহানা দিয়ে দলীয় মতাদর্শের গন্ডিতে এমন ফাঁক ফোকর বের করা হয় যে, সকল রকমের কাঁচা ও পাকা ঈমানের লোকজন তার মধ্যে স্থান পেতে পারে। এভাবে আদর্শের সীমানা এত সম্প্রসারিত করা হয় যে, তার আদৌ কোন চিহ্নিত সীমান্ত অবশিষ্ট থাকে না। এর পরিণামে দলের অভ্যন্তরে বিচিত্র মত ও পথের লোকজনের সমাগম ঘটে, যাদের ঐ আন্দোলনের আদর্শ ও মূলনীতির সাথে কোনই সংশ্রব থাকে না।

এরপর যখন দলের অভ্যন্তরে দলীয় আদর্শের যথার্থ সমমনা লোকদের সংখ্যা কমে যায় এবং বিরোধী ভাবাপন্ন লোকের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন সামাজিক পরিবেশ এবং শিক্ষা–দীক্ষার ব্যবস্থাও বিকৃতির শিকার হতে থাকে। এর ফলে প্রত্যেক নতুন বংশধর পূর্ববর্তী বংশধরের চেয়ে খারাপ হয়ে জন্ম নিতে থাকে। দল ক্রমশ অবক্ষয় ও অধোপতনের দিকে এগুতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থারও উদ্ভব হয় যে, যে আদর্শ ও মূলনীতির ভিত্তিতে ঐ দলটি

---

১. আধুনিক যুগের আন্দোলনগুলোতে এই জিনিসটিকেই (Purge) বলা হয়ে থাকে। সকল দলেই অবাঞ্ছিত লোকদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করার রেওয়াজ আছে। এমনকি কোথাও কোথাও দলীয় আদর্শ থেকে প্রকাশ্যে বিচ্যুত হওয়া লোকদেরকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়। (পুরানো)

গঠিত হয়েছিল, তা একেবারেই উধাও হয়ে যায়। এ পর্যায়ে এসে দল প্রকৃতপক্ষে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তা নিরেট একটা প্রজন্মভিত্তিক ও সমাজিক জাতীয়তার রূপ নেয়। শুরুতে আন্দোলনের পতাকাবাহীরা যে নামে পরিচিত হতো, সেই নামে পরিচিত হতে আরম্ভ করে আন্দোলনকে সাবাড়কারীরা ও তার পতাকা ভূলুণ্ঠিতকারীরা। যে নাম একটা আদর্শ ও লক্ষ্যের সাথে যুক্ত ছিল, তা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা থেকে পুত্রের কাছে হস্তান্তরিত হতে থাকে এবং পুত্র প্রবরের জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শের সাথে সেই নামের কোন যোগসূত্র আছে কিনা তার তোয়াক্কা করা হয় না। বস্তুত এ ধরনের লোকদের খপ্পরে পড়ে সেই নাম আপন তাৎপর্য (Significance) হারিয়ে ফেলে। নামটা যে কোন একটা লক্ষ্য ও আদর্শের সাথে যুক্ত এবং তা যে আসলে নিরর্থক বা তাৎপর্যহীন নয়, সে কথা তারা নিজেরাও ভুলে যায়। দুনিয়াবাসীও বিস্মৃত হয়ে বসে।

ইসলাম বর্তমানে এ সর্বশেষ স্তরটিতে উপনীত। মুসলমান নামে যে, জাতিটি বর্তমানে বিরাজমান, সে জাতি নিজে যেমন ভুলে গেছে, তার কার্যকলাপ দ্বারা সারা দুনিয়ার মানুষকেও ভুলে যেতে বাধ্য করেছে যে, ইসলাম আসলে একটা আন্দোলনের নাম। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কিছু সংখ্যক মূলনীতির ভিত্তিতে এর আর্বিভাব হয়েছিল। আর যে দলটি এ আন্দোলনের আনুগত্য ও তার পতাকা বহন করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল, সেই দলটিকে বুঝানোর জন্যই মুসলমান শব্দটির উদ্ভব হয়েছিল। আন্দোলনটি হারিয়ে গেল। তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেল। তার মূলনীতি ও আদর্শ একে একে লংঘিত হলো। আর তার নাম সকল তাৎপর্য হারিয়ে এখন নিছক একটি বংশীয় ও সমাজিক জাতীয়তার নাম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমন কি যেখানে ইসলামের লক্ষ্য পদদলিত হয়, যেখানে তার আদর্শ হয় লংঘিত, যেখানে ইসলামের পরিবর্তে ইসলাম বিরোধী তৎপরতা চলে, সেখানেও মুসলমান নামটি নির্দ্বিধায় ব্যবহৃত হয়।

শহরে যান। "মুসলমান বেশ্যা"দেরকে দেখতে পাবেন বিশেষ এলাকার বাড়ী ঘরের সামনে বসে থাকতে। "মুসলমান ব্যভিচারীদের" দেখবেন ঘুর ঘুর করতে। কারাগারগুলো দেখে আসুন। "মুসলমান চোর" "মুসলমান ডাকাত" ও "মুসলমান দুষ্কৃতিকারী"দের সাথে পরিচিত হবেন। অফিস আদালতে ঘোরা-ফিরা করুন। ঘুষ খাওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, ধোঁকাবাজি, জালিয়াতি, যুলুম

এবং সকল ধরনের নৈতিক অপরাধের সাথে জড়িত দেখতে পাবেন মুসলমান নামক কিছু লোককে। সমাজে চলাফেরা করুন। কোথাও "মুসলমান মদখোর" কোথাও "মুসলমান জুয়াড়ী" কোথাও "মুসলমান গায়ক ও বাদক" এবং "মুসলমান গুন্ডা"র কবলে পড়বেন। একটু ভাবুন তো, এই "মুসলমান" শব্দটাকে কতদূর ঘৃণিত করে রাখা হয়েছে এবং কি কি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। মুসলমান আর ব্যভিচারী! মুসলমান আর মদখোর! মুসলমান আর জুয়াড়ী! মুসলমান আর ঘুষখোর! একজন কাফেরের যা যা করার কথা, সে সবই যদি মুসলমানও করতে আরম্ভ করে, তাহলে পৃথিবীতে মুসলমানের অস্তিত্বের প্রয়োজন কি? ইসলাম তো সেই আন্দোলনেরই নাম ছিল, যা পৃথিবী থেকে যাবতীয় অন্যায় ও অনাচার দূর করতে এসেছিল। সে মুসলমান নামে সেই সব বাছাই করা মানুষের দল গঠন করেছিল, যাঁরা নিজেরা উঁচু মানের চরিত্রের অধিকারী হবে এবং চরিত্র সংশোধনের কাজে নেতৃত্ব দেবে। নিজ দলের লোকদের জন্য সে হাত কাটা, পাথর মেরে হত্যা করা, বেত মের মেরে চামড়া তুলে ফেলা এমনকি ফাঁসিতে চড়িয়ে মারার মত ভয়ংকার শাস্তি শুধু এ জন্যই নির্ধারণ করেছিল, যাতে পৃথিবী থেকে ব্যভিচার, মদ খাওয়া এবং চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে যে দলের আভির্বাব, সেই দলের ভেতরে কোন ব্যভিচারী, মদখোর ও চোর-ডাকাত না থাকে। মানব জাতির সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত, তারা সারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম চরিত্রবান উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ হোক এটাই ছিল তার উদ্দেশ্য। এ কারণেই জুয়া, জালিয়াতী, ঘুষখোরী তো দূরের কথা, কোনো মুসলমান গায়ক বাদক হোক, এটাও ছিল তার কাছে অনভিপ্রেত। কেননা চরিত্র সংশোধনকারীর মর্যাদার তুলনায় এটাও অত্যন্ত হীন ও নীচ কাজ। যে ইসলাম এহেন কড়া বিধি-নিষেধ এবং এমন কঠোর শৃংখলার মধ্য দিয়ে স্বীয় আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, আর যে ইসলাম নিজ দলে বেছে বেছে মহত্তম চরিত্রের লোকদেরকে ভর্তি করেছিল, তার পক্ষে এর চেয়ে অবমাননাকর ব্যাপার আর কি হতে পারে যে, চোর ব্যভিচারী ও বেশ্যার সাথে পর্যন্ত মুসলমান শব্দ যুক্ত হবে? এমন চূড়ান্তভাবে অপমানিত ও ধিকৃত হবার পরও "ইসলাম" ও "মুসলমানের" কতখানি গুরুত্ব থাকতে পারে যে, মানুষের মাথা তার সামনে ভক্তিতে নুয়ে পড়বে এবং তাকে এক নজর দেখার জন্য মানুষের চোখ অধীর হয়ে পথ পানে তাকিয়ে থাকবে? পথে পথে, অলিতে গলিতে ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়ানো কোন বখাটে লোককে দেখে কেউ কখানো সম্মানে উঠে দাঁড়ায়, এমন দৃশ্য কি কখনো আপিনি দেখেছেন?

এতো নেহাৎ নিম্ন শ্রেণীর মানুষের উদাহরণ দেয়া হলো। উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণীর অবস্থা আরো দুঃখজনক। এ শ্রেণীর লোকেরা মনে করে, ইসলাম একটা পুরুষানুক্রমিক জাতীয়তার নাম। যে ব্যক্তির মা-বাবা মুসলমান, সে সর্বাবস্থায়ই মুসলমান, চাই আকীদা, আদর্শ ও জীবনাচারের দিক থেকে তার ইসলামের সাথে দূরতম সম্পর্কও না থাকুক। সমাজে চলাফেরা করলে আপনি সর্বত্র আজব আজব ধরনের "মুসলমানদের" সাক্ষাত পাবেন। কোথাও দেখবেন, এক ভদ্রলোক প্রকশ্যে আল্লাহ ও রসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপে লিপ্ত এবং ইসলাম সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য করছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি 'মুসলমান'। আর এক ভদ্রলোক আল্লাহ, রসূল ও আখেরাতের কট্টোর বিরোধী এবং কোনো না কোনো বস্তুবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু তবুও তাঁরা 'মুসলমান' থাকতে ক্যোনো অসুবিধা হয়নি। আর এক ভদ্র মহোদয় দেদার সুদ খান অথচ যাকাতের নামও মুখে আনেন না। কিন্তু তিনিও 'মুসলমান'। আর এক ভদ্রলোক নিজের স্ত্রী ও কন্যাকে মেম সাহেবা বা শ্রীমতিজী সাজিয়ে সিনেমায় নিয়ে যাচ্ছেন অথবা কোন নাচ-গানের অনুষ্ঠানে তাকে দিয়ে বাদ্য বাজানো হচ্ছে। অথচ মুসলমান শব্দটা তাঁর সাথেও যথারীতি যুক্ত হয়ে রয়েছে। আর এক ভদ্রলোক নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও যাবতীয় ফরয ত্যাগ করে বসে আছেন। মদ, ব্যভিচার, ঘুষ, জুয়া সবই যেন তার জন্য বৈধ হয়ে গেছে। হালাল ও হারামের বাছবিচার সম্পর্কে তিনি শুধু অজ্ঞই নন, বরং জীবনের কোনো ব্যাপারেই তিনি এ কথা জানবার প্রয়োজনই বোধ করেন না যে, আল্লাহর আইন এ ব্যাপারে কি নির্দেশ দেয়। চিন্তা, কথাবার্তা ও কার্যকলাপে তাদের এবং একজন কাফের ও মোশরকের মধ্যে কোনোই প্রভেদ দেখা যায় না। তথাপি তিনি মুসলমান হিসেবেই পরিগণিত হয়ে থাকেন। মোটকথা এ তথাকথিত মুসলিম সমাজটা যদি নিরীক্ষণ করা হয়, তবে সেখানে বিচিত্র রকমের মুসলমান চোখে পড়বে। সেখানে এত রকমারি মুসলমান পাওয়া যাবে যে, তা গুণেও শেষ করা যাবে না। এটা যেন একটা চিড়িয়াখানা যেখানে চিল, কাক, শকুন, বাবুই, তিতির এবং হজারো রকমের প্রাণী রয়েছে। চিড়িয়াখানায় থাকার কারণে তারা সকলেই চিড়িয়া (পাখি) বটে।

আরো মজার ব্যাপার এই যে, এ সব বিকারগ্রস্ত মুসলমান শুধু যে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে তা নয়, বরং এখন তাদের মতাদর্শই এই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, 'মুসলমান' যে কাজই করে, সেটাই 'ইসলামী' কাজ।

এমন কি তারা যদি ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তবে তাও ইসলামী বিদ্রোহ। তারা সুদভিত্তিক ব্যাংক খুললে তা হবে 'ইসলামী ব্যাংক'। তারা বীমা কোম্পানী খুললে তাও হবে 'ইসলামী বীমা কোম্পানী' তারা ইসলাম বিরোধী জ্ঞান–বিজ্ঞানের শিক্ষা কেন্দ্র খুললে তার নাম হবে 'মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' 'ইসলামিয়া কলেজ', অথবা 'ইসলামী স্কুল'। তাদের কুফরী রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র নামে অবহিত করা হবে। তাদের মধ্যে ফেরাউন ও নমরুদের মত শাসক হলেও তাকে 'মুসলিম বাদশাহ' বলা হবে। তাদের জাহেলী তথা অনৈসলামিক জীবন আখ্যায়িত হবে "ইসলামী সভ্যতা ও কৃষ্টি" রূপে। তাদের সঙ্গীত, চিত্রশিল্প ও মূর্তি গড়াকে 'ইসলামী চারুকলা' নামে ভূষিত করা হবে। তাদের নাস্তিক্যবাদ ও ভিত্তিহীন কল্পনাকে বলা হবে 'ইসলামী দর্শন'। এমন কি, কোন মুসলমান সমাজতন্ত্রী হয়ে গেলেও তাকে 'মুসলিম সমাজতন্ত্রী' বলে আখ্যায়িত করা হবে। এ সকল নাম আজকাল সকলের কাছেই সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। শুধমাত্র 'ইসলামী মদ্যশালা' 'ইসলামী বেশ্যালয়' এবং 'ইসলামী জুয়ার আড্ডা' ধরনের পরিভাষাগুলো প্রচলন বাকী রয়েছে। মুসলমানদের এহেন কার্যকলাপ ইসলাম শব্দটাকে এত অর্থহীন করে দিয়েছে যে, একটি কাফেরসুলভ কাজকে 'ইসলামী কুফরী' অথবা 'ইসলামী পাপাচার' নাম নামকরণ করাতেও এখন আর কেউ পরিভাষাগত বৈপরিত্য (Contradiction in Terms) অনুভব করে না। অথচ আপনি যদি কোন দোকানে "নিরামিষ–ভোজীদের গোশ্‌ত বিপনী" অথবা "বিলেতী স্বদেশী ষ্টোর" লেখা বোর্ড লটকানো দেখেন অথবা কোন ভবনের নাম "তওহিদী জনতার মূর্তি পূজা ভবন" রাখা হয়েছে বলে শুনতে পান, তা হলে সম্ভবত আপনি হাসি দমন করতে পারবেন না।

ব্যক্তি–মানসের অবস্থা যখন এরূপ, তখন জাতীয় লক্ষ্য ও জাতীয় নীতির ওপর এ বৈপরীত্যের প্রভাব না পড়ে পারে না। মুসলমানদের পত্র–পত্রিকায় ও সভা–সমিতিতে আজকাল শিক্ষিত শ্রেণীর মুসলমানরা যে শ্লোগানটিতে সবচেয়ে বেশী মুখর, তাহলো "সরকারী চাকুরীতে আমাদের অংশ দেয়া হোক।" অর্থাৎ কিনা, আল্লাহ বিমুখ শাসন ব্যবস্থা চালাতে যেসব কলকব্জা দরকার, তার শতকরা অন্তত এতভাগ যেন আমরা হতে পারি। "আইন রচনা করে যে আইন সভা তার আসন সমূহে আমরা যেন অন্তত পক্ষে এত আনুপাতিক হারে হিস্‌সা পাই। مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ[১]এর শতকরা অন্তত এত জন যেন আমরাও হই।

---

১ যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না। (মায়েদা, আয়াত ৪৪)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ [১] এর প্রধান অংশ যেন, আমাদের থাকে। তাদের সমস্ত চিৎকার এরই জন্য হয়ে থাকে। আর এরই নাম দেয়া হয় ইসলমের কল্যাণ। এরই চারপাশে মুসলমানদের জাতীয় রাজনীতি ঘুরপাক খাচ্ছে। বস্তুত এ গোষ্ঠীটিই বর্তমানে মুসলিম জাতির সামগ্রিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করছে। অথচ এ সব কার্যকলাপের শুধু ইসলামের সাথে কোন সম্পর্ক নেই তা নয়, বরং এ সব ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত কার্যকলাপ। ভেবে দেখার বিষয় যে, ইসলাম যদি একটা জীবন্ত আন্দোলন হিসেবে বহাল থাকতো, তাহলে কি তার দৃষ্টিভঙ্গী এ রকম হতো? সামগ্রিক সংস্কার প্রায়াসী কোন আন্দোলন এবং নিজস্ব আদর্শ ও মূলনীতির ভিত্তিতে পৃথিবীতে আপন শাসন কায়েম করতে আগ্রহী কোন দল কি আপন অনুসারীদেরকে ভিন্ন কোনো আদর্শের অনুসারী সরকারের সহায়ক শক্তিতে পরিণত হবার অনুমতি দেয়? এমন কথা কি কেউ কখনো শুনেছে যে, সমাজতন্ত্রীরা ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের অবকাঠামোতে সমাজতান্ত্রিক স্বার্থের প্রশ্ন তুলেছে? অথবা ফ্যাসিবাদীদের গ্রান্ড কাউন্সিলে আপন প্রতিনিধিত্বের ওপর সমাজতন্ত্রের টিকে থাকা বা ধ্বংস হওয়া নির্ভরশীল মনে করেছে? আজ যদি রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির কোন সদস্য নাৎসী সরকারের অনুগত সেবক হয়ে যায়, তাহলে কি তাকে এক মুহূর্তের জন্যও পার্টিতে থাকতে দেয়া হবে? আর যদি সে নাৎসী সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে নাৎসীবাদকে বিজয়ী করার চেষ্টা করে, তাহলে কি তার জীবনের নিরাপত্তার আশা করা যায়? অথচ এখানে কি দেখা যাচ্ছে? যে খাদ্যকে ইসলাম একান্ত নিরূপায় অবস্থায় মুখে দেয়ার অনুমতি দেয় এবং যাকে গলার নীচে পাঠানো জন্য غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ [২] এর শর্ত আরোপ করে এবং তাকে সতর্ক করে দেয় যে, চরম ক্ষুধার সময় যেমন শুকুর খাওয়া যায়, তেমনি এ খাদ্যও কেবল জান বাঁচানোর জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকুই খাও। কিন্তু মুসলমানরা সেই খাদ্য মজা করে পূর্ণ তৃপ্তির সাথে খাচ্ছে, এমনকি এরই ভিত্তিতে ইসলাম ও কুফরীর লড়াই চলে এবং একেই ইসলামের স্বার্থ ও কল্যাণের কেন্দ্রবিন্দু

---

১. যারা কুফরী করেছে, তারা তাগুতে (আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু) পথে লড়াই করে। (নিসা, আয়া ৭৬)

২. আইন ভঙ্গ করতে ইচ্ছুক হওয়া চলবে না এবং একান্ত প্রয়োজনীয় সীমা অতিক্রম করবে না। (বাকারাহ)

বলে আখ্যায়িত করা হয়। এরপর একটা নৈতিক ও সামজিক মতাদর্শ হিসেবে ইসলামের শাসকসূলভ ভূমিকা পালনের দাবী শুনে শুনে দুনিয়ার মানুষ যদি ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে আরম্ভ করে, তা হলে বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না। কেননা, ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারীরা স্বয়ং তার মর্যাদা, সম্মান ও তার দাবীকে পেট পূজার বেদীতে উৎসর্গ করে দিয়েছে।

একটি উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন, এক ব্যক্তি বিরাট হাকডাক ছেড়ে একটা সামরিক আন্দোলন চালু করে দিল। সে বড় গলায় দাবী করলো যে, আমি তোমাদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনবো এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিজয়ী করে ছাড়বো। আপনাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ তার দিকে ছুটে গেল এবং সকলেই তার কাছে সাফল্য ও বিজয় লাভের আশায় উদগ্রবী হয়ে রইল। আপনাদের সংবাদপত্র তাকে পূর্ণ সমর্থন দিল এবং ক্রমান্বয়ে লোকটা ইসলামের সেনাপতি এবং জাতির সর্বজন মান্য নেতায় পরিণত হলো অথচ আপনাদের মধ্যে খুব কম লোকই অনুভব করে যে, ঐসব নেতার আকিদা-বিশ্বাস, কুরআন সংক্রান্ত জ্ঞান, তাঁদের চরিত্র, কথাবার্তা, কার্যকলাপ এবং কর্মপদ্ধতিটা কেমন, তাও বিচার-বিবেচনা করা দরকার। এক ব্যক্তি যখন ইসলামী পরিভাষা সমূহের আড়ালে মেকিয়াভেলি, ডারউইন, আর্নেষ্ট হেগেল, এবং কার্লপিয়ারসনের মত লোকদের মতবাদ তুলে ধরেন, যখন তিনি শরীয়াতের বিধান ও প্রাকৃতিক আইনকে মিলিয়ে জগাখিচুরী করে ইসলামের ভিত্তিমূল উৎপাটন করে ফেলেন, যখন তিনি ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া, ইবাদাত, তাওহীদ, রিসালাত, জেহাদ, হিজরত, নেতার আনুগত্য, জামায়াত সবকিছুরই অর্থ বিকৃত করেন। তখন আমরা শুধু এ লোভের বশবর্তী হয়ে নির্দ্বিধায় ঐ বিষ পান করতে থাকি যে, আর না হোক, 'মুসলিম জাতির সামরিক সংঘবদ্ধ করনের কাজটা তো ইনি করেই ছাড়বেন। এক ব্যক্তি প্রকাশ্য মিথ্যাচারে লিপ্ত, তদুপরি মিথ্যার ভিত্তিতেই নিজের গোটা আন্দোলন গড়ে তোলেন, এমনকি অমুসলিমদের সামনে পর্যন্ত মিথ্যাচার দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের অবমাননা করেন। কটূক্তি ও আসফালন দ্বারা মুসলমানদের জাতীয় চরিত্রকে চরমভাবে কলংকিত ও তামাশার বস্তুতে পরিণত করেন, অমুসলিমদের মুখোমুখী হয়ে প্রথম আঘাতেই ক্ষমা চেয়ে নেন, অতপর নিজের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রকাশ্যে মিথ্যা বলেন যে, আমি ক্ষমা চাইনি, তারপর পুনরায় আস্ফালন করতে করতে আগের সেই জায়গায়

লড়াই করতে ফিরে যান যেখানে আর কখনো যাবেন না বলে অঙ্গিকার করেছিলেন। আমাদের মুসলিম জনতা এ সব কিছু দেখেও তার পেছনে লেগে থাকে কেবল এই আশায় যে, ভদ্রলোক, আর কিছু না করুক, আমাদেরকে ইহকালীন কল্যাণ ও সাফল্য তো না এনে দিয়েই ছাড়ছেন না। এক ব্যক্তি এ রকম যে, তার লেখনী ও মুখ নিসৃত প্রতিটি ভাষণ ও তার প্রতিটি চালচলন হীনতা, নীচতা ও অশালীনতায় পরিপূর্ণ, পরহেজগারী, সত্যনিষ্ঠতা ও গাম্ভীর্যের নামনিশানাও তাতে নজরে পড়ে না। এহেন ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে নিতেও আমাদের কিছুমাত্র দ্বিধা-সংকোচ হয়না। এমনকি একটি অনৈসলামিক সরকার প্রতিষ্ঠাকল্পে সে ৫০ হাজার মুসলমানদের প্রাণ বারবার উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়, আর এ কাজের উপকারিতা সে এভাবে ব্যাখ্যা করে যে, এ বাহানায় তোমরা সামরিক ট্রেনিং পাবে এবং তোমাদের সামরিক অবস্থান দৃঢ় হবে। মুসলমানরা এহেন গর্হিত কৌশলও সযত্নে গ্রহণ করে এবং এই ভেবে আনন্দিত হয় যে, আমরা একজন সামরিক সংগঠক তো পেয়ে গেলাম।[১] এ সব থেকে বুঝা যায় যে, মুসলমানদের নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের মান কতদূর নীচে নেমে গেছে। আমরা নিজেদেরকে যে ইসলামের প্রতিনিধি বলে দাবী করি, তা পৃথিবীতে এ নীতি বাস্তবায়নের জন্যই আবির্ভূত হয়েছিল যে, মানুষের উদ্দেশ্যই শুধু পবিত্র হলে চলবে না, বরং সেই সাথে উদ্দেশ্য হাসিলের উপায়ও পবিত্র হতে হবে। অথচ আজ আমাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, যে পন্থাটাই আমাদের কাছে সাফল্য এনে দেয়ার যোগ্য বলে মনে হয়, সেটা যত কদর্য ও গর্হিত পন্থাই হোক না কেন, দৌড়ে গিয়ে সেটাই লুফে নেই। আর যে ব্যক্তি তা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হয়, তাকে আমরা ছিড়েভুড়ে খেয়ে ফেলতে উদ্যত হই। উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় ও পন্থা সৎ না অসৎ তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে শুধুমাত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধিকেই চূড়ান্ত কাম্য বস্তু নির্ধারণ করা একমাত্র কাফের ও নাস্তিকদেরই স্বভাব। মুসলমানও যদি এ কাজ করে তা হলে তার আর কি বৈশিষ্ট অক্ষুণ্ন রইল? অধিকন্তু এরূপ পন্থা অবলম্বনের পর অন্যান্য অমুসলিম জাতি থেকে পৃথক 'মুসলমানের' স্বতন্ত্র জাতিসত্তা অক্ষুণ্ন থাকার পক্ষে কি যুক্তি থাকতে পারে।

---

১. এসব ১৯৩৯ সালের ব্যাপার। বর্তমানে ১৯৭২ সালে এটা আলোচনায় আসার কথা নয়। কিন্তু আমরা এটা বাদ দেইনি এজন্য যে, সে সময়কার প্রকাশিত পুস্তক আমরা কোন পরিবর্তন ও সংশোধন ছাড়াই হুবহু পেশ করতে ইচ্ছুক। (নতুন)

আরো ওপরের স্তরে চলুন। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় জাতীয় সংগঠন 'মুসলিম লীগ' নয় কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্বের দাবীদার। সেই মুসলিম লীগ এখন কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে, তা লক্ষ্য করুন। বর্তমান যুদ্ধের[১] শুরুতে এ দলটি নিজের যে নীতি ঘোষণা করেছিল এবং পরে বড়লাটের ঘোষণার পর যে অভিমত ব্যক্ত করেছে, তা একটু পড়ে দেখুন এবং বারবার পড়ুন।[২] একটি আদর্শবাদী দলের আচরণ এবং শুধুমাত্র আপন জাতির রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে গঠিত দলের আচরণের পার্থক্য নির্ণয়ের যোগ্যতা যদি আপনার থেকে থাকে, তা হলে প্রথম দৃষ্টিতেই আপনি অনুভব করবেন যে, যুদ্ধের সময় লীগ যে নীতি অবলম্বন করেছে, তাতে আদর্শবাদের কোন লক্ষণই নেই। যদি এ কথা মেনে নেয়া হয় যে, আসলে এ নীতিতে মুসলমানদের মনের কথাই প্রতিফলিত হয়েছে, তা হলে এর দর্পণে যে কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দেখতে পাবে যে, সেই সব নামধারী মুসলমানের নৈতিক মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোন জাতি যদি এ অবস্থায় পতিত হতো, যে অবস্থায় স্থানীয়ভাবে মুসলিম লীগ পতিত, তা হলে সে জাতির জাতীয় সংগঠনও এ ধরনের নীতি অবলম্বন করতো এবং প্রায় একই ধরনের ভাষায় প্রস্তাব গ্রহণ করতো, আপনি মুসলমানের পরিবর্তে শিখ, পারসিক, জার্মান, ইটালিয়ান যে নাম ইচ্ছা, রাখতে পারেন, একই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং স্থানীয় পরিস্থিতি তার সাথে যুক্ত করে দিন, অতপর আনায়াসে আপনি এ প্রস্তাবকে ঐ জাতিগুলোর যে কোন একটার প্রস্তাব বলে চালিয়ে দিতে পারবেন। এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, মুসলমান জাতি এখন দুনিয়ায় অন্যান্য জাতির পর্যায়ে নেমে গেছে। একটি বিশেষ স্থান ও পরিবেশে দুনিয়ার অন্য কোন কাফের ও মোশরেক জাতি যে কর্মপন্থা অবলম্বন করতে পারে মুসলমানরাও ঠিক তাই অবলম্বন করছে। সে ভুলে গেছে যে, সে মূলত একটি নৈতিক আদর্শের প্রতিনিধি এবং রক্ষক।

১· দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে, যা ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর শুরু হয় এবং ৩রা সেপ্টেম্বর বৃটিশ সরকারও তাতে যোগদান করে। (নতুন)

২· বর্ণনার ধারাক্রম থেকেই বুঝা যায় যে, মহাযুদ্ধের সময় মুসলিম লীগ যে নীতি অবলম্বন করেছিল, সেটাই এখানে প্রতিপাদ্য বিষয়। বক্ষমান নিবন্ধের শেষে আমরা ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ তারিখে গৃহীত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রস্তাব সংযোজন করবো। সেটি পড়ে যে কোন ব্যক্তি বুঝে নিতে পারে যে, যুদ্ধের ব্যাপারে নিজস্ব কোন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী দলের পক্ষে এ ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব কিনা। (নতুন)

আর এ হিসেবেই তার নাম মুসলমান। তার কাজ হবে সর্বপ্রথম একটি বিষয়ের নৈতিক দিক পর্যালোচনা করা এবং তার মুসলমানিত্বের দাবী এই যে, ঐ দিকটির আলোকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, অন্য কিছুর আলোকে নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একজন মুসলমানও যদি কেবল এটাই দেখে যে, উপস্থিত সমস্যাটা স্বয়ং তার জীবনে এবং তার জাতির জীবনে কি প্রভাব বিস্তার করে এবং উক্ত পরিস্থিতিতে সে কিভাবে নিজের সুবিধা অর্জন করতে পারে। তা হলে "মুসলমান" নামে তার আলাদা অস্তিত্ব বজায় থাকার কোন কারণই থাকে না। একজন মানুষ যদি একেবারে অমুসলমান হয় এবং কোন আসমানী কিতাবের হাওয়াও তার গায়ে না লাগে, তা হলে তার পক্ষে এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব।

আমি এ ব্যাপারটাকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি না। আর রাজনৈতিকভাবে মুসলিম লীগের এ নীতি ভারতে বসবাসরত মুসলমান নামক এ জ্যাতিটির জন্য ক্ষতিকর হবে, না কল্যাণকর হবে, তাও আমার বিবেচ্য বিষয় নয়। আমার কাছে যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ তা শুধু এই যে, যে জাতিটি বর্তমানে মুসলমান নামে আখ্যায়িত হওয়ার কারণে সারা বিশ্বে ইসলামের প্রতিনিধিরূপে বিবেচিত, তার সর্বোচ্চ সংস্থা বিশ্বের সামনে ইসলামকে কিভাবে পেশ করলো। এ দৃষ্টিভঙ্গীতে যখন আমি মুসলিম লীগের প্রস্তাবের প্রতি দৃষ্টি দেই, তখন আমার অন্তরাত্মা বেএখতিয়ার বিলাপ করে ওঠে।[১] মুসলমান হিসেবে পৃথিবীর সকল জাতির মনে নিজেদের উচ্চতর নৈতিক মর্যাদার স্বাক্ষর রাখার একটা দুর্লভ সুযোগ মুসলিম লীগাররা পেয়েছিল। আমরা যে একটা নৈতিক আদর্শের অনুসারী এবং সেই নৈতিক আদর্শ সত্য ও ন্যায়নীতির মহত্তম প্রেরণায় উজ্জীবিত, আর দুনিয়াতে শুধু আমাদের সমাজই যে, এ বৈশিষ্টের অধিকারী যে ব্যক্তিগত কিংবা জাতিগত লাভ ক্ষতির বিবেচনার উর্ধে উঠে কেবলমাত্র নৈতিকতার ভিত্তিতেই সে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে থাকে, এ সত্যটি জগতবাসীর সামনে তুলে ধরার

---

১. কিছু লোক অসততার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আমার এ বাক্যটিকে পূর্বাপর বক্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমার ওপর এ অপবাদ আরোপ করেছে যে, ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে মুসলিম লীগ লাহোরে যে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে, সে সম্পর্কেই নাকি আমি এ কথা বলেছি। অথচ আমার এ নিবন্ধ ১৯৩৯ সালের নভেম্বরে মাসিক তরজুমানুল কুরআনে প্রকাশিত হয়। এ নিবন্ধে ১৯৪০ সালের প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করাতো কোন ঐশী শক্তির বলেই সম্ভব। (নতুন)

একটা সুবর্ণ সুযোগ তারা লাভ করেছিলো। যদি লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ইসলামী চেতনার লেশমাত্রও বিদ্যমান থাকতো, তা হলে তারা এ সুযোগকে হাতছাড়া হতে দিতেন না। আর এর যে গভীর নৈতিক প্রভাব পড়তো তা এতো মূল্যবান ও মর্যদাপূর্ণ যে, তার মোকাবিলায় এ কর্মপন্থা অবলম্বনের ফলে যে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে তার কোন গুরুত্বই নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, লীগের কায়েদে আযম থেকে শরু করে তার নগণ্য অনুসারী পর্যন্ত একজনও এমন নয় যে, ইসলামী মানসিকতা ও ইসলামী চিন্তাভঙ্গী ধারণ ও পোষণ করেন এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সকল বিষয় বিচার-বিবেচনা করে থাকেন। মুসলমানের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য কি এবং তার বিশিষ্ট মর্যাদা ও অবস্থান কি, সে সম্পর্কে এ সকল ব্যক্তি একেবারেই অজ্ঞ। তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানরাও দুনিয়ার অন্যান্য জাতির মতই একটা জাতি। তারা মনে করেন যে, সম্ভাব্য যে কোন রাজনৈতিক কৌশল এবং যে কোন কার্যকর রাজনৈতিক ফন্দিফিকির দ্বারা এ জাতির স্বার্থ সংরক্ষণ করে দেয়াই "ইসলামী রাজনীতি"। অথচ এ ধরনের নীচু মানের রাজনীতিকে ইসলামী রাজনীতি আখ্যা দেয়া ইসলামের মানহানি করা ছাড়া আর কিছু নয়।

মুসলমানদের জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ থেকে যে কয়টি দৃষ্টান্ত আমি এখানে পেশ করলাম এর সব ক'টি একটিমাত্র সিদ্ধান্তেরই দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। সেটি এই যে, ইসলামী আন্দোলন বর্তমানে অবনতি ও অধোপতনের এমন চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যেখানে কোন আন্দোলন সম্পূর্ণ প্রাণহীন হয়ে যায়, শুধু নামটাই অবশিষ্ট থাকে এবং "কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন" প্রবাদের অনুরূপ নামের মূল অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিসের ওপর তা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ধ্যান-ধারণা অনৈসলামিক, তবু তাদের নাম মুসলমান। তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনৈসলামিক, তথাপি তারা নামে যথারীতি মুসলমান। স্বভাব চরিত্র ইসলামের বিপরীত তা সত্ত্বেও মুসলমান শব্দটা তাদের নামের সাথে প্রযুক্ত। চালচলন অনৈসিলামিক, তথাপি তাদের ওপর মুসলমান শব্দটা নির্দ্বিধায় ব্যবহৃত। ব্যক্তি থেকে সংগঠন পর্যন্ত। সমাজের নিম্নতম শ্রেণী থেকে শুরু করে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত, ক্ষুদ্র সমিতি থেকে শুরু করে বৃহত্তর সংসদ পর্যন্ত, সর্বত্র এই সর্বব্যাপী ব্যধি মহামারীর আকারে বিস্তৃত। আমার বিবেক একাধিকবার আমার কাছে এ প্রশ্ন তুলেছে যে, যে ইসলাম একদিন ঝড় তুফানের মত হয়ে আবির্ভূত হয়েছিল এবং যার

সামনে পৃথিবীর কোন শক্তি তিষ্টাতে পারতো না, আজ তার বিশ্বজোড়া অস্তিত্ব ও শাসনক্ষমতা কিসে ছিনিয়ে নিল? এ প্রশ্নের জবাব প্রতিবারই আমি এরূপ পেয়েছি যে, ইসলামী আন্দোলনের ওপর অবনতি ও অবক্ষয়ের সেই বিধান বলবৎ হয়েছে, যার কথা আমি শুরুতেই উল্লেখ করেছি। এখন এর প্রতিকার ও সংশোধনের একমাত্র উপায় এই যে, ইসলামকে একটি আন্দোলনের আকারে পুনরোজ্জীবিত করতে হবে এবং মুসলিম শব্দটার প্রকৃত মর্মকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। এ মৃতপুরীতে যে মুষ্টিমেয় কয়টি মুসলিম হৃদপিণ্ড এখনো স্পন্দিত হচ্ছে এবং যার গভীরতম অন্তস্থল থেকে এখনো এ সাক্ষ্য ঘোষিত হচ্ছে যে, ইসলামই একমাত্র সত্য ও নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা এবং মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণ একমাত্র ইসলামী জীবন বিধানেই নিহিত, তাদের অবগত হওয়া দরকার যে, এখন একমাত্র করণীয় কাজ এটাই। তবে এ কাজ সমাধা করাটা কোন ক্রীড়াকৌতুকের ব্যাপার নয়। এটা সেই পর্বত ভাঙ্গার কাজের মতই দুরূহ যার কথা ভাবতে গেলেও ফরহাদের হাতুড়ি গলে পানি হয়ে যায়।

(তরজুমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৩৯)

পরিশিষ্ট

নিম্নে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির সেই প্রস্তাবটির বিবরণ দেয়া হলো, যা ১৯৩৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরে গৃহীত হয়েছিল।

"কার্যনির্বাহী কমিটির অভিমত এই যে, ২৭শে আগস্ট ১৯৩৯ তারিখে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের গৃহীত ৮ নং প্রস্তাবটি ভারতীয় মুসলমানদের প্রকৃত আবেগ ও মতামত প্রতিফলিত করে। ঐ প্রস্তাবে বলা হয়েছেঃ ভারতীয় মুসলমানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ওপর একটি সংবিধান চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে বৃটিশ সরকার যে নীতির পরিচয় দিয়েছে, তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হোক। বিশেষত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে তা অতীব দুঃখজনক। কেননা এর পরিণতিতে ভারতে এমন একটি স্বাধীন শত্রুভাবাপন্ন সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার কায়েম হয়ে যাবে, যা মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার পদদলিত করে ছাড়বে। তা ছাড়া বড়লাট ও কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহের গভর্ণরদের আপন বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা ও তাদের প্রতি সুবিচার করা কর্তব্য ছিল। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে চরম উদাসীনতা, অবহেলা ও কৌশলগত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে একেবারেই নিষ্ক্রিয় থেকেছেন। অধিকন্তু তারা প্যালেস্টাইনের আরবদের দাবীদাওয়াও অগ্রাহ্য করেছেন। এ অবস্থায় বৃটিশ সরকার যদি ভবিষ্যত দুর্যোগ মোকাবিলা করার ব্যাপারে বিশ্বের মুসলমানদের, বিশেষত ভারতীয় মুসলমানদের সহানুভূতি লাভ করতে চায়, তাহলে ভারতের মুসলমানদের দাবীদাওয়া অকুণ্ঠ চিত্তে মেনে নেয়া তার কতর্ব্য।"

"ভারত শাসন আইনে বর্ণিত পরিকল্পনা স্থগিত করা হয়েছে এই মর্মে বড়লাট সাহেব যে ঘোষণা জারী করেছেন, কার্যনির্বাহী কমিটির দৃষ্টিতে তা

প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। বড়লাট সাহেবের এ ঘোষণা ভারতের এবং বিশেষত মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূল। কার্যনির্বাহী কমিটি দাবী জানাচ্ছে যে, ঐ পরিকল্পনা স্থগিত করার পরিবর্তে পুরোপুরিভাবে পরিত্যাগ করা হোক এবং এ দাবী অবিলম্বে মেনে নেয়ার জন্য বৃটিশ সরকারের কাছে আদেবন জানাচ্ছে। কমিটি এ কথাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চায় যে, বড়লাট সাহেব কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যদের সামনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি কাম্য' বলে যে মন্তব্য করেছেন এবং এ যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি বৃটিশ সরকারের অভিষ্ট বলেছেন, কার্যনির্বাহী কমিটি তা মোটেই সমর্থন করে না। কমিটি বৃটিশ সরকারের নিকট জোর আবেদন জানাচ্ছে যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রদেশ সংক্রান্ত অংশ কার্যকরী করার পর যে ফলাফল দেখা গেছে এবং পরিস্থিতির যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ভবিষ্যত শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করা হোক।"

"এ প্রসঙ্গে কমিটি এ কথা স্পষ্ট করে দিতে চায় যে, ভারতের রাজনীতিতে মুসলমানরা একটি বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী এবং দীর্ঘকাল ধরে মুসলমানগণ এ আশা পোষণ করে আসছে যে, ভারতের জাতীয় জীবনে এখানকার শাসন ব্যবস্থায় এবং দেশ পরিচালনায় সম্মানজনক আসন লাভ করবে। এ জন্যই তারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে, যাতে করে স্বাধীন ভারতে স্বাধীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা নিজেদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ও নিরুদ্বেগ মন নিয়ে সংখ্যাগুরু জাতির সাথে সহযোগিতা করতে পারে। কিন্তু পরিস্থিতিতে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, বিশেষত তথাকথিত পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ায় বর্তমান প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর পরিস্থিতি যেভাবে পাল্টে গেছে, তাতে করে বিগত দু'বছরের কিছু বেশী সময়ে এক নিদারুণ তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। এ তিক্ত অভিজ্ঞতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত করেছে যে, ঐ প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র ভারতের মুসলমানদের ওপর হিন্দু সংখ্যাগুরুর চিরস্থায়ী ও একতরফা শাসন চাপিয়ে দিয়েছে। আর তার ফলে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহের মুসলমানদের জানমাল ও মানমর্যদা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এমনকি প্রতিদিন কংগ্রেস সরকারগুলো মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার ও সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করছে। এ কথা সত্য যে, মুসলমানরা ভারতের অধিবাসীদের ওপর কেউ শোষণ চালাক, তার বিরোধী। এও সত্য যে, তারা

বহুবার ভারতের স্বাধীনতার দাবী তুলেছে। কিন্তু সেই সাথে মুসলমানরা এ সংকল্পও ব্যক্ত করে থাকে যে, তারা মুসলমানদের ওপর এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুর ওপর হিন্দু সংখ্যাগুরুর শাসন জেঁকে বসুক এবং মুসলমানরা হিন্দুদের গোলামে পরিণত হোক–এটা কিছুতেই হতে দেবে না। এ কারণেই তারা এমন, যে কোন "কাংখিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার" কট্টর বিরোধী, যা দ্বারা গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার নামে ভারতে সংখ্যাগুরুর শাসন জেঁকে বসবে। যে দেশ বহু জাতি অধ্যুষিত এবং যে দেশ এক জাতিক রাষ্ট্র হওয়ার যোগ্য নয়, সে দেশের জন্য সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা কখনো মানানসই হতে পারেনা।

মুসলিম লীগ "জোর যার মুল্লুক তার" এ মতবাদে বিশ্বাস করে না। সে বিনা কারণে অন্যের ওপর আক্রমণ চালানোর নিন্দা করে। সে মানুষের স্বাধীনতার পতাকাবাহী। শক্তিমান শুধু শক্তির বলে অন্যের অধিকার কেড়ে নেবে, এর অনুমতি সে কখনো দিতে পাবে না। কার্যনির্বাহী কমিটি পোল্যান্ড, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল। তা সত্ত্বেও সে মনে করে, যেসব কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে মুসলমানদের জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা নেই, যেখানে তাদের মৌলিক অধিকার নিষ্ঠুরভাবে দলিত মথিত হচ্ছে, সেখানে বৃটিশ সরকার ও বড়লাট যতক্ষণ মুসলমানদের সাথে সত্য ও সুবিচারমূলক আচরণ না করবে, ততক্ষণ বৃটেন তার এ বিপদের মুহূর্তে মুসলমানদের সাহায্য ও সহযোগিতা যথাযথভাবে অর্জন করতে পারবে না। কার্যনির্বাহী কমিটি রাজকীয় সরকার ও বড়লাটের নিকট জোর আবেদন জানাচ্ছে যে, যেখানে যেখানে প্রাদেশিক সরকার মুসলমানদের অধিকার ক্ষুণ্ন করছে, তাদের ওপর যুলুম ও নিপীড়ন চালাচ্ছে এবং তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার হরণ করছে, সেখানেই শাসনতন্ত্র অণুসারে গভর্নরদের যে বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে, তা প্রয়োগ করার জন্য তাদেরকে যেন নির্দেশ প্রদান করেন। কার্যনির্বাহী কমিটি অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, গভর্নরগন এ যাবত মুসলমানদের অধিকার রক্ষায় শৈথিল্য দেখিয়ে আসছেন। যেসব প্রদেশে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, সেখানে গভর্নরগণ বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করলে প্রশাসন অচল করে দেয়া হবে এই মর্মে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড ক্রমাগত হুমকি দিতে থাকায় গভর্নরগণ ভীত হয়ে নিজেদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করেননি।

মুসলিম লীগ ভারতের স্বাধীনতার পতাকাবাহী হওয়া সত্ত্বেও রাজকীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে, মুসলিম লীগের অনুমোদন ও সম্মতি প্রদান

ছাড়া এমন কোন ঘোষণা যেন তাঁরা না দেন, যার লক্ষ্য হবে ভারতে শাসনতান্ত্রিক বিকাশ ও অগ্রগতির স্তরসমূহ চিহ্নিত করণ। তা ছাড়া এ ব্যাপারে মুসলিম লীগের অনুমোদন ও সম্মতি ছাড়া বৃটিশ সরকার ও পার্লামেন্ট কোন ধরনের সংবিধান রচনা ও পাশ করার অধিকারী নয়।

প্যালেষ্টাইনের আরবদের ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের অনুসৃত নীতি মুসলমানদের আবেগ ও অনুভূতিকে প্রচন্ডভাবে আহত করেছে। এমনকি এ ব্যাপারে যত প্রতিবাদ জানানো হয়েছে, তারও কোন ন্যায়সঙ্গত ফলাফল এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কার্যনির্বাহী কমিটি পুনরায় বৃটিশ সরকারকে জোর আবেদন জানাচ্ছে যে, আরবদের জাতীয় দাবীসমূহ অবিলম্বে মেনে নেয়া হোক।

পৃথিবী আজ যে মহাসংকটের সম্মুখীন, তা থেকে সাফল্যজনকভাবে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বৃটিশ সরকার যদি মুসলমানদের যথার্থ ও সম্মানজনক সহযোগিতা লাভ করা প্রয়োজন মনে করে।. তা হলে মুসলমানদেরকে এই মর্মে আশ্বস্ত করা তার কর্তব্য যে, তাদের অধিকার সুরক্ষিত। সেই সাথে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল দল মুসলিম লীগের আস্থা অর্জন করাও তার অন্যতম কর্তব্য। ওয়ার্কিং কমিটি বর্তমান নাজুক মুহুর্তে প্রত্যেক মুসলমানকে এ মর্মে আবেদন জানাচ্ছে যে, "দ্বিধাহীন চিত্তে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের সংকল্প নিয়ে মুসলিম লীগের পতাকা তলে সমবেত হোন। কেননা এর ওপরই ভারতের নয় কোটি মুসলমানের অনাগত কালের ভাগ্য, সম্মান ও মর্যদা নির্ভরশীল।[১]

(ডক্টর আশেক হোসেন বাটালভী রচিত ও লাহোরের পাকিস্তান টাইমস প্রেস থেকে মুদ্রিত "আমাদের জাতীয় সংগ্রাম, জানুয়ারী–ডিসেম্বর, ১৯৩৯" থেকে উদ্বৃত)

১· রেখাচিহ্নিত কথাগুলো লক্ষ্যণীয়। এতে বৃটিশ সরকারকে ভারতীয় মুসলমানদের অধিকারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার শর্তে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সহযোগিতাদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, বৃটেন ও তার প্রতিপক্ষ সমূহের মধ্যকার যুদ্ধ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে পরিচালিত যুদ্ধ ছিল, না অন্যায় ও অসত্যের পক্ষে, সেটা আমাদের বিবেচ্য বিষয় ছিল না। আমাদের বিবেচ্য ছিল শুধু এই যে, আমাদের জাতীয় অধিকার যেন সুরক্ষিত হয় এবং এই অধিকার সুরক্ষিত হবে, এই মর্মে নিশ্চয়তা লাভের পর আমরা এ যুদ্ধে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিলাম। অথচ যুদ্ধটি কোন মতেই ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ ছিল না বরং অন্যায় ও অসত্যের জন্যেই তা পরিচালিত হয়েছিল। (নতুন)

পুরুষানুক্রমিক মুসলমানদের সামনে উন্মুক্ত দু'টি পথ

কাজ, তা সে ব্যক্তিগত হোক কিংবা সমষ্টিগত, তার বিশুদ্ধতার জন্য দু'টো শর্ত একান্ত জরুরীঃ পয়লা শর্ত হলো, নিজেকে চেনা। আপনাকে সর্বপ্রথম জানতে হবে যে, আপনি কে। আর আপনি যেই হোন, সেই হওয়ার দাবী কি। আর এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানোর পর যদি আপনি এমন কোন তথ্য পেয়ে যান, যা আপনার কাছে সন্তোষজনক নয়, অর্থাৎ আপনার অভিলাস যদি এই হয় যে, আপনি আছেন, তা না থেকে অন্য কিছু হয়ে যাবেন, তা হলেও আপনার জন্য এটা অপরিহার্য যে, যা হতে চান, সেটা নির্দিষ্ট করবেন এবং যা হতে চান তার দাবী কি, সেটাও ভালোভাবে বুঝে নিবেন

দ্বিতীয় শর্ত হলো, ইচ্ছা শক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। আপনাকে অবশ্যই মনস্থির করতে হবে যে, আপনি যা আছেন তাই থেকে যেতে চান, না অন্য কিছু হতে চান। অতপর এ সিদ্ধান্তের আলোকে আপনি যা হতে চান, তার দাবী পূরণের জন্য আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য এর চেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না যে, এক অবস্থার প্রতি তার আসক্তি থাকবে, আবার অন্য অবস্থার প্রতিও মোহ থাকবে। কখনো এক অবস্থাকে বুকে টেনে নেবে, আবার কখনো অন্য অবস্থার দিকে ছুটবে। অথচ দু'অবস্থার কোনো একটিরও দাবী পূরণের জন্য সে প্রস্তুত থাকবে না। এই নিত্য নতুন রং বদলানো ও অস্থির চিত্ততার পরিণাম স্বরূপ কাজের দোদুল্যমানতা ও ভ্রান্তি দেখা দেয়া অনিবার্য। যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এ অবস্থায় পতিত হয় তাকে গুরুত্বহীন ও মূল্যহীন হয়ে যেতে হয়। তার কোনো

স্থীতিশীলতা থাকে না। তার অবস্থা হয়ে যায় ঝরা পাতার মত, যাকে বাতাসের ঝাপ্টা এসে ক্রমাগত এখান থেকে ওখানে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে অস্থিরমতিত্ব ও কাজের দোদুল্যমানতার যে প্রবণতা বেশ কিছুদিন যাবত লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং বর্তমানে আরো লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে, তার কারণ সম্পর্কে আমি যতই চিন্তা-ভাবনা করেছি, ততই আমার বিশ্বাস প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে যে, ঐ দু'টো জিনিসের অভাবই তাদের সমস্ত বিভ্রান্তির উৎস। কোথাও নিজেকে সঠিকভাবে চেনার অক্ষমতা, কোথাও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপরাগতা এবং ইচ্ছা ও সংকল্পের অভাব।

একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গোষ্ঠী আমাদের ভেতরে এমন রয়েছে, যাদের আদৌ কোন আত্মোপলব্দি ও আত্মমর্যাদাবোধ নেই। মুসলমান হওয়ার অর্থ কি এবং তার দাবী কি, তা তাদের মোটেই জানা নেই। এমতাবস্থায় তাদের কাছ থেকে কি করে আশা করা যায় যে, তারা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কার্যক্রমের জন্য সত্যিকার মুসলিম সুলভ কর্মপন্থা অবলম্বন করবে।

আর একটি গোষ্ঠী রয়েছে এবং তারাও সংখ্যার দিক থেকে নগণ্য নয় যাদের আত্মোপলব্দি থাকলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও অটুট ইচ্ছা শক্তি নেই। তারা জানে যে, আমরা কোন্ মর্যাদার অধিকারী এবং সেই মর্যাদার অধিকারী হওয়ার দাবী কি। কিন্তু এটা জানার কারণে তাদের মধ্যে যুগপৎ আসক্তি ও ভীতি এই উভয় ধরনের ভাব জন্ম লাভ করে। তাদের যে বিশিষ্ট মর্যাদা ও অবস্থান বর্তমানে রয়েছে, সেটা টিকে থাকুক, এটা তারা কামনা করে। কেননা ঐ মর্যাদা ও অবস্থানের প্রতি তাদের মমত্ববোধ ও হৃদয়ের টান বিদ্যমান কিন্তু ঐ অবস্থানে বহাল থাকার অত্যাবশ্যক দাবী পূরণে তারা ভীত সন্ত্রস্ত। তারা জানে যে, মুসলমান হওয়াটা তামাসা নয়, তার সাথে জড়িত রয়েছে দায়িত্ব ও কর্তব্যের এক ভারী বোঝা। তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে বহু বিধি-নিষেধের কড়াকড়ি। রয়েছে আত্মত্যাগ ও কুরবানী, রয়েছে কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রাম। এটা স্বেচ্ছায় বরণ করা এমন এক গুরুদায়িত্ব যা সারা দুনিয়ার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বাধ্য করে এবং সেই সংঘর্ষের বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই দাবী করা চলে না। এ ভয়ংকর দায়িত্বের ভীতি তাদের মনে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে, তারা মুসলমান হওয়ার দাবী পূরণ থেকে পালিয়ে বেড়ায় এবং একটা

সহজতর অবস্থান গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু তারা এটাও জানে যে, মুসলমান থাকা অবস্থায় অন্য কোন অবস্থান গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্য তাদের ইচ্ছাশক্তি নিষ্ক্রীয় ও স্থবীর হয়ে গেছে। ইসলাম ও কুফরীর মাঝখানে তারা দোদুল্যমান রয়েগেছে। ইসলামকে তারা বুকে টেনে নিতে চায়। কিন্তু তার ভীতিপ্রদ দাবী দেখে তা থেকে দূরে পালায়। কুফরীর আয়েশী আনন্দময় ও লাভজনক জীবনের দিকে ছুটে যেতে চায়। কিন্তু সেই আয়েশী আল্লাহদ্রোহিতা তাদেরকে জানিয়ে দেয় যে, আমার কাছে আসতে হলে তোমাদেরকে পুরোপুরি কাফের হয়ে আসতে হবে এবং আমার সমস্ত দাবী পূরণ করতে হবে। তারা এর জন্যও প্রস্তুত নয়। তাই তা থেকেও তারা দূরে সরে যায়। ফলে তাদের অবস্থা এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সব দিকেই তারা কেবল সুখ ও লাভ সন্ধান করে। অথচ কোন দিকেরই দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেত প্রস্তুত নয়।

বস্তুত মুসলমান সমাজ বর্তমানে এ দু'গোষ্ঠীরই সমষ্টি। তাই মুসলমানদের মধ্যে আজকাল যেসব সামাজিক আন্দোলন চালু হচ্ছে, তা ইসলামের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত। সেগুলোর উদ্দেশ্য ভ্রান্ত। কর্মপদ্ধতি ভ্রান্ত নেতৃত্ব ভুল পথে চালিত। আর তার চালিকা শক্তির গতি–প্রকৃতিতেও ভ্রান্তি বিরাজমান। সচেতনতার অভাবে অনেকে এ ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে পারে না। তাই প্রবল ঝোঁক ও আবেগের বশে এ সব আন্দোলন তারা পরিচালনা করে থাকে। তারা মনে করে, কোন আন্দোলনে "মুসলমানদের উপকারিতা" থাকলেই সে আন্দোলন সঠিক হয়ে যায়। يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا [১] কিছুলোক এ ভ্রান্তি বুঝতে পারলেও তারা নিজেদের প্রবৃত্তির গোপন দুর্বলতার দরুন এ সব আন্দোলনকে সমর্থন করে। কেননা তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে এরূপ প্রবঞ্চনা দিয়ে অভিভূত করে রেখেছে যে, ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে একটা মধ্যবর্তী পথ অবলম্বনই নিরাপদ। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মাঝে কোন মধ্যবর্তী পথ নেই এবং এ ধরনের কোনো পথে চললে মুসলমানদের ইহকাল পরকাল কোনোটাই হয় না। সুতরাং মুসলমানদের প্রকৃত কল্যাণ কামনার দাবী এই যে, তাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের পথ এবং উভয়ের দাবী ও পরিণতি তুলে ধরা প্রয়োজন এবং তাদেরকে দু'টোর একটা গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া উচিত।

১· "তারা মনে করে যে, তারা যা করছে ভালই করছে।" (সূরা কাহাফ, আয়াত ১০৪)

আমি মাসিক তরজুমানুল কুরআনে "জাতি" এবং "জামায়াত" বা দলের মৌলিক পার্থক্যের আলোচনার অবতারণা করেছিলাম ইসলাম ও জাহেলিয়াতের উল্লিখিত পথ দু'টো সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যেই।[১] এ আলোচনায় আমি কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে এ কথা প্রমাণিত করেছিলাম যে, "মুসলমান" পরিভাষাটি যে মানবগোষ্ঠীর জন্য তৈরী হয়েছে, তা আসলে প্রচলিত অর্থে কোন "জাতি" নয় বরং তা একটা দল বিশেষ। এবার একটু সবিস্তারে বলতে চাই যে, "জাতি" ও "দল" হওয়ার দাবী ও ফলাফলে পার্থক্য কি। আপনাকে জাতি না হয়ে দল হতে বাধ্য করার কোন অধিকার আমার বা অন্য কারো নেই। আপনার যা খুশী তা হওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা ও এখতিয়ার রয়েছে। তবে আমি আপনাকে শুধু এতটুকু সাহায্য করতে পারি যে, আপনার মনের দ্বন্দ্ব ও দৃষ্টির অস্পষ্টতা দূর করতে পারি, যাতে আপনি উক্ত উভয় অবস্থার মধ্যে সঠিকভাবে তুলনা করতে পারেন এবং উভয় অবস্থাকে একত্রিক করার যে পন্থা আপনি উদ্ভাবন করেছেন তা যে নীতগতভাবেই ভুল এবং ফলাফলের দিকে দিয়ে মারাত্মক তা যেন আপনি বুঝতে পারেন।

কোন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ মূলত ঐতিহাসিক প্রভাব এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতা থেকেই জন্মে। অর্থাৎ কিছু লোক যখন দীর্ঘকালব্যাপী বিশেষ এক ধরনের নৈতিক ধ্যান-ধারণা ও সামাজিক রীতিনীতি ধারণা করে পরস্পরে মতৈক্য গড়ে তোলে এবং অন্যান্য মানবগোষ্ঠী থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করে অতপর এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম পর্যন্ত এ উত্তরাধিকার বহন করে তার ভিত্তি নিজেদের ভেতরে সুদৃঢ় করে তোলে, তখন তাদের মধ্যে নিজেদের সামগ্রিক সত্তার যে চেতনার সৃষ্টি হয়, তাকেই "জাতীয়তা" নামে আখ্যায়িত করা হয়। কিছু অভ্যাস ও প্রথার প্রতি তাদের একাত্মতা জন্মে এবং কিছু ধ্যান-ধারণার প্রতি তাদের আসক্তি ও প্রেমের সৃষ্টি হয় যাতাদের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। এ সকল জিনিসের সমষ্টিকেই তাদের জাতীয় সংস্কৃতি বলা হয়। তাদের মধ্যে পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকার এ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা

---

১. তাফহীমাত প্রথম খন্ডে "ইসলামী জাতীয়তার মর্মকথা" দেখুন। অধিকতর বিশ্লেষণের জন্য দেখুন "ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ"। এ নিবন্ধদ্বয় প্রথমে মাসিক তরজুমানুল কুরআনে প্রকাশিত হয় এবং পরে তা উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবেশিত হয়। (নতুন)

ও উত্তর-পুরুষদের জন্য তা রেখে যাওয়ার বাসনা স্বাভাবিকভাবেই জন্ম লাভ করে, যাতে তাদের জাতীয় জীবনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।

যে মানবগোষ্ঠী এ অর্থে একটি জাতিতে পরিণত হয়, তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জন্ম নেয়ার পর তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এ আকাংখার উদ্ভব হয় যে, নিজেদের সামগ্রিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ যেন তাদের নিজেদের হাতেই থাকে এবং অন্য কোন গোষ্ঠীর ইচ্ছা যেন তাদের ওপর চেপে বসতে না পারে। এটা একটা জাতির রাজনৈতিক স্বার্থ। অনুরূপভাবে জীবিকার যেসব উপকরণ তার কাছে সঞ্চিত রয়েছে তা সংরক্ষণ করা এবং অধিকতর যেসব উপকরণ অর্জন করা সম্ভব, জনগণের অধিকতর সমৃদ্ধির স্বার্থে তা অর্জন করাও তার কাম্য। একেই বলা হয় জাতির অর্থনৈতিক স্বার্থ।

এ কথা স্বতসিদ্ধ যে, জাতীয়তার এই যে সংজ্ঞা ওপরে বর্ণিত হলো, তার আলোকে মুসলমানরা শত শত বছরের উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ হয়ে একটি জাতিতে পরিণত হয়েই রয়েছে এবং তারা এখন দুনিয়ার অন্য সকল মানবগোষ্ঠী সমূহের মধ্যে একটা বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র সামষ্টিক সত্তার অধিকারী। এ কথাও সন্দেহাতীত যে, বিপুল সংখ্যক ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী দ্বারা বেষ্টিত থাকার কারণে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং তাদের জাতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণের প্রশ্নও দেখা দেয় এবং সে প্রশ্নের গুরুত্ব উপেক্ষা করার মত নয়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, মুসলমানদের জাতীয় রূপ কি শুধু এটাই? দুনিয়ার অন্যান্য জাতির মতই তারাও কি কেবল একটি জাতি এবং তা ছাড়া আর কিছুই নয়? তাদের জাতীয়তার স্বরূপ কি শুধু ততটুকুই যে, একটি গোষ্ঠী পুরুষানুক্রমিকভাবে এক ধরনের জীবন যাপন করে নিজেদের মধ্যে "জাতীয়তার" সৃষ্টি করে নিয়েছে? তারা যাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলে, তা কি কেবল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অভ্যাস, প্রথা ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সমষ্টি?[১] বাপ-দাদার উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করা, এ যাবত অর্জিত রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক উপকরণাদি হাত ছাড়া হতে না দেয়া, স্বজাতির লোকদের সুখ সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণাদি হস্তগত করা এবং সার্বিকভাবে তাদের সামষ্টিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের

১. ইসলামী সংস্কৃতি কোন জিনিসের নাম তা আমি 'ইসলামী তাহজীব আওর উসকে উসূল ও মাবাদী' (ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা) নামক পুস্তকে বর্ণনা করেছি। (নতুন)

হাতে রাখা–কেবলমাত্র এগুলোই কি তাদের জাতীয় সমস্যা? যদি এটাই মুসলমানদের জাতীয়তা ও সংস্কৃতি এবং এগুলোই তাদের জাতীয় সমস্যা হয়ে থাকে, তা হলে নিসন্দেহে তাদের মধ্যে বর্তমানে যেসব আন্দোলন চালু রয়েছে। তার সবই সঠিক। এমতাবস্থায়ঃ তাদের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সকল নামধারী এবং মুসলিম সমাজের সাথে সংশ্রবযুক্ত মুসলমানদেরকে একই মঞ্চে সমবেত করার যোগ্য লীগ ধরনের একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান তাদের থাকবে। তাদেরই সমাজের কোনো ব্যক্তি তাদের নেতা হবে এবং সেই নেতার ইংগীতে তারা উঠবে ও বসবে এবং তাদের যাবতীয় তৎপরতার উদ্দেশ্য হবে শুধু এই যে, যা কিছু হাতে আছে তা হাতছাড়া না হতে পারে এবং আরো যা কিছু হস্তগত করা সম্ভ তা হস্তগত হয়, চাই তা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ হোক বা অবৈধ হোক, যদিও সেই ইসলামের নামেই তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। দেশের শাসন ব্যবস্থা তা সে যে ধরনেরই হোক না কেন তার নিয়ন্ত্রণে তাদের স্বগোত্রীয় লোকদের পূর্ণ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা থাকাই তাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে বিবেচিত হওয়ার কথা, যাতে করে তারা আপন পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকার (অর্থাৎ নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি)–কে তারা যে আকারে টিকিয়ে রাখতে চায়, রাখতে পারে এবং যে ধরনের সুযোগ–সুবিধা দেশের জনগণের মধ্যে বন্টিত হয় তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের স্বগোত্রীয়রাও পেতে পারে।

অবস্থা ও পরিবেশ বিবেচনা করে দেশের যে কোন দলের সাথে যে কোন শর্তে যেমন খুশী সম্পর্ক স্থাপন করাও তাদের জন্য বৈধ হবে[১] কেবল এই শর্তে যে, এ সম্পর্ক যেন তাদের গোষ্ঠী স্বার্থের অনুকূল হয়। এ ধরনের কোন সম্পর্ক স্থাপন যখন জেনে শুনে ক্ষতিকর শর্তে করা হবে অথবা তাতে আপন জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ উপেক্ষিত হবে, কেবল তখনী জাতীয় বিশ্বাস ঘাতকতার প্রশ্ন উঠবে।

অন্যান্য জাতির মধ্যে যেমন জাতীয়তাবাদের (Nationalism) উৎপত্তি ঘটেছে, তাদের মধ্যেও তেমনি তার উৎপত্তি ঘটা বৈধ হবে। তারাও ইটালী,

১. চাই তা কংগ্রেস হোক কিংবা সমাজতান্ত্রিক দল কিংবা অন্য কোন দল। (পুরানো)

জার্মানী ও জাপানের মত পৃথিবীতে নিজেদের স্বেচ্ছাচারমূলক কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। ফ্যাসিবাদী পন্থায় নিজেদেরকে সংগঠিত করতে পারবে। প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) ও যোগ্যতমের টিকে থাকার (Survival of the Fittest) বিধান অনুসারে নিজেদেরকে বাঘের মত "যোগ্যতম" প্রমাণিত করতে পারবে এবং অযোগ্য ছাগল ভেড়াদের গ্রাস করা শুরু করতে পারবে। তারাও সাম্রাজ্যবাদীদের কাতারে শামিল হতে পারবে। যেন তেন প্রকারে পৃথিবীতে আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং এ পার্থিব জীবনেই এ পৃথিবীতেই বেহেস্তের স্বাদ ভোগের ব্যবস্থা করতে পারবে।

বস্তুত জাতীয়তার এ মতাদর্শ গ্রহণ করার পর মুসলমানদের জন্য এ সবই বৈধ হয়ে যায়। তবে এ কথা সকলেরই ভালোভাবে জেনে নেয়া উচিত যে, এ ধরনের জাতীয়তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্কই নেই। কোনো বর্ণবাদী গোষ্ঠীর সাথে ইসলামের যেমন কোনোই সংশ্রব নেই তেমনি কোনো দলের পুরুষানুক্রমিক রীতি-প্রথার প্রতিও তার কোন আসক্তি নেই। পার্থিব জীবনের সমস্যাবলীকে সে কতিপয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে না। ইসলাম পৃথিবীতে এ জন্য আসেনি যে, মানব জাতি আগে থেকেই যেসব সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে, তার ওপর সে নিজের নামে আরো একটা গোষ্ঠী আমদানী করবে। ইসলাম মানব গোষ্ঠীসমূহকে হিংস্র পশুতেও পরিণত করতে চায় না যে, তাদেরকে পরস্পরের মধ্যে টিকে থাকার লড়াই বাঁধিয়ে দিয়ে প্রাকৃতিক নির্বাচনের পরীক্ষায় অংশীদার করবে। কেননা এ সবই ইসলামের পরিপন্থী। আপনার জাতীয়তা ও জাতীয় সংস্কৃতি যদি এ-ই হয়ে থাকে এবং এ-ই যদি হয়ে থাকে আপনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, তাহলে আপনি আপনার জাতির জন্য অন্য কোনো একটা নাম রেখে নিন। ইসলামের নাম ব্যবহার করার আপনার কোনো অধিকার নেই। কেননা ইসলাম আপনার এ জাতীয়তা ও এ সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে। আমার বুঝে আসে না যে, ইসলামের নামটাই ব্যবহার করা চাই, আপনার এমন গো ধরার হেতুটা কি। "মুসলমান" শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য নিয়ে তো আপনার কোনো মাথাব্যথা নেই। আপনার তো কেবল নিজের জাতীয়তার জন্য একটা নামের দরকার। তা এ জন্য আপনি যে নামই উদ্ভাবন করবেন সেটাই আপনার স্বতন্ত্র সামষ্টিক সত্তার প্রতিক হিসেবে বেশ ব্যবহৃত হতে থাকবে, যেমন "মুসলমান" শব্দটা এখন প্রতিক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ধরনের জাতীয়তার মধ্যে এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে. যার জন্য "মুসলমান" শব্দ ব্যবহার করতেই হবে?

এ নামটা পাল্টে দেয়ার প্রয়োজন শুধু এ জন্য দেখা দেয়নি যে, আপনারা যে মতবাদ ও আদর্শের ওপর আপন জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপন করছেন, সেটা মূলত ইসলামের বিরোধী। বরঞ্চ পাল্টে দেয়ার প্রয়োজন এ জন্যও দেখা দিয়েছে যে, এ সব মতাদর্শ নিয়ে মুসলমানরা যা কিছুই করবে, তা ইসলামের দুর্ণাম ও কলংক ডেকে আনবে। দুনিয়ার মানুষ তাদের কার্যকলাপ দেখে মনে করবে যে, ইসলাম বোধ হয় এ সবই শিক্ষা দেয় আর এর ফলে তারা ইসলামের প্রতি অধিকতর বীতশ্রদ্ধ হয়ে দূরে সরে যাবে। তারা আপন "জাতীয় স্বার্থের" খাতিরে অমুসলিম সেনাবাহিনীকে আপন জনসংখ্যার আনুপাতিক আসন বহাল রাখতে চেষ্টা করবে আর দুনিয়ার মানুষ বুঝবে যে, ইসলাম বোধ হয় এ রকমই শিক্ষা দেয় যে, যে তোমাকে পনেরো টাকা বেতন দেয় তার হুকুমে যে কোনো মানুষের প্রাণনাশ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। তারা আপন জাতীয় স্বার্থের তাগিদে যে কোন ধরনের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সুযোগ-সুবিধা আকড়ে ধরতে চেষ্টা করবে। অথচ দুনিয়ার মানুষ এ হীন মানসিকতার জন্য ইসলামকেই দায়ী করবে। তারা চরম নীতিভ্রষ্টতা সহকারে আপন স্বার্থের অনুকূল যে কোন জিনিসের সমর্থন এবং আপন স্বার্থের প্রতিকূল যে কোন জিনিসের বিরোধিতায় সোচ্চার হবে। কখনো তারা একটি দলে যোগ দেবে আবার কখনো আর একটি দলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে এবং তা কোনো নৈতিক বা আদর্শিক মতৈক্যের কারণে নয়, বরং নিছক "জাতীয় স্বার্থের" খাতির। মুসলিম জাতির চরিত্রে যখন এহেন সুবিধাবাদের প্রতিফলন ঘটবে, তখন মানুষ ভাববে যে, ইসলাম এধরনের চরিত্রেরই জন্ম দিয়ে থাকে। তারা জাতীয় স্বার্থের সন্ধানে চতুর্দিকে ব্যগ্রভাবে ছুটবে, ফ্যাসিবাদ ও কম্যুনিজমের আদর্শ পর্যন্ত গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না উৎপীড়নমূলক পুঁজিবাদ ও স্বৈরাচারী ব্যক্তি শাসিত রাজ্যেও আশ্রয় নেবে। ইংরেজ হিন্দু ও দেশীয় রাজ্য যেখানেই স্বার্থের দেবতাকে সমাসীন দেখবে, তার দিকেই সিজদায় আনত হবে। আর মুসলমানদের কল্যাণেই ইসলাম এ সব কলংকে কলুষিত হতে থাকবে। ইসলাম শত শত বছর ধরে মুসলমানদের ওপর যে অনুগ্রহ করেছে তার বদলা অন্তত এমন শোচনীয় অপমান ও লাঞ্ছনা দ্বারা দেয়া কোন ক্রমেই উচিত হতে পারে না।

পক্ষান্তরে আপনি যদি যথার্থই ইসলামকে ভালোবাসেন এবং আপনি সত্যিকার মুসলমান থাকতে চান, তা হলে আপনার জানা উচিত যে, ইসলাম ইয়াহুদী ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের মত কোন পৈতৃক ধর্ম নয়, যা বর্ণবাদী জাতীয়তা

গড়ে তোলে। ইসলাম হলো সমগ্র মানব জাতির জন্য একটা নৈতিক ও সামাজিক জীবন ব্যবস্থা। এটা একটা বিশ্বজনীন মতবাদ (World Theory) এবং একটা আন্তর্জাতিক আদর্শ (Universal Idea). এ আদর্শ এমন একটা সমাজ গড়ে তুলতে চায়, যা এ জীবন ব্যবস্থা, এ মতবাদ ও মতাদর্শ নিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে আবির্ভূত হবে, বিশ্ববাসীর সামনে এর বাস্তব চিত্র তুলে ধরবে এবং যে যে জাতির যে যে মানুষ এ আদর্শকে গ্রহণ করবে, তাদেরকে সে আপন সমাজের অর্ন্তভূক্ত করতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত সকল জাতির মধ্যে ভেদাভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবে। তার মতে যে জিনিস তার মতবাদ ও জীবন বিধানের সাথে সঙ্গতিশীল, কেবল সেটাই 'ইসলামী' বলে গণ্য হতে পারে। আর যে জিনিস তার পরিপন্থি, তা মেনে নিতে সরাসরি অস্বীকার করবে, চাই সারা দুনিয়ার মুসলমানদের ব্যক্তিগত স্বার্থ তার সাথে জড়িত থাকুক। সুতরাং মুসলমানরা যদি ইসলামের জীবন বিধানের খাতিরে বেঁচে থাকতে চায় এবং এ জীবন বিধানকে পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা–সাধনা করে, তা হলে নিসন্দেহে তারা ইসলামী সমাজ ও মুসলিম জনগোষ্ঠী বলে বিবেচিত হবে। নচেৎ নিজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ এবং আপন স্বার্থের খাতিরে সংগ্রাম ও চেষ্টা–সাধনা করার বেলায় ইসলামের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আপনি কাজ করবেন নিজের জন্য আর নাম ব্যবহার করবেন ইসলামের, এটা কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না।

ইসলামী জীবন বিধানের এ বিশ্বজনীনতা ও আন্তর্জাতিকতা হৃদয়ঙ্গম করার পর এবার বুঝতে হবে যে, একটা বিশ্বজনীন জীবন বিধান ও আন্তর্জাতিক মতবাদের দাবী ও চাহিদা কি।

প্রথমত, সে রকমারি দলের মধ্যে সাধারণ একটা দল হয়ে থাকাতে সন্তুষ্ট হয় না। বরঞ্চ তার স্বাভাবিক দাবী এ হয়ে থাকে যে, সে হবে সর্বেসর্বা এবং একমাত্র দল। সে প্রতিপক্ষীয় কোনো শক্তিকে নিজের সহযোগী ও অংশীদার করতে প্রস্তুত হয় না আপোষ করা (Compromise) তার পক্ষে অসম্ভব। সে দর কষাকষি করে না, বরং বিজয়ী ও পরাক্রান্ত হতে চায়।

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ১

দ্বিতীয়ত, সে জীবন সমস্যাগুলো ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে না বরং সামগ্রিক ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। অমুক ব্যক্তি, অমুক শ্রেণী বা অমুক গোষ্ঠীর কল্যাণ কিসে নিহিত, সেটা তার বিবেচ্য বিষয় হয় না। তার বিবেচ্য বিষয় শুধু মানুষ এবং সামগ্রিকভাবে মানুষের জন্য যেসব সমস্যার সমাধান প্রয়োজন, তাই সে সমাধান করতে চায়। এরূপ সমাধানে কে কতটুকু পাবে এবং কে কতটুকু হারাবে তার তোয়াক্কা সে করে না।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ২

তৃতীয়ত, সাময়িক ও আঞ্চলিক লক্ষ্য অর্জন তার অভিষ্ট হয় না বরং একটা চিরন্তন ও বিশ্বজনীন লক্ষ্যই তার কাম্য। সেই লক্ষ্য এই যে, পৃথিবীতে জীবন যাপনের যে পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া তার মূলনীতির বিরুদ্ধে চালু রয়েছে তার বিলোপ ঘটিয়ে আপন আদর্শ ও মূলনীতির ভিত্তিতে স্বতন্ত্রভাবে একটা ব্যবস্থা কায়েম করবে।

চতুর্থত, ইসলাম এমন কোন জাতীয়তার সংকীর্ণ গন্ডীতে আবদ্ধ থাকতে রাজী হয় না যার ভিত্তি বংশীয় ও পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তার সফলতার অপরিহার্য শর্ত এই যে, সমকালীন মানব জাতির মধ্য হতে উত্তম ও সৎ লোকদেরকে বেছে বের করে আপন সংগঠনে নিয়ে আসবে এবং তাদের বিবিধ যোগ্যতাকে কাজে লাগাবে। সে যদি কোনো বিশেষ জাতির স্বার্থের রক্ষক হয়ে যায়, তা হলে অন্যান্য জাতির ওপর তার আবেদনের কোনো প্রভাব যে থাকবে না, তা বলাই বাহুল্য।

পঞ্চমত, ইসলাম কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর বংশানুক্রমিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত রীতিপ্রথার সাথে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে না। বরং প্রত্যেক যুগে সমগ্র মানব জাতি আপন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা যেসব তথ্য—

১. "যেন তিনি এ সত্য ও সঠিক ব্যবস্থাকে অন্য সকল জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করে দিতে পারেন।" (তওবা, আয়াত ৩৩)

২. তোমরাই সেই শ্রেষ্ঠতম উম্মাত যাকে মানব জাতির (হেদায়াত ও সংশোধনের) জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে। (আলে –ইমরান, আয়াত ১১০)

তত্ত্ব নয় বরং তথ্য উদ্ভাবন করে অথবা নিজস্ব চেষ্টা–সাধনা দ্বারা যে কল্যাণকর ফলাফল লাভ করে, সেই সমস্ত তথ্য ও আবিষ্কারকে নিয়ে নিজের প্রস্তাবিত সমাজ ব্যবস্থায় আপন মূলনীতি অনুসারে এমনভাবে বিলীন করে দেয় যে, তা এ সামষ্টিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক অংশে (আমদানী করা জিনিস নয়) পরিণত হয়।

ষষ্ঠত, এ সাফল্যের জন্য শুধু ইসলামী বিধানকে চূড়ান্ত সত্য ও মানব জাতির জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত করাই যথেষ্ট নয়, বরং আপন অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সে নিজের মূলনীতিগুলোকে একটা বিপ্লবী আন্দোলনের ভিত্তিরূপে দাঁড় করানোর দাবী জানায়। আরো দাবী জানায় যে, এ আদর্শে বিশ্বাসীরা যেন একটা মুজাহিদের দল হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তার মতাদর্শ রাষ্ট্রীয় মূলনীতির রূপ ধারণ করে।

এগুলো হলো ইসলামের দাবী এবং মুসলমান হওয়ারও দাবী। এক্ষণে মুসলমানরা যদি "ইসলামী দল" হিসেবে সক্রিয় হতে চায়, তা হলে তাদেরকে এ যাবত অনুসৃত জাতীয় নীতি পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে এ সব দাবীর সাথে সঙ্গতিশীল ও সমন্বিত করে নবরূপে ঢেলে সাজাতে হবে।

তাদেরকে মস্তিষ্ক থেকে জাতীয় স্বার্থ সংক্রান্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং তদস্থলে ইসলামের আদর্শ ও লক্ষ্যকে বদ্ধমূল করতে হবে। সাময়িক ও আঞ্চলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করতে হবে এবং আপন দৃষ্টিকে এ একটি মাত্র লক্ষ্যের দিকে কেন্দ্রীভূত কতে হবে যে, ইসলামের আদর্শ যেন পৃথিবীতে শাসক আদর্শে পরিণত হয়। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলে তাদেরকে সারা দুনিয়ার সাথে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবং তাদের আদর্শকে মানে না এমন কোনো পক্ষের সাথে তারা কোনো শর্তেই আপোস রফা করতে পারবে না। তাদেরকে একটা অনমনীয় আদর্শবাদী দলে পরিণত হতে হবে। আদর্শের প্রতি অনুগত নয় এমন অকর্মণ্য লোকদেরকে ছাটাই করতে হবে এবং অন্য সকল জাতির মধ্য থেকে এ আদর্শের আনুগত্য কতে প্রস্তুত এমন লোকদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে নিজেদের দলে ভেড়াতে হবে। সুবিধাবাদ ও সযোগসন্ধানী মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে এবং যত বড় ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থ যুক্ত হোক, আপন আদর্শ ও মূলনীতির বিপরীত কিছুই করা চলবে না। আদর্শের জন্য লড়াই করতে পারে এবং জাতীয় রাষ্ট্র

(National State) নয় বরং আদর্শবাদী রাষ্ট্র (Ideological State) কায়েমের অভিলাস পোষণ করে–এমন এক সংগ্রামী সংগঠন তাদের গড়ে তুলতে হবে।

এ ধরনের সংগঠন যখন তারা গড়ে তুলবে, তখন তাদের নেতৃত্বও পাল্টে ফেলতে হবে। তখন কেবলমাত্র তারাই মুসলিম সমাজের নেতা হতে পারবে, যারা ইসলামের মৌল তত্ত্বকে সঠিকভাবে জানে এবং তা সবচেয়ে বেশী অনসরণ করে। একটি জাতির নেতা হওয়ার জন্য জাতির সদস্য হওয়াই যথেষ্ট। কিন্তু একটি আদর্শবাদী দলের নেতা হতে হলে দলীয় আদর্শের সবচেয়ে বড় পতাকাবাহী হতে হয়। মুসলমানদের জাতীয় সংগঠনে ইসলামী আদর্শচ্যুত লোকেরা প্রথম সারিতেও স্থান পেতে পারে। কিন্তু আদর্শভিত্তিক সংগঠনে তাদের স্থান সবচেয়ে পেছনের সারিতে হবে। এমনকি তাদের অনেকে হয়তো আদৌ কোনো সারিতেই স্থান পাবে না।

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ উপরোক্তআলোচনাথেকেদু'টোপথই স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন এ উভয় পথের লাভ–লোকসানেও তুলনা করে দেখুন। তাতে করে উভয় পথের যে কোন একটি পথ বেছে নেয়া সহজ হবে।

মুসলমানরা যদি নিছক বৈষয়িক স্বার্থের জন্য সংগ্রামরত একটি জাতি হয়, তাহলে তাদের অবস্থা হবে একটা কঠিন পাথরের মত। তাদের মোকাবিলায় অনুরূপ কঠিন পাথরের আকারে আরো বহু জাতি বিদ্যমান থাকবে। তাদের সাথে সে সব জাতির সংঘর্ষ পাথরের সাথে পাথরের সংঘর্ষের মতই হবে। এক পাথর আর এক পাথরের অংশ নিয়ে নিজ দেহের আয়তন বৃদ্ধি করতে পারে না, কিংবা এক পাথর এক পাথরের ভেতরে ঢুকতেও পারে না। দুটো পাথরের মধ্যে দু ধরনের আচরণই হওয়া সম্ভব। হয় উভয় পাথর নিজ নিজ জায়গায় বসে থেকেই সন্তুষ্ট থাকবে। নচেৎ এক পাথর আর এক পাথরের ওপরে চড়াও হবে এবং তার সাথে টক্কর দিয়ে তাকে চূর্ণ করতে ও পিষে ফেলতে চেষ্টা করবে। প্রথম অবস্থায় মুসলমানরা সীমিত থেকে যাবে। দ্বিতীয় অবস্থায় তাদের বিস্তার ও সম্প্রসারণের সম্ভাবনা থাকে বটে, তবে সেটা ফ্যাসিবাদী ইটালী ও নাৎসী জার্মানীর সম্প্রসারণের মতই। সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনও এককালে এভাবে নিজের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিল। এ ধরনের সম্প্রসারণ দ্বারা মুসলমানরা পৃথিবীতে আর একটি নৈরাজ্যবাদী ও দুরাচার জাতির সংযোজন ঘটানো ছাড়া আর কোনো কীর্তি সাধন করতে

পারবে না। কিছু কাল পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়ানোর পর অবশেষে আপন অপকর্মের শাস্তি লাভ করার মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াই হবে তার শেষ পরিণতি।

পক্ষান্তরে মুসলমারা যদি ইসলামী মর্মার্থ অনুসারে এমন একটি আদর্শবাদী দলে পরিণত হয়, যা কেবল একটি বিশ্বজনীন জীবন বিধান ও আন্তর্জাতিক মতবাদের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত থাকে এবং যে দলে প্রতিটি মানুষ তাদের আদর্শকে গ্রহণ করে সমান মর্যদা ও সমান অধিকার নিয়ে প্রবেশ করার সুযোগ পায়, তা হলে তাদের অবস্থা কঠিন পাথরের মত না হয়ে একটা বর্ধনশীল দেহের (Organic Body) মত হবে। সে ক্ষেত্রে মুসলিম জাতিকে একটি গাছের সাথে তুলনা করা যাবে যা তার চার পাশ থেকে বিভিন্ন বস্তুর অংশ আহরণ করে ধীর ধীরে বড় হতে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় মুসলমানরা একদিন একটি বিশ্বশক্তিতে পরিণত হবে। তারা দুনিয়াকে জয় করবে নিজের জন্য নয় সত্য ও ন্যায়ের আদর্শকে সমুন্নত করার জন্য। যদি সত্য সত্যই তাদের আদর্শ মানুষের বিবেককে আকৃষ্ট করতে এবং মানব জাতির সামস্যাবলীর সমাধান করতে সক্ষম হয় বস্তুত আসলেই তা সক্ষম তাহলে দুনিয়ার মানুষ স্বতষ্ফূর্তভাবে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করতে এগিয়ে আসবে। মুসলমানদের ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থের ডাকে কোনো বিশ্বজোড়া আকর্ষণ বা মোহ নেই। আপনি যদি সে দিকে মানুষকে আহবান জানান তা হলে মানুষ সে দিকে কখনো স্বতষ্ফূর্থভাবে আকৃষ্ট হবে না। আপনাকে বল প্রয়োগে টেনে আনতে হবে। কিন্তু ইসলামের আদর্শ ও মূলনীতির বিশ্বজয়ের ক্ষমতা রয়েছে। বিশ্বের মানুষ তার দিকে আপনা থেকেই আকৃষ্ট হবে যদি মুসলমানরা আপন জাতীয় স্বার্থের জন্য নয়, বরং আপন আদর্শের জন্য বেঁচে থাকতে ও জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে। সমাজতন্ত্রের উদাহরণ আপনার সামনেই বিদ্যমান। সমাজতন্ত্রবাদীরা স্বগোত্রীয়দের স্বার্থের জন্য নয়, বরং সমাজতন্ত্রের আদর্শের জন্য অবিরত সংগ্রাম করেছিল বলেই সমাজতন্ত্র ক্রমান্বয়ে একটা বিশ্বশক্তিতে পরিণত হতে সমর্থ হয়েছে। আজ যদি তারা সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম থেকে বিরত হয় এবং প্রত্যেক দেশের সমাজতন্ত্রীরা কেবল নিজেদের জাতীয় স্বার্থের ধান্ধায় মেতে ওঠে, তা হলে অচিরেই দেখতে পাবেন সমাজতন্ত্র একটা বিশ্বশক্তি হিসেবে খতম হয়ে যাবে।

(তরজুমানুল কুরআন, মে, ১৯৩৯)

সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু

যেহেতু মুসলমানরা নিজেদের ধর্মকে একটা আন্তর্জাতিক আন্দোলনের পরিবর্তে একটা স্বকীয় জাতীয় সংস্কৃতি এবং নিজেদেরকে একটা আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দলের পরিবর্তে নিছক একটি জাতিতে পরিণত করে রেখেছে। এ জন্যই আমরা আজ এর এই ফলাফল দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলমানদের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আজ তার জন্য এটা একটা মস্ত উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আদমশুমারীতে আমি যখন চারজনের মোকাবিলায় একজন, তখন আমি চর্তুগুণ শক্তির আধিপত্য থেকে নিজেকে কিভাবে রক্ষা করি।

এ উদ্বেগ ও পেরেশানী ক্রমাম্বয়ে পরাজিত মানসিকতায় রূপান্তরিত হচ্ছে। আর দুর্বল প্রতিপক্ষের ন্যায় এখন মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য আপন গন্ডীতে সংকুচিত হয়ে পড়া ছাড়া আর কোন পথ নজরে আসছে না। এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে শুধু এ কারণে যে, ইসলামের আকারে তার কাছে যে জিনিসটি রয়েছে তার শক্তি কত প্রবল এবং মুসলমান হিসেবে পৃথিবীতে তার মর্যাদা কিরূপ, তা সে জানেই না। ইসলামকে সে একটা ভোতা ও নিস্তেজ অস্ত্র এবং নিজেকে নিছক একটি "জাতি" মনে করছে। এ জন্যই তার বেঁচে থাকা সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। তার যদি স্মরণ থাকতো যে, আমি একটি আদর্শবাদী দলের সদস্য এবং এমন দলের সদস্য, যার উদ্দেশ্যই হলো আপন আদর্শ ও মতবাদ এবং সমাজ দর্শন (Social Philosophy) দ্বারা সমগ্র দুনিয়াকে জয় করা, তাহলে তার কখনো কোনো উদ্বেগের কারণ দেখা দিত না। তার জন্য সংখ্যালঘু ও সংখাগুরুর প্রশ্নই উঠতো না। আপন গন্ডীতে সংকুচিত ও সীমিত হওয়ার পরিবর্তে সে সামনে এগিয়ে যেত এবং ময়দান দখল করার কৌশল উদ্ভাবনের চিন্তা-ভাবনা করতো।

সংখ্যাধিক্য সংখ্যা স্বল্পতার প্রশ্ন দেখা দেয় কেবল আদর্শ বিবর্জিত জাতিসমূহের ক্ষেত্রে আদর্শবাদী দলের ক্ষেত্রে নয়। কোন শক্তিশালী মতবাদ

এবং প্রাণবন্ত সামাজিক দর্শন নিয়ে যেসব দলের অভ্যুদয় ঘটে, সেসব দল সব সময়ই সংখ্যালঘু হয়ে থাকে এবং সংখ্যালঘু হয়েও বিরাট বিরাট সংখ্যাগুরুর ওপর শাসন চালায়। রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যদের সংখ্যা বর্তমানে মাত্র ৩২ লাখ[১] এবং বিপ্লবের সময় আরো কম ছিল। কিন্তু সেই দলটি ১৭ কোটি মানুষকে পদানত করে ছাড়লো। মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদী দল মাত্র ৪ লক্ষ সদস্য সমবায়ে গঠিত। এ দল যে দিন রোম শহরে কুচকাওয়াজ পরিচালনা করে, সে দিন তার সদস্য সংখ্যা ছিল তিন লাখ। কিন্তু এ ক্ষুদ্র দলটি ইটালীর সাড়ে চার কোটি মানুষের ওপর জেঁকে বসলো। জার্মানীর নাৎসী পার্টির অবস্থাও একই রকম। খোদ ইসলামের ইতিহাস থেকে যদি প্রাচীন কালের উদাহরণ দেয়া হয়, তাহলে তা এই বলে উপেক্ষা করা হতে পারে যে, সেই যুগ অতিক্রান্ত এবং সেই পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। কিন্তু এ উদাহরণগুলো আমাদের এ যুগেরই সাম্প্রতিকতম ঘটনা হিসেবে বিরাজমান। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সংখ্যালঘু আজও শাসন ক্ষমতা লাভ করতে পারে যদি সে একটি আদর্শবাদী দলের মত সাধনা করে এবং সংকীর্ণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিবর্তে এমন আদর্শ ও মূলনীতির জন্য সংগ্রাম করে, যা মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান করতে ও মানুষের মনোযোগ ঐ দলের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

এ উদ্দেশ্যে ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে অন্য সকল দলের চেয়ে উত্তম ও আকর্শণীয় কর্মসূচী রচনা করা সম্ভব এবং সেই কর্মসূচী নিয়ে মুসলমানরা যদি সক্রীয় চেষ্টা–সাধানায় আত্মনিয়োগ করতে উঠে পড়ে লেগে যায়, তাহলে মাত্র কয়েক বছরেই পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে। কিন্তু এখানে যেসব লোকের হাতে মুসলমানদের নেতৃত্ব বিদ্যমান, তারা ইসলাম কি, তা যেমন জানেনা, নিজেদের মুসলমানী পরিচয় যেমন তাদের অজ্ঞাত, তেমনি যে শক্তি ও পরাক্রম দ্বারা ইসলাম সব কিছুকে জয় ও পদানত করে থাকে, সেই শক্তির উৎসের সন্ধানও তারা জানে না। তাদের মাস্তিষ্কের দৌড় বড়জোর এতদূর যে, নিজেদেরকে সংখ্যালঘু দেখে হয় সুরক্ষিত দূর্গে আশ্রয় নিতে ছুটে যাওয়ার চিন্তা–ভাবনা করবে, নচেত অন্যদের অনুসরণ এবং অমুসলিম নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া বাঁচার আর কোন উপায় নেই বলে সিদ্ধান্ত নেবে।

---

১. এ পরিসংখ্যান ১৯৩৯ সালের। (নতুন)

পৃথিবীতে বর্তমানে যতগুলো দল ক্ষমতায় আধিষ্ঠিত রয়েছে, তার কোনটারই জনশক্তি কয়েক লাখের বেশী নয়। সম্ভবত রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টিই বর্তমানে সবচেয়ে বড় দল। কিন্তু আমি একটু আগেই বলেছি যে, তার সদস্যও ৩২ লাখের বেশী নয়। এই হিসেবে দেখতে গেলে বলতেই হয় যে, যে আদর্শ ও মতবাদের পতাকাবাহীর সংখ্যা কেবল একটি দেশেই আট কোটি এবং সারা পৃথিবীতে ৪০ কোটি বা তারও বেশী। তার সমগ্র পৃথিবীর শাসক হওয়ার কথা। দুনিয়ার এই চল্লিশ কোটি মুসলমানের মধ্যে যদি দলীয় চেতনা জাগ্রত থাকতো, আপন দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপলব্ধি থাকতো এবং তারা সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সর্বাত্মক সংগ্রামে বদ্ধপরিকর হতো, তা হলে সত্যি সত্যিই তারা সারা দুনিয়ার শাসক হয়ে বসতে পারতো। কিন্তু কেবলমাত্র এই চতনা ও উপলব্ধির অভাব এবং এই সংগ্রামী প্রেরণা ও উদ্দীপনার অনুপস্থিতিতেই এমন বিরাট জনশক্তি সম্পন্ন দলকে একেবারেই নিষ্প্রভ, নিষ্ক্রীয় ও অকর্মণ্য করে দিয়েছে। শয়তানের লেলিয়ে দেয়া বিভিন্ন অপশক্তি এই দলটিকে চিমটে ধরে রেখেছে এবং সে যাতে কোন ক্রমেই আত্মসচেতন না হতে পারে এবং নিজের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার মত সম্বিত কখনোই ফিরে না পায়, সে জন্য তারা অব্যাহত চেষ্টায় নিয়োজিত। পশ্চিম থেকে পূর্ব এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত ভারতের মুসলমানদের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখুন। সর্বত্রই আপনার চোখে পড়বে যে, একটা না একটা শয়তান এ জাতির সাথে দুষ্টগ্রহের মত লেগে আছে এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিজের অপকর্মে মেতে রয়েছে। যেখানে মুসলমানদের মধ্যে এখনো ধর্মীয় চেতনা অবশিষ্ট রয়েছে, সেখানে এ শয়তানরা ধর্মীয় আলখেল্লা পরে আসে এবং ধর্মের নামে এমন সব নগণ্য ও ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে তর্ক-ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয়-এমনকি মাথা ফাটাফাটি পর্যন্ত ঘটিয়ে দেয়, যার ইসলামে কোনই গুরুত্ব নেই। এভাবে মুসলমানদের সমস্ত ধর্মীয় আবেগ উচ্ছ্বাস তাদের নিজেদের নিপাত করার কাজেই ব্যয়িত হয়। আর যেখানে ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য ও উদাসীনতার সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে অন্য ধরনের শয়তানদের উপদ্রব ঘটে এবং তারা পার্থিব উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রলোভন দেখিয়ে মুসলমানদেরকে নিরেট অনৈসলামিক উদ্দেশ্য ও অনৈসলামিক কর্মপদ্ধতি সম্পন্ন আন্দোলনের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

যারা মুসলিম জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, তারা জানেন যে, এমন অধোপতিত অবস্থা ও তাদের মধ্যে অনেকখানি নৈতিক

শক্তি রয়েছে এবং তা দ্বারা অনেক কাজ নেয়ার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু এ জাতিটাকে এমন কতকগুলো রোগে পেয়ে বসেছে, যা আট কোটি মুসলমানের এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে দিয়েছে। যে মহান লক্ষ্যের জন্য ইসলাম জেহাদ, পরিশ্রম ও প্রাণান্তকর সাধনার দাবী জানায়, তা থেকে তাদেরকে অনেক দূরে ঠেলে দেয়া হয়েছে। তাদের মনমানস থেকে ইসলামের যথার্থ ধারণা এবং মুসলমানের প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্যকে মুছে ফেলা হয়েছে। আসলে তাদেরকে একেবারেই আত্মভোলা করে দেয়া হয়েছে। তাদের মনে এ ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল করা হয়েছে যে, ইসলাম তাদেরকে যে জীবন পদ্ধতি দেয় তার যেমন কোন ভবিষ্যত নেই, তেমনি তার সাফল্যেরও কোন সম্ভাবনা নেই।

এ সব কারণে আমরা আদমশুমারীর রেজিষ্টারে মুসলমান নামের যে বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী দেখতে পাই, ইসলামের কল্যাণ সাধনে তার কোনই কার্যকারিতা নেই। এ জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে যদি কিছু করা হয়, তাহলে শোচনীয় হতাশার শিকার হতে হবে। তাদের ওপর বড় জোর এতটুকু আশা করা যেতে পারে যে, যদি একটা জীবন্ত আন্দোলনের আকারে ইসলামের পুনরুত্থান ঘটে এবং স্বীয় আদর্শ ও মূলনীতির কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তাকে শয়তানের অনুচর বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়, তা হলে সম্ভবত সে অমুসলিমদের চাইতে এই পুরুষানুক্রমিক মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু বেশী স্বেচ্ছাসেবী অপেক্ষাকৃত সহজেই পেয়ে যাবে।

এখন যারা প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল হওয়া ইসলামকে জানে ও বুঝে, যাদের মন এ ব্যাপারে পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত যে, এ ইসলামের শাসনেই মানবতার কল্যাণ ও সাফল্য নিহিত এবং একমাত্র ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতেই মানবীয় সমাজ ও সভ্যতার একটা ভারসাম্যপূর্ণ ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে ওঠতে পারে, তাদের কতিপয় ভুল ধারণা থেকে নিজের মন-মগজকে পরিষ্কার এবং কয়েকটি বিষয় মনে বদ্ধমূল করে নেয়া উচিত।

প্রথমত ইসলামকে "মুসলমানদের স্বার্থের" সাথে জড়িত করা ঠিক নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এ প্রশ্নের কোনই গুরুত্ব নেই এবং ইসলাম তার অনুসারীদের এ "স্বার্থ" স্বীকারই করে না যে, একটা অনৈসলামিক শাসন

ব্যবস্থা চালানোর জন্য কতজন মুসলমান স্বশস্ত্র বাহিনীতে, কতজন পুলিশ বাহিনীতে, কতজন সরকারী অফিস–আদালতে এবং কতজন আইন সভায় আসন লাভ করবে। যাতে করে আল্লাহর এ জমীনে তারাও অমুসলিমদের মত আইন রচনার কাজে নিয়োজিত হতে পারে। ইসলামে এ প্রশ্নেরও কোন গুরুত্ব নেই যে, কোন্ কোন্ দেশীয় রাজ্যের শাসনভার মুসলমান শাসকদের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে, যাতে করে তারা অমুসলিম রাজাদের মত আল্লাহর রাজ্যের অবৈধ মালিক হয়ে মসনদে আসীন হতে পারে। এ জাতীয় প্রশ্নাবলীকে ইসলামের স্বার্থের দোহাই দিয়ে গুরুত্ববহ করে তোলা স্বয়ং ইসলামেরই অবমাননার শামিল। একটি ইসলামী আন্দোলনকে এ ধরনের যাবতীয় প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের বিজয় ও সাফল্য বর্তমান আদমশুমারীর খাতায় তালিকাভুক্ত মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তির ওপর যেমন নির্ভরশীল নয়, তেমনি তার বিজয়ের পথে হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিমদের সংখ্যাধিক্যও কোন দুলংঘ বাধা নয়। আদমশুমারীর খাতায় মুসলমান ও অমুসলমানদের আনুপাতিক হার দেখে এরূপ ধারণা করা যে, ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের আনুপাতিক হার যত, ইসলামের শক্তিও ঠিক ততটুকুই এবং এরূপ মনে করা যে, অধিবাসীদের মধ্যে অমুসলিমদের আনুপাতিক হার যত বশী, ইসলামের বিজয়ের সম্ভাবনা ততই কম। এটা কেবল ইসলামকে যারা একটা প্রাণহীন অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম মনে করে, তাদেরই কাজ। বস্তুত ইসলাম যদি একটা জীবন্ত কর্ম চঞ্চল আন্দোলন হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং তার আদর্শ ও মূলনীতির ভিত্তিতে ভারতবাসীর জীবনের প্রকৃত সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য একটা বাস্তব কর্মসূচী নিয়ে কোন সুসংগঠিত দল ময়দানে আসে, তা হলে নিশ্চিত থাকুন যে, তার আবেদন কেবল জাত মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরঞ্চ হয় তো বা অমুসলিমরা তার দিকে তাদের চেয়েও বেশী আকৃষ্ট হবে এবং এ দুর্বার স্রোতকে কোন শক্তিই রুখতে পারবে না। মুসলমানদেরকে সকল জায়গা থেকে সংগ্রহ করে কতিপয় নিরাপদ জায়গায় পৌছিয়ে দেয়াকেই যারা ইসলামের হেফাজতের একমাত্র উপায় মনে করে, পরিতাপের বিষয় যে, তারা ইসলামের এই সম্ভাবনাগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

তৃতীয়ত, কোন আন্দোলনের সাফল্য ও বিজয় কেবল তার প্রকৃত অনুসারী ও ভক্তদের সংখ্যা শতকরা ৬০ বা ৭০ হয়ে যাওয়ার ওপর

নির্ভরশীল নয়। ইতিহাসের ঘটনাবলী এবং স্বয়ং চলতি দুনিয়ার অভিজ্ঞতার আলোকেই বলা যায় যে, একটি সুসংগঠিত শক্তিশালী দল যার সদস্যরা আপন আন্দোলনের প্রতি অটুট আস্থা ও বিশ্বাস রাখে, এর জন্য জান ও মাল উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকে এবং দলীয় শৃংখলার পূর্ণ আনুগত্য করে সে দল কেবল নিজের ঈমান ও শৃংখলা শক্তির বলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম চাই তার সদস্য সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে হাজারে একজনও না হোক। দলীয় কর্মসূচী কোটি কোটি মানুষকে আকৃষ্ট করে থাকে এবং কোটি কোটি মানুষের সহানুভূতি লাভ করে থাকে। তবে স্বয়ং পার্টির অভ্যন্তরে কেবল তারাই থাকে, যাদের ঈমান ও আনুগত্যের গুণাবলী সর্বোচ্চ ও পূর্ণাঙ্গ মানের। বস্তুত ইসলামকে বিজয়ী ও ক্ষমতাসীন করতে সত্যিকারের মুসলমানদের সংখ্যার বিপুলতার প্রয়োজন নেই। অল্পই যথেষ্ট যদি তারা জ্ঞানে ও কর্মে মুসলমান হয় এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল বাজী রেখে জিহাদ করতে প্রস্তুত থাকে।

(তরজুমানুল কুরআন, জুন, ১৯৩৯)

কতিপয় আপত্তি ও অভিযোগ

তরজুমানুল কুরআনের জনৈক পাঠক লিখেছেনঃ "আপনার দৃষ্টিতে বর্তমান নেতৃবৃন্দ ও জনগণের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করা বা আখ্যায়িত হবার যোগ্য। এ যুগের রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্যে এ নামধারী মুসলমানদের কল্যাণের কোন চেষ্টা করাকেও আপনি ভালো মনে করেন না। তা হলে আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন, এ মুসলমানদেরকে কি নামে ডাকা উচিত এবং তার ওপর যে চারিদিক থেকে হামলা চালানো হচ্ছে, তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন চেষ্টা–তদবীর করার প্রয়োজন আছে কি না?

এ কথা সত্য যে, বর্তমান যুগের মুসলমানরা ভালো মুসলমান নয়। তারা ধর্মের পাবন্দী করেনা। তাই বলে কি তাদেরকে ডুবেই যেতে দেয়া হবে?——যতক্ষণ সবাই ভালো মুসলমান না হয়, ততক্ষণ কি তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করবে না, আর তাদেরই মত অন্যান্য মুসলমানরা তাদের কল্যাণের জন্য কোন চেষ্টা করতে পারবেনা?——ডুবন্ত মানুষকে এ কথা বলা যে, তুমি গভীর পানিতে গিয়েছিলে কেন এবং তুমি কোন সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য নও সম্পূর্ণ মানবতা বিরোধী কাজ। তাকে তো উদ্ধার করা দরকার এবং যে কোন উপায়ে তার জান বাচানোর চেষ্টা করা কর্তব্য।"

অপর একজন লিখেছেনঃ "আমার জন্য এবং আমার সমমতাবলম্বী অনেকের জন্য আপনার ভূমিকা অত্যন্ত বিব্রতকর হয়ে ওঠেছে। জাতীয়তাবাদী মুসলমান ও কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতাকারী মুসলমানদের কার্যকলাপের সমালোচনা যতদিন আপনি করেছেন, ততদিন আমরা মনে করেছি যে, আপনি ভারতে মুসলমানদের স্বকীয়তা বজায়

রাখার পক্ষপাতী। এ জন্য আপনি যাদের কার্যকলাপে মুসলমানদের স্বকীয়তা হারিয়ে যাওয়ার আশংকা বোধ করেছেন, তাদের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু যে দুটি দল এ স্বকীয়তা রক্ষারই চেষ্টায় তৎপর, সেই মুসলিম লীগ ও খাকসার আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধেই আপনি এখন সমালোচনা শুরু করে দিয়েছেন। আমার বুঝেই আসছে না যে, আপনি তা হলে কি চান? ভারতে মুসলমানদের যদি বেঁচে থাকতে হয়, তবে কোন একটা কেন্দ্রের অধীন সমবেত হওয়া, একটি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ার এবং একটা নেতৃত্বের অধীন কাজ করা তাদের পক্ষে অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্যে যে চেষ্টা করা হয়, আপনার পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধাচরণের অর্থ কি দাঁড়ায়? আপনি যদি ধর্মীয় ভাবধারার পুনরুজ্জীবন চান, তা হলে মুসলমানদের একটি সামষ্টিক অবকাঠামো গড়ে ওঠার পরই তা সম্ভব। আপাতত ভালো হোক মন্দ হোক, যে রকমই হোক, সংগঠনতো তৈরী হচ্ছে! এর সাথে সহযোগিতা করুন। পরে যথা সময়ে ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের কাজটাও করে নেবেন। কিন্তু আপনার হাবভাব দেখে তো মনে হচ্ছে, মুসলমানদের কল্যাণের জন্য যা–ই কিছু চেষ্টা হচ্ছে, তার কোনটির সাথেই আপনি সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নন।"

সম্প্রতি আমি বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে বিভিন্ন আপত্তি ও অভিযোগ সম্বলিত যে কয়টি চিঠি পেয়েছি, উল্লিখিত চিঠি দুটি তারই অন্যতম। আমাদের শিক্ষিত লোকদের অনেকেই এ ধরণের চিন্তাধারা পোষণ করছেন এবং উল্লিখিত চিঠিগুলোতে এ চিন্তাধারারই প্রতিফলন ঘটেছে।

এ কথা সত্য যে, আপন ত্রুটি–বিচ্যুতির পর্যালোচনা ও আত্মসমালোচনা কোন সুখকর কাজ নয়। আমিও সুখকর মনে করে এ কাজ করি না। এ কাজ যখন করি, তখন নিজের কাছেই মনে হয়, কোন তিক্ত ও বিষাক্ত পানীয় পান করছি। আর আমার অন্যান্য ভাইরা এতে যে তিক্ততা অনুভব করেন, তাও আমি ভালোভাবেই উপলব্দি করি। এ অনুভূতি সত্ত্বেও আমার বিবেক দাবী জানায় যে, এ তিক্ততাটুকু এড়িয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তাকে সহ্য করাই সঙ্গত। তিক্ত স্বাধের জিনিস তো বাস্তবক্ষেত্রেই বিদ্যমান। শৈথিল্য দেখানো ও এড়িয়ে যাওয়ার ফলে নিজের অনুভূতিকে বাস্তব ও প্রকৃত তিক্ততা উপলব্ধি করার ক্ষমতাকে নিষ্ক্রীয় করে দেয়া ছাড়া আর কোন লাভ হয়না। অন্যদের যুলুম ও আগ্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযোগে সোচ্চার হওয়া আর তার পাশাপাশি নিজের ত্রুটি ও দুর্বলতা সম্পর্কে উদাসীন হওয়া বরং তাকে বৈধ ও সঙ্গত

সাব্যস্ত করার যুক্তি প্রমাণ অনুসন্ধান করাতে বেশ মজা লাগে এবং মন উৎফুল্ল হয়। তবে আসলে এটা মারফিয়া ইনজেকশনের পর্যায়ভুক্ত। এটা একটা মাদক দ্রব্যের মত, যার নেশায় বিভোর হয়ে রোগী ঘুমিয়ে যায়। তবে তার ভেতরের যে বিকারের দরুন বাইরের আপদ তার ওপর চড়াও হয়েছে, সেটা তাতে দূর হয় না। আমার সমালোচক ভাইরা চান আমি যেন তাদেরকে সেই মাদক সেবন করিয়ে দেই। তাদের বাসনা, যে কল্পনার স্বর্গে তাঁরা বাস করছেন, যে মরিচিকাকে তারা অমৃতের ঝর্ণা ভেবে পরম আশায় বুক বেঁধে বসে আছেন এবং যেসব ভ্রান্ত ধারণার মনোমুগ্ধকর রূপ তাদেরকে মত্ত করে রেখেছে, সে সবই যেন আমি যথাযথভাবে বহাল থাকতে দেই। বরঞ্চ সম্ভব হলে আমিও তাদের সাথে শামিল হয়ে যাই, এটাই তারা চান। ওপরোক্ত জিনিসগুলোর প্রশংসা করা তাদের কাছে ইসলাম ও মুসলমানদের সবচেয়ে মূল্যবান সেবা বলে মনে হয়। এ সেবার উপকারিতাও আমার জানা আছে। তবে আমার সমস্যা এই যে, আমি তাদের দুশমন হয়েও তাদের কাছে প্রিয় থাকবো এটা মেনে নিতে আমি অক্ষম। তার চেয়ে বরং তাদের বন্ধু হয়েও অপ্রিয় থাকবো, এটা আমার কাছে অধিকতর পছন্দনীয়।

বস্তুত, মুসলমানদের স্বার্থ, মুসলমানদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি, মুসলমানদের সংঘবদ্ধতা, মুসলমানদের একতা ও এককেন্দ্রিকতা, মুসলমানদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি, এ সব বহুল উচ্চারিত শব্দগুলো ব্যবহার করেই আমরা সকলে আপন আপন বক্তব্য তুলে ধরতে অভ্যস্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের বাস্তব কর্মপদ্ধতি সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন। আমরা সকলে এক একজন এক এক পথ নিয়ে চলছি। এর কারণ কি? এটা কি নিছক আকস্মিক ব্যাপার? না এর গভীরে কোন নিগূঢ় কারণ লুকিয়ে আছে, যা বুঝবার চেষ্টা করা হচ্ছে না?

আমার মতে এর কারণ এই যে, আমাদের ব্যবহৃত শব্দগুলো এক রকম হলেও তা দ্বারা আমরা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বুঝে থাকি। 'মুসলমান' শব্দটা আমরা সবাই উচ্চারণ করি। কিন্তু আমি এর এক রকম অর্থ বুঝি আর অন্যরা আর এক রকম অর্থ বোঝে। এ কারণেই স্বার্থ, কল্যাণ, উন্নতি, সমৃদ্ধি, সংগঠন, সংঘবদ্ধতা, এককেন্দ্রিকতা এবং অনুরূপ প্রতিটি শব্দ যা মুসলমানদের সাথে যুক্ত করে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে, আমাদের মধ্যে বিভিন্ন অর্থবোধক হয়ে রয়েছে। এ অস্পষ্টতার কারণেই ভুল বুঝাবুঝি সংঘটিত হয়ে থাকে। আর লোকেরা যখন এ জট খুলতে অক্ষম হয় তখনই শুরু হয়ে যায় আপত্তি ও অভিযোগের পালা। বলা হয় যে, তোমরা মুসলমানদের স্বার্থ, কল্যাণ, উন্নতি,

সমৃদ্ধি ইত্যাদি চাও না। দল গঠিত হচ্ছে, কেন্দ্রমুখী হওয়ার সম্ভবনা সৃষ্টি হচ্ছে, অথচ তোমরা তার বিরোধিতা করছ। মুসলমানদের কল্যাণের জন্য কাজ হচ্ছে আর তোমরা তাতে বাধ সাধছ। অথচ একজন এ সব শব্দ দ্বারা যেসব সুনির্দিষ্ট জিনিসকে বুঝায়, অন্যজন এ শব্দগুলো সে সব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যই মনে করেনা। নচেত মুসলমানদের কল্যাণ চাইবেনা এমন বেঈমান কে আছে? আসুন, একটু অনুসন্ধান করে দেখি, এ জটিলতা কি ধরনের।

শর্তহীন ও শর্তসাপেক্ষ জিনিসের পার্থক্যটা প্রত্যেক মানুষের কাছেই বোধগম্য। আমরা যখন এমন কোন শব্দ বলি, যা কোন বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত নয়। তখন তার প্রয়োগে প্রশস্ততা জন্মে এবং শব্দটা ব্যাপক অর্থবোধক হয়ে পড়ে। আর যখন তাতে কোন বিশেষণ তথা শর্ত জুড়ে দেয়া হয় তখন সেই বিশেষণের গন্ডীর মধ্যে ছাড়া তার ব্যবহার সঠিক হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা যখন বলি 'রং' তখন তা যে কোন রং এর বেলায়ই প্রযোজ্য। এখন কোন জিনিসের কালো, সাদা বা লাল রং যদি উন্নতি লাভ করে তবে আমরা অবশ্যই বলবো যে রংটা গাড় হচ্ছে। কিন্তু যদি তাকে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে সাদা বলে বিশেষিত করি, তা হলে কালো, লাল, সবুজ ও অন্যান্য রং এর বেলায় ঐ শব্দটা আর প্রযোজ্য হবেনা। কালো বা লাল রং এর উন্নতিকে সাদা রং এর উন্নতি বলা ঠিক হবে না। অনুরূপভাবে উদাহরণ স্বরূপ "কাফেলা" শব্দটা ধরুন। যে কোন দিকে যাত্রারত কাফেলার ওপর এ শব্দটা প্রয়োগ করা চলবে। যে দিকেই সে অগ্রসর হোক, তাকে কাফেলার অগ্রগতি বলে অভিহিত করা যাবে। যে কেউ সে কাফেলার নেতা হতে পারে, যে কোন যানবাহনে চড়ে তা যাত্রা করতে পারে এবং যে কোন ধরনের রসদপত্র তার পাথেয় হতে পারে। মোট কথা মূল শব্দটা শর্তহীন হওয়া তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জিনিসই শর্তহীন ও বিশেষণ মুক্ত হবে। কিন্তু যদি পেশোয়ার যাওয়ার শর্ত আরোপ করে তাকে "পেশোয়ারের কাফেলা" নামে আখ্যায়িত করা হয়, তা হলে তা আর সাধারণ কাফেলা থাকবে না, একটা বিশেষ কাফেলায় পরিণত হবে। যে কাফেলা পেশোয়ারের অভিযাত্রী হবে, কেবল তাকেই "পেশোয়ারের কাফেলা" বলা যাবে। বোম্বে বা মাদ্রাজযাত্রী কাফেলাকে পেশোয়ারের কাফেলা বলা চলবে না। এভাবে এ কাফেলার সাথে সংশ্লিষ্ট সব কিছুই পেশোয়ারের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যাবে। যেমন পেশোয়ারের কাফেলার অগ্রগতির অর্থ হবে তার পেশোয়রের রাস্তা ধরে অগ্রসর হওয়া। সে

যদি অন্য কোন পথ ধরে চলতে থাকে, তা হলে সেই চলাকে পেশোয়ারের কাফেলার অগ্রগতি বলা যাবে না। বরং একে অগ্রগতির পরিবর্তে পশ্চাদধাবন বলতে হবে। কেননা অন্য পথে সে যত কদমই এগুবে, পেশোয়ার থেকে সে দূরেই সরে যেতে থাকবে। এ কাফেলার নেতাও এমন ব্যক্তিই হতে পারে যার পেশোয়ারের রাস্তা জানা আছে। কোন ব্যক্তি অন্য রাস্তা সম্পর্কে যতই অভিজ্ঞ হোক, সে যদি পেশোয়ারের রাস্তা না চিনে, তবে সে পেশোয়ারের কাফেলার নেতা হতে পারে না। অন্যান্য জিনিসকেও এভাবেই বুঝতে চেষ্টা করুন।

এখন দেখুন, জটিলতা কিভাবে দেখা দেয়। কাফেলারই উদাহরণই বিচার করুন। একটা কাফেলার নাম "পেশোয়ারের কাফেলা"। কিন্তু আপনি পেশোয়ারের বাধ্যবাধকতা ভুলে গিয়ে আপনি তাকে একটি সাধারণ কাফেলা মনে করলেন। অথবা পেশোয়ারের পথ আপনার অজানা। অথবা আপনি মনে করে নিলেন যে, এ কাফেলা একবার যখন "পেশোয়ারের কাফেলা" নামে আখ্যায়িত হয়েছে, তখন তা পেশোয়ার ছাড়া যে পথ ধরেই যাত্রা করুক, তাকে পেশোয়ারের কাফেলাই বলতে হবে। অথচ আমি তা মনে করি না। আমি পেশোয়ারের কাফেলাকে তার আসল অর্থেই গ্রহণ করি এবং পেশোয়ার সংক্রান্ত শর্ত বা বাধ্যবাধকতা আমি উপেক্ষা করতে প্রস্তুত নই। এ মতান্তরের ফল দাড়ায় এই যে, এ কাফেলা সম্পর্কে যত কথাই বলা হয় আমার ও আপনার মধ্যে কথায় কথায় ঝগড়া লাগে। যতক্ষণ কোন শর্ত বা বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয় না, ততক্ষণ আমরা একমত থাকি। কাফেলার লোকদেরকে একত্রিত করা হোক, তাদেরকে অন্যান্য কাফেলার সাথে মিশে হারিয়ে যেতে দেয়া না হোক, ডাকাতের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করা হোক, তাদের জন্য পাথেয় প্রয়োজন, একজন নেতার প্রয়োজন, তাদেরকে সংঘবদ্ধ করে দ্রুতবেগে গন্তব্য স্থানের দিকে এগিয়ে যাওয়া দরকার, এ সব কথা যতক্ষণ শর্তহীন, ধ্যবাধকতামুক্ত ও অনির্দিষ্ট ভাষায় বলা হবে, ততক্ষণ আমার ও আপনার মধ্যে কোন দ্বিমত থাকবে না। কিন্তু যখন এ জিনিসগুলোকে নির্দিষ্ট করার সময় হয়। তখন আমার ও আপনার ধ্যান–ধারণায় বিস্তর পার্থক্য দেখা দেয়। হঠাৎ এক ব্যক্তি আবির্ভূত হয় এবং লোকজনকে সংঘবদ্ধ করে বোম্বের দিকে চালাতে শুরু করে। অতপর আরেকজন আবির্ভূত হয় এবং কোলকাতার অভিমুখে যাত্রা করে। তৃতীয় আর একজন এসে ভিন্ন আর এক পথ অবলম্বন করে। আপনি প্রত্যেক কাফেলা চালককে দেখে জিন্দাবাদ ধ্বনি তোলেন এবং এই বলে হাক ডাক ছাড়েন যে, পেশোয়ারের কাফেলার যাত্রা শুরু হয়েছে।

আমার আপত্তি এখানেই। এই সংঘবদ্ধ হওয়া এবং এই অগ্রাভিযানকে আর যাই হোক, পেশোয়ারের কাফেলার সংঘবদ্ধ হওয়া এবং অগ্রাভিযান নয়। আপনি বলেন যে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যাত্রীরা এক জায়গায় সমবেত তো হচ্ছে এবং একটা কাফেলার কাঠামো তো তৈরী হচ্ছে। আমি বলি সব কথাই ঠিক। কিন্তু কেবল একত্রিত হওয়া এবং কাফেলার কাঠামো তৈরী হওয়ার নাম তো আর পেশোয়ারের কাফেলা হওয়া নয়। আপনি বলেন, ঐ দেখ কত সুন্দর কত দ্রুতগামী গাড়ীতে চড়ে এ কাফেলা চলে যাচ্ছে। আমার কথা এই যে, আপনার বর্ণিত গুণবৈশিষ্ট্যগুলো আমি অস্বীকার করি না। তবে প্রশ্ন হলো, এই গাড়ী কোন্ দিকে যাচ্ছে। যদি তা পেশোয়ার অভিমুখী না হয়, তা হলে তা পেশোয়ারের কাফেলার জন্য মানানসই নয়। এরূপ ক্ষেত্রে তার দ্রুতগমন আরো বেশী বিপজ্জনক। কেননা তার ফলে কাফেলা গন্তব্য স্থান থেকে আরো দূরে চলে যেতে থাকবে। আপনি বলবেন যে, আরে ভাই, কাফেলাটা তৈরী হতে দাও এবং যাত্রাটা শুরু করতে দাও। অতপর পেশোয়ারের রাস্তায়ও এক সময় ওঠা যাবে। আমার কথা হলো, পেশোয়ারে যাওয়ার সংকল্প যতক্ষণ মুলতবী রয়েছে এবং আপনি যতক্ষণ অন্যান্য সড়ক দিয়ে চলা অব্যাহত রেখেছেন ততক্ষণের জন্য আপনার নামটা পাল্টে রাখুন। আপনার অভিযাত্রা চলুক, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। আপত্তিজনক শুধু এটা যে, আপনি যাত্রা করবেন বোম্বে, মাদ্রাজ ও কোলকাতা অভিমুখে, অথচ আপনার নাম হবে "পেশোয়ার যাত্রী"। আপনি হয়তো বলবেন যে; জনাব পেশোয়ারের রাস্তা তো খুবই দুর্গম, এখন ওদিকে যাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই আপাতত পেশোয়ারের কাফেলাটিকে অন্যান্য সহজগম্য পথ ধরে চলতে দিন। আমি বলি, আমি আপনাকে দুর্গম রাস্তায় চলার জন্য কখন জবরদস্তি করলাম? আমার কথা তো শুধু এই ছিল যে, পেশোয়ারের কাফেলা পেশোয়ারের রাস্তা বাদ দিয়ে অন্যপথ ধরে চলবে, আর তার পরও সে পেশোয়ারের কাফেলাই থাকবে, এটা একটা স্ববিরোধী ব্যাপার। আমি শুধু এই স্ববিরোধিতা পরিত্যাগ করার দাবী জানাচ্ছি।

এই গোটা আলোচনায় বিতর্কের ভিত্তি হলো এই যে, আপনি একটি অসাধারণ জিনিসকে সাধারণ এবং শর্ত যুক্ত জিনিসকে শর্তহীন বানাচ্ছেন আর সেই সাথে তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জিনিসকেও বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করে দিচ্ছেন। কিন্তু আমি শর্তযুক্ত জিনিসকে শর্তযুক্ত মনে করেই কথা বলছি। আপনি যদি মনমগজকে পরিষ্কার করে নেন এবং সাধারণ কাফেলা ও

পেশোয়ারের কাফেলায় পার্থক্য কি, তা হৃদয়ঙ্গম করেন, তা হলে আর কোনই জটিলতা দেখা দিতে পারে না। কিন্তু আপনি এ সহজবোধ্য ব্যাপারটাকে মেনে নেয়ার পরিবর্তে আলোচনার মোড় অন্য প্রসঙ্গের দিকে ঘুরিয়ে দেন। কখনো বলেন, তোমরা কাফেলার সমাবেশ সারিবদ্ধকরণ ও অগ্রগতির বিরোধী। অথচ সমাবেশ সংঘবদ্ধতা ও অগ্রাভিযানের বিরোধিতা করার প্রশ্নই ওঠে না। কখনো আপনি প্রশ্ন তোলেন যে, এটা যদি পেশোয়ারের কাফেলা না হয় তা হলে তাকে আর কোন্ নামে অভিহিত করা হবে? অথচ নামকরণের দায়ীত্ব আমার ওপর বর্তায় না। আমার বক্তব্য তো সুস্পষ্ট। কাফেলা যদি পেশোয়ারের পথের যাত্রী হয়ে থাকে, তা হলে তা পেশোয়ারের কাফেলা। আর যদি তা না হয়, তবে সে নিজের নাম যা খুশী রাখুক, কিন্তু পেশোয়ারের কাফেলা নামকরণ কিছুতেই লাগসই হয়না। ইচ্ছা হয় আপনি কাফেলা যে পথে চলছে, তা পেশোয়ারের পথ কিনা, তা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা চালান। কিন্তু নীতিগতভাবে এ কথা আপনাকে মেনে নিতেই হবে যে, যে কাফেলা পেশোয়ারের যাত্রী নয়, তা পেশোয়ারের কাফেলা নয়। পুনরায় আপনি সমমর্মীতার প্রশ্ন তোলেন। অথচ সমমর্মীতা ও নির্মমতার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। এটাতো বাস্তবতার প্রশ্ন। মাদ্রাজ বা কোলকাতা গমনকারীদেরকে আমি পেশোয়ারের যাত্রী কিভাবে বলি? জেনেশুনে একটা অবাস্তব ব্যাপার বিশ্বাস করা কি ধরনের সমমর্মীতা? আমার মতে বরং এটা পেশোয়ারের রাস্তা, আর অমুক অমুকটি অমুক অমুক স্থানে যাওয়ার পথ, এ কথা সাফ সাফ বলে দেয়াই সমমর্মীতার সঠিক পন্থা। যারা যথার্থই পেশোয়ার যেতে চায়, কিন্তু রাস্তা না চেনার কারণে অন্যান্য রাস্তায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে, অথবা তাদেরকে ঘুরানো হচ্ছে, তারা সঠিক পথ চিনে নেবে। আর যারা আসলেই অন্যপথে যেতে চায়, আমি তাদের পথ আগলে দাঁড়াতেও চাইনা। আর তাদের সাথে আমার এমন কোন শত্রুতাও নেই যে, অমানবিক পন্থায় তাদের প্রতি নির্মম আচরণ করবো। আমার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, যেদিকে যেতে চায় জেনে শুনে পূর্ণ সচেতনতার সাথে যাক। আর যখন যাবে, তখন অবাস্তব নাম নিয়ে যেন না যায়।

মুসলমানদের বেলায় যে ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে, তা উপরোক্ত উদাহরণে যা বলা হলো, অবিকল সেই ধরনের ব্যাপার। মুসলমান শব্দটা ইসলাম থেকেই গৃহীত। আর ইসলাম একটা সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারা, একটা জীবন লক্ষ্য, একটা জীবনপদ্ধতি ও আচরণ পদ্ধতির নাম। এ দিক দিয়ে

মুসলমান অর্থ যে কোন ধরনের মানুষ নয় বরং যে মানুষ জীবনের সকল ব্যাপারে সেই সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারা, সেই জীবন লক্ষ্য, সেই বিশেষ চরিত্র ও চালচলন এবং সেই বিশেষ কর্ম ও আচরণ পদ্ধতি অনুসরণ করে, যার নাম ইসলাম। "মুসলমান" শব্দের এ সব অপরিহার্য বাধ্যবাধকতা ও শর্তাবলী যদি সঠিকভাবে বুঝে নেয়া হয়, তা হলে মুসলমানদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি, তাদের স্বার্থ ও সংগঠন এবং তাদের নেতৃত্ব—এক কথায় তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জিনিসের অর্থ ও মর্ম নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যদি এ সব বাধ্যবাধকতা উপেক্ষা করে "মুসলমান" শব্দটাকে একটি সাধারণ মানবগোষ্ঠীর ধর্মের অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে প্রতিটি মানুষ যে কোন জিনিসকে মুসলমানদের স্বার্থ, তাদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি যে কোন ধরনের সংগঠনকে ইচ্ছামত নিজস্ব সংগঠন এবং সর্বস্তরের মানুষকে পরিচালনা করার যোগ্য বলে অনুমিত যে কোন মানুষকে মুসলমানদের নেতা ও আমীর রূপে বিবেচনা করতে ও মেনে নিতে পুর্ণ ও অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের এখানে বর্তমানে এরূপ একটা পরিস্থিতিরই উদ্ভব হয়েছে। "ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ" এর বাধ্যবাধকতা অগ্রাহ্য করে সত্যি সত্যিই "মুসলমানদেরকে নিছক একটি জনসমষ্টি মনে করা হয়েছে এবং এর ফলে অত্যন্ত আজব ও উদ্ভট ধরনের বস্তুকে মুসলমানদের স্বার্থ, তাদের কল্যাণ ও সুখ, তাদের সমাজ ও সংগঠন এবং তাদের নেতৃত্ব প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন কেউ বলেন, ব্যাংক, বীমা এবং অনুরূপ অন্যান্য জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়াতে মুসলমানদের স্বার্থ নিহিত। অথচ মুসলমান শব্দটার আদৌ কোন অর্থ যদি থেকে থাকে তবে সে অর্থের আলোকে বর্তমানে পৃথিবীতে যে অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে, তাকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করে তার স্থলে ইসলামী আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যশীল একটা নতুন অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রত্যেক মুসলমানই আদিষ্ট। তা হলে মুসলমান হিসেবে যে ব্যবস্থার সাথে আপনার আদর্শিক সংঘাত ও শত্রুতা বিদ্যমান, সেই ব্যবস্থাতেই আপনার স্বার্থ সংরক্ষিত মনে করা এবং তাকেই "মুসলমানদের স্বার্থ" নামে আখ্যায়িত করা উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কের পরিচায়ক নয় তো আর কি? অনুরূপভাবে সরকারী চাকুরীতে এবং আইন রচনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আসন লাভকে "মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষক" বলে মনে করা হয়ে থাকে। অথচ মুসলমান শব্দটাকে যদি ইসলামের বাধ্যবাধকতার অধীন করা হয়, তা হলে দেখা যায় যে, এই সমস্ত জিনিসই মুসলমানের স্বার্থের পরিপন্থী। যে শাসন ব্যবস্থা

পরিচালনাকে আপনি মুসলমানদের স্বার্থে জরুরী বলছেন, আসলে সেই শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন করাতেই মুসলমানদের স্বার্থ নিহিত। অনুরূপভাবে ইংরেজরা এ দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে, তার সাহায্যে মুসলমানদের নব্য বংশধরের মন-মানস গড়ে তোলাকে আপনি মুসলমানদের সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নতির চাবিকাঠি মনে করেন। আর সেই শিক্ষা ব্যবস্থার অধীন আপনি নিজ খরচে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বানিয়ে তার নাম রাখেন ইসলামিয়া স্কুল, ইসলামিয়া কলেজ ও মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ এ গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী ধাঁচে গড়ে তোলে।

মুসলমানদের সমাজ, সংগঠন ও নেতৃত্ব সম্পর্কেও আপনাদের মনে এ ধরণেরই ভ্রান্ত ধারণা বিরাজমান। আসলে ইসলাম যে কি ধরনের আন্দোলনের নাম, কি তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, কি তার আদর্শ ও মূলনীতি এবং সে কি ধরনের আচরণ ও কর্মপদ্ধতি দেখতে চায়, সেটা যদি আপনি জানতেন, তা হলে অতি সহজেই স্থির করতে পারতেন যে, ইসলামের নামে যেসব রাজনৈতিক দল, সংগঠন এবং নেতারা তৎপর, তারা আসলে কোন্ পর্যায়ের। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের দল শুধু সেটাই হতে পারে, যা আল্লাহ বিমুখ সরকার উৎখাত করে আল্লাহর অনুগত সরকার কায়েম করতে এবং আল্লাহর আইনকে রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত করতে তৎপর হয়। যে দল তা করে না, বরং আল্লাহ বিমুখ শাসন ব্যবস্থার অধীন "মুসলমান" নামক একটি জাতির পার্থিব কল্যাণের জন্য কাজ করে, তা ইসলামী দল বা সংগঠন নয় এবং তাকে মুসলমানদের দল বলাও ঠিক নয়। অনুরূপভাবে একমাত্র সেই সংগঠনই মুসলমানদের সংগঠন হওয়ার যোগ্য, যা ইসলামী সাংগঠনিক নীতিমালা ও বিধান অনুসারে গঠিত হয় এবং যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ইসলামের অনুসারী। অন্যথায় যে সংগঠন ফ্যাসিবাদী পন্থায় গঠিত হয় এবং যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ইসলামের নয় বরং শুধু নিজের বিজয় ও পরাক্রম প্রতিষ্ঠা, তাকে কেবল এ জন্য মুসলমানদের সংগঠন বলা যাবে না যে, তা আদমশুমারীর মুসলমানদেরকে সংগঠিত করছে এবং তাদেরকে "পৃথিবীর উত্তরাধিকারী" করার জন্য অব্যাহতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একইভাবে মুসলমানদের নেতা হওয়ার যোগ্যও কেবল তারাই যারা ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি সবার আগে জানে এবং আল্লহভীতি ও সততার গুণে যারা গুণান্বিত। পক্ষন্তরে ইসলামের কোন জ্ঞানই যাদের নেই অথবা অসম্পূর্ণ জ্ঞানের দরুণ ইসলাম ও জাহেলিয়তকে মিলিয়ে মিশিয়ে

একাকার করে ফেলে এবং খোদাভীতি ও সততার ন্যূনতম অপরিহার্য শর্ত পূরণে যারা অক্ষম তাদেরকে নিছক পাশ্চাত্য ধাঁচের রাজনীতি ও সংগঠন পদ্ধতিতে পারদর্শী ও দেশপ্রেমিক হওয়ার কারণে মুসলমানদের নেতৃত্বের যোগ্য সাব্যস্ত করা ইসলাম সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞতা ও অনৈসলামিক মানসিকতার পরিচায়ক।

এ কথাগুলো যখন মুসলিম জনগণকে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়, তখন তারা বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয় এবং আপত্তি ও অভিযোগের হিড়িক পড়ে যায়। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে আবেগপ্রবণ হওয়ার কোন অবকাশ নেই। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করেই তাদের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত যে, তারা ইসলামের স্বার্থে ইসলামী নীতি অনুসারে কাজ করবে, না নিজের স্বার্থে নিজের মনগড়া নীতি অনুসারে কাজ করবে। যদি প্রথমটা স্থির হয়ে থাকে, তা হলে তাদের সহজ সরল পন্থায় প্রতিটি অনৈসলামিক কাজ ত্যাগ করা কর্তব্য, আর যদি দ্বিতীয়টার পক্ষে মনস্থির করা হয়ে থাকে, তা হলে তারা যা করতে চায় সানন্দে করুক। আমি তাদের পথ রোধ করতে আসছি না। তাদের কাছে আমার অনুরোধ শুধু এই যে, তারা যেন ইসলাম ও মুসলমানদের নামের অপপ্রয়োগ করা বন্ধ করে।

(তরজুমানুল কুরআন, ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

লক্ষ্যভ্রষ্ট পথিক

পৃথিবীতে সব সময় দুই শ্রেণীর মানুষ কর্মরত থাকে। এক শ্রেণী, যারা বিরাজমান পরিস্থিতিকে হুবহু মেনে নেয় এবং সেই অনুসারে কাজ করে। অপর শ্রেণীটি হলো, যারা বিরাজমান পরিস্থিতিকে এ দৃষ্টিতে দেখে থাকে যে, বর্তমানে তা যেমনই থাকুক, আসলে তা কেমন থাকা উচিত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা বিরাজমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে থাকে। প্রথম শ্রেণীটি বর্তমানের গাড়ী চালায়। আর দ্বিতীয় শ্রেণী ভবিষ্যতের সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য পথ সুগম করে। এ উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতা আবশ্যক। তবে তাদের সহযোগিতার স্বাভাবিক পন্থা হলো সংঘর্ষ।

"পরিস্থিতি বর্তমানে কেমন" এটা যাদের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু তারা সর্বদা বর্তমানের ওপরই আসক্ত থাকে। তাদের কথা হলো, যা চলছে, ভালোই চলছে। এতে কোন সমালোচনার অবকাশ নেই। আর যদি সমালোচনার যোগ্য হয়েও থাকে, তবে এখন তার উপযুক্ত সময় নয়। এখন সমালোচনা করলে অমুক অমুক সমস্যা দেখা দেবে এবং অমুক অমুক স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটবে। এ সব কথা তারা এজন্য বলে থাকে যে, সাময়িক স্বার্থ ও তাৎক্ষণিক সুযোগ সুবিধার মধ্যেই তাদের নজর আটকা পড়ে থাকে। বর্তমানের সুখ-স্বাচ্ছন্দের মোহ তাদেরকে ভবিষ্যতের সুখাস্বাচ্ছন্দের কথা ভাববারই সুযোগ দেয় না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে দেখতে গেলে সমালোচনার উপযুক্ত সময় আর কখনোই আসবে না। কেননা যখন যা হবে, তাদের দৃষ্টিতে তা ভালোই হবে। সব সময়ই এমন কিছু স্বার্থ থাকবে, যার ব্যাঘাত ঘটার আশংকা বিদ্যমান। সেসব স্পর্শকাতর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করে তারা সব সময়ই এ কথা বলতে থাকবে যে, এখন সমালোচনার সময় নয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তারা নিজেরা কখনও বলতে পারবে না যে, সমালোচনার উপযুক্ত সময় কোন্‌টি।

কিন্তু যাদের দৃষ্টি "কেমন হওয়া উচিত" নিয়ে আবর্তিত, তারা পরিস্থিতিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকে বলে "বর্তমানবাদীদের" কাছে যেটা একেবারেই অসময়, তারা সেটাকেই উপযুক্ত সময় মনে করে। উপস্থিত

সুখ যাদের পরম কাম্য, তাদের শত চিৎকার, বিলাপ এমনকি গালিগালাজ শুনেও তাদের নির্বিকার থেকে কাজ করে যেতে হয়। তা না হলে সমাজের সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ অসম্ভব হয়ে পড়তে বাধ্য। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, "যা চলছে ভালোই চলছে" এ মানসিকতা সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যাওয়ার পর কোন সংস্কার ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করাই সম্ভব নয়। সমাজে যে অনাচার বিদ্যমান, তার অনুভূতিই সৃষ্টি হবেনা। ফলে তা দূর করার আবশ্যকতাও অনুভূত হবে না। যদি কিছু অনুভূতি জাগ্রত হয়ও তবে তা ধামাচাপা দেয়ার জন্য ঐ সব অনাচারকে অনিবার্য প্রমাণ করা অথবা তাকে সদাচার সাব্যস্ত করার হাজারো খোঁড়া যুক্তি হাজির করা হবে।

"কেমন হওয়া উচিত" এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যে সমালোচনা করা হয়, তার ফলে চলমান অনাচারগুলো তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ হয়ে যাবে এবং সমালোচকের ইপ্সিত আদর্শ (Ideal) পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সমাজ স্থবিরতা ও অচলাবস্থার শিকার হয়ে থাকবে। এমনটি অবাস্তব ও অপ্রত্যাশিত। এমনটি কখনো হয়নি এবং হতেও পারে না। সমালোচনার প্রভাব স্বভাবতই পর্যায়ক্রমে হয়ে থাকে। প্রথম প্রথম ওটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও বিরক্তি বিবেচিত হয়ে থাকে। কেননা সাধারণ গণমানষ নগদ প্রাপ্যের প্রতিই বেশী আগ্রহী এবং বাকীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে থাকে। তারপর একটা যুগ আসে সন্দেহ-সংশয়ের। এ সময় সততা ও সদুদ্দেশ্য প্রবণতা ছাড়া সম্ভাব্য সকল খারাপ জিনিস সংস্কারকের ওপর আরোপ করা হয়। অতপর যদি তার সমালোচনায় সত্যি সত্যিই কোন সারবত্তা থেকে থাকে, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় বাস্তবিকই সমালোচনার মাধ্যমেই চিহ্নিত ত্রুটিগুলোর সন্ধান পাওয়া যায় এবং সমালোচক যে মানদন্ডকে সামনে রেখে সমালোচনা করেছেন, তাকেই শ্রোতাদের বিবেক সত্য বলে মেনে নেয়। তাহলেই লোকেরা ক্রমান্বয়ে সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে আরম্ভ করে। এভাবে যখন পর্যায়ক্রমে সংস্কার ও সংশোধনের পক্ষে জনমত গঠিত হতে থাকে, তখন সমসাময়িক নেতৃত্বের ওপর চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে হয় উত্তরসূরী নেতৃবৃন্দ আপন নীতি পাল্টাতে বাধ্য হন, নতুবা পরিবর্তনশীল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক নতুন নেতৃত্ব (Leadership) আপনা আপনি তৈরী হয়ে আবির্ভূত হয়। এ প্রক্রিয়া চলাকালে ইতিহাসের গতি কখনো স্তব্ধ হয় না বা তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না। সুতরাং যে অচলাবস্থার ভয়ঙ্কর চিত্র

দেখিয়ে "বর্তমানবাদীরা" সংস্কার ও উন্নয়নের প্রতিটি চেষ্টাকে মারাত্মক বিষময় সাব্যস্ত করে থাকেন, তা দেখা দেয়ার কোন অবকাশই থাকে না।

কোন বিশেষ অবস্থাকে আদর্শ বা মডেল বলে চিহ্নিত করে তার প্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা করার অর্থ এরূপ হয় না যে, আমরা বর্তমান অবস্থা থেকে হঠাৎ এক লাফে সেই আদর্শ অবস্থায় পৌছে যেতে চাই। এমন আকস্মিক পরিবর্তনের কথা কোন বুদ্ধিমান মানুষই যে কল্পনা করতে পারে না, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। কেননা পরিবর্তন সর্বাবস্থায় পর্যায়ক্রমেই সংঘটিত হবে। তবে সম্ভবত কোন বুদ্ধিমান মানুষের কাছ থেকে এটাও আশা করা যায় না যে, যে অবস্থাটাকে সে আদর্শ বলে আখ্যায়িত করছে। তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে কোন পর্যায়েই সে রাজী হতে পারে। সে যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে, তবে যে অবস্থাটাকে কাম্য ও কাংখিত বলে ঘোষণা করছে, তার দিকেই সামগ্রিক পরিস্থিতি এক কদম দু কদম করে হলেও অগ্রসর হোক, এটা তার অত্যন্ত ব্যগ্রতাবেই কামনা করার কথা। উদাহরণ স্বরূপ, আমি যদি মনে করি যে, খেলাফতে রাশেদার ধরনের নেতৃত্ব, রাজনীতি ও জীবনধারা মুসলমানদের জন্য আদর্শ স্থানীয়, তবে তার অর্থ এ নয় যে, এখন যে ব্যক্তি মুসলমানদের নেতা হবেন, তাকে অবশ্যই অবিকল হযরত ওমর ফারুকের (রা) মত নেতা হতে হবে, আর তাঁর সঙ্গীরা সকলে হযরত আলী (রা) হযরহ আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা) এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)–এর সমপর্যায়ের হবে। তাই বলে এর অর্থ এটাও নয় যে, সাহাবায়ে কেরামের সময়কার মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম মানের পরিবেশ আমার চূড়ান্ত গন্তব্য হওয়া সত্ত্বেও আমি এমন লোকদেরকে নেতা ও পথ প্রদর্শক মেনে নেব, যারা সেই গন্তব্য স্থলে যাওয়ার পথও চেনেন না এবং সেদিকে যেতে ইচ্ছুকও নন বরং তার ঠিক বিপরীত দিকে ধাবমান।

মনে করুন আমি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার ফুট উচ্চতায় উঠতে চাই। তা হলে ওপরে ওঠার যোগ্য মাধ্যম বা উপকরণই আমাকে খুঁজতে হবে, চাই প্রাথমিক পর্যায়ে তা আমাকে দশ ফুটের বেশী ওপরে তুলতে সক্ষম না-ই হোক। এমন কোন উপকরণ যদি আমি না পাই, তা হলে আমি ভূ-পৃষ্ঠের ওপরেই থেকে যাওয়া পসন্দ করবো। কিন্তু আপনি যদি দেখতে পান যে, আমি একটা বৈদ্যুতিক লিফটে বসে কোন কয়লার খনিতে নামতে শুরু করেছি, অথচ ঐ উপায়ে আমি সেই উচ্চ স্থানেই যেতে চাইছি, তা হলে আমার উন্মাদ

হওয়ার ব্যাপারে কি আপনার কোন সন্দেহ থাকবে? অনুরূপভাবে, যাদের বাস্তব জীবনে, চিন্তাধারায়, মতাদর্শে, রাজনৈতিক কর্ম পদ্ধতিতে ও নেতৃত্বের প্রকৃতিতে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেও ইসলামের কোন আলামত দেখতে পাওয়া যায় না, যারা ছোট বড় কোন সমস্যার ব্যাপারেই কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গী কি, তা জানে না এবং তা অন্বেষণ করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে না,[১] যারা কেবল পাশ্চাত্য আইন ও পাশ্চাত্য শাসনতন্ত্রেই পথ নির্দেশিকার সন্ধান পায়, তারাই শরণাপন্ন হয় এবং যারা নিছক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়া আর কিছুরই ধার ধারে না, তাদের পদানুসরণ করেই আমি ইসলামী সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও হযরত ওমরের শাসন ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কর্মরত রয়েছি, এটা যখন দেখবেন, তখনও আমার মস্তিষ্ক বিকৃতির ব্যাপারে আপনার সন্দেহ থাকা উচিত নয়। মঞ্জিলে মকসুদ নির্ধারণ করা হলো একটা, আর তার পথ নির্ণয় করা হলো ঠিক তার বিপরীতমুখী! ঐ গন্তব্যে পৌছার সংকল্পকারী কোন মানুষ এই পথে পদচারণার কথা কল্পনাও করতে পারে, এটা কোন বুদ্ধিমান মানুষ স্বীকার করবেনা।

লক্ষ্যভ্রষ্ট পথিক হয়তো অজ্ঞতার অজুহাতে দায় এড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেই ব্যক্তির অবস্থা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়, যে নিজেরই ঘোষিত আদর্শের ভয়ে ভীত হয়, বিরক্ত হয়, তাকে লাঞ্ছিত ও পদদলিত হতে দেখে হর্ষোৎফুল্ল হয়, তার সমর্থককে আক্রমণ করতে তেড়ে যায়। আবার সেই সাথে এ কথাও বলতে থাকে যে, আমার আদর্শ তো ওটাই। বস্তুত এ এক কিম্ভূতকিমাকার আদর্শ, যার সাথে এ যাবত আমাদের কোন পরিচয় ছিল না। আমাদের তো এ কথাই জানা ছিল যে, আদর্শ মানুষের প্রিয়তম বস্তু। তার নাম শুনে মানুষের মনে উদ্দীপনার সৃষ্টি হওয়ার কথা। যদি কেউ আপন আদর্শকে আয়ত্ব করতে অক্ষম হয়, তবে সে দুঃখিত ও ব্যথিত হবে এটাই স্বাভাবিক। আর যদি তার এ ভ্রষ্টতাকে ধরিয়ে দেয়া হয় তবে সে লজ্জায়

---

১. বিস্ময়ে পরিপূর্ণ এ পৃথিবীতে যেসব আজব ও উদ্ভট কথাবার্তা শুনতে পাওয়া যায় তার মধ্যে এও একটা যে, "আমাদের নেতা যদিও কুরআন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন, তথাপি তিনি যেসব কাজ করছেন, তা অবিকল কুরআনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।" অন্য কথায় এ বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, নবুয়াত একটা অনাবশ্যক বস্তু। কুরআনের জ্ঞান ছাড়াই কুরআনে বর্ণিত 'সিরাতুল মুস্তাকীম' তথা সঠিক পথে চলা মানুষের পক্ষে সম্ভব। জাহেলিয়াতের প্রতি গোয়ার্তুমীপূর্ণ পক্ষপাতিত্বের এমন ন্যক্কারজনক দৃষ্টান্ত আর কিছুই হতে পারে না। (পুরানো)

অধোবদন হবে, এটাও প্রত্যাশিত। কিন্তু এখন আমরা এ নতুন ধরনের আদর্শের সাথে পরিচিত হলাম। একে নিজের আদর্শ বলে দাবী করা হয় ঠিকই। কিন্তু এর নাম উল্লেখ করুন। দেখবেন, অনেকের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। এর দিকে অগ্রসর হতে বলুন। দেখবেন, রাগের চোটে অনেকের চোখমুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। এর বিরুদ্ধাচরণের সমালোচনা করুন। দেখবেন, অনেকে লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে চরম স্পর্ধা ও ধৃষ্টতার সাথে তার সাফাই দেয়া শুরু করেছে। সে আদর্শের সমর্থক তার দাবীদারের দৃষ্টিতেই সর্বাধিক ধিকৃত ও ক্রোধভাজন। আর সে আদর্শের অবমাননাকারী তার দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। কি আশ্চার্য এ আদর্শ আর কি অদ্ভুদ এর ভক্ত।

মজার ব্যাপার এই যে, কংগ্রেস এবং তার অখন্ড ভারতভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে তো ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতির নাম উচ্চারণ করা হয় এবং এ সংক্রান্ত শ্লোগানগুলিকে যুদ্ধের শ্লোগানের মত ব্যবহার করে মুসলমানদেরকে সমবেত হওয়ার আহবান জানানো হয়। কিন্তু যেখানে এই ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতির সংরক্ষকগণ সমবেত হন, সেখানে এই ইসলামেরই আইন–কানুন প্রকাশ্যে লংঘন করা হয় এবং এই ইসলামী সংস্কৃতিকেই জবাই করা হয়। এ সব দেখে শুনে মনে হয় ভিন্ন জাতির লোকদের হাতে না হয়ে নিজেদের হাতেই ইসলামী সংস্কৃতির জবাইয়ে কাজটা সম্পন্ন হোক এই দাবী আদায়ের লক্ষ্যেই যেন তাদের যাবতীয় সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত ছিল।

এ সব সম্মেলন ও সমাবেশে "মুসলিম" নারী হিন্দু বা খৃস্টান নারীর মতই চরম অনৈসলামিক ও অশালীন সাজসজ্জায় ভূষিতা হয়ে সভাকে আলোকিত করেন। সেখানে নামাজের সময়েও সভার কার্যক্রম চলতে থাকে। আর যদি নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সভা মূলতবী করা হয়, তবে নেতা থেকে শুরু করে কর্মী পর্যন্ত কেউই তেমন নামাযের জন্য ওঠে না। লেবাস পোশাকে, ওঠাবসায়, দাওয়াতে ও খানাপিনায় কোথাও ইসলামী সংস্কৃতির নামনিশানাও দৃষ্টিগোচর হয় না। একজন সাধারণ মুসলমান ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতির এই তথাকথিত রক্ষকদের সাহচর্যে গিয়ে নিজেকে এতটা অজানা ও অচেনা পরিবেশে বেষ্টিত অনুভব করে, যতটা কোন হিন্দু বা অন্য কোন বিধর্মীদের অনুষ্ঠানে অনুভব করে। সেখানে আপনি যদি ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা শুনতে থাকেন, তবু ভুলেও কখনো কুরআন ও হাদীসের উল্লেখ হবে না। কোন সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের নির্দেশ জানবার উদ্যোগ

নেয়া হবে না। এমনকি কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গী যদি দ্ব্যর্থহীনভাবে তাদের সামনে তুলে ধরা হয়, তবুও নির্দ্বিধায় তার বিপরীত কর্মপন্থা অবলম্বন করা হবে। কমিটি বৈঠকে বা মূল অধিবেশনে আপনি কখনো এমনভাবে মুসলমানদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে শুনবেন না যে, তাদের কোন সামষ্টিক লক্ষ্য কোন নৈতিক মর্যদা এবং কোন আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এ সবের পরিবর্তে সেখানে যাবতীয় আলোচনা কেবল মুসলিম নামধারী যে সমাজ বা গোষ্ঠী বিরাজমান, তাকে যাবতীয় পার্থিব ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করা এবং যাবতীয় পার্থিব কল্যাণ ও সুযোগ সুবিধা দ্বারা সমৃদ্ধ করার উপায় উদ্ভাবনের ব্যাপারেই কেন্দ্রীভূত থাকে। এ ছাড়া এই সম্প্রদায়টির যারা প্রধান নেতা, তাদের অবস্থা কি, তাও একবার ভেবে দেখা যাক। তাদের অধিকাংশই এরূপ যে, তাদের বাড়ীতে যদি কখনো যান, তবে নামাযের সময় কেবলার দিক দেখিয়ে দেয়ার মত কোন লোক আপনি পাবেন না এবং আরাম আয়েশ ও বিলাসের উপকরণে কানায় কানায় পূর্ণ কক্ষসমূহ থেকে আর যাই হোক, একখানা জায়নামায সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। সকল নেতাকে বসিয়ে ইসলামের মৌলিক ও প্রাথমিক তত্ত্বের পরীক্ষা নেয়া হোক। দেখা যাবে, দু'একজন বাদে প্রায় কেউই শতকরা দুই এর বেশী নম্বর পাবেনা।

আমার বুঝে আসে না যে, এটাই কি সেই সংস্কৃতি, যাকে কংগ্রেস ও তার অখন্ড জাতীয়তাবাদ থেকে রক্ষা করার জন্য গালভরা বুলি আওড়ানো হয়? আর এই নাকি তার রক্ষণাবেক্ষনের পদ্ধতি? আর এ সব পদ্ধতি অনুসরণ এবং এ সব নেতার অনুকরণেই কি ইসলামী হুকমতের সেই চরম লক্ষ্য ও চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছার আশা করা হয়? আমি জানি, আমার এ সব প্রশ্ন অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ঝুকিপূর্ণ। এগুলো মুখে আনাই নিজের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ডেকে আনার শামিল। ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতির নাম উচ্চারণ করে দেখুন। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে যে, এ আবার কোন্ বেসুরো ধূয়া উঠতে আরম্ভ করলো? এমন অবান্তর প্রসঙ্গ উত্থাপনের কি যুক্তি আছে? দেখতে পাওনা, সবে আমরা সংস্কৃতির হেফাজতের জন্য বৈঠক করছি? বৈঠক করার সময়ও আবার তার হেফাজত করতে হয় নাকি?

এ দোমুখো নীতি এবং ধান দেখিয়ে চিটা বেচার কারসাজির জন্যই বিরুদ্ধবাদীরা এ কথা বলার সুযোগ পেয়ে যায় যে, আসল মতলবটা হলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। ধর্ম ও সংস্কৃতির ধূয়া সাধারণ মুসলমানদের আবেগ উস্কিয়ে দেয়ার ফন্দি ছাড়া আর কিছু নয়। এ সব কার্যকলাপ দেখে

কে বুঝবে যে, আপন ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রেমে আপনি সত্যিই আন্তরিক? মুখে যতই বলেন যে আপনার হৃদপিন্ডে ব্যথা কিন্তু হাত দিয়ে যদি ক্রমাগত পেট মুচড়াতে থাকেন, তা হলে দর্শক নিশ্চয়ই বুঝবে যে, ব্যথা আপনার হৃদপিন্ডে নয় বরং পেটে। এ ধরনের আচরণেই একটি জাতির নৈতিক বল ধ্বংস এবং অন্যান্য জাতির মন থেকে তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বিনষ্ট হয়ে যায়।

দলাদলি, বিশৃংখলা ও আভ্যন্তরীণ কলহের শোচনীয় পরিণতি দেখে মুসলমানরা ঐক্য, সংঘবদ্ধতা ও কেন্দ্রমুখী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে বটে। তবে দুঃখের বিষয় যে, বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতার দরুন এ উপলব্ধিও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়েছে। সাধারণভাবে জনগণ এখন এরূপ ভুল ধারণায় লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে যে, সংঘবদ্ধ হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও কেন্দ্রমুখী হওয়া মূলতই একটা কল্যাণকর ব্যাপার। কাজেই যে কোন কেন্দ্র বা মঞ্চ সামনে আসুক, তার পাশেই সমবেত হওয়া এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সামনে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। তাহলে আল্লাহ চাহেতো কোথাও না কোথাও পৌঁছা যাবেই। এক সময়ে যেমন "শিল্পের খাতিরেই শিল্প" এবং "সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য" এরূপ একটা বাতিক সৃষ্টি হয়েছিল। তেমনি এখন নতুন বাতিক জন্মেছে যে, "ঐক্যের খাতিরেই ঐক্য" "সংঘবদ্ধতার জন্যই সংঘবদ্ধতা" এবং "কেন্দ্রমুখী হওয়ার উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রমুখী হওয়া" চাই। অথচ এ সব জিনিস সফল হবে কিনা, তা নির্ভর করে, ঐক্যের প্রেরণা ও চালিকা শক্তি, সংঘবদ্দতার নীতি ও আদর্শ এবং কেন্দ্রমুখী হওয়ার ধরন ও গুণগত মান কিরূপ তার ওপর। উদ্দেশ্যহীনভাবে একটা ভ্রান্ত কেন্দ্রের পাশে সমবেত হওয়া অথবা কোন ভুল উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া কল্যাণকর না হয়ে বরং ক্ষতিকর হতে পারে।

মুসলমানরা আসলে কি চায় এবং তারা কি উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হতে চায়, সে ব্যাপারে তাদের সর্বপ্রথম গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে ও বুঝেসুজে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। তারা যদি যথার্থই এমন একটা ইসলামী সংগঠন গড়তে চায়, যা ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্যে উপনীত হতে সমর্থ, তা হলে তাদের জানা দরকার যে, বর্তমানে যে ধরনের সংগঠন প্রক্রিয়া চলছে তা সম্পূর্ণ ভুল। বর্তমান সংগঠন কাঠামোতে যারা সবার আগের সারিতে অবস্থান করছে, ইসলামী সংগঠনে তাদের সঠিক স্থান সবার পেছনের সারিতে। বরঞ্চ কারো কারো সেখানে স্থান পাওয়াও সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনার ওপর নির্ভর করে। এ ধরনের লোকদেরকে নেতার আসনে বসানো রেলগাড়ীর সবচেয়ে

পেছনের বগীকে ইঞ্জিনের জায়গায় স্থাপনের শামিল। যে উচ্চ স্থানে আপনি যেতে চান, এই তথাকথিত ইঞ্জিন আপনাকে সে স্থান অভিমুখে এক ইঞ্চিও নিয়ে যেতে পারবে না। তবে গাড়ী আপনভারে আপনাআপনি নীচের দিকে নামবে। আর আপনারা কিছুদিন এ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত থাকবেন যে, মাশায়াল্লাহ আমাদের 'ইঞ্জিন' তো ভীষণ দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। এ বাস্তবতাকে যত শ্রীঘ্র উপলব্দি করবেন, ততই ভাল। কেননা প্রতি মুহূর্তে আপনারা ওপর থেকে নীচের দিকে নেমে চলেছেন। যারা ইসলামী সংস্কৃতি জিনিসটা কি তা জানে না, তারা এর কি রক্ষণাবেক্ষণ করবে? যারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহে লিপ্ত, তাদের হাতে তার বিকাশ ও পুনরুজ্জীবনের আশা করা কিভাবে সম্ভব? মুখে মুখে তারা ইসলামী সংস্কৃতির জিগির তোলে ঠিকই, কিন্তু তাদের মনে যদি এই সংস্কৃতির প্রতি সত্যি সত্যিই দরদ ও আসক্তির সৃষ্টি হতো, তা হলে নিশ্চিতভাবে তাদের জীবনধারা পাল্টে যেত, তাদের মানসিকতা ও চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটতো। বর্তমানে তাদের জীবনে এ সব নিদর্শন অনুপস্থিত। এ থেকেই বুঝা যায় যে, প্রকৃত ইসলামী আবেগ ও উদ্দীপনা তাদের মনে আদৌ সঞ্চারিত হয়নি।

আর যদি ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী সংস্কৃতি এ দেশের মুসলমানদের লক্ষ্য না হয়ে থাকে, বরং সরল অর্থে নিছক একটা জাতি হিসেবে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখাই তাদের কাম্য হয়ে থাকে এবং নিজেদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী প্রেরণা উজ্জীবিত করে অন্যান্য জাতির সাথে সাফল্যজনক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়াই তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে থাকে। তা হলে তাদের বর্তমান নেতৃবৃন্দের ইসলামী মান দেখবার কোনই প্রয়োজন নেই, আর তাদের সাথে আমারও কোন কথা নেই। তাদের পথ আর আমার পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক। তবে এখানে আমার পূর্ববর্তী কথাটার পুনরাবৃত্তি করতে চাই। তা এই যে, মুসলমানদের এহেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্য তাদের ইসলামের নাম ব্যবহার করার কোন অধিকার নেই। কেননা ইসলাম সকল ধরনের জাতীয়তাবাদের বিরোধী, চাই তা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হোক, অথবা তথাকথিত "মুসলিম জাতীয়তাবাদ"।

কেউ কেউ এ ধরনের অনৈসলামী সংগঠন ও অনৈসলামিক কেন্দ্রায়নের স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে যুক্তি পেশ করে এরূপ ধারণা দেয়ার প্রয়াস পান যে, এটাই সেই 'জামায়াত' যার আনুগত্য করার নির্দেশ এবং যা থেকে

বিচ্ছিন্ন হওয়া বা বিচ্ছিন্ন থাকার পরিণামে জাহান্নামের শাস্তির হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি ভেবে অবাক হই যে, এই প্রয়াসকে অজ্ঞতা প্রসূত মনে করবো, না আল্লাহ ও রসূলের সামনে ধৃষ্টতা প্রদর্শনের শামিল মনে করবো। কুরআন তো সেই মসজিদেও যাওয়ার অনুমতি দেয়না, যার ভিত্তি আল্লাহভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অথচ আল্লাহভীতির বা তাকওয়া-পরহেজগারীর নাম উচ্চারণ করলেই আমাদের দেশে তাকে পাগলামী বা বাতিক বলে আখ্যায়িত করা হয়। কুরআন বলে যে, "আল্লাহর রজ্জু" দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। অথচ এখানে বলা হচ্ছে যে, জনগণ একমত হয়ে যে কোন রজ্জু আকড়ে ধরলেই মুক্তি নিশ্চিত হয়, চাই তা আল্লাহর রজ্জু হোক বা না হোক। কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যেঃ

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُونَ -

"হে মুসলমানগণ! তোমাদের প্রকৃত বন্ধু এবং সঙ্গী শুধু আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহর অনুগত থাকে।" (আল মায়েদাহঃ ৫৫)

এমন কি কুরআনে এ কথাও বলা হয়েছে যেঃ

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ -

"যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তা হলে তারা তোমাদের দীনী ভাই।" (সূরা তাওবাঃ ১১)

অথচ এখানে নামায ও যাকাতের শর্ত নিরর্থক মনে করা হয়। ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব তো দূরের কথা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের জন্য পর্যন্ত এগুলো শর্ত বলে গণ্য হয় না। স্বয়ং আল্লাহর নির্ধারিত এ সব শর্তের কথা বললেই অনেকে ভ্রুকুঞ্চিত করে।

বস্তুত হাদীসে দলের আনুগত্য, নেতার আদেশ মানা এবং "দল থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে হবে" ইত্যাকার যেসব হুশিয়ারী জামায়াত ও নেতার অবাধ্যতার ব্যাপারে উচ্চারিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী আদর্শের

ভিত্তিতে নিছক বৈষয়িক স্বার্থের খাতিরে গঠিত সংগঠন ও নেতৃত্বের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। কুরআন ও হাদীসে দলের আনুগত্যের যে নির্দেশ রয়েছে, তার অর্থ একমাত্র দুনিয়াবী স্বার্থ বর্জিত খালেছ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত গঠিত দলের আনুগত্য। এরূপ দল থেকে বিচ্ছিন্নতার পরিণাম নিসন্দেহে জাহান্নাম এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ সব নির্দেশকে পার্থিব স্বার্থে দল সৃষ্টি এবং রাজনৈতিক দল সমূহের আনুগত্যের যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো আল্লাহর রসূলের নামে অপবাদ রটনার শামিল। কোন জাতি যদি অন্য জাতির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক স্বার্থের তাগিদে সংগ্রাম করতে চায়, তা হলে সে প্রচলিত স্বাভাবিক নিয়ম–বিধি অনুসারে নিজস্ব বাহিনী গঠন ও শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করুক। মাঝখানে আল্লহকে টেনে আনার তার কি অধিকার আছে? দু'টো জাতির নিরেট পার্থিব স্বার্থ ভিত্তিক দ্বন্দ্ব সংঘাতে আল্লাহর পক্ষপাতিত্বের কি প্রয়োজন পড়েছে যে, একটি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া লোকদেরকে তিনি জাহান্নামের শাস্তি দেবেন না, আর অন্যটির শক্তি বৃদ্ধির জন্য তার বিরোধীদেরকে তিনি জাহান্নামের শাস্তির হুমকি দেবেন?

কোন কোন মহল এ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত আছে যে, মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষ অবলম্বনের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং অধিকাংশ মুসলমান যে রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে এবং যে নেতৃত্বের আনুগত্য করে, তাকে সমর্থন করা জরুরী। কিন্তু এটা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষ অবলম্বন করতে বলেছেন, তার অর্থ হলো সেই সব মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যারা পর্যাপ্ত ইসলামী জ্ঞান ও চেতনার অধিকারী, যারা হক ও বাতিল তথা ন্যায় ও অন্যায় এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম এবং যারা ইসলামের মূলনীতি ও প্রাণশক্তি সম্পর্কে অন্তত এতটা জ্ঞান রাখে যে, কোন্‌টা ইসলাম সম্মত আর কোন্‌টা ইসলাম সম্মত নয়, তা বুঝতে পারে। এ ধরনের মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কখনো কোন অন্যায় ও ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের ওপর একমত হতে পারে না। আর ঘটনাক্রমে কোন ভুল ধারণায় লিপ্ত হলেও তার ওপর বেশী সময় টিকে থাকতে পারেনা। এ কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে সমর্থন ও সহযোগিতা করার জন্য কঠোর

নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু যারা এ সব অত্যাবশ্যক গুণবৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত এবং যাদের মধ্যে ভালো ও মন্দ বাছাই করার প্রাথমিক জ্ঞানও নেই, তাদের সংখ্যাধিক্য ইসলামের পরিভাষায় সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। তাদের সংগঠনও ইসলামের স্বীকৃত 'জামায়াত' নয়। তাদের নেতাও ইসলামে 'আমীর' পদবাচ্য নয় এবং সে আমীরের কোন পর্যায়েই আনুগত্য লাভেরও অধিকার নেই। নিছক 'মুসলমান' শব্দ দ্বারা প্রতারিত হয়ে যারা জাহেলিয়াতের তথা কুফরী ব্যবস্থার অনুসারীদের সংগঠনকে ইসলামী সংগঠন মনে করে এবং এ ধরনের কোন সংগঠন খালেছ ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের জন্য উপকারী হবে বলে মনে করে, তাদের বুদ্ধির স্থূলতা নিদারুণ বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক।

(তরজুমানুল কুরআন, জানুয়ারী, ১৯৪০)

ইসলামের দাওয়াত ও মুসলিম জীবনের লক্ষ্য

যখন কোন ব্যক্তির দেহে এমন মরাত্মক বিকার উপস্থিত হয় যে, থেকে থেকেই খিচুনী হয় এবং হাত পা ছুড়তে থাকে অথবা উন্মাদের মত প্রলাপ বকতে থাকে এবং প্রচন্ড অস্থিরতা প্রকাশ করতে থাকে; আর মধ্যবর্তী সময়েও সে অনবরতই কোন না কোন যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে, তখন তার এ অবস্থা দেখে বুদ্ধিমান লোকেরা কি ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে? তারা কি একে নিছক জিন-ভূতের আছর মনে করে, না স্বয়ং তার দেহের ভেতরেই কোন অসুস্থতা বা বিকলত্ব আছে বলে ধারণা করে? তারা কি তার দাপাদাপির চিকিৎসা হাত পা বেঁধে প্রলাপ বকার চিকিৎসা মুখ বন্ধ করে এবং জ্বরের চিকিৎসা বরফের পট্টি লাগিয়ে করে? না, তার দেহ কাঠামোতে সৃষ্ট মূল বিকলত্বকে বুঝতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় এবং ঐ উপসর্গ দূর করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে?

ব্যক্তিগত পর্যায়ে এরূপ অবস্থার উদ্ভব হলে প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোক তার প্রতিকারে দ্বিতীয় পন্থাই অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু নিদারুণ বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এক ব্যক্তিকে এ অবস্থায় পতিত দেখে যে বুদ্ধি সঠিক সিদ্ধান্ত উপনীত হয়, গোটা মানবজাতিকে অনুরূপ শোচনীয় অবস্থায় দেখার পর সে বুদ্ধি কোথায় যেন হারিয়ে যায়। বস্তুতঃ সমগ্র মানব জগত বর্তমানে এক ভয়াবহ সংকটে পতিত। তার দেহে এমন ভয়ংকর খিচুনীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে যে, তার প্রভাবে গোটা পৃথিবী কেঁপে উঠেছে।[১] বস্তুত এটা নতুন কোন ঘটনা নয়। বেশ কিছুকাল যাবত এ ধরণের বিকার অব্যাহত ভাবে তার ওপর সংগঠিত হচ্ছে। শুধু তাই নয় মধ্যবর্তী বিরতির সময়টুকু শান্তিতে কাটে না। কোন না কোন জ্বালা যন্ত্রণায় তাকে অস্থিরই থাকতে হয়। কিন্তু সারা দুনিয়া দীর্ঘকাল ব্যাপী এ পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও কারো মাথায় এ কথা

১· উল্লেখ্য যে, এ সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘোরতররূপ ধারণ করেছিল। (নতুন)

ঢুকছে না যে, মানবীয় সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার মূলে একটা মৌলিক ত্রুটি বিদ্যামান। সমগ্র পৃথিবীর বুদ্ধিমান লোকেরা আভ্যন্তরীণ ত্রুটির কারণে বাইরের অবয়বে যে, আলামতগুলো পরিস্ফুট হচ্ছে, কেবল তার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। ওপরে যে ফোঁড়াটি সবচেয়ে লক্ষণীয় হয়ে দেখা দেয়, তার ওপরেই আঙ্গুল রেখে তারা বলে দেয় যে, এ জিনিসটা কেটে ফেলে দাও তাহলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কেউ বলে ঃ স্বৈরতন্ত্রই সকল আপদের উৎস। ওটাকে উৎখাত কর। কেউ বলেঃ সাম্রাজ্যবাদই সকল ফ্যাসাদের মূল। ওটার উচ্ছেদ ঘটাও। কেউ বলে পুঁজিবাদ দুনিয়াটাকে জাহান্নাম বানিয়ে রেখেছে। ওটার বিলোপ ঘটাতে হবে। এই নির্বোধদের বিবেক বুদ্ধি কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। তারা জানেই না যে, উপদ্রবের মূল উৎসটা অন্যত্র রয়েছে। সেটা যতক্ষণ মাটিতে বহাল আছে, ততক্ষণ অব্যাহতভাবে তা থেকে ডালপালার জন্ম ও বিস্তার ঘটতেই থাকবে। কেয়ামত পর্যন্ত যদি এ সব ডালপালা কাটাছাঁটা চলতে থাকে, তবে সময়ের অপচয় ছাড়া আর কোন লাভ হবে না।

পৃথিবীর যেখানে যে অনাচার ও বিকৃতি বিদ্যমান, তার মূল একটাই। সেটি হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া। এটাই সকল অনাচার, অনাসৃষ্টি এবং সকল পাপ পংকিলতার মূল। এ মূল থেকেই সেই বিষবৃক্ষের জন্ম হয়, যার শাখা প্রশাখা ক্রমেই চারদিকে বিস্তৃত হয়ে মানবজাতিকে উপহার দেয়, বিপদ–মুসিবতের বিষফল। এ মূল যতক্ষণ বহাল থাকবে, ততক্ষণ আপনি ডালপালা যতই কাটছাট করুন না কেন, তার ফলে এক দিক থেকে বিপদ আপদের আগমন বন্ধ হলেও অন্যদিক থেকে তা আবার শুরু হয়ে যাবে।

স্বৈরতন্ত্র ও নিরংকুশ ক্ষমতা সম্পন্ন রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করা হলে কি লাভ হবে? একটি মানুষ অথবা একটা বংশ খোদায়ীর আসন ও ক্ষমতা থেকে সরে যাবে এবং তার স্থলে পার্লামেন্ট এসে খোদার আসনে বসবে। এ ছাড়া আর কি? কিন্তু এই উপায়ে কি আসলে মানুষের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়? যেখানে পার্লামেন্টের একচ্ছত্র প্রভুত্ব চালু আছে সেখানে কি যুলুম, নির্যাতন ও অরাজকতা নেই?

সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত করে কি ফায়দা হবে? কেবল এতটুকুই ফায়দা হবে যে, এক জাতির ওপর থেকে আর এক জাতির প্রভুত্বের অবসান ঘটবে। কিন্তু

এর পরে কি পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ শুরু হয়ে যাবে? যেখানে কোন জাতি নিজেই নিজের প্রভু সেজে বসেছে, সেখানে কি মানুষ শান্তিতে আছে?

পুঁজিবাদ নির্মূল হয়ে গেলে কি সুফল লাভ হবে? শ্রমজীবী মানুষ ধনিক শ্রেণীর প্রভুত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের তৈরী করা প্রভুদের গোলাম হয়ে যাবে মাত্র। কিন্তু এতে কি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার, শান্তি ও নিরাপত্তার মত অমূল্য সম্পদ মানুষের করায়ত্ব হয়? যেখানে শ্রমিকদের তৈরী করা প্রভুদের শাসন চলছে, সেখানে কি মানুষ এ জিনিসগুলো পেয়েছে?

বস্তুত আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রত্যাখানকারীরা যে সর্বোত্তম লক্ষ্য পেশ করতে পারে, সেটা এর চেয়ে বেশী কিছু নয় যে, দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ লোকেরা নিজেদের কল্যাণের জন্য নিজেরাই নিজেদের শাসক হবে। পৃথিবীতে এ ধরনের পরিস্থিতি ও পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া বাস্তবিক পক্ষে সম্ভব কিনা। সে কথা না হয় বাদ দিলাম।[১] প্রশ্ন এই যে, এরূপ পরিবেশ যদি সৃষ্টি হয়েও যায় তাহেল সেই কল্পিত স্বর্গে কি মানুষ স্বীয় প্রবৃত্তির শয়তান থেকে অর্থাৎ সেই অজ্ঞ ও জাহেল 'খোদার' গোলামী থেকেও মুক্ত হয়ে যেতে পারবে, যার কাছে প্রভুত্ব করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, ন্যায়বিচার ও সততা এ সবের কোনটাই নেই? আছে শুধু কামনা বাসনা ও ভোগ স্পৃহা, আর তাও অন্ধ ও শক্তিমদমত্ত ভোগ স্পৃহা।

মোটকথা, পৃথিবীর অঞ্চলে অঞ্চলে ও দেশে দেশে মানবীয় বিপদ-মুসবিত ও সমস্যাবলীর যত সমাধানেরই চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে, সে সবের সার সংক্ষেপ কেবল এতটুকুই যে, প্রভুত্ব বা সার্বভৌমত্ব কতক মানুষের হাত থেকে ছিনতাই হয়ে অন্য কিছু মানুষের হাতে স্থানান্তরিত হবে। এটা সমস্যার সমাধান নয় বরং সমস্যাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা বা তার গতিপথ পরিবর্তন করার শামিল। তার অর্থ হলো, সমস্যার সয়লাব এ যাবত যে পথ দিয়ে এসেছে, তা থেকে ভিন্ন পথ দিয়ে তা আসুক। একে যদি সমাধান নামে আখ্যায়িত করা হয়। তবে সেটা হবে যক্ষা রোগকে ক্যানসারে পরিবর্তিত করার মতই সমাধান। আপনার উদ্দেশ্য যদি কেবল যন্ত্রণা বিতাড়ন হয়ে থাকে, তা হলে নিসন্দেহে আপনি সফল হয়েছেন। আর যদি উদ্দেশ্য হয়ে

---

১. অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সত্যিকার গণতন্ত্র আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোথাও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। আর তাত্বিক যুক্তি থেকেও প্রমাণিত যে, এমনটি হওয়া কার্যত অসম্ভব। (পুরনো)

থাকে প্রাণরক্ষা, তা হলে একটা প্রাণঘাতী রোগের বদলে আর একটি প্রাণঘাতী রোগের ঝুঁকি নিয়ে আপনি মোটেই সফলকাম হননি।

মানুষ একজন আর একজনের প্রভু হোক অথবা আর একজনের প্রভুত্ব মেনে নিক, অথবা নিজেই নিজের মনিব হয়ে বসুক, এ সকল অবস্থাতেই তার ধ্বংস ও বিপর্যয়ের আসল কারণ যথারীতি বহাল থেকে যায়। যে ব্যক্তি আসলে রাজা নয়, সে যদি রাজা হয়ে বসে, যে ব্যক্তি আসলে গোলাম, সে যদি নিজেকে খোদা বা প্রভুর আসনে অধিষ্ঠিত করে, যে ব্যক্তি আসলে দায়ীত্বশীল ও অধীনস্ত প্রজা, সে যদি স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীন শাসক হয়ে কাজ করতে থাকে, তা হলে এ ধরণের দাবী করা ও দাবী মেনে নেয়াকে মূলত একটা ভুল বুঝাবুঝি ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। প্রকৃত ব্যাপার যা, তা যেমন ছিল তেমনই থাকবে। আসলে যে প্রভু ছিল, সে প্রভুই থাকবে। যে গোলাম ছিল, সে গোলামই থাকবে। কিন্তু এই গোলাম যখন এরূপ প্রকান্ড ভুল ধারণায় লিপ্ত হবে যে, সে নিজেই সর্বোচ্চ সার্বভৌম শাসক অথবা তারই মত অন্য কোন গোলাম তার সর্বোচ্চ সার্বভৌম শাসক, আর এত বড় ভুল ধারণার ভিত্তিতে যখন সে নিজের গোটা জীবনের ইমারত গড়ে তুলবে, আর যখন সে এই মনে করে কাজ করবে যে, তার ঊর্ধে কোন প্রভু বা শাসক নেই যার কাছে তার জবাবদিহি করা এবং নিজের করণীয় ও বর্জনীয় কাজে যার সম্মতি গ্রহণ করা অপরিহার্য, তা হলে তার জীবনের গোটা ইমারত আগাগোড়াই ভ্রান্ত হয়ে যাবে এবং সে জীবনে সততা ও বিশুদ্ধতা খুঁজতে যাওয়া নিরেট বোকামী ছাড়া আর কিছু হবে না। সৃষ্টি একজনের আর তার ওপর শাসন চলবে আর একজনের, স্রষ্টা ও পালনকর্তা হবে একজন আর আদেশ নিষেধ আসবে আর একজনের তরফ থেকে, রাজ্য হবে একজনের আর রাজত্ব করবে অন্যজন এমন কথা কোন্ মানুষটির বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

যিনি মানুষকে সৃষ্টি করলেন, যিনি মানুষের বসবাসের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, যিনি নিজের সৃষ্টি করা বাতাস, পানি, আলো, উত্তাপ এবং অন্যান্য জিনিস দ্বারা মানুষের লালন–পালনের কাজ সম্পন্ন করে যাচ্ছেন, যার অসীম ক্ষমতা মানুষকে ও মানুষের আবাসস্থল এই গোটা পৃথিবীকে সর্বদিক দিয়ে বেষ্টন করে রেখেছে এবং যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের গন্ডীর ভেতর থেকে মানুষ কোন অবস্থাতেই বেরিয়ে আসতে পারে না, বিবেক ও স্বভাবের দাবী এই যে, সেই মহাপরাক্রান্ত সত্ত্বাই মানুষের ও এই পৃথিবীর মালিক ও মনিব হোন।

তিনিই হোন বিশ্বচরাচরের একচ্ছত্র খোদা, একমাত্র প্রভু, সার্বভৌম সম্রাট ও শাসক। তার সৃজিত পৃথিবীতে স্বয়ং তিনি ব্যতীত আর কে শাসন ও কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারে? একজন অধীনস্থ প্রজা ও গোলাম কেমন করে তারই মত অন্যান্য প্রজা ও গোলামদের মালিক ও মনিব হবার দাবীদার হতে পারে? সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা ছাড়া স্বীয় সৃষ্টি ও পালিতের মালিকানা আর কার জন্য বৈধ হতে পারে? তার এ সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনার উপযুক্ত ক্ষমতা, জ্ঞান ও বিশালত্ব আর কার আছে? মানুষ যদি এ সাম্রাজের আসল সম্রাটের সার্বভৌমত্ব ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব না মানে এবং তাঁর ছাড়া অন্য কারুর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে, অথবা নিজেরই সার্বভৌমত্বের দাবীদার হয়, তবে এটা হবে বাস্তব ঘটনার সুস্পষ্ট পরিপন্থী, তা হবে আগাগোড়াই ভুল এবং এক প্রাকান্ড ও সবচেয়ে নির্জলা মিথ্যা। এটা এত বড় মিথ্যা যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু প্রতি মুহূর্তে তা খন্ডন করে যাচ্ছে। এমন ভিত্তিহীন দাবী এবং এমন ভ্রান্ত আনুগত্য ও বশ্যতা দ্বারা প্রকৃত ব্যাপার বিন্দুমাত্রও পরিবর্তিত হয় না। যিনি মালিক, তিনি মালিকই থাকবেন, যিনি সম্রাট ও শাসক, তিনি সম্রাট ও শাসকই থাকবেন। তবে বাস্তবতার বিরুদ্ধে অন্যের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে কিংবা নিজের সার্বভৌমত্বের দাবীদার হয়ে যে মানুষ কাজ করবে, তার জীবন আগোগোড়াই ভ্রান্তিময় ও অশুদ্ধ হয়ে যাবে। বাস্তব কখনো তোমার উপলব্ধি বা স্বীকৃতির মুখাপেক্ষী নয় যে, তুমি উপলব্ধি করলেই তা বাস্তব হবে। বরঞ্চ তুমিই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে নিজের চেষ্টা ও কাজকে তার অনুসারী বানানোর মুখাপেক্ষী। তুমি যদি বাস্তবতাকে উপলব্ধি না কর এবং কোন অবাস্তব ও ভ্রান্ত জিনিসকে বাস্তব মেনে নাও, তবে তাতে তোমারই ক্ষতি। তোমার ভুল বুঝাবুঝিতে বাস্তবতার কোন হেরেফের হতে পারেনা।

যে জিনিসের ভিত্তিই সম্পূর্ণ ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাকে আংশিক সংশোধন ও মেরামত দ্বারা যে বিশুদ্ধ করা সম্ভব নয়, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক মিথ্যা অপসৃত হওয়ার পর তার জায়গায় আর এক মিথ্যা প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে বাস্তব অবস্থায় কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। এ ধরনের পরিবর্তন দ্বারা ছেলে ভুলানোর কাজ হতে পারে, কিন্তু অসত্য ও অবাস্তবতার ওপর জীবন গড়ে তোলার যে ক্ষতি এক অবস্থায় ছিল, তা ভিন্নতর অবস্থায়ও যথারীতি বহাল থাকবে।

এ ক্ষতি দূর করা এবং মানুষের প্রকৃত সাফল্য ও সৌভাগ্য নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় এই যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের সার্বভৌমত্বকে সম্পূর্ণরূপে, প্রত্যাখ্যান করতে হবে. এবং যিনি আসলেই নিখিল বিশ্বের অধিপতি, তাঁর সার্বভৌমত্বই মেনে নিতে হবে। মানুষের সার্বভৌমত্বের বাতিল ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে কোন শাসন ব্যবস্থাকে প্রত্যাখান করতে হবে এবং শুধুমাত্র সেই শাসন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে হবে, যেখানে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব শুধুমাত্র আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ থাকবে, যিনি বাস্তবিক পক্ষেই সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক। যে শাসন ব্যবস্থায় মানুষ আপন জন্মগত অধিকার বলেই সার্বভৌমত্ব ও নিরংকুশ শাসন ক্ষমতার দাবীদার, সেই শাসন ব্যবস্থার শাসনাধিকার অস্বীকার করতে হবে এবং শুধুমাত্র সেই শাসন কর্তৃত্বকে বৈধ বলে মানতে হবে, যার আওতায় মানুষ আসল ও প্রকৃত সার্বভৌম শাসকের অনুগত খলিফা তথা প্রতিনিধির পদমর্যাদা গ্রহণ করে। এই মৌলিক সংস্কার যতক্ষণ সম্পন্ন না হবে যতক্ষণ মানুষের সার্বভৌমত্বকে চাই তা যে কোন আকারে ও যে কোন প্রকারে বিদ্যমান থাকুক সমূলে উৎখাত না করা হবে এবং যতক্ষণ মানুষের সার্বভৌমত্বের অবাস্তব ধারণার পরিবর্তে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব বা খেলাফতের বাস্তবতা সম্মত ধারণা প্রতিষ্ঠিত না হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত মানব সভ্যতার বিকৃত ও বিকল যন্ত্র কস্মিনকালেও স্বাভাবিক হতে পারবে না চাই পুঁজিবাদের পরিবর্তে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক, একনায়কত্বের স্থলে গণতন্ত্র আসুক, অথবা সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক। শুধুমাত্র খেলাফতের আদর্শই মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। এর দ্বারাই যুলুমের অবসান ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ আদর্শকে গ্রহণ করেই মানুষ আপন ক্ষমতা ও প্রতিভা সমূহের যথাযথ ও নির্ভুল প্রয়োগস্থল এবং আপন চেষ্টা–সাধনার বিশুদ্ধ দিক নির্দেশনা লাভ করতে পারে। গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ ও নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী বিশ্ব প্রভু আল্লাহ ছাড়া করতে পারে আর কেউ মানবীয় সমাজ ও সভ্যতার জন্য এমন মূলনীতি ও বিধি–নিষেধ দিতে সক্ষম নয়, যা হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, যাতে স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ একদেশদর্শিতার নামগন্ধ পর্যন্ত নেই, যা নির্ভেজাল ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা সকল মানুষের স্বার্থ ও অধিকারের সমান নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম এবং সর্বোপরি যা আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে নয় বরং সকল সৃষ্টির জন্মগত স্বভাব প্রকৃতি সংক্রান্ত সুনিশ্চিত ও বিশুদ্ধ জ্ঞান ও

তথ্যের ভিত্তিতে রচিত। শাসন ও আইন রচনার ব্যাপারে নিজ অভিলাস ত্যাগ করে মানুষ যখন আল্লাহর ওপর ও তার প্রেরিত জীবন বিধানের ওপর ঈমান আনে এবং পরকালের জবাবদিহির চেতনা নিয়ে এই বিধানকে দুনিয়ায় বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে, কেবল তখনই সে অনুরূপ আদর্শ বিধান লাভ করতে পারে।

ইসলাম মানবজীবনে এই মৌলিক সংস্কার সাধনের জন্যই এসেছে। সে কোন একটি জাতির প্রতি অনুরাগ ও আর একটি জাতির প্রতি বিরাগ বা শত্রুতা পোষণ করে না। তাই একটিকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করা এবং অপরটিকে অধোপতিত করা তার কাম্য নয়। সে চায় সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি। আর সে জন্য সে একটা বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন বিধান মানুষের সামনে উপস্থাপিত করে। সে একটা সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বিশেষ দেশ বা কোন বিশেষ মানবগোষ্ঠীর প্রতি দৃষ্টি দেয় না, বরং প্রশস্ত দৃষ্টি নিয়ে সমগ্র পৃথিবী ও তার সমস্ত অধিবাসীর প্রতি নজর দেয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাময়িক ঘটনা দুর্ঘটনা ও সমস্যাবলী থেকে উর্ধে উঠে সে মানবজাতির সেই সব নীতিগত ও মৌলিক সমস্যার প্রতি মনোযোগ দেয়, যার সমাধানের মাধ্যমে সকল যুগে এবং সকল পরিস্থিতি ও পরিবেশে যাবতীয় খুঁটিনাটি ও আনুসঙ্গিক সমস্যাবলীর আপনা আপনি সমাধান হয়ে যায়। যুলুমের ডালপালা এবং অনাচার ও অরাজকতার অধস্তন রূপ তার বিবেচনার বিষয় নয়। যুলুমের মূল ও অনাচারের উৎসের ওপর সে সরাসরি আঘাত হানে, যাতে ঐ সব শাখা প্রশাখার উৎপাদনই বন্ধ হয়ে যায় এবং স্থানে স্থানে নিত্যনতুন কাটছাঁটের বিতর্ক আর অবশিষ্ট না থাকে।

এ সমস্ত ছোট ছোট আনুসঙ্গিক ও খুঁটিনাটি সমস্যা, যার সাথে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী আজকাল জড়িয়ে পড়ছে। যেমন ইউরোপে হিটলারের উদ্ধত আগ্রাসন, ইথিওপিয়ায় ইটালীর বিপর্যয় ও বিভীষিকা, চীনে জাপানের নিপীড়ন ও নির্যাতন, অথবা এশিয়া ও আফ্রিকায় বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদ ইসলামের দৃষ্টিতে এ সব সমস্যার কোনই গুরুত্ব নেই। তার দৃষ্টিতে কেবল একটি প্রশ্নেরই গুরুত্ব রয়েছে। সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে তার প্রশ্ন ঃ

ءَارْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

"ভিন্ন ভিন্ন প্রভুর গোলামী ভালো, না সেই অদ্বিতীয় আল্লাহর গোলামী ভাল যাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ও পরাক্রম সকলের ওপর প্রতিষ্ঠিত?" (সূরা ইউসুফ ঃ ৩৯)

যারা ভিন্ন ভিন্ন প্রভুর গোলামী পসন্দ করে, ইসলাম তাদের সকলকে একই গোষ্ঠীভুক্ত মনে করে, তা তারা পরস্পরে যতই উপদলে বিভক্ত থাকুক না কেন। তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাত ইসলামের দৃষ্টিতে এক নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে আর এক নৈরাজ্যের সংঘাত ছাড়া কিছু নয়। তাদের কোন পক্ষই মূল নৈরাজ্যের শত্রু নয় বরং সে নৈরাজ্যের কোন একটা শাখার বিরোধী। যে নৈরাজ্যের পতাকা এক পক্ষ উঁচু করে রেখেছে, অপর পক্ষ তাকে নামিয়ে দিতে চায় এবং তার স্থলে ঐ পক্ষ নিজের মনোনীত নৈরাজ্যের পতাকা তুলে ধরতে চায় বলেই উভয়ের এই পারস্পরিক বৈরিতা। কিন্তু যে পক্ষ মূল নৈরাজ্যেরই বিরোধী, এ দু'পক্ষের কারো সাথেই তার ঐক্য হতে পারে না। এক মিথ্যা খোদার পূজারীদের ওপর আর এক মিথ্যা খোদার গোলামদেরকে তার অগ্রাধিকার দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা সে একই সময়ে সকল বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত। তার সর্বশক্তি একটি মাত্র উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। সেটি হলো মানুষকে বিভিন্ন অসত্য ও অবাস্তব প্রভুর গোলামী থেকে মুক্ত করা এবং সেই মহাপরাক্রমশালী, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে সকল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যিনি বাস্তবিকপক্ষে رَبِّ النَّاسِ (মানুষের প্রভু) مَلِكِ النَّاسِ (মানুষের বাদশাহ) এবং اِلٰهِ النَّاسِ -- (মানুষের মা'বুদ)।

বস্তুত "মুসলমান" শব্দটা যদি নিরেট নিরর্থক শব্দ হয়ে থাকে এবং তাকে যদি কেবল নাম বাচক বিশেষ্য হিসেবে একটি মানবগোষ্ঠীর প্রতিকরূপে ব্যবহার করার রেওয়াজ হয়ে থাকে, তা হলো তা মুসলমানদের নিজেদের জীবনে যে কোন উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও যে কোন কর্মনীতি অনুসরণের অবাধ স্বাধীনতা থাকা উচিত। কিন্তু ইসলামকে যারা একটা মতাদর্শ ও জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছে, 'মুসলমান' শব্দটা যদি তাদেরকে বুঝানোর পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তা হলে এ কথা অনস্বীকার্য যে, যা ইসলামের আদর্শ, লক্ষ্য, কর্মনীতি, মুসলমানের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রণালী তা থেকে ভিন্ন কিছু হতে পারে না। কালের আবর্তন ও পরিস্থিতির বিবর্তনের অজুহাতে ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও নীতি অবলম্বন করা কোন মুসলমানের জন্য বৈধ হতে পারে না। মুসলমান যেখানে যে পরিস্থিতিতেই অবস্থান করবে, তাকে

সমকালীন ঘটনাবলী ও স্থানীয় সমস্যাবলীর সম্মুখীন হতেই হয়। তাই বলে এমন ইসলামের কোন স্বার্থকতা নেই যা শুধুমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে মেনে চলা হবে এবং ভিন্ন রকমের পরিস্থিতিতে তা পরিত্যাগ করে ভিন্নতর মতবাদ অবলম্বন করা হবে। আসল মুসলমান মানেই হলো সকল ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ইসলামের মৌলিক দর্শন ও বুনিয়াদী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের আলোকে জীবনের সকল কার্য্যকলাপ সম্পন্ন করা। নচেৎ মুসলমান যদি প্রত্যেক ঘটনা ও প্রত্যেক অবস্থাকে ভিন্নতর ও বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে আরম্ভ করে এবং সব সময় কেবল পরিবেশ ও পরিস্থিতি দেখে নতুন নতুন নীতি উদ্ভাবন করে নেয়, যার সাথে ইসলামের মতাদর্শ ও উদ্দেশ্যের সাথে কোন সম্পর্ক ও সঙ্গতি নেই, তা হলে এমন ধরনের মুসলমান হওয়া এবং অমুসলিম হওয়াতে কোনই পার্থক্য নেই। একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের অনুসারী হওয়ার অর্থই এই যে, আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, আপনার দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপদ্ধতি সেই মতাদর্শেরই অনুসারী হবে, যার আনুগত্য করার সিদ্ধান্ত আপনি নিয়েছেন। একজন মুসলমান তখনই খাঁটি মুসলমান বলে গণ্য হবে, যখন সে জীবনের সকল খুটিনাটি ব্যাপারে এবং নৈমিত্তিক ঘটনাবলীতে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী এবং ইসলামী পদ্ধতি অবলম্বন করবে। এক ধরনের মুসলমান আছে যারা বিশেষ পরিস্থিতি ও পরিবেশে ইসলামী পদ্ধতি বাদ দিয়ে অনৈসলামী পদ্ধতি অবলম্বন করে আর এরূপ অজুহাত দেখায় যে, বর্তমান অসুবিধাজনক পরিস্থিতি ও পরিবেশে আমাকে একটু অনৈসলামী পদ্ধতিতে কাজটা সারতে দাও। পরে যখন পরিস্থিতি সুবিধাজনক হবে তখন মুসলমান হিসেবে কাজ করতে আরম্ভ করবো। এ ধরনের মুসলমানরা আসলে এ কথাই ব্যক্ত করে থাকে যে, হয় সেই ইসলামকে জীবনের সকল ব্যাপারে এবং সকল পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে সমভাবে কার্যোপযোগী একটা পূর্ণাঙ্গ ও সর্বব্যাপী জীবন ব্যবস্থা হিসেবেই বুঝতে পারেনি। নচেৎ তার মন মানস ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিশীল হয়ে গড়ে ওঠেনি। ফলে ইসলামের মূলনীতিগুলোকে খুটিনাটি ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মুসলমান হিসেবে কি নীতি অবলম্বন করা উচিত, তা নির্ধারণ করার যোগ্যতা তার অর্জিত হয়নি।

একজন প্রকৃত মুসলমান হিসেবে যখন আমি দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন তুরস্কে তুর্কীদের, ইরানে ইরানীদের এবং আফগানিস্তানে আফগানদের

ক্ষমতাসীন দেখে আনন্দ প্রকাশ করার কোন হেতু খুঁজে পাই না। মুসলমান হিসেবে আমি حكم الناس على الناس للناس (জনগণ দ্বারা জনগণের ওপর জনগণের শাসন)[১] এ মতবাদের প্রবক্তা নই যে, তা দেখে আমি খুশী হব। আমি বরঞ্চ حكم الله على الناس بالحق ন্যায়ের ভিত্তিতে মানুষের ওপর আল্লাহর শাসন[২] এ মতবাদে বিশ্বাসী। এ দিক থেকে আমার মতে ইংল্যাণ্ডে ইংরেজদের এবং ফ্যান্সে ফরাসীদের সার্বভৌমত্ব যতখানি ভ্রান্ত তুরস্ক ও অন্যান্য দেশের ওপর সেই দেশবাসীর সার্বভৌমত্বও ঠিক ততখানি ভ্রান্ত। শেষোক্তটি বরঞ্চ অধিকতর ভ্রান্ত। কেননা যেসব জাতি নিজেদেরকে মুসলমান নামে আখ্যায়িত করে থাকে, তাদের আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে মানুষের সার্বভৌমত্ব গ্রহণ করা আরো বেশী দুঃখজনক। অমুসলিমরা যদি ضالين অর্থাৎ 'বিপথগামীর' পর্যায়ে পড়ে থাকে, তা হলে মুসলমানরা উক্ত আবরণের দরুন مغضوب عليهم অর্থাৎ ক্রোধভাজন পদবাচ্য।

ভারতের যেসব অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু, সেখানে তাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক–একজন মুসলমান হিসেবে সে ব্যাপারে আমি মোটেই আগ্রহী নই। আমার দৃষ্টিতে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবী রাখে, তা হলো এই যে, আপনাদের এই 'পাকিস্তানে' শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, না পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক মতাদর্শ অনুসারে জনগণের সার্বভৌমত্বের ওপর? যদি প্রথমটা হয় তা হলে নিশ্চয়ই ওটা সঠিক অর্থে 'পাকিস্তান' হবে, আর যদি দ্বিতীয়টা হয়, তা হলে আপানাদের পরিকল্পনা মোতাবেক দেশের যেসব অংশ অমুসলিমদের শাসন কায়েম হবে, সেই সব অংশের মতই ওটা 'নাপাকিস্তান' হবে। বরঞ্চ আল্লাহর দৃষ্টিতে ওটা হবে আরো বেশী অপবিত্র, আরো বেশী ঘৃণিত ও অভিশপ্ত। কেননা এখানে মুসলিম নামধারীরা অমুসলমানদের মতই কাজ করবে। এখানে রামদাসের পরিবর্তে আব্দুল্লাহর খোদার আসনে বসাতে আমি যদি খুশী হই, তা হলে সেটা ইসলাম হবে না বরং তা হবে নিরেট জাতীয়বাদ। আর এই 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ' আল্লাহর শরীয়াতে 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ'–এর মতই অভিশপ্ত।

---

1. (Government of the people by people for the people.)
2. (Rule of god on man with justice.)

মুসলমান হিসেবে আমার দৃষ্টিতে ভারতের একদেশ হিসেবে বহাল থাকা অথবা দশভাগে বিভক্ত হওয়াতে কোন পার্থক্য নেই। আসলে সমগ্র পৃথিবী একই দেশ। মানুষ তাকে হাজার ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে। এ যাবতকার বিভক্তি যদি বৈধ থেকে থাকে, তা হলে আগামীতে আরো খন্ড খন্ড হলে কি এসে যায়? এটা কি এমন গুরুতর ব্যাপার যে, এ নিয়ে মুসলমানরা একটা মুহূর্তও চিন্তা–ভাবনা করে সময় নষ্ট করবে? মুসলমান যে বিষয়ে চিন্তা–ভাবনা করতে পারে তা হলো এই যে, এখানে মানুষের মাথা আল্লাহর হুকুমের সামনে নত হবে, না মানুষের হুকুমের সামনে। যদি আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত হয়, তা হলে ভারতকে আরো প্রশস্ত করুন। হিমালয়ের প্রাচীর মাঝখান থেকে সরিয়ে দিন এবং সমুদ্রকেও উপেক্ষা করুন যেন এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা সবই ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে। আর যদি তা মানুষের সার্বভৌমত্বের সামনে মাথা নোয়ায়, তা হলে ভারত আর তার পূজারীরা জাহান্নামে যাকগে। ওটা এক দেশ থাকুক কিংবা দশহাজার টুকরো হয়ে যাক, তাতে আমার কি এসে যায়? এ মূর্তি ভেঙ্গে গেলে যারা একে উপাস্য মনে করে, তারাই ছটফট করবে। আমি তো এ দেশে এক বর্গমাইল এলাকাও যদি এমন পেয়ে যাই, যেখানে মানুষের ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারো সার্বভৌমত্ব চলবে না। তা হলে আমি তার এক কনা পরিমাণ মাটিকে সারা ভারতের চেয়েও মূল্যবান মনে করবো।

মুসলমান হিসেবে আমার কাছে ভারতকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্ত করারও কোন গুরুত্ব নেই। বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়া তো কেবল (কোন মাবুদ নেই)–এর সমার্থক হবে। এ নেতিবাচক ঘোষণার ওপরই সিদ্ধান্ত নির্ভরশীল নয়। এরপর ইতিবাচক ঘোষণাটা কি হবে, তার ওপরই সিদ্ধান্ত নির্ভরশীল। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কেউই এ কথা অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখাবে না যে, গোটা স্বাধীনতা সংগ্রামই সাম্রাজ্যবাদের দেবতাকে হটিয়ে গণতন্ত্রের দেবতাকে সরকারের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত। আর এটা যখন সত্য, তখন এক দেবতার স্থলে আর এক দেবতার অধিষ্ঠানে কোনই পার্থক্য সূচিত হবে না। এর অর্থ দাঁড়াবে লাতের বিদায় ও মানাতের আগমন। এক মিথ্যা খোদা আর এক মিথ্যা খোদার স্থলাভিষিক্ত হলো। বাতিলের গোলামী যেমন ছিল তেমনই থেকে গেল। একে কোন্ মুসলমান স্বাধীনতা বলতে পারে?

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلٰكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ إِنَّ الْخَبِيْثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيْثَ ١

বর্তমানে ভারতে মুসলমানদের বিভিন্ন সংগঠন ইসলামের নামে কর্মরত রয়েছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে যদি ইসলামের কষ্টিপাথরে সেগুলোর মতাদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কার্যক্রমকে আমরা যাচাই করি, তা হলে এর সব কয়টিই অচল দ্রব্য বলে প্রমাণিত হবে। চাই পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক নেতা হোন, কিংবা প্রাচীন ধাচের ধর্মীয় নেতা উভয়েই আপন আপন মতবাদ ও নীতির দিক থেকে সমান পথভ্রষ্ট। উভয়েই সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্ধকারে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে। উভয়েই আপন আসল লক্ষ্য বাদ দিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে শূন্যে তীর ছুড়ছে। এক গোষ্ঠীর মাথায় চড়াও হয়ে আছে হিন্দুর জুজু এবং তারা মনে করে যে, হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের করাল গ্রাস থেকে বাঁচার মধ্যেই মুক্তি নিহিত। অপর গোষ্ঠীর মাথায় সওয়ার হয়েছে বৃটিশ ভূত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ফাঁদ থেকে নিস্তার পাওয়াকেই তারা মুক্তি বলে মনে করছে। এদের কারো দৃষ্টিই সত্যিকার মুসলমানের দৃষ্টি নয়। তা যদি হতো তা হলে তারা দেখতে পেত যে, আসল শয়তান দু'টোর কোনটাই নয়। আসল শয়তান হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কোন শক্তির সার্বভৌমত্ব। এ শয়তান থেকে মুক্তি না পেলে কিছুই পাওয়া হলো না। লড়াই যদি করতে হয় তবে একে উৎখাত করার জন্য লড়াই কর। তীর যদি ছুড়তে হয়, তবে এর দিকেই নিরিখ করে তীর নিক্ষেপ কর। যত শক্তি নিয়োগ করতে পার, এই শয়তানকে নির্মূল করার জন্য কর। এ ছাড়া আর যে কাজেই চেষ্টা–সাধনা কর না কেন, তা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত লোকদের চেষ্টা– সাধনার মতই ব্যর্থ হতে বাধ্যঃ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً * اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا * اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِ هٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا

১. এটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস। এর অর্থঃ অনাচার, অনাচার দ্বারা নির্মূল হয় না, বরং সদাচার দ্বারা নির্মূল হয়। এক কলুষতা দূর হয়ে আর এক কলুষতা তার স্থলাভিষিক্ত হলে কলুষতার উচ্ছেদ হলো কোথায়?

"হে নবী! আপনি বলুনঃ কারা আপন কার্যকলাপে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত, তা কি আমি তোমাদের জানিয়ে দেব? দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা-সাধনা বৃথা হয়ে গেছে অথচ তারা মনে করে যে, তারা যা করছে ভালই করছে। ঐসব লোক তারাই যারা আপন প্রতিপালকের নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করেছে। এবং তার সাথে সাক্ষাত অবধারিত, একথাও অবিশ্বাস করেছে। এর ফলে তাদের সকল কর্ম বাতিল হয়ে গেছে। তাই কেয়ামতের দিন আমি তাদের কর্ম পরিমাপ করার ব্যবস্থা করবো না।" (সূরা কাহ্ফঃ ১০৩-১০৫)

পাশ্চাত্য ধাচের নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে তো তেমন বিস্ময়ের সঞ্চার হয় না। কিন্তু বিস্ময় জাগে আলেমদের সেই গোষ্ঠীটির ব্যাপারে, যারা রাতদিন আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের বাণী চর্চায় নিয়োজিত রয়েছেন। আমার বুঝে আসে না যে, তাদের কি হয়েছে। তাঁরা কোন্ চোখ দিয়ে কুরআন পড়েন, যে হাজার বার পড়া সত্ত্বেও মুসলমানদের জন্য নীতিগতভাবে যে অকাট্য ও শাশ্বত কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, তার কোন সন্ধান তারা পান না? যেসব বিষয়কে তারা সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়ে রেখেছেন, কুরআনে আমরা তার নিতান্ত গৌণ গুরুত্বও খুঁজে পাই না এবং তাকে মামুলী খুঁটিনাটি ব্যাপার হিসেবেও স্থান পেতে দেখি না। যেসব সমস্যায় দিশেহারা হয়ে তাঁরা দিল্লীতে নিরপেক্ষ মুসলমি সম্মেলন অনুষ্ঠিত করলেন এবং অত্যন্ত অধীরভাবে বক্তৃতা করলেন, সে ধরনের সমস্যাবলী কুরআনে কোথাও ইশারা ইংগীতেও আলোচিত হয়নি। পক্ষান্তরে কুরআনে আমরা দেখতে পাই যে, একজনের পর একজন নবী আসছেন আর একই সত্যের দিকে নিজ নিজ জাতিকে আহবান জানাচ্ছেন যেঃ

يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ [১]

বাবেল, সদোম, মাদায়েন, হিজর, কিংবা নীল নদের উপত্যকা যে অঞ্চলই হোকনা কেন এবং খৃষ্টপূর্ব চল্লিশতম, বিশতম বা দশম শতাব্দী-যে যুগই হোক না কেন, পরাধীন জাতি হোক অথবা স্বাধীন জাতি, দূর্ভাগা দরিদ্র ও পশ্চাদপদ জাতি হোক কিংবা সভ্যতা ও রাজনীতিতে উন্নততম জাতি হোক সকল অঞ্চলে, সকল যুগে এবং সকল জাতির মধ্যে আল্লাহর

---

১. "হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মনিব নেই।"

পক্ষ থেকে আবির্ভূত নেতৃবৃন্দ মানুষের সামনে একই দাওয়াত পেশ করেছেন। সে দাওয়াত ছিল এই যে, "তোমরা আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য কর। আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভু ও মনিব নেই।" হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আপন জাতিকে সুস্পষ্টভাবে বলে দিলেন যে, আমার ও তোমাদের মধ্যে কোন সহযোগিতা এবং কোন সহকর্ম সম্ভব নয় যতক্ষণ তোমরা এ প্রধানতম মূলনীতিকে মেনে না নাও।

كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ

"আমরা তোমাদের সকল নীতি ও কার্যক্রম প্রত্যাখান করলাম এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতা ও বিভেদ বিরাজ করবে যতক্ষণ না তোমরা একমাত্র আল্লাহকে মনিবরূপে মেনে নেবে।" (সূরা মুমতাহিনাহ ঃ ৪)

হযরত মূসা (আঃ) ফেরআউনের কাছে গিয়ে اَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ (বনী ইসরাইলকে আমার সাথে যেতে দাও) এ দাবী করার আগেই ঘোষণা করলেন যে, اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ (আমি বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ হতে বার্তাবাহক হয়ে এসেছি। (আল আরাফ ঃ ১০৪)

তাকে আরো দাওয়াত দিলেন যে,

هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى

"তোমার কি পবিত্র হওয়ার ইচ্ছা আছে এবং আমি তোমাকে তোমার প্রভুর সন্ধান দেই অতপর তুমি তাঁকে ভয় কর–এটা কি তুমি চাও?" (সূরা নাজিয়াত–১৮–১৯)

তিনি তাকে আরো সতর্ক করে দিলেন যে, তুমি প্রতিপালক ও মনিব নও। যিনি সকল জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং জীবন যাপনের প্রণালী শিক্ষা দিয়েছেন তিনিই প্রভু ও প্রতিপালক।

رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى (طه : ٥٠)

হযরত ঈসা (আঃ)–এর জাতি রোম সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে গিয়েছিল। তিনি এসে বনী ইসরাঈল ও পার্শ্বপর্তী অন্যান্য জাতিকে রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার দাওয়াত দেননি, বরং দাওয়াত দিয়েছেন এই বলে ঃ

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

"নিশ্চয় আল্লাহই আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তার দাসত্ব কর। এটাই সঠিক পথ।" (আলে ইমরান ঃ ৫১)

এটা সবার জানা যে, কুরআনে উল্লিখিত এ সব ঘটনা অন্য কোন জগতের ঘটনা নয়, আমরা যে দুনিয়ায় বসবাস করি তারই ঘটনা। আর এগুলো আমাদের মত মানুষেরই ঘটনা। যেসব দেশ ও জাতিতে নবীরা (আঃ) এসেছেন, সেখানে অন্য কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজ– রাষ্ট্রগত সমস্যা যে ছিল না এবং সেগুলোর সমাধানের জন্য তার দিকে মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন ছিল না এমন কথা বলার অবকাশ নেই। সুতরাং এটা যখন বাস্তব যে, ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেক নেতা সকল যুগে ও সকল দেশে যাবতীয় আঞ্চলিক ও সাময়িক সমস্যাকে উপেক্ষা করে এই একটি সমস্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং একমাত্র এর ওপরই সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। তখন এ থেকে কেবলমাত্র এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, তাঁদের দৃষ্টিতে এ সমস্যাটাই ছিল সকল সমস্যার উৎস। তাই তারা এ সমস্যার সমাধানের ওপরই নির্ভরশীল মনে করতেন জীবনের অন্য সকল সমস্যার সমাধানকে।

এখন হয় বলুন, আল্লাহর প্রেরিত ইসলামী আন্দোলনের এ নেতৃবৃন্দের সকলেই বাস্তব রাজনৈতিক কান্ডজ্ঞান বর্জিত ছিলেন, তারা মানব জীবনের সমস্যাবলীর মধ্যে কোনটি আগে এবং কোনটি পরে বিবেচ্য, তা জানতেন না এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম কিভাবে পরিচালনা করতে হয় আর রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলীর সমাধানের উপায় কি, সে জ্ঞান তাঁদের ছিল না। নতুবা স্বীকার করুন যে, আজকের যুগে যে সকল মনীষি ইসলামের প্রতিনিধি এবং মুসলমানদের নেতা ও পথপ্রদর্শকের আসনে অধিষ্ঠিত, তারা শরীয়াতের খুঁটিনাটি বিধি–বিধান সম্পর্কে যতই পারদর্শী হোন, ইসলামী আন্দোলনের

মেজাজ ও প্রকৃতি কি, তা তাঁরা বুঝেন না এবং কি পদ্ধতিতে এ আন্দোলন চালাতে ও এগিয়ে নিতে হয় তা তাঁরা জানেন না।

সকল মুসলমানের জানা দরকার যে, একটি মুসলিম সমাজ বা জনগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে আমরা সকলে সেই আন্দোলনের শামিল, যার নেতা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন নবীগণ আলাইহিমুসসালাম। প্রত্যেক আন্দোলনের একটা বিশেষ চিন্তাভঙ্গী এবং কর্মপদ্ধতি থাকে। ইসলামের চিন্তা ও কর্মের পদ্ধতি কি, তা আমরা নবীদের জীবনেতিহাস থেকেই জানতে পারি। আমরা যে যুগ ও যে দেশেরই মানুষ হই না কেন এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবনের, সমস্যাবলী যে ধরনেরই হোক না কেন, নবীদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যা ছিল আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অবিকল তাই নির্ধারিত হয়ে আছে। আর সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার জন্য আমাদের সেই পথই অনুসরণ করতে হবে, যা নবীগণ সকল যুগে অনুসরণ করে গেছেন।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

"ঐ সকল ব্যক্তিকে আল্লাহই পথপ্রদর্শন করেছিলেন। সুতরাং তুমিও তাদেরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ কর।" (আল্ আনআম–৯০)

জীবনের সকল সমস্যা ও ঘটনাবলীকে নবীগণ যে দৃষ্টিতে দেখতেন, আমাদেরও সেই দৃষ্টিতেই দেখা উচিত। যে মানদণ্ডে তারা সবকিছুর মূল্য ও মান পরিমাপ করতেন, আমাদেরও সেই মানদণ্ডেই পরিমাপ করতে হবে। সামষ্টিক কার্যক্রম ও রীতিনীতিকে নবীগণ যে ধারায় ও যে খাতে প্রবাহিত করেছিলেন, আমাদের সামষ্টিক কার্যক্রম ও রীতিনীতিকেও সেই খাতেই প্রবাহিত করতে হবে। নবীদের প্রদর্শিত এ পথ ও আদর্শ ছেড়ে আমরা যদি অন্য কোন পথ ও আদর্শের অনুগামী মতবাদ ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করি, তা হলে আমাদের পথভ্রষ্ট হওয়া অনিবার্য। একজন জাতীয়তাবাদী, একজন গণতন্ত্রী এবং একজন সমাজতন্ত্রী যে সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দুনিয়ার জীবনের সমস্যাবলী ও ঘটনা প্রবাহকে দেখে থাকে সেই সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরাও দেখি, তবে তা হবে আমাদের মর্যাদার পক্ষে ঘোর অবমাননাকর। যেসব জিনিস তাদের দৃষ্টিতে মহত্ত্বের সর্বোচ্চ মানে উন্নীত আমাদের দৃষ্টিতে তা এত নিকৃষ্ট ও নীচুমানের যে, তার প্রতি সামান্যতম ভ্রুক্ষেপ করাও আমাদের জন্য অশোভন। আমরা যদি তাদেরই আচরণভঙ্গী অবলম্বন করি, তাদেরই ভাষায় কথা বলি এবং তারা যেসব হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মোহে উন্মত্ত, সেসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে আমরাও উদগ্রীব

হই, তা হলে সেটা হবে নিজেদের মর্যাদাকে নিজেদের হাতেই ধুলায় লুণ্ঠিত করার শামিল। সিংহ যদি ছাগলের মত ডাকতে আরম্ভ করে এবং তারই মত উন্মত্ততার সাথে ঘাসের স্তুপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তা হলে তার অর্থ হবে এই যে, সে স্বেচ্ছায় জঙ্গলের বাদশাহী ত্যাগ করেছে। এভাবে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করার পরও বনের প্রজারা তার সেই সিংহ সুলভ মর্যদা স্বীকার করবে, এটা সে কিভাবে আশা করতে পারে? জনসংখ্যানুপাতে জাতীয় সরকার গঠনের যে দাবী–দাওয়া সংখ্যালগিষ্ঠতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা জনিত যে কান্না ও বিলাপ নিরাপত্তা ও স্বাধীকারের জন্য যে আর্তচিৎকার, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় রাজ্যের শাসকদের আনুকুল্যে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের যে কৌশল সমূহ এবং তার পাশাপাশি মাতৃভূমির স্বাধীনতার যে শ্লোগান সমূহ ও পন্ডিত নেহরুর সুরে সুর মিলিয়ে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ধ্বনি উত্থিত ও গৃহীত হতে দেখা যাচ্ছে, এ সব আমাদের জন্য ছাগলের বুলি ছাড়া আর কিছু নয়। এ সব বুলি উচ্চারণ করে আমরা নিজেরাই একটা ভুল অবস্থান গ্রহণ করছি। এভাবে আমরা নিজেদের মর্যাদাকে এমন বিকৃতভাবে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরছি যে, বিশ্ববাসী আমাদেরকে সিংহ নয়, বরং ছাগল ভাবতেই বাধ্য হচ্ছে। অথচ আল্লাহ আমাদেরকে এর চেয়ে অনেক উচ্চ পদে আসীন করেছেন। সেই উচ্চতর পদের দাবী এই যে, আমাদেরকে আজ সারা দুনিয়া থেকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল শক্তির সার্বভৌমত্ব উচ্ছেদের উদ্যোগ নিতে হবে এবং আল্লাহর বান্দাদের ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রভুত্ব ও আধিপত্য যাতে বহাল থকতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এটাই সিংহের ভূমিকা। এই ভূমিকা পালন করতে বাইরের কোন শর্তের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু সিংহের হৃদয়। যে সিংহ খাচায় আটকা পড়লে ছাগলের মত আচরণ করতে আরম্ভ করে, সে আসলে সিংহ নয়। আর যে সিংহ ছাগলের সংখ্যাধিক্য কিংবা বাঘের ঔদ্ধত্য দেখে নিজের সিংহ–স্বভাব ভুলে যায়, সেও প্রকৃত সিংহ নয়।

(তরজুমানুল কুরআন, মে, জুন–১৯৪০)

প্রকৃত মুসলমানদের জন্য একমাত্র কর্মপন্থা

আমি আগেই বলেছি যে, ইসলাম সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য মৌলিক সংস্কারের একটা দাওয়াত এবং বাস্তব সংস্কারের একটা বৈপ্লবিক কর্মসূচী নিয়ে এসেছে। তার দাওয়াত এই যে, সকল মানুষ যেন এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয় এবং এর ফলে তার নির্দেশ ছাড়া অন্য সকল নির্দেশ যেন বাতিল হয়ে যায়। আর তার কর্মসূচী এই যে, যে সকল মানুষ এ দাওয়াতকে গ্রহণ করবে, তারা একটা দল বা জামায়াত গঠন করে এই মৌলিক সংস্কারকে বাস্তবে কার্যকর করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, যাতে করে সকল ব্যক্তির, পরিবারের, শ্রেণীর, জাতির ও বংশীয় ধারার শাসন ও জনগণের সার্বভৌম শাসন সম্পূর্ণরূপে উৎখাত হয়ে যায় এবং আল্লাহর সাম্রাজ্যে তার প্রজাদের ওপর শুধুমাত্র তারই আইন কার্যত চালু হয়। মানুষ সৃষ্টির আদিকাল থেকে সকল নবী (আঃ) কেবলমাত্র এ দাওয়াত ও এ কর্মসূচীই নিয়ে এসেছেন এবং এ একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা সকল চেষ্টা ও সাধনা নিয়োজিত করেছেন। মুসলমানরা যেহেতু নবীদেরই উত্তরাধিকারী ও অনুসারী তাই বাস্তবিক পক্ষে তাদেরও এ ছাড়া আর কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই এবং আর কোন কর্মসূচীও নেই। মুসলমানদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে আমার একমাত্র অভিযোগ এই যে, তাঁরা নিজেদেরকে মুসলমান তথা নবীদের অনুসারী বলে দাবী করা সত্ত্বেও এ উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বর্জন করে এমন সব উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যার সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই।

ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ, কিছু লোক ছাড়া আজ পর্যন্ত আমি একজন মুসলমানও এমন দেখিনি--তা সে যে, কোন দলের সাথেই সংশ্লিষ্ট হোক না কেন--যিনি আমার এ অভিযোগ সঠিক বলে নীতিগতভাবে স্বীকার করেননি। সকলেই স্বীকার করে যে, নিসন্দেহে মুসলমানদের আসল করণীয়

কাজ এটাই এবং নবীগণ আমাদেরকে এ লক্ষ্যের দিকেই পথ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু জবাবে দু' মহল থেকেই দু' ধরনের প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে ঃ

"সবার আগে ভারতের স্বাধীনতা চাই" এ মতের প্রবক্তা আলেমগণ এবং তাঁদের সমমনা মুসলমানগণ এ পথে পা বাড়ানোর সমস্যাবলী এভাবে বর্ণনা করেন যে, ভারতে যদি শুধু মুসলমান বাস করতো অথবা তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকতো--যেমন মিশর, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশে রয়েছে--তা হলে আমাদের পক্ষে, ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালানো অবশ্যই সহজ হতো এবং সে অবস্থায় তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু সমস্যা এই যে, আমরা এখানে সংখ্যালঘু। সংখ্যাগুরুরা অমুসলিম এবং ইসলামী শাসনের নাম শুনতেই তারা আঁতকে ওঠে। তাদের নজর কেবল সম্মিলিত জাতীয় সরকার পর্যন্তই যেতে সক্ষম। ওপরে বসে আছে বৃটিশ সরকার এবং তা আমাদের ও আমাদের অমুসলিম প্রতিবেশীদের ওপর একই সাথে দমন নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। খোদ মুসলমান জনসংখ্যারও একটা বিরাট অংশ চরিত্র ও আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে অধপতনের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গেছে। তাই বর্তমান সময়ে একমাত্র সম্মিলিত সরকার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করে অমুসলিমদের সাথে মিলিত হয়ে ইংরেজ শাসনের খপ্পর থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টার চেয়ে বেশী কিছু করা সম্ভব নয়। এ স্তরটা অতিক্রম করার পর স্বাধীন ভারতে আমরা আমাদের শক্তিকে পুনরায় সংগঠিত করবো এবং আমাদের ঐ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগ্রাম শুরু করবো। এ ছাড়া আর কোন কর্মপন্থা বর্তমানে কার্যোপযোগী নয়।

পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ ও তার সমমনা লোকেরা আপন সমস্যাবলীকে অন্যভাবে বর্ণনা করেন। তারা বলেন যে, আমরা এখানে একেতো মুষ্টিমেয় সংখ্যক। তদুপরি শিক্ষাদীক্ষায় ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমাদের শক্তি নিতান্তই নগণ্য। অধিকন্তু একটা সংকীর্ণমনা সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির উৎসগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছে। তারা বাস্তবে তো আমাদেরকে একটা আলাদা জাতি ধরে নিয়ে শিক্ষা ও উপার্জনের সকল দ্বার আমাদের জন্য রুদ্ধ করে দেয়। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নীতিগতভাবে আমাদের পৃথক জাতিসত্তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং কামনা করে যে, আমরা যেন 'ভারতীয় জাতি'তে একীভূত হয়ে এখানে এমন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করি, যেখানে নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটই হবে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উপায়। এই উদ্দেশ্য

সিদ্ধিতে তাদের সফল হওয়ার অর্থ হবে আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে খোয়ানো। সেই অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের আকাংখা পোষণ করা কিভাবে সম্ভব হবে? সুতরাং আপাতত এ ছাড়া আর কোন কার্যোপযোগী কর্মপন্থা আমাদের হাতে নেই যে, দুনিয়ার অন্যান্য জাতি যেভাবে নিজেদেরকে সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত করে থাকে, আমরাও সেভাবে নিজেদেরকে সংগঠিত করবো এবং দুনিয়ায় সচরাচর যেভাবে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করা হয়ে থাকে, আমরাও সেভাবে সংগ্রাম করবো এবং সর্ব প্রথম যেসব অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, সেখানে বৃটিশ গণতান্ত্রিক রীতি অনুসারে রচিত শাসনতন্ত্রের অধীন আমাদের নিজস্ব সরকার গঠন করবো। পরে যখন ক্ষমতা আমাদের হাতে এসে যাবে, তখন আমরা মুসলমানদের শিক্ষা–দীক্ষার ব্যবস্থা করে এবং তাদের নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করবো। আর আল্লাহ যদি চান, তবে বাদবাকী ভারতকেও পুনরায় দখলে আনার জন্য চেষ্টা চালাতে থাকবো।

আপাত দৃষ্টিতে উভয় পক্ষের চিন্তাধারায় অনেকখানি সারবত্তা আছে বলে মনে হয়। আর এ জন্যই ভারতের বেশীর ভাগ মুসলমান এ দু' গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যে সমস্যাবলীর বর্ণনা এ দু' পক্ষ দিয়ে থাকেন, তার মোটেই সারবত্তা নেই। বরঞ্চ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমে তাদের এসব সমস্যার উল্লেখ থেকেই বুঝা যায় যে, তারা ইসলামী আন্দোলনের মেজাজ ও তার কর্মপদ্ধতি (Technique) একেবারেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। বেশী গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস সামনে থাকলে প্রথম দৃষ্টিতেই এ সব ওজর–আপত্তির অসারতা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

পৃথিবীতে যেখানেই কোন নবী বা রসূল এসেছেন, একাকিই এসেছেন। সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর তো প্রশ্নই ওঠে না। সেখানে আদৌ কোন 'মুসলিম জাতির' অস্তিত্বই ছিল না। রসূল সারা জাতির মধ্যে এমনকি সমগ্র পৃথিবীতে তখন একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন। এমন বিস্ময়কর সংখ্যালঘিষ্ঠতা নিয়েও রসূল এ দাবী নিয়ে আর্বিভূত হয়েছেন যে, আমি পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করতে এসেছি। হাতে গণার মত কয়েকজন লোক তার সহগামী হয়। আর এ নগণ্যতম সংখ্যালঘু দল ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর বিশাল জনসমুদ্র তাদের সাথে যে আচরণ করতো, তার

সাথে ভারতের অমুসলিম সংখ্যাগুরুদের একচ্ছত্র আধিপত্য ও বল প্রয়োগ নীতির কোন তুলনাই হয় না, যদিও এরই জন্য কাঁদতে কাঁদতে আমাদের 'মুসলিম জাতীয়তাবাদী' ভাইদের চোখের পানি শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এখানে চাকুরী, ব্যবসায় ও জেলা বোর্ড ইত্যাদিতে স্থান লাভের সুযোগ-সুবিধা যেটুকু আছে, নবীদের আবির্ভাবকালীন সমাজে তা থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সেখানে তো মুসলিম সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বেঁচে থাকার অধিকারও স্বীকৃতি ছিল না। তা ছাড়া সেখানে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকতো, চাই তা দেশী বা বিদেশী যাই হোক না কেন, যে নিষ্ঠুর নির্যাতন ও নিপীড়ন মুসলমানদের ওপর চালাতো, তার সাথে কোনক্রমেই ভারতের ইংরেজ শাসকদের আচরণের তুলনা করা যায় না যদিও আমাদের 'স্বাধীনতা কামী' ভাইরা তার যন্ত্রণায় অতিষ্ট। তাছাড়া রসূল ও তার সাহাবীগণ ইসলামী শাসন কায়েমে যেসব সময় কেবল সফলই হয়েছেন, তা নয়। একাধিকবার তারা এ কাজে ব্যর্থও হয়েছেন। নবীদেরকে এবং তাদের সাহাবীদেরকে কখনো কখনো হত্যা করা হয়েছে এবং সে সব মিথ্যা খোদায়ীর ক্ষুদে দাবীদাররা নিজেদের ধারণা মতে এ আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করে ছেড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলেন এবং যাঁরা এ কাজকেই প্রধানতম কর্তব্য মনে করতেন, তারা জীবনের শেষ নিশ্বাস অবধি এ উদ্দেশ্যে কাজ অব্যাহত রেখেছেন৷ তাঁদের কেউই সংখ্যাগুরুদের দাপট বা সরকারের দৌরাত্ম্য ও দুর্ধর্ষতা দেখে কিংবা সাময়িক ও স্থানীয় সমস্যাবলী বিবেচনা করে অন্য কোন বিকল্প পন্থার দিকে বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ করেননি।

সুতরাং এ কথা সম্পূর্ণ ভুল যে, এ আন্দোলন শুরু করতে ও চালাতে তার সহায়ক বাহ্যিক উপকরণ ও অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। যে সহায়ক উপকরণ ও অনুকূল পরিবেশ তারা অনুসন্ধান করে, তা কোনদিন পাওয়া যায়নি, কখনো পাওয়া যাবেও না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বাহ্যিক কোন উপকরণ নয়, বরং মুসলমানদের নিজেদের অভ্যন্তরে ঈমান থাকার প্রয়োজন। এ লক্ষ্যই যে সত্য ও সঠিক, সে ব্যাপারে অন্তরের সাক্ষ্য প্রয়োজন। আর মুমিনের বাঁচা মরা এ লক্ষ্য অর্জনের খাতিরেই হওয়া উচিত, সে ব্যাপারে তার মনে দৃঢ় সংকল্প জন্ম নেয়া প্রয়োজন। বস্তুত এ ঈমান, এ সাক্ষ্য এবং এ সংকল্প যদি থাকে, তা হলে সারা পৃথিবীতে এ কথা ঘোষণা করার জন্য একাকী একজন মানুষই যথেষ্ট যে, 'আমি পৃথিবীতে আল্লাহর রাজ কায়েম করতে চাই।' তার পেছনে কোন সংঘবদ্ধ সংখ্যালঘু কিংবা কোন স্বায়ত্ব

শাসিত সংখ্যাগুরু থাকার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। দেশকে প্রথমে বিজাতীয় আধিপত্য থেকে মুক্ত করারও কোন আবশ্যকতা নেই। বিজাতিই বা কি, স্বজাতিই বা কি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সর্বভৌমত্ব স্বীকার করা সকল মানুষই তার কাছে সমান। সকলেই তার সাথে সমানভাবে যুদ্ধরত এবং সেও সকলের সাথে সমানভাবে যুদ্ধরত। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে বিদেশী রোমকরা যে আচরণ করেছিল, তার চেয়ে অনেক ভয়াবহ আচরণ করেছিল হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে তার স্বজাতির লোকেরা।

পবিত্র কুরআনকে অর্থ বুঝে যে ব্যক্তিই পড়বে, সে এ কথা প্রথম দৃষ্টিতেই অনুধাবন করতে পারবে। কিন্তু আরো একটু গভীর দৃষ্টি দিলে বুঝা যাবে যে, ভারতের মুসলিম জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী যে ধরনের সমস্যাবলীকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালানোর পথে অন্তরায় মনে করছেন, তা আসলে একটি জাতির সমস্যা--আন্দোলনের সমস্যা নয়। যেখানে একটি জাতি নিজেদের জীবন যাপন ও জাতীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সংগ্রামরত থাকে, সেখানে যে এ ধরনেরই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তা নিসন্দেহে সত্য। যে দেশে তারা বসবাসরত, সেখানে তাদের সংখ্যা কত? তাদের সংগঠন আছে কিনা? তাদের শিক্ষাগত মান কিরূপ? অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন? তারা একক শাসনের অধীন, না দ্বৈত শাসনের অধীন? এ সব প্রশ্নের জবাবের ওপরই তার ভবিষ্যত নির্ভরশীল এবং এ সব প্রশ্নের আলোকেই তাদের নীতি নির্ধারণ করতে হয়। কিন্তু একটা আদর্শবাদী আন্দোলন, যা কোন বিশেষ জাতির স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং সমগ্র মানব জীবনের সার্বিক সংস্কার সংশোধন এবং মুক্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে একটা দাওয়াত নিয়ে আবির্ভূত হয়, তাকে এ সব প্রশ্নের একটারও সম্মুখীন হতে হয় না। তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। তার আদর্শ যথার্থই যুক্তিযুক্ত কিনা? সে আদর্শ মানব জীবনের সমস্যাবলীর কতটা সমাধান নিশ্চিত করে? সাধারণভাবে মানুষের সহজাত, স্বভাব ও বিবেকবুদ্ধিকে তা কতখানি আকৃষ্ট করে? আর এ আদর্শের দিকে দাওয়াত প্রদানকারীরা স্বয়ং তার আনুগত্য ও অনুসরণে কতখানি নিষ্ঠাবান এবং কতখানি কৃত সংকল্প? এ প্রশ্নগুলোর জবাবের ওপরই ঐ দলের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল।

মুসলমানদের যেটুকু বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তার আসল কারণ এই যে, তাদের মধ্যকার চিন্তাশীল লোকেরা নিজেদের উক্ত দু'টো

বৈশিষ্ট্যকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছেন। কখনো তারা এমন সব আকাংখা ও সংকল্প প্রকাশ করেন, যা ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট। তখন তাঁদের কথাবার্তা শুনে মনে হয়, তাঁরা আসলে একটা আদর্শবাদী আন্দোলনের অনুসারী ও আহবায়ক। আবার কখনো তাঁরা নিছক একটা জাতির রূপ ধারণ করেন এবং অন্যান্য জাতি যেভাবে চিন্তা-ভাবনা করে থাকে, সেভাবেই চিন্তা-ভাবনা করেন। তখন তাঁরা এমন সমস্যাবলীতে জড়িয়ে পড়েন, যাতে কেবল জাতিগুলোই আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং এ চিন্তাভঙ্গীর কারণে এমন সব সমস্যাকে তারা অন্তরায় মনে করেন যা কেবল জাতীয় অভিলাস ও আকাংখার পথেই অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে। তাঁরা আজ পর্যন্ত এ দু' বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য বুঝতে পারেননি এবং তারা আসলে কি, সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তও নিতে সক্ষম হননি। আর এ জন্যই তারা এ যাবত স্ববিরোধিতা ও জড়তা থেকে মুক্ত কোন নীতি নিজেদের জন্য নির্ণয় করতে পারেননি।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জাতীয়তা এবং জাতীয় স্বার্থ কোন প্রচারযোগ্য জিনিস নয়। যেমন জার্মান, ইটালীয়, বৃটিশ অথবা ভারতীয় জাতীয়তার দিকে কাউকে আহবান করা যেতে পারে, এমন কথা কেউ ভাবতেও পারে না। কেননা এটা কোন আদর্শ বা নীতি নয় যে, যে কোন মানুষের কাছে তা পেশ করা যেতে পারে। এগুলো হলো প্রজাতিক ধারাবাহিকতা, ইতিহাস ঐতিহ্য ও সভ্যতার উপাদানে নির্মিত কতকগুলো অনমনীয় ও অপরিবর্তনীয় গণ্ডী। এ সব গন্ডীতে যারা জন্মগ্রহণ করেছে, কেবল তারাই এ সব গন্ডীর স্বার্থ ও আশা-আকাংখার প্রতি আগ্রহী হতে পারে। অন্য গন্ডীর লোকদের এর প্রতি আগ্রহী হওয়ার কোনই কারণ নেই। একজন জার্মান যদি তার জার্মান জাতীয়তার ভিত্তিতে কিছু করতে চায়, তাহলে সে একমাত্র জার্মানদের কাছ থেকেই সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভের আশা করতে পারে। জার্মান জাতীয়তার টিকে থাকা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভে ইংরেজের কি গরজ পড়েছে। জার্মানদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য একমাত্র জার্মানরাই ব্যাকুল ও উদগ্রীব হতে পারে। তার মোকাবিলায় বরঞ্চ ইংরেজরাও আপন শ্রেষ্ঠত্ব আধিপত্য বিস্তারের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রাণপন সংগ্রামে লিপ্ত হবে, এটাই স্বাভাবিক। এটা অবশ্য বিচিত্র নয় যে, উভয় পক্ষ একে অপরের কিছু লোককে অবৈধ উপায়ে খরিদ করে নিজের এজেন্ট বা দালাল বানিয়ে নিল। কিন্তু এটা কখনো সম্ভব নয় যে, ইংরেজরা জার্মান

জাতীয়তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাদের পরম বন্ধু হয়ে যাবেন, অথবা জার্মানরা ইংরেজ জাতীয়তা গ্রহণ করে ইংরেজদের সহায়ক ও রক্ষকের ভূমিকা পালন করবে। এটা সম্ভব নয় বলেই যেখানে দুটো জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়, সেখানে কেবল স্বার্থের জন্যই ঐক্য হয় এবং যতক্ষণ স্বার্থের দাবীতে ঐক্য বহাল রাখার প্রয়োজন হয় ততক্ষণই ঐক্য বহাল থাকে। আর যেখানে উভয়ের মধ্যে গোলযোগ ও সংঘর্ষ পাকিয়ে ওঠে, সেখানে উভয়কে কেবল নিজেদের জাতীয় শক্তি, সংঘবদ্ধতা, অর্থবল, জনবল ও অস্ত্রবলের ওপরই নির্ভর করতে হয়। এ সব দিক দিয়ে যে জাতি দুর্বল হয়, সে পরাজিত এবং যে জাতি শক্তিধর হয় সে জয়যুক্ত হয় এবং প্রতিপক্ষকে পরাভূত করে। জার্মানীর মোকাবিলায় পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স কেন পরাজিত হলো? ফিনল্যান্ড ও রুমানিয়াকে রাশিয়ার মোকাবিলায় কেন পর্যুদস্ত হতে হলো? সংঘর্ষটা জাতিতে জাতিতে ছিল বলেই এ রকম হয়েছিল। উভয় দিকে ছিল জাতীয়তা। সুতরাং যে জাতি জনবল, ধনবল ও অস্ত্রবলে বড় ছিল, সে দুর্বলকে পিষ্ট করলো। কোন পক্ষই নিরেট মানবতার ভিত্তিতে এমন কোন আদর্শ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি, যা বিপক্ষের মানুষদেরকে আকৃষ্ট করতে পারে এবং দুশমনের ভেতর থেকেই ক্রমান্বয়ে তার বন্ধু সংগ্রহ করা সম্ভব হতে পারে।

একটি জাতির অবস্থা এরকমই হয়ে থাকে। এখন ভেবে দেখুন যে, এই দুনিয়ায় কিংবা এ ভারতে মুসলমানদের অবস্থা কি সত্যিই এরূপ? আমরা কি নিছক বর্ণগত, ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারজাত সভ্যতার তৈরী একটা গোষ্ঠী (Group) যার জাতীয়তা দুনিয়ার অন্যান্য জাতীয়তার মতই প্রচারযোগ্য ও প্রসারযোগ্য নয়? আমাদের জাতীয় আশা আকাংখা কি সে সব জাতির আশা আকাংখার মতই যে, তার ওপর অন্যান্য জাতির ঈমান আনা স্বভাবতই অসম্ভব? আমাদের আশা আকাংখা কি সে ধরনের জাতীয় আশা আকাংখার মতই যা অর্জন করা জনবল, ধনবল ও সাংগঠনিক শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়? যে ইসলামী রাষ্ট্রের নাম আমরা অহরহ উচ্চারণ করে থাকি, তা কি নিতান্তই একটা জাতীয় রাষ্ট্র (National State) যা কেবল একটি জাতির সংখ্যাধীক্যের বলেই প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম? সংখ্যায় কম হলেই কি আমারা একটা জাতীয় সংখ্যালঘুতে (National Minority) পরিণত হই, যার জন্য সংখ্যাগুরুর সাথে আপোষ করা অথবা আপন স্বকীয়তা রক্ষার কৌশল অবলম্বন করা ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকে না? আসলে কি দুনিয়ার

অন্যান্য জাতির মত আমাদের কাছেও স্বাধীনতার অর্থ কেবল ভিন্ন জাতির শাসন থেকে মুক্তি লাভ? স্বজাতি বা স্বদেশবাসীর সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া কি আমাদের আশা–আকাংখা ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জরুরী?

যদি তাই হয়, তা হলে তো মুসলমানদের বিভিন্ন দল আজকাল যা কিছু করছে, ঠিকই করছে। অমুসলিম প্রতিবেশীদের সাথে একযোগে স্বাধীনতা সংগ্রামও সঠিক, বৃটিশ সরকার ও দেশীয় রাজ্যসমূহের সহায়তায় হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধও সঠিক, সশস্ত্র বাহিনীতে, সরকারী চাকুরীতে এবং নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিত্বের লড়াইও ন্যায়সঙ্গত, মুসলিম রাজ্যসমূহের সমর্থনও যুক্তিসঙ্গত, দেশবিভাগের দাবীও যথার্থ, খাকছারদের সামরিক সংগঠনও বিশুদ্ধ এবং যে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সত্য ও ন্যায়ের আদর্শকে জলাঞ্জলী দিয়ে মুসলিম জাতি বা মুসলিম ব্যক্তিবর্গের জন্য সম্ভাব্য সবরকমের সুযোগ–সুবিধা লাভের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করা হয়, তাও নির্ভুল। যেহেতু জাতীয়তার রীতি ও প্রথা এ রকমই এবং দুনিয়ার জাতিগুলো এ সব কর্মপন্থাই অবলম্বন করে থাকে, তাই এগুলোর সবই ন্যায়সঙ্গত। যে জাতি কোন আদর্শের ধার ধারে না, যে জাতি কেবলমাত্র আপন জাতিগত কল্যাণ ও প্রতিপত্তি ছাড়া আর কিছু কামনা করে না। তারপক্ষে এ সব কর্মপন্থা অবলম্বন করা ছাড়া আর উপায়ই বা কি? তবে এ সব কর্মপন্থা অবলম্বন করার সাথে সাথে আমরা যদি এরূপ খোশখেয়ালে মত্ত হই যে, নিজেদেরকে এ ধরনের একটি আদর্শহীন ও স্বার্থ সর্বস্ব জাতির পর্যায়ে নামিয়ে আনার পরও আমরা এ ভূখণ্ডে আল্লাহর শাসন তথা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে পারবো, তবে সেটাই হবে ভুল। কেননা এমতাবস্থায় এ স্বপ্নসাধ কখনো পূর্ণ হবার নয়।

বস্তুত শুধু একটি দেশে নয়, বরং সারা দুনিয়ায় নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা যদি কোন জিনিসের থেকে থাকে, তবে তা শুধু সেই আদর্শবাদী আন্দোলনেরই আছে, যা মানুষকে কেবল মানুষ হিসাবেই সম্বোধন করে এবং তার সামনে স্বয়ং তার সর্বাঙ্গীন কল্যাণের স্বাভাবিক বিধান পেশ করে। এ ধরনের আন্দোলন একটা প্রচারমূলক শক্তির রূপ ধারণ করে। অথচ জাতীয়তাবাদ কখনো সে ধরনের শক্তি নয়। এ আদর্শবাদী আন্দোলন জাতীয়তার প্রাচীর, বর্ণ ও বংশগত বড়াই ও বিদ্বেষ এবং জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের সুদৃঢ় রক্ষাব্যূহ সব কিছুকেই ডিঙ্গিয়ে যায় এবং কোন কিছুই তার গতি রোধ করতে সক্ষম হয় না। সে সর্ব দিকে ও সর্বত্র আপন প্রভাব

প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে করতে এগিয়ে যায়। তার শক্তি তার অনুসারীদের সংখ্যা অথবা উপায় উপকরণের ওপর নির্ভরশীল থাকে না। একজন মানুষ একাই তার সূচনা করার জন্য যথেষ্ট। অতপর তা তার আদর্শের শক্তিবলে সম্মুখে অগ্রসর হয়। সে আপন শত্রুদের মধ্য থেকেই বন্ধু গড়ে তোলে। সকল জাতির মধ্য থেকে মানুষ ছুটে এসে তার পতাকা তলে সমবেত হতে থাকে এবং উপায় উপকরণও তারা সাথে করেই নিয়ে আসে। যারা যুদ্ধংদেহী হয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করতে আসে তাদের এ মর্দে মুমিনের দল শুধু তোপ কামান দিয়েই গোলা বর্ষণ করে না, বরং দীনী শিক্ষা ও আদর্শের বাণও নিক্ষেপ করে। রক্ত পিপাসু শত্রুদের মধ্য থেকে তারা নিজেদের তেজস্বী সমর্থকও খুঁজে বের করে। তাদের মধ্য থেকেই তারা পেয়ে যায় সৈনিক, সেনাপতি, দক্ষ শিল্পী, পুঁজিপতি, শিল্পপতি ও কারিগর। চরম নিসম্বল অবস্থায়ও সব ধরনের সরঞ্জাম তাদের হস্তগত হয়ে যায়। তাদের আদর্শবাদের সয়লাবের মুখে সংকীর্ণ জাতীয়তা কখনো টিকে থাকতে পারে না। বড় বড় পাহাড় তাদের সামনে আবির্ভূত হয়, আর তা লবনের মত গলে গলে এ দুরন্ত প্লাবনের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর প্রশ্ন চিরায়ত সত্যের পতাকাবাহী এ দৃপ্ত বাহিনীর কাছে একটা অর্থহীন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কোন সুসংগঠিত ও প্রাচুর্যময় জাতীর শক্তি তার সহায় হোক--এর মুখাপেক্ষী সে কখনো হয় না। সে কোন জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করার উদ্যোগই গ্রহণ করে না যে, জাতিসমূহ তার প্রতিরোধ করতে সক্ষম.হবে। কেননা সে তো এমন এক আদর্শের শাসন কায়েম করতে চায়, যা সকল জাতির সহজাত ন্যায়বোধ ও স্বাভাবিক সত্য প্রবণতাকে আবেদন জানায়। অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত বিদ্বেষ পরায়ণ শক্তিগুলো কিছুকাল তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে। কিন্তু মানুষের জন্মগত সৎপ্রবৃত্তি তথা বিবেকের মরিচা যখনই উঠে যায়, অমনি তার ভেতরে যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, সেটা কবির ভাষায় এরূপঃ

"অরণ্যের সকল হরিণ আপন মাথা হাতে নিয়ে প্রতীক্ষা রত,
এ আশায় যে একদিন তুমি শিকারের সন্ধানে আসবে।"

মুসলমানগণ কুরআন ও রসূলের (স) আদর্শ জীবনের দর্পণে নিজেদের চেহারা নিরীক্ষণ করুক। যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের জন্য তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে, সেটা এ ধরনেরই কোন মরিচাধরা প্রেরণা নয়তো? এমন নয়তো যে, সংকীর্ণ গন্ডীতে আবদ্ধ জাতিসমূহের মধ্যে দীর্ঘকাল বসবাস

করতে গিয়ে এবং তাদেরই মত শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে নিজেদের আসল পরিচয়কে ভুলে বসেছে এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নিজেদেরকে প্রচলিত পরিভাষায় 'জাতি' বলে পরিচয় দিতে দিতে একটি দৈন্যদশায় লিপ্ত জাতি স্বভাবতই যেসব সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতায় ভারাক্রান্ত থাকে, সে সব সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতায় নিজেকেও আক্রান্ত বলে ভেবে নিয়েছে?

প্রকৃত ব্যাপার যদি এ হয়ে থাকে যে, মুসলমানরা মুলত একটা বিশ্বজোড়া আদর্শবাদী আন্দোলনের অনুসারী ও পতাকাবাহী, তাহলে মুসলিম রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যেসব সমস্যা নিয়ে এ যাবত সময় নষ্ট করেছেন, সেসব সমস্যা এক নিমেষেই খতম হয়ে যায়। গোটা পরিস্থিতিটাই তা হলে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যায়। মুসলিম লীগ, আহ্‌রার দল, খাকসার দল, জমিয়াতুল উলামা ও স্বতন্ত্র সম্মেলন-সকলেরই গৃহীত এ যাবতকালের সকল কার্যবিবরণী সম্পূর্ণরূপে বাতিল ও বিলোপ যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। আমরা জাতীয় সংখ্যালঘুও নই, আর জনসংখ্যার শতকরা অনুপাতের ওপরও আমাদের মূল্যায়ণ নির্ভরশীল নয়। হিন্দুদের সাথেও আমাদের কোন জাতিগত বিরোধ নেই, ইংরেজদের সাথেও আমাদের স্বাদেশিকতার ভিত্তিতে কোন দ্বন্দ্ব নেই। যেসব দেশীয় রাজ্যে মুসলিম নামধারীরা নিরংকুশ শাসক হয়ে জেঁকে বসেছে, তাদের সাথেও আমাদের কোন মৈত্রীরবন্ধন নেই। না আছে সংখ্যালঘু হিসেবে আমাদের রক্ষাকবচের প্রয়োজন, আর না আছে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে আমাদের জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের গরজ। আমাদের তো কেবল একটাই আকাংখা ও অভিলাস এবং সেটা এই যে, আল্লাহর বান্দারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো শাসনাধীন যেন না হয়, বান্দাদের প্রভূত্ব যেন খতম হয় আর আল্লাহ যে ইনসাফভিত্তিক আইন পাঠিয়েছেন কেবলমাত্র সেই আইনেরই শাসন যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের এ লক্ষ্য ও অভিলাসকে আমরা ইংরেজ, দেশীয় রাজ্যের শাসকবৃন্দ, হিন্দু, শিখ, খৃস্টান, পার্সিক এবং আদমশুমারীর মুসলমান--সকলের কাছেই তুলে ধরবো। যারা এটা মেনে নেবে তারা আমাদের মিত্র আর যারা অস্বীকার করবে তাদের সাথে আমাদের লড়াই। এতে তাদের শক্তি কত আর আমাদের শক্তি কত তার তোয়াক্কা আমরা করি না।

এ পরিচয়কে যথার্থ বলে গ্রহণ করা এবং এ আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থ ও গরজকে ভুলে যাওয়া অপরিহার্য। আমাদেরকে সকল সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে উঠতে হবে

এবং আমাদের তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল ছোট খাট ব্যাপারকে এড়িয়ে যেতে হবে। আমরা যদি ভারতীয় জাতীয়তার গোড়ামীতে লিপ্ত হই, তা হলে ইংরেজ ও অভারতীয়রা আমাদের দাওয়াত কানে তুলবে না। আর যদি নামধারী মুসলিম জাতীয়তার প্রেমাসক্ত হই, তা হলে হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতির হৃদয়ের দুয়ার আমাদের ডাক শোনার জন্য উন্মুক্ত হবে--এমন কোন কারণ নেই। আমরা যদি হায়দরাবাদ, ভুপাল, বাহাওয়ালপুর ও রামপুরের মত দেশীয় রাজ্যসমূহের মর্যদা বহাল রাখার আবদার কেবল এ যুক্তিতে ধরি যে, সেখানে মুসলিম রাজার শাসন চালু রয়েছে, তা হলে আমরা যে ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস করি এবং সত্যিই ইসলামী শাসন কায়েম করা আমাদের লক্ষ্য, সেটা চরম নির্বোধ ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করবে না। অমুসলিম সরকারের অধীন চাকুরী এবং অনৈসলামিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হই, তা হলে আমাদের এ কথার কোন ভারত্ব থাকবে না যে, আমরা ইসলামী আদর্শবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমরা যদি জনসংখ্যানুপাতে দেশবিভাগের দাবী করি, তা হলে অমুসলিমরা মুসলমানদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে, এটা অনুভবই করবে না এবং সে কারণে তারা নিজেদের অবস্থান পরিত্যাগ করে আমাদের আহবানে সাড়া দেয়ার কোন প্রয়োজনই উপলব্ধি করবে না। আর যদি আমরা অনৈসলামিক নীতির ভিত্তিতে যৌথ জাতীয় সরকার গঠনে অংশ গ্রহণ করি, তা হলে আমাদের এ কাজে ও আমাদের এ আহবানে এমন সুস্পষ্ট বৈপরিত্য দেখা দেবে যে, আমাদের সত্যবাদিতা ও সত্যনিষ্ঠতা তো দূরের কথা, আমাদের বিবেকবুদ্ধি নিয়েই সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে যাবে। এ পথে চলতে হলে আমাদেরকে এ সব গোড়ামী ও সংকীর্ণতা বর্জন করতে হবে। সন্দেহ নেই যে, এতে আমাদের বহু ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু এ ধরনের ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করা ছাড়া ইসলামী আন্দোলন কখনো চলেনি, চলতেও পারে না। যা কিছু খোয়াতে হয়, হোক। হযরত ঈসা (আ)–এর উক্তি অনুসারে জুববা যদি চলে যায়, তবে জামাটাও ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। তবেই আল্লাহর জমীনে আল্লাহর শাসন কায়েম হওয়া সম্ভব হবে।

(তরজুমানুল কুরআন, জুলাই, ১৯৪০)

ইসলামের সঠিক পথ ও তা থেকে বিচ্যুতির বিভিন্নরূপ

মুসলমানদের মধ্যে যারা পাকিস্তান গড়াকে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে, যারা ইংরেজ সরকারের কবল থেকে ভারতকে স্বাধীন করার ওপরই নিজেদের সকল আশা-ভরসা নির্ভরশীল মনে করছে এবং যারা এ উভয় গোষ্ঠীর মধ্যস্থলে বিভিন্ন পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে,—এ সকলের মধ্যে একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করছি। সেটি এই যে, এরা সকলেই ইসলামের আসল লক্ষ্যস্থলের দিকে সোজা পথে অগ্রসর হতে কুণ্ঠিত। তারা এ পথে সমস্যার এক বিরাট পাহাড় দেখতে পায় এবং তা দূর থেকে দেখেই বাঁকা পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ডানে বা বামে ঘুরে যায়। অথচ আমি স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে উপলব্ধি করি যে, ইসলামী লক্ষ্যে কোন বাঁকা পথ দিয়ে পৌঁছা সম্ভব নয়। ঐ লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে কেবলমাত্র সোজা ও প্রত্যক্ষ পথ দিয়েই তা সম্ভব। আর এ পথে যেসব বাধাবিঘ্ন দেখা যায় তাকে সঠিকভাবে বুঝবার ও দূর করার চেষ্টা করলে অতিক্রম করা অসাধ্য কিছুনয়।

আমার উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত দাবীর পর্যালোচনা করে তার এক একটি অংশ নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করবো।

১· আসল ইসলামী লক্ষ্য কি?

২· উক্ত লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সোজা পথ কি?

৩· এ পথে যেসব বাধাবিপত্তি দেখা যায় তা কি কি?

৪· এই সব বাধা-বিঘ্ন দেখে যে বাঁকা ও ঘোরালো পথগুলো অবলম্বন করা হচ্ছে, তা কি কি?

৫· এ সব বিভিন্ন পথে কি কি ভ্রান্তি ও ত্রুটী রয়েছে এবং কি কারণে এ সব পথ ধরে মূল লক্ষস্থলে পৌঁছা সম্ভব নয়?

৬· বাধা–বিপত্তিগুলো প্রকৃতপক্ষে কি ধরনের এবং তা কিভাবে দূরীভূত হতে পারে?

এ প্রশ্নগুলো নিয়েই চলতি নিবন্ধে আমি আলোচনা করতে চাই।

১. ইসলামের আসল লক্ষ্য

এ প্রথম প্রশ্নটির যে জবাব পবিত্র কুরআনে দেয়া হয়েছে, তা এই যেঃ

هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ-(التوبة : ٣٣)

"তিনিই (আল্লাহ) যিনি আপন রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ও সঠিক দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি এ সত্য দীনকে অন্যসকল দীনের ওপর বিজয়ী করে দেবেন, তা এটা মুশরিকদের কাছে যতই অপসন্দনীয় হোক না কেন।" (সূরা তাওবাঃ ৩৩)

এ আয়াতে هدى বা হেদায়াত অর্থ হলো দুনিয়ায় জীবন যাপনের বিশুদ্ধ ও নির্ভুল পদ্ধতি। ব্যক্তিগত আচরণ, পারিবারিক ব্যবস্থা, সমাজের বিন্যাস, অর্থনৈতিক লেনদেন, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক কর্মকৌশল এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক--মোট কথা, জীবনের সকল দিক ও বিভাগে মানুষের জীবনের জন্য সঠিক আচরণ পদ্ধতি ও কর্মপ্রণালী কি হওয়া উচিত, সেটা আল্লাহ তাঁর রসূলকে জানিয়ে দিয়ে পাঠিয়েছেন।

দ্বিতীয় যে জিনিসটি আল্লাহর রসূল সাথে নিয়ে এসছেন, তা হলো دين حق তথা সত্য, সঠিক ও বিশুদ্ধ আল্লাহর দীন। 'দীন' শব্দের মূল অর্থ আনুগত্য ও অনুসরণ। 'দীন' যে ধর্ম অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেটা তার আসল অর্থ নয়। যেহেতু ধর্মেও মানুষ চিন্তা ও কর্মের একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার আনুগত্য ও অনুসরণ করে, তাই ওটাকে 'দীন' বলা হয়। বস্তুত এ যুগের 'রাষ্ট্র' শব্দটা বলতে যা বুঝায়, 'দীন' শব্দের মর্ম বহুলাংশেই তাই। কোন উচ্চতর ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষের আনুগত্যের নামই রাষ্ট্র। দীন ও অবিকল তাই।

আর 'দীনে হক' বা সত্যদীন হলো, মানুষ কর্তৃক অন্য মানুষের স্বয়ং নিজের এবং সকল সৃষ্টির দাসত্ব ও আনুগত্য পরিহার করে, কেবলমাত্র আল্লাহর সর্বোচ্চ ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব মেনে নেয়া এবং একমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও আনুগত্য গ্রহণ করা। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রসূল স্বীয় প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে এমন একটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, যেখানে না আছে মানুষের নিজের স্বেচ্ছাচারের কোন স্থান আর না আছে মানুষের ওপর অন্য মানুষের সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্বের কোন অধিকার। বরঞ্চ সার্বভৌমত্ব ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যা কিছু আছে কেবল আল্লাহরই আছে।[১]

---

১. অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি যা লিখেছি, অনেকেই তা বুঝতে ভুল করেছেন। এর কারণ এই যে, আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্ব জানা না থাকলে, এ বিষয়টা বুঝে উঠা দুরূহ। আধুনিককালে রাষ্ট্র বলতে শুধুমাত্র আভ্যন্তরীন আইনশৃংখলা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার দায়িত্ব সম্পাদনকারী প্রশাসনিক যন্ত্রটাকেই বুঝায় না। বরং এ যুগে প্রকৃতপক্ষে ধর্মের মতই সমগ্র মানব জীবন রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের অধীন। রাষ্ট্র চাই সমাজতান্ত্রিক হোক অথবা ফ্যাসিবাদী অথবা গণতান্ত্রিক, প্রত্যেকটারই ভিত্তিমূলে রয়েছে একটা বিশেষ অতিপ্রাকৃতিক মতবাদ, রয়েছে মানুষ ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে একটা বিশেষ ধারণা এবং একটা নির্দিষ্ট চারিত্রিক ও সামাজিক দর্শন। প্রতিটি রাষ্ট্রই আবার নিজস্ব বিশেষ তত্ত্ব ও দর্শনের প্রেক্ষাপটে একটি সর্বোচ্চ বা সার্বভৌম ক্ষমতাধর কর্তা নির্ণয় করে থাকে, (যথা জাতি, দেশবাসী, অথবা সম্প্রদায়) যার প্রতিনিধিত্ব কোন একনায়ক অথবা সংসদ অথবা পার্টির হাতে সমর্পিত হয়। উপরন্তু রাষ্ট্রের পরিসীমায় বসবাসকারী সকলকে উক্ত সর্বোচ্চ কর্তার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা এবং তার সীমাহীন ও সর্বাত্মক আনুগত্য করার দাবী জানানো হয়। অধিবাসীদের ব্যক্তিগত জীবন এবং সামগ্রিক সামাজিক জীবনের কোন অংশই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের আওতার বাইরে থাকে না। রাষ্ট্রই নিজস্ব দর্শন অনুসারে তাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে, রাষ্ট্রই নিজস্ব নৈতিক দর্শনের আলোকে নির্ধারণ করে তাদের চারিত্রিক মানদন্ড। তাদের জীবনের জন্য আইন কানুন রচনা এবং বৈধ ও অবৈধের সীমা নির্ধারণের কাজও রাষ্ট্রই সম্পন্ন করে। জনগণ কি কি পন্থায় আপন আপন চেষ্টা-সাধনা সম্পন্ন করবে আর কি কি পন্থায় তা করতে পারবে না সেটাও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই স্থির করা হয়। যদিও সর্বকালেই রাষ্ট্রের মর্মার্থ এ রকমই ছিল, এবং সে জন্যই اَلنَّاسُ عَلٰى دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ (জনগণ তাদের রাজাদের জীবনাচারই অনুসরণ করে থাকে) এ প্রবাদটির প্রচলন হয়েছিল, কিন্তু ইতিপূর্বে এ মর্মার্থটা ধামাচাপা পড়েছিল। অধুনা এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং সারা দুনিয়ায় এ রাষ্ট্র দর্শনই স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এখন ভাবুনতো, এ ছাড়া আর কাকে দীন বলা যায়? একটা অতিপ্রাকৃতিক বিশ্বাস, এক সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তার বিদ্যমানতার ধারণা--যার ওপরে আর কারো কর্তৃত্ব (Authority) থাকবে না, সেই সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর কর্তার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা ও তার আনুগত্যে নিজেকে সমর্পণ করা, এমন একটা চারিত্রিক ও সামাজিক দর্শন যার ওপর গোটা মানব জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এমন একটা সর্বব্যাপী বিধান--এ সবের সমষ্টির নামই তো দীন। এ জন্যই আজকালকার

রসূলকে পাঠানোর উদ্দেশ্য এই বলা হয়েছে যে, তিনি যেন আল্লাহর দেয়া সেই আনুগত্য প্রক্রিয়াকে (দীন) এবং সেই জীবন বিধানকে (আল-হুদা) আনুগত্যের গোটা ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করে দেন। আনুগত্যের গোটা ব্যবস্থা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? পৃথিবীতে মানুষ ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগতভাবে যে যে পন্থায় কারো আনুগত্য করে চলেছে, তার প্রত্যেকটাই আনুগত্যের এক একটা ধরন এবং দীনের সামগ্রিক সত্তার এক একটা বাস্তব রূপ। সন্তান কর্তৃক মা-বাপের আনুগত্য, স্ত্রী কর্তৃক

পাশ্চাত্য দার্শনিক এবং চিন্তাবিদরাও বলতে শুরু করেছেন যে, বর্তমান যুগের রাষ্ট্র আল্লাহ ও ধর্মের স্থান দখল করেছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যে ব্যক্তি এ সব রাষ্ট্রের কোনটির আনুগত্য করে এবং তার আনুগত করাকে সঠিক ও বৈধ মনে করে, সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের প্রভুত্বে ঈমান আনে এবং অন্যের আনুগত্যে নিজেকে সমর্পণ করে। আর যে ব্যক্তি এ রাষ্ট্রের আনুগত্য করাকে অবৈধ মনে করে এবং একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যে বিশ্বাসও করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের আনুগত্য করতে রাজী থাকে, সে যদিও আল্লাহর প্রতি ঈমানদার, কিন্তু তার ইসলাম অর্থাৎ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ আল্লাহর বিকল্প শক্তির জন্যই নিবেদিত। পক্ষান্তরে নবীগণ আলাইহিমুস সালাম যে দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন, তা ছিল এই যে, মানুষ যেন একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং একমাত্র 'আল্লাহর আনুগত্যেই নিজেকে সমর্পণ করে। সে যেন আল্লাহকেই সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশীল শাসকরূপে স্বীকার করে তারই আনুগত্য মেনে নেয় এবং তার সমগ্র জীবনের ওপর, যেন একমাত্র সেই সর্বব্যাপী নৈতিক ও আইনগত বিধি-বিধানই চালু হয়, যা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

এ কথা সত্য যে, এ বিষয়টি আমি যে ভাষায় বর্ণনা করি, তা প্রাচীন মুসলিম মনীষীদের লেখা কেতাবাদিতে পাওয়া যায় না। তার কারণ এই যে, তৎকালে এইসব শব্দ এ সব অর্থে ব্যবহৃত হতো না। কিন্তু ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে বিবেচনা করে দেখুন তো, যে তত্ত্ব আমি বর্ণনা করেছি, কুরআনে কি তাই বর্ণনা করা হয়নি এবং সত্য পথের পথিকৃত সকল মুসলিম মনীষীবৃন্দ কি সেই তত্ত্বই এ যাবত বর্ণনা করে আসেননি? দুঃখের বিষয় যে, লোকেরা কুরআন পড়ে অথচ বুঝতে চেষ্টা করে না সকল নবী এ কথাই বলেছেন যে, একমাত্র আল্লাহকেই ইলাহ ও রব (অর্থাৎ সর্বদিক দিয়ে নিরংকুশ ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশীল প্রভু ও শাসক) হিসাবে মেনে নাও, তারই দাসত্ব গ্রহণ কর এবং যে নৈতিক ও আইনগত বিধান (শরীয়াতী ব্যবস্থা) আমরা তাঁর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছি, তার অনুকরণ কর। আর আমি রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছি, তার আলোকে দেখুন যে, নবীগণ আল্লাহর সর্বোচ্চ ও সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন, মানুষ কর্তৃক তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং মানব জীবনে আল্লাহর শরীয়াতকে বাস্তবায়িত করার যে আহবান জানিয়েছিলেন, তা আল্লাহর রাষ্ট্র এবং আল্লাহর সরকার প্রতিষ্ঠার আহবান ছাড়া আর কি হতে পারে? যারা আপত্তি তুলেছেন, তারা যদি আমার এ বক্তব্য অস্বীকার করেন, তা হলে আমি তাদের কাছে জানতে চাই যে, নবীগণ তা হলে কি জন্য এ সব শরীয়াত নিয়ে এসেছিলেন, এতসব হালাল হারামের বিধি-

স্বামীর আনুগত্য, চাকর কর্তৃক মনিবের আনুগত্য, কর্মচারী কর্তৃক কর্মকর্তার আনুগত্য, নাগরিক কর্তৃক সরকারের আনুগত্য, অনুচর ও কর্মী কর্তৃক নেতার আনুগত্য এবং এ ধরনের অগণিত আনুগত্য সামাগ্রিকভাবে একটা আনুগত্যের জগৎ গড়ে তোলে। আনুগত্যের এ গোটা জগৎ তার সকল অংশ ও শাখা–প্রশাখা সমেত একটা বৃহত্তর আনুগত্য এবং বৃহত্তর আইনের অধীন হয়ে যাক, সকল আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের আওতায় আসুক, একমাত্র আল্লাহর আইন ও বিধান দ্বারা এগুলো বিধিবদ্ধ (Regulated) হোক, এবং এ বৃহত্তর আনুগত্য ও এ আইন–বিধির আওতার বাইরে আর কোন আনুগত্য না থাকুক––এ উদ্দেশ্যেই নবী ও রসূলগণ এসে থাকেন।

বস্তুত, এটাই রসূলের ওপর অর্পিত দায়িত্ব, তার চূড়ান্ত লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও ব্রত। এ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শির্কে লিপ্তরা যতই ভ্রূকুটি করুক, যতই নাক সিটকাক তার পরোয়া না করে এ কাজ তাকে সমাধা করতেই হবে। শির্কে লিপ্ত কারা? যারা আপন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে আল্লাহর আনুগত্যের সাথে অন্য কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ (আল্লাহর

নিষেধের হেতু কি ছিল, এতসব দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধি তাঁরা কোন্ কারণে পেশ করেছিলেন? কোন্ কারণে নিম্নের ঘোষণাগুলো জারী করা হয়েছিল।

مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুসারে বিচার ফায়সালা করে না তারা জালেম।" (আল্–মায়েদা : ৪৫)

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى

"যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে সবচেয়ে মজবুত ও অটুট রজ্জু ধারণ করে।" (আল্–বাকারা : ২৫৬)

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ اَمَرَ اَنْ لاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ

"শাসনের অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তাঁর নির্দেশ এই যে, তাঁর ছাড়া আর কারো দাসত্ব ও আনুগত্য করোনা।" (ইউসুফ–৪০)

কেনইবা প্রত্যেক নবী এ কথা বলতেন: فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।" আল্লাহর এ শরীয়াতগুলো কি এমনভাবেই নাযিল হয়েছিল যে, ওগুলোও সঠিক এবং মানুষের রচিত আইন–বিধানও সঠিক বলে মেনে নেয়া যাবে এবং মানুষ ইচ্ছা করলে শরীয়াতের অনুসরণ করতে পারবে আবার ইচ্ছা করলে মানুষের রচিত আইনও মেনে চলতে পারবে? (তরজুমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ১৯৪১)

আনুগত্যের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত) আনুগত্যকে শরীক করে তারাই শির্কে লিপ্ত। আল্লাহর প্রাকৃতিক আইনের ব্যাপার অবশ্য স্বতন্ত্র। সে আইনের আনুগত্য ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সকলেই করছে। কেননা তা না করে কোন উপায়ই নেই। তবে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও এখতিয়ারের যে পরিমন্ডলটা রয়েছে, সেখানে কোন কোন মানুষ তো পুরোপুরিভাবে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করে। আর কতক লোক নিজ জীবনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে কোন অংশে আল্লাহর প্রেরিত নৈতিক বিধানের (শরীয়াত) অনুসরণ করে, আর অন্য কোন অংশে নিজের প্রবৃত্তির অথবা অন্যদের আনুগত্য করে। এ কাজটার নামই হলো আল্লাহর আনুগত্যের সাথে অন্যান্য আনুগত্যকে শরীক করা। যারা এ সব রকমারি শির্কে লিপ্ত, তাদের কাছে নিজেদের প্রাকৃতিক আনুগত্যের মত ইচ্ছাধীন আনুগত্য ও দাসত্বকেও পুরোপুরি ও নির্ভেজালভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়াটা খুবই অপসন্দ ও বিব্রতকর হয়ে দাঁড়ায়। অজ্ঞতার কারণেই হোক আর চারিত্রিক শৈথিল্যের কারণেই হোক, শির্কের ওপরই তারা অটল থাকতে চায়। কিন্তু আল্লাহর রসূলের ওপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যে, এ ধরনের লোকদের বিরোধিতা ও বাধাদান সত্ত্বেও স্বীয় কাজ যেন তাঁরা অবশ্যই সম্পন্ন করেন।

২—উক্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সোজা পথ

ওপরে যে লক্ষ্য বর্ণনা করা হলো, ওটাই ইসলামের লক্ষ্য এবং ঐ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য আল্লাহর রসূল যে পথ অবলম্বন করেছেন, সেটাই সরল ও সোজা পথ। সে পথ এই যে, মানুষকে 'আলহুদা' (আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান) এবং 'দীনে হক' (আল্লাহর পূর্ণ ও নির্ভেজাল আনুগত্য ও দাসত্ব) এর দিকে দাওয়াত দিতে হবে। এরপর যারা এ দাওয়াতকে গ্রহণ করার মাধ্যমে আপন দাসত্ব ও আনুগত্যকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করবে, আল্লাহর আনুগত্যের সাথে অন্য কোন আনুগত্যের মিশ্রণ ঘটানো পরিত্যাগ করবে এবং আল্লাহর আইনকেই নিজের জীবনের আইনে পরিণত করবে, তাদেরকে নিয়ে একটা মজবুত দল গঠন করতে হবে। অতপর এ দল আপন সাধ্যমত সকল নৈতিক, তাত্বিক এবং বৈষয়িক, উপায় উপকরণকে কাজে লাগিয়ে সত্য দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক জিহাদ পরিচালনা করবে। যেসব শক্তির বলে আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া অন্যান্য আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সেই সকল শক্তির দাপট চূর্ণ করা এবং পৃথিবীর যাবতীয় বিধান ও

আনুগত্যের ওপর আল্লাহর বিধান ও আল্লাহর আনুগত্যকে বিজয়ী করে দেয়া পর্যন্ত এ জেহাদ অব্যাহত রাখতে হবে।

এ সোজা ও সরল পথের প্রতিটি অংশ চিন্তা–ভাবনার দাবী রাখে।

প্রথম অংশ হলো সকল মানুষকে সর্বতোভাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব মেনে নেয়া এবং তার প্রেরিত আইন–কানুনকে নিজ নিজ জীবনের আইন ও বিধানে পরিণত করার দাওয়াত প্রদান। এ দাওয়াত হওয়া চাই সার্বজনীন এবং তা সব সময় চালু থাকা চাই। এর সাথে অন্য কোন অবান্তর ও অসংলগ্ন জিনিসের মিশ্রণ ঘটানো চলবে না। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন বর্ণ, বংশ এবং বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সংক্রান্ত বিতর্ক, মানবরচিত বিধান সমূহের মধ্যে একটির ওপর অন্যটিকে অগ্রাধিকার দান, স্বার্থপরতার ভিত্তিতে এ ধরনের কোন বাতিল ব্যবস্থাকে সমর্থন করা, অথবা কোন বাতিল ব্যবস্থার অধীন নিজের জন্য স্থান করে নেয়ার জন্য চেষ্টা করা––এ সমস্ত কাজই শুধু যে আল্লাহর বিধান ও আল্লাহর আনুগত্যের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তা নয়––বরং তার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তার জন্য ক্ষতিকরও। সুতরাং যখন কোন ব্যক্তি বা দল সত্য দীনের দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবে তখন তাকে এ সমস্ত দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে এবং আপন দাওয়াতের সাথে সম্পর্কহীন অথবা সামঞ্জস্যহীন কোন বিষয়কে নিজ দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত করা চলবে না।

দ্বিতীয় অংশ এই যে, দল শুধু সে সব লোককে নিয়েই গঠন করতে হবে যারা এ দাওয়াতকে জেনে ও বুঝে গ্রহণ করবে, যারা আনুগত্য ও দাসত্বকে সত্যি সত্যি আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করবে। যারা আল্লাহর আনুগত্যের সাথে অন্যান্য আনুগত্যকে শরীক করা কার্যতই বর্জন করবে এবং বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহর আইনকে নিজের জীবনের আইনে পরিণত করবে। পক্ষান্তরে যারা এ চিন্তাধারা ও এ জীবন পদ্ধতির শুধুমাত্র স্বীকৃতি দেবে অথবা তার প্রতি সহানুভূতিশীল হবে, তারা উক্ত জেহাদ পরিচালনাকারী দলের নেতা তো দূরের কথা, কর্মীও হতে পারে না। এ কথা সত্য যে, যে কোন ব্যক্তির যে কোন পর্যায়েই তার প্রতি সহানুভূতিশীল বা বাহ্যিক সহযোগী হওয়াও মস্তবড় আনন্দের কথা। তথাপি সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীর মধ্যে যে সত্যিকার পার্থক্য রয়েছে, তাকে কোন অবস্থাতেই উপেক্ষা করা ঠিক নয়।

তৃতীয় অংশ এই যে, আল্লাহর আনুগত্যের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত যে আনুগত্যের ব্যবস্থা চালু রয়েছে, তার ওপর প্রত্যক্ষ আঘাত হানতে হবে, আল্লাহর আনুগত্য প্রতিষ্ঠাকেই সকল চেষ্টা ও তৎপরতার একমাত্র লক্ষ্য ও কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং এ ছাড়া অন্য কোন বিষয়কে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে তার পেছনে শক্তি ব্যয় করা উচিত নয়।[১]

৩—বাধাবিপত্তি ও সমস্যাবলী

বর্তমান সময়ে ভারতে মুসলমানদের যতগুলো পৃথক রাজনৈতিক দল রয়েছে, তাদের প্রায় সকলেরই দাবী এই যে, ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যা, আমাদেরও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তাই। কিন্তু যে সোজা সরল ও প্রত্যক্ষ পথের বর্ণনা আমি এ মাত্র দিলাম, সেটা তারা সকলেই পরিত্যাগ করেছে। তারা "আল্লাহর বিধান" ও "আল্লাহর আনুগত্য" ("আল- হুদা" ও 'দীনে হক')-এর

---

১ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা যে নবীর আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, কেউ কেউ এ কথা আদৌ স্বীকার করে না। অথচ সেই সাথে তারা এমন আজব কথাও বলে যে, "যখন, কোন নবী কোন দাওয়াত নিয়ে আসেন, তখন তাঁর প্রথম শ্রোতাদের কোন গোষ্ঠী যদি সে দাওয়াত গ্রহণ করে তবে তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র কায়েম করা জরুরী হয়ে যায় এবং তারা তাদের রাষ্ট্র ইসলামী পদ্ধতিতে কায়েম করে। তবে এই রাষ্ট্র গঠন একটা আনুসঙ্গিক ব্যাপার--নবীর আবির্ভাবের আসল উদ্দেশ্য নয়।" প্রশ্ন এই যে, নবী কি ধরনের দাওয়াত নিয়ে আসেন যে, তার গ্রহণকারীদের নিজস্ব রাষ্ট্র গঠন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে?

নবীর দাওয়াত যদি শুধু এই হয় যে, আল্লাহর পূজা কর, তাহলে সে দাওয়াতের জন্য নিজস্ব রাষ্ট্র গঠন করার কি দরকার? আরো আশ্চার্য কথা এই যে, "তারা ইসলামী পদ্ধতিতে রাষ্ট্র গঠন করে।" নবী যদি রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে না এসে থাকেন, তিনি যদি কোন শাসন পদ্ধতিও না দিয়ে থাকেন এবং শাসন ব্যবস্থা তার দাওয়াতের অংশও না হয়ে থাকে, তা হলে এই "ইসলামী পদ্ধতির রাষ্ট্র" কোথা থেকে এল? আর যদি তিনি একটা শাসন ব্যবস্থাও দিয়ে থাকেন এবং সেটা তাঁর দাওয়াতের অংশ হয়ে থাকে, তা হলে এ রাষ্ট্র কায়েম করাটা তার আগমনের উদ্দেশ্যবহির্ভূত এবং একটা আনুসঙ্গিক ব্যাপার হয়ে গেল কিভাবে? তা হলে আল্লাহ তাঁর নবীদেরকে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠান, তার কোন অংশ কি ঐচ্ছিক (optional) হয়ে থাকে? সেটা কি নিছক একটি লেজুড় হিসেবে জুড়ে দেয়া হয় যে, ইচ্ছা হলে তার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন, নতুবা করবেন না? আর নবী যদি কোন শাসন ব্যবস্থা পেশ করেন, তা হলে তা কি এ ধরনের হয়ে থাকে যে, ওটাও সঠিক আর তার বিরোধী অন্য কোন ব্যবস্থা যদি থেকে থাকে তবে তাও সঠিক? না তার মর্যদা এরকম যে, একমাত্র এটাই

অবিমিশ্র ও উন্মুক্ত দাওয়াত যেমন দেয় না, তেমনি তারা সেই ধরনের দলও গঠন করে না, যার নেতৃত্ব ও সদস্যপদ খালেছ আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। অধিকন্তু কুরআনে মুসলমানদের সকল চেষ্টা–সাধনাকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য যে একটিমাত্র লক্ষ্যবিন্দু নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, অন্য সকল অবান্তর উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে সেই একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিকে তারা আপন চেষ্টা–সাধনাকে কেন্দ্রীভূতও করছে না। সোজা ও প্রত্যক্ষ পথের এ তিনটি অংশ থেকেই বিপথগামী হয়ে গেছে এ সকল মুসলিম দল।

এভাবে বিপথগামী হওয়ার দরুন এ দলগুলোর কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচী কি কি রূপ ধারণ করেছে, তার বিবরণ আমি পরে দেবো। তার আগে আমি এ বিপথগামিতার কারণ বিশ্লেষণ করতে চাই। এর কারণ এই যে, আসল ইসলামী লক্ষ্যের দিকে প্রত্যক্ষভাবে অগ্রসর হওয়ার পথে এ দলগুলো তিনটে বড় রকমের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে এবং তার কোন সমাধান তাদের বুঝেআসেনা।

একঃ প্রথম যে সমস্যাটার তারা সম্মুখীন হয়, তা এই যে, "আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা" (আল–হুদা) এবং "আল্লাহর নির্ভেজাল ও সর্বাত্মক আনুগত্যের" (দীনে হক) দিকে উন্মুক্ত দাওয়াত দেয়ার সাফল্য বর্তমান

সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত শাসন ব্যবস্থা আর এর বিপরীত যে শাসন ব্যবস্থা রয়েছে তা বাতিল। আপনি যদি প্রথমোক্ত মতের সমর্থক হয়ে থাকেন, তাহলে প্রকৃতপক্ষে আপনি যেন এ কথাই বলতে চাইছেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র ও কুফরী রাষ্ট্র একই সমান। আর যদি আপনি দ্বিতীয় বক্তব্যের সমর্থক হয়ে থাকেন তাহলে অনুগ্রহপূর্বক একটু চিন্তা–ভাবনা করে বলুন যে, ইসলামী রাষ্ট্র ও কুফরী রাষ্ট্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটা কি, আর একটির ন্যায়সঙ্গত ও সঠিক সাব্যস্ত হওয়া এবং অপরটির বাতিল সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাখ্যা কিভাবে দেবেন? এ সমস্ত ব্যাপারে যদি পর্যাপ্ত চিন্তাভাবনা করা হতো, তা হলে আপনা থেকেই এ কথা বুঝে আসতো যে, ইসলামী রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার মৌলিক তত্ত্ব ইসলামের তাওহীদ ও রিসালাত বিশ্বাসের সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত এবং এ বিষয়টা আনুসঙ্গিক নয় বরং মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী। 'লা–ইলাহা' বলেই যে নেতিবাচক ঘোষণা উচ্চারণ করা হয়, তার মধ্য দিয়েই আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার এবং 'ইল্লাল্লাহ'র ইতিবাচক ঘোষণার মধ্য দিয়েই আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়। বস্তুত এটাই ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি। (তরজুমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর–১৯৪১)

অবস্থায় তাদের কাছে অসম্ভব মনে হয়। তারা বলে যে, অন্যান্য দল তো কেবল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান পেশ করে। আর যারা তাদের প্রস্তাবিত সমাধানে আকৃষ্ট হয়, তারা নিজ নিজ ধর্ম ও জাতীয়তা পরিবর্তন না করেই তাতে যোগদান করে থাকে। কিন্তু ইসলাম শুধু পার্থিব ও বৈষয়িক সমস্যার সমাধান পেশ করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং আকীদা-বিশ্বাসের একটা বিধান এবং ইবাদাত ও শরীয়াতী বিধি-নিষেধেরও একটা সুনির্দিষ্ট তালিকা দেয়। উপরন্তু এ আন্দোলনে যোগদানের জন্য ধর্ম ও জাতীয়তা পরিবর্তন করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় অন্যান্য আন্দোলন যেভাবে ত্বরিত প্রসার লাভ করে থাকে, ইসলামের মুক্ত দাওয়াত সেভাবে প্রসার লাভ করবে, এটা কিভাবে আশা করা যায়?

দুইঃ দ্বিতীয় যে সমস্যা তারা এ পথে লক্ষ্য করে তা এই যে, ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষের মনে প্রচন্ড বিদ্বেষ বিরাজমান। তারা মনে করে যে, অন্যান্য আন্দোলনের প্রসার অপেক্ষাকৃত সহজ। কেননা তার বিরুদ্ধে জনমন ততটা বিদ্বেষভারাক্রান্ত নয়। কিন্তু ইসলামের প্রসার দুঃসাধ্য। কেননা তার নাম শুনতেই অতীত ও বর্তমানের বিদ্বেষের এক বিরাট ঝড় মাথা তুলে দাঁড়ায়।

তিনঃ তৃতীয় সমস্যা তাদের দৃষ্টিতে এই যে, কোটি কোটি মুসলমান সম্বলিত এক বিশাল জাতি এখানে বিদ্যমান। তারা জাতীয়তার বিচারে 'মুসলমান' হলেও তাদের নৈতিক মান এত উঁচু নয় যে, ইসলাম কায়েমের লক্ষ্যে সংগ্রাম চালাতে পারে। এহেন জাতিকে নিয়ে ঐপথে যাত্রা করতে চাইলেও করা সম্ভব নয়। আবার তাকে বাদ দিয়েও চলতে মনে চায় না। তা ছাড়া এ প্রশ্নও মন-মগজকে বিব্রত করে যে, সকল লক্ষ্য উপেক্ষা করে একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার লক্ষ্যের ওপর যদি মনোনিবেশ করা হয়, তা হলে বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় এবং ভবিষ্যত্যের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ক্ষেত্রে 'মুসলমানদের' জাতীয় স্বার্থের কি পরিণতি হবে?

৪—পথভ্রষ্টতার বিভিন্ন রূপ

উপরোক্ত তিনটে সমস্যা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে দেখে লোকেরা ডান ও বাম দিকে রাস্তা কেটে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকে। খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিভিন্ন লোকের মতামতে এবং বাস্তব কর্মপদ্ধতিতে যে বিভিন্নতা রয়েছে, তা বাদ দিয়ে বড় বড় ও মৌলিক পার্থক্য অনুসারে ভাগ করলে মুসলমানদেরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ

একটি শ্রেণীর বক্তব্য এই যে, প্রথমে আমাদের ভারতের অমুসলিম অধিবাসীদের সাথে একমত হয়ে এদেশকে বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত করে নেয়া উচিত। এতে করে এখানে একটা অভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যাবে। এ স্তর পার হওয়ার পর আমরা ক্রমান্বয়ে উক্ত রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করবো।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারণা এই যে, প্রথমে বৃটিশ শাসনের উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের হিন্দু সংখ্যাগুরুর আধিপত্যকে স্থায়ীভাবে প্রতিরোধ করা উচিত এবং এমন কৌশল অবলম্বন করা উচিত যাতে দেশে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে দুটো রাষ্ট্র কায়েম হয়। একটি রাষ্ট্রে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে আসবে। আর অপর রাষ্ট্রটিতে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় শাসন ক্ষমতা হিন্দুদের হাতে চলে যাবে। তবে সেই রাষ্ট্রে যতদূর সম্ভব শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচ দ্বারা মুসলমানদের অবস্থান নিরাপদ করতে হবে। এই স্তর অতিক্রম করার পর আমরা মুসলিম সংখ্যাগুরু অধ্যুষিত রাষ্ট্রকে পর্যায়ক্রমে ইসলামীর রাষ্ট্রে পরিণত করে ফেলবো। তারপর হিন্দু সংখ্যাগুরু অধ্যুষিত রাষ্ট্রের পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের চেষ্টা চালাবো।

তৃতীয় যে গোষ্ঠীটি রয়েছে, তা বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বস্তরের জনগণকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ও একটা বিপ্লবী দল গঠন করার কাজকে সহজ করার জন্য ইসলামকে একটা ভিন্নরূপ দিতে চায়, যাতে করে যে সমস্ত লোক ইসলামী আকীদা বিশ্বাস, ইবাদাত ও শরীয়াতী বিধি–নিষেধের কড়াকড়িতে ভীত, তাদের কাছে ইসলাম গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এ গোষ্ঠীটি যদিও আলাদা একটা দলীয়রূপ পরিগ্রহ করেনি। কিন্তু আমার জানা মতে এরূপ মনোভাবের অধিকারী বেশ কিছু সংখ্যক লোকের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তাদের পরিকল্পনা বর্তমানে প্রস্তুতির পর্যয়ে রয়েছে।

৫—ভ্রষ্ট পথসমূহের ত্রুটি

এবার আমি এসব গোষ্ঠীর প্রত্যেকটির চিন্তাধারার একে একে সমালোচনা করে তাতে কি কি ত্রুটি ও ভ্রান্তি রয়েছে এবং প্রত্যেকটি গোষ্ঠী ইসলামের সঠিক পথ থেকে কিভাবে বিপথগামী হয়েছে এবং সে সব

ঘোরালো ভ্রষ্ট পথ ধরে ইসলামী লক্ষ্যে উপনীত হবার সম্ভাবনা চিরতরে রুদ্ধ কেন, তা ব্যাখ্যা করবো।

সবার আগে ভারতের স্বাধীনতা কামনাকারীরা

এ গোষ্ঠীটির সংখ্যাগুরু অংশ আলেম ও ধর্মীয় চিন্তাধারার লোকদের নিয়ে গঠিত। সাধারণত এ গোষ্ঠীর লোকেরা দ্বিতীয় গোষ্ঠীর লোকদের তুলনায় অধিকতর ধার্মিক। এ জন্য তাদের বিপথগামীতার জন্য আমার সবচেয়ে বেশী দুঃখ হয়। এ গোষ্ঠীটি উপরোক্ত সমস্যাবলীতে ভীত হয়ে এরূপ মত অবলম্বন করেছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আসল ইসলামী লক্ষ্যের দিকে সরাসরি ও সোজাসুজি যাত্রা করা অসম্ভব। এ জন্য তারা "বৃটিশ শাসন থেকে ভারতের মুক্তি"কেই তাদের যাবতীয় চেষ্টা–সাধনার লক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করেছে। লক্ষ্য পাল্টে যাওয়ার কারণে অনিবার্যভাবেই পথও পাল্টে গেছে। ইসলামের প্রত্যক্ষ পথের যে তিনটে অংশ আমি বর্ণনা করেছি। তাদের পথ তার প্রতিটি অংশেই তা থেকে ভিন্ন।

একঃ দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইসলামের নিয়ম এই যে, মানুষকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার আহবান জানাতে হবে। অথচ তারা ভারতবাসীকে এ বলে আহবান জানায় যে, তোমরা নিজেরাই দেশের মালিক– মোক্তার ও সর্বেসর্বা হও। তারা আল্লাহর আনুগত্যহীন সকল উচ্চতর কর্তত্বকে অস্বীকার করে না বরং শুধুমাত্র ইংরেজদের কর্তত্বকেই অস্বীকার করে। এমনকি তারা আল্লাহর সর্বোচ্চ কর্তৃত্বকেও কার্যকরভাবে স্বীকৃতি দেয় না বরং তার পরিবর্তে দেশবাসীর সর্বভৌম ক্ষমতা ও জনগণের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বকে কার্যকরভাবে স্বীকৃতি দেয়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইংরেজদের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব এবং জনগণের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব এ দুটোর যেটাই মানা হোক, তা সমানভাবে শির্কের পর্যায়ভুক্ত। এদিক দিয়ে এ দ'ুটোতে কোনই ব্যবধান নেই। কাজেই তাদের দাওয়াত আগাগোড়াই অনৈসলামিক বরং ইসলাম বিরোধী দাওয়াত।

তারা মনে করে যে, ইংরেজ শাসনের চাইতে ভারতের জনগণের আত্মশাসনের ক্ষমতা এবং ইংরেজদের আইন রচনার চাইতে ভারতবাসীর আইন রচনা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে দুটোই একই রকম কুফরী এবং একই সমান আল্লাহদ্রোহিতা ও পাপ।

শুধু তাই নয়, তারা ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় বিজাতীয় এবং স্বদেশী বিদেশীর বৈষম্য তুলে ধরে বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার আগুন জ্বালানোর কাজে অংশ নেয়। অথচ এ জিনিসটা ইসলামের সার্বজনীন দাওয়াতের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। ইসলামের দৃষ্টিতে ইংরেজ ও ভারতবাসী উভয়ই মানুষ। নিজের দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে উভয়কে সে সমভাবে এবং একই ভঙ্গীতে সম্বোধন করে। ইংরেজ জাতির সাথে ইসলামের বিরোধ এ জন্য নয় যে, ইংরেজরা এক দেশের অধিবাসী হয়ে আর একদেশ শাসন করতে কেন এল। বরং বিরোধের একমাত্র কারণ এই যে, তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তার আইনের আনুগত্য কেন স্বীকার করে না। ভারতের অধিবাসীদের সাথেও তার অবিকল এ প্রশ্নেই বিবাদ। সে উভয়কে একই সত্যের দিকে আহবান জানায়। একজনের সমর্থক হয়ে আর একজনের সাথে বিরোধে লিপ্ত হওয়া তার মর্যদারপরিপন্থী।[১] কেননা সে যদি ভারতবাসী ও ইংরেজের জাতিগত বিরোধে একজনের পক্ষপাতিত্ব ও অন্যজনের বিরোধিতা করে। তা হলে শেষোক্তজনের হৃদয়ের দরজা ইসলামের দাওয়াতের জন্য রুদ্ধ হয়ে যাবে। এবারে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যারা একদিকে ইসলামের দাওয়াত দেন, আবার অপর দিকে এ জাতিগত ও দেশগত বিরোধে পক্ষ নেন, তারা আসলে ভারতীয় জাতীয়তার স্বার্থের জন্য ইসলামের স্বার্থকে বিসর্জন দেন।

এসব মৌলিক ত্রুটি সত্ত্বেও এ মহজ্জনেরা সময় সময় ইসলাম প্রচারের কাজেও লিপ্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু এ ধরনের প্রচার কখনো হৃদয়গ্রাহী হতে পারে না। একই যন্ত্রে দু'টি ভিন্নধর্মী সুর এবং একই মুখ থেকে দুটো সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী কথা শুনে কে–ইবা প্রভাবিত হতে পারে?

দুই ঃ দল গঠনের ব্যাপারে এ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ আরো বেশী তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। একে তো দাওয়াতের পকৃতি পাল্টে যাওয়ার কারণে আপনা–আপনি দলের কাঠামো বিন্যাস ও তার সাংগঠনিক উপাদান সমূহ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে গেছে। উপরন্তু "মুসলিম জাতীয়তাবাদ" কেন্দ্রিক

১· এর অর্থ এ নয় যে, একটি জাতি অন্য জাতির ওপর যুলুম করলে বা তার অধিকার ক্ষুণ্ন করলে ইসলাম মজলুম জাতির সমর্থন করবে না।বরং প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ এই যে, দুটি জাতির মধ্যে জাতিগত বা দেশভিত্তিক বিরোধ দেখা দিলে ইসলাম তাতে অংশীদার হবে না। যালেমকে সে যালেম বলেই ভৎর্সনা করবে। সে কোন জাতির লোক, সেটা তার বিচার্য বিষয় নয়। অনুরূপ ভাবে মজলুমকে সে শুধু মজলুম বলেই সমর্থন করবে––অমুক জাতির লোক বলে নয়। (পুরানো)

ধ্যান-ধারণা তাদের চিন্তাগত বিভ্রান্তিকে আরো জটীল করে তুলেছে। এসব কারণে তারা ভালো-মন্দ সবধরনের মানুষকে দলভূক্ত করে নেন। আর এ সব লোকের কথায় ও কাজে একই সময়ে রকমারি পরস্পর বিরোধী ব্যাপার সংগঠিত হয়ে থাকে। একটা সুসংহত ও একক বৈশিষ্ট্যধারী আদর্শের পতাকা সমুন্নত করার জন্য আপনি যখন মনস্থির করবেন, তখন অনিবার্যভাবে আপনাকে নিজ দলের জন্য এমন লোকজন বাছাই করতে হবে, যারা নিবিষ্ট চিত্তে ও একাগভাবে উক্ত বিশিষ্ট আদর্শের অনুসারী হবে। পক্ষান্তরে আপনি যখন একটা জগাখিচুরী ধরনের ও অনির্দিষ্ট প্রকৃতির আদর্শের পতাকা উত্তোলনের লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন, তখন আপনার লোক নির্বাচনের মান অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতটা কড়া শর্তযুক্ত ও বিধিবদ্ধ হবে না। যতটা হওয়া দরকার একটা একক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আদর্শকে সমুন্নত করার ক্ষেত্রে। কিছুদিন আগের ঘটনা, ভারতের একটা উঁচু দরের সংগঠনের আঞ্চলিক শাখা গঠনের ব্যাপারে সলপরামর্শ করা হচ্ছিল— এমন একটা বৈঠকে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলাম। কিছুক্ষণ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, সদস্যপদের ফরম ছাপিয়ে নেয়া হবে এবং পনেরো দিনের মধ্যে যতবেশী সম্ভব সদস্য ভর্তি করে সদস্যদের একটা সাধারণ সভা ডেকে কর্মকর্তাদের নির্বাচন করিয়ে নেয়া হবে। ব্যাস, সংগঠনের শাখা হয়ে গেল। এভাবে হরেক ধরনের মানুষ নিছক সদস্য ফরম সই করে বাৎসরিক চার আনা চাঁদা দিয়ে এ সব দলে সমবেত হয়। আর এ সব লোকের ভোটেই নির্বাচিত হয়ে দলের নেতৃত্বদানের গুরুদায়িত্ব বহনকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়। এ ধরনের লোকদের ঐক্যবদ্ধ ইচ্ছা অনুযায়ীই দলীয় নীতি রচিত বা রহিত হয়। দলীয় কাঠামো তৈরীর এ প্রক্রিয়ায় কখনো পূর্ণাঙ্গ ইসলাম কায়েমের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব, এমন আশা করা কি বাতুলতা নয়?

তিনঃ অনুরূপভাবে, তৃতীয় অংশেও তাদের কর্মপদ্ধতি ইসলামের সরল ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। আমি আগেই বলেছি যে, অনৈসলামিক আনুগত্য ব্যবস্থার ওপর ইসলাম প্রত্যক্ষ আঘাত হানে। বিশ্ব প্রভুর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে মানুষের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত হোক--এটাই তার দাবী ও আকাংখা। অথচ আলোচ্য গোষ্ঠীটি ঠিক এর বিপরীত কাজেই নিজেদের চেষ্টা-সাধনাকে নিয়োজিত করে। বৃটিশ শাসনব্যবস্থাকে উৎখাত করে তার স্থলে জনগণের শাসন ও গণসার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার কাজেই তারা আত্মনিয়োগ

করে। ইসলামের সরল সঠিক পথ থেকে এ এক সুস্পষ্ট বিচ্যুতি। এ বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি সম্পর্কে যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তারা বলে যে, বৃটিশের অধীনতা ইসলামের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। আমরা একাকি এ প্রতিবন্ধকতা দূর করতে অক্ষম। তাই আমরা প্রথমে অন্যদের সাহায্যে এ প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করে নিতে চাই। এরপর আসল মঞ্জিলে মকসুদের দিকে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু আমার বুঝে আসে না যে, কাজটা কিভাবে সহজ হবে। এটা সর্বজন বিদিত যে, একটা আনুগত্য ব্যবস্থাকে তথা দীনকে উৎখাত করে, তার জায়গায় অন্য একটা আনুগত্য ব্যবস্থা তথা দীন চালু করা সম্ভবই নয় যতক্ষণ প্রথম ব্যবস্থাটাকে খারাপ মনে করা ও উচ্ছেদ করা এবং দ্বিতীয় ব্যবস্থাটাকে ভাল মনে করা ও প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা ও সংকল্প জনমনে সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দেয়া না হবে। ভারতে বর্তমানে চালু বৃটিশের আনুগত্য ব্যবস্থার পরিবর্তে আপনি যদি এ দেশবাসীর মনোপুত গণতান্ত্রিক আনুগত্য ব্যবস্থা কায়েম করতে চান, তা হলে এ বিপ্লবটা সংগঠিত করার একমাত্র উপায় এই যে, ভারতবাসীর মনে ইংরেজ শাসনের পরিবর্তে তাদের নিজেদের শাসনেরই সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত হওয়ার ধারণা এবং কার্যত দেশের সার্বভৌম কর্তৃত্ব হস্তগত করার সংকল্প পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে জাগিয়ে তুলতে হবে। পক্ষান্তরে আপনি যদি ভারতে আল্লাহর আনুগত্য ব্যবস্থা চালু করতে চান, তা হলে এ বিপ্লবও একমাত্র এভাবেই সংঘটিত করা সম্ভব যে, জনগণকে আপন সার্বভৌমত্ব বর্জন ও আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কোন শক্তির সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, এবং তারপর আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি এত দৃঢ় বিশ্বাস তাদের মনে বদ্ধমূল করে দিতে হবে যেন তারা স্বেচ্ছায় ও স্বাগ্রহে তার সামনে মাথা নুইয়ে দেয়। প্রশ্ন এই যে, আল্লাহর আনুগত্যের সিষ্টেম চালু করা যাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য, তারা সজ্ঞান ও সচেতন অবস্থায় উক্ত উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় হিসেবে গণসার্বভৌমত্বের ধারণা ও ইচ্ছা জাগিয়ে তোলার কৌশল কিভাবে অবলম্বন করতে পারে? জনমনে আপন সর্বভৌম ও স্বেচ্ছাচারমূলক কর্তৃত্বের বিশ্বাস ও সংকল্প এত প্রবলভাবে বদ্ধমূল করা—যাতে তার প্রচন্ডতার প্রভাবে ইংরেজ জাতির গোলামীর মূল উৎপাঠিত হয় এবং তার পরিবর্তে গণকর্তৃত্বের গোলামী প্রতিষ্ঠিত হয়, কোন্ যুক্তিতে ন্যায়সঙ্গত বিবেচিত হতে পারে? যেখানে সর্বস্তরের গণমানুষের মনে এরূপ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল থাকে যে, দেশ

শাসনের ব্যাপারে তাদের মতই চূড়ান্ত এবং তাদের ওপর আর কারো কর্তৃত্ব চলতে পারে না। সেখানে বিশ্বপ্রভুর কর্তৃত্বের সামনে আপন কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের দাবী ত্যাগ করার জন্য তাদেরকে রাজী করা বর্তমান ইংরেজ প্রভুত্বের মূল উৎপাটন করার চাইতে কি কম দুরূহ ব্যাপার? ভারতের মত 'গোলাম' দেশে আল্লাহর শাসন কায়েম করা যত কঠিন, আমেরিকা, জাপান, জার্মানী ও ইংল্যাণ্ডের মত, 'স্বাধীন' দেশে কি তা তার চেয়ে কম কঠিন কাজ। এ প্রশ্নের জবাব যদি নেতিবাচক হয়ে থাকে এবং নিশ্চয়ই তা নৈতিবাচক--তা হলে আমি এ কথা বুঝতে অক্ষম যে, বৃটিশ শাসনের পরিবর্তে ভারতীয় শাসন প্রতিষ্ঠাকে কোন্ হিসাবে আল্লাহর শাসন কায়েমের দিকে এক ধাপ অগ্রগতি বলে মনে করা যেতে পারে?

তথাপি ক্ষণিকের জন্য যদি এ কথা মেনেও নেয়া হয় যে, কার্যত এ কৌশল ফলদায়ক হওয়া সম্ভব, তবুও আমি একে ন্যায়সঙ্গত ও সঠিক বলে মানি না। যে কৌশল ফলদায়ক হয় তা সবসময় ন্যায়সঙ্গতও হবে এটা জরুরী নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ভীষণ নোংরা ও ঘৃণ্য অপকৌশল। একজন মুসলমানের পক্ষে এ ধরনের কৌশল অবলম্বনের কথা কল্পনা করাও অনুচিত। যে ব্যক্তি বাস্তবিক পক্ষে পূর্ণ সততা ও সত্যবাদিতার সাথে আল্লাহকেই সমগ্র বিশ্বভূবনের একচ্ছত্র মালিক বলে বিশ্বাস করে, সে আপন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন্ মুখে এ কথা জনগণের মধ্যে প্রচার করতে পারে যে, তোমরাই এ দেশের নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে একমাত্র আল্লাহর আদেশ নিষেধই অনুসৃত হওয়া উচিত এবং সরকার এমন হওয়াই উচিত যা আল্লাহর কাছে দায়ী হবে, সে ব্যক্তি কেমন করে কামনা করতে পারে যে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে জনগণের আদেশ নিষেধ পালিত হোক এবং সরকার জনগণের কাছে দায়ী হোক? একজন সত্যাশ্রয়ী মানুষ যে ধারণা-বিশ্বাসকে আসলেই বাতিল মনে করে তার সমর্থন বা প্রচার সে কেমন করে করতে পারে? যে জিনিসকে সে অসত্য ও বাতিল মনে করে তার প্রতিষ্ঠার জন্য জান মাল দিয়ে জিহাদ করা তার পক্ষে কিভাবে সম্ভব?

ওপরে যে কথা কয়টি বললাম, তা থেকে প্রমাণিত হলো যে, এ গোষ্ঠীটির অনুসৃত পথ, ইসলামের সঠিক ও সোজা পথের বিপরীত। তবে এ ঘোরালো পথ ধরে তাদের পক্ষে যে ইসলামের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা কখনো সম্ভব নয়, তার প্রমাণ আমার কাছে এই যে, সে সব সমস্যার ভয়ে ভীত

হয়ে তারা বাঁকা ও ঘোরালো পথ অবলম্বন করেছে, তা ভারতের বৃটিশ শাসনমুক্ত হওয়ার পরও যথারীতি বহাল থাকবে। একটু আগে আমি সমস্যাবলীর যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, সেগুলোর প্রতি আর একবার নজর বুলিয়ে নিন। ওগুলোর মধ্য থেকে কোন একটা সমস্যাও কি স্বাধীন ভারতে দূর হবে? যদি না হয়, তা হলে যারা আজ ওসব সমস্যার মোকাবিলা করার কৌশল ও সাহসের অভাবে পথ এড়িয়ে যাচ্ছে, তারা কালও এই একই কারণে আসল ইসলামী লক্ষ্যের দিকে সরাসরি অগ্রসর হতে চাইবে না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, এ লক্ষ্যের দিকে আপনি যখনই অগ্রসর হতে চাবেন, আপনাকে এ সব সমস্যার মুখোমুখি হতেই হবে। যারা এগুলো মোকাবিলা করার কৌশল ও হিম্মত থেকে বঞ্চিত, তারা শুধু বর্তমান পরিস্থিতিতেই নয়, কোন অবস্থাতেই এ পথে অগ্রসর হতে পারবে না। আর যাদের কাছে কৌশল ও সংকল্প দুটোই আছে, তাদের পক্ষে কোন বাঁকা ও ঘোরালো পথে চলা সময়ের অপচয় এবং বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। তারা বরঞ্চ সমস্যার এ পাহাড় কেটে সোজা পথেই আপন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে।

পাকিস্তানবাদী গোষ্ঠী

দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ধাঁচে গঠিত ও পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিত মন-মানসের অধিকারী লোকদের সমষ্টি।[১] এ শ্রেণীটির রাজনৈতিক চিন্তাধারা হুবহু পাশ্চাত্য উৎস থেকে সংগৃহীত। কিন্তু যেহেতু পুরুষাণুক্রমিকভাবে ইসলামের স্বপক্ষে একটা অন্ধ আবেগ তাদের মধ্যে রয়েছে এবং "মুসলিম জাতি" হওয়ার চেতনা তাদের মধ্যে জেগে উঠেছে, তাই তারা "মুসলিম জাতির" নিমিত্ত যা কিছু করতে চায়, তা ইসলামের নামেই করতে উৎসুক। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, তাদের কথা ও কাজে ইসলামী পরিভাষা সমূহ এবং পাশ্চাত্য ধাঁচের চিন্তা ও কর্মপ্রণালী এক আশ্চার্য জগাখিচুড়ীতে পরিণত হয়েছে। এ জগাখিচুড়ীর পর্যালোচনা করে তার প্রতিটা অংশকে আলাদা করে তার উৎস ও স্বরূপ দেখিয়ে দেবো—এ নিবন্ধে আমার তেমন সুযোগ নেই। আলোচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপটে

---

১. নিবন্ধ লেখার সময়ে এ গোষ্ঠীতে উল্লেখযোগ্য আলেমদের সমাবেশ ঘটেনি। পরবর্তীকালে অবশ্য বেশ কিছু সংখ্যক আলেম অন্তর্ভুক্ত হন। তবে তাঁরা এ গোষ্ঠীর অনুসৃত নীতি ও কার্যক্রমের ওপর কখনো প্রভাব ফেলতে পারেননি। (নতুন)

আমি শুধু এই বিষয়টা বিশ্লেষণ করতে চাই যে, প্রথম গোষ্ঠীর মত এ গোষ্ঠীর কর্মপ্রাণালীও সঠিক পথের তিনটি অংশ থেকেই বিচ্যুত।

১· প্রথমে দাওয়াতের কথাই ধরা যাক। তাদের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা ও ভাষণ, তাদের কর্মীদের কথাবার্তা, তাদের লেখক সাহিত্যিকদের লেখা—সব কিছুই সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের দাওয়াত আসলে একটা জাতীয়তাবাদী দাওয়াত। অর্থাৎ তারা ইসলামের মূল লক্ষ্যের দিকে মানুষকে ডাকে না। মুসলমানরা সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে হিন্দু জাতির মোকাবিলায় নিজস্ব পার্থিব স্বার্থ সংরক্ষণ করুক--এটাই তাদের আহবান। যারা হিন্দু মুসলিম সম্মিলিত জাতীয়তার ভিত্তিতে ভারতকে আগে স্বাধীন করতে চায়, তারা যেমন ইংরেজদেরকে আপন জাতীয় প্রতিপক্ষ মনে করে নিয়েছে, ঠিক তেমনি এ গোষ্ঠীটি হিন্দুদেরকে আপন জাতীয় প্রতিপক্ষ ধরে নিয়েছে। এ দিক থেকে তারাও সম্মিলিত "স্বাধীনতাকামীরা" একই পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু একটা কারণে এ গোষ্ঠীর কার্যকলাপ প্রথমোক্ত গোষ্ঠীর তুলনায় ইসলামের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিয়েছে। সে কারণটি এই যে, পূর্বোক্ত গোষ্ঠী তো স্বদেশ ও স্বদেশী স্বার্থের খাতিরে সংগ্রামে লিপ্ত। কিন্তু এ গোষ্ঠী নিজের জাতীয় ও দুনিয়াবী স্বার্থে বারবার ইসলাম ও মুসলমানের নাম উল্লেখ করে থাকে। আর এ জন্য অনর্থক ইসলাম একটা যুদ্ধের প্রতিপক্ষ হয়ে পড়েছে এবং অমুসলিম জাতিগুলো ইসলামকে নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শত্রুরূপে গণ্য করতে আরম্ভ করেছে। এভাবে তারা শুধু যে ইসলামের দিকে সর্বস্তরের মানুষকে দাওয়াত দেয়ার অযোগ্য হয়ে পড়েছে, তা নয় বরং ইসলামের প্রসারের পথে তা একটা মস্ত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এর এমন মারাত্মক ফল হয়েছে যে, অন্য মুসলমানরা যদিও কাজ করতে চায়, তবে অমুসলিমদের মনকে ইসলামের জন্য অর্গলবদ্ধই দেখতে পাবে।

এ কথা অস্বীকার করা যায়না যে, এ গোষ্ঠীটি আপন জাতীয়তাবাদী প্রচারণার পাশাপাশি কখনো কখনো ইসলামের সুমহান গুণাবলী ও তার মূলনীতিসমূহের মাহাত্ম্যও বর্ণনা করে থাকে। কিন্তু প্রথমত জাতীয়তাবাদের পটভূমিতে এ জিনিসটা একটা আদর্শবাদী দাওয়াতের পরিবর্তে নিছক একটা জাতীয় অহংকারে পরিণত হয়। তদুপরি ইসলামের দাওয়াতের সাথে তারা ঐ দাওয়াতের সম্পূর্ণ বিরোধী কতকগুলো জিনিসের মিশ্রণ ঘটায়। এক দিকে তারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রচার করে। অপর দিকে, সম্পূর্ণ অনৈসলামিক

শাসন ব্যবস্থায় পরিচালিত "মুসলিম" দেশীয় রাজ্য ও সরকারকে সমর্থন করে। এক দিকে ইসলামী অর্থনীতির ব্যাখ্যা দেয়, অপরদিকে আপন জাতিভুক্ত ধনাঢ্য কারুণদের পক্ষ সমর্থন করে। এক দিকে মানুষের আইন রচনার বিরোধিতা করে। অপর দিকে প্রচলিত আইনসভা গুলোতে আপন কোটার দাবী জানায়। এক দিকে বিশ্ব প্রভুর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেয়। অপরদিকে গণসার্বভৌমত্বের মতবাদের ভিত্তিতে নিজেদের জাতীয় সরকার গঠনের চিন্তা-ভাবনা করে। এক দিকে মানুষের বংশগত, জাতিগত ও ভৌগলিক বিভক্তির বিরোধিতা করে। অপর দিকে অব্যাহতভাবে জাতিগত ধুয়া তোলে ও জাতীয়তার মতাদর্শের আলোকে অন্যান্য জাতির সাথে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে লিপ্ত হয়। এক দিকে নিঃস্বার্থ সত্যনিষ্ঠার দাবীদার সাজে। অপর দিকে দিবারাত্র আপন পার্থিব স্বার্থের জন্য আহাজারী করে। এক দিকে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য গর্ব জাহির করে ও তার হেফাজতের জন্য সোচ্চার আন্দোলন করে। অপর দিকে সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিনাশ সাধনকারী ও বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেয়। এ দুটো বেখাপ্পা জিনিস কিভাবে খাপ খেয়ে চলতে পারে? "মদের বিরোধিতা করবো আবার মাতালদের সাথে মিতালীও করবো" এমন পরস্পর বিরোধী আচরণ দ্বারা দুনিয়ার মানুষ কখনো কি অভিভূত হয়েছে যে, আজ ঐ ধরনের আচরণ দ্বারা ইসলামের পতাকা ওড়ানোর আশা করা হচ্ছে?

২· এ শ্রেণীর লোকেরা কি পদ্ধতিতে দল গঠন করে সেটাও খতিয়ে দেখুন। জন্মগতভাবে মুসলমান—এমন প্রত্যেক লোককেই তারা সদস্য হবার আহবান জানায় এবং এ আহবানে যে ব্যক্তিই সাড়া দেয় তাকে তারা প্রাথমিক সদস্য বানায়। অতপর এ সব প্রাথমিক সদস্যদের ভোটেই কর্মকর্তা ও দায়িত্বশীল নির্ধারিত হয় এবং তাদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা হয়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ কর্মপন্থা শুধুমাত্র জাতীয় সংগঠনের জন্যই মানানসই হতে পারে। আর এ পদ্ধতিতে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, তাতে একটি জাতির আশা-আকাংখা যে ধরণেরই হোক না কেন, তা অর্জনের চেষ্টা করা ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকে না। একটা আদর্শবাদী আন্দোলন পরিচালনার জন্য দল গঠনের এ পদ্ধতি শুধু যে নিষ্ফল তা নয়, বরং ক্ষতিকরও। জন্মগতভাবে মুসলমান হওয়ার কারণে একটি জাতির সকল লোককে সত্যিকার মুসলমান বলে গণ্য করা এবং তাদের সম্মিলিত উদ্যোগে যে কাজই হবে, তা ইসলামী আদর্শেরই অনুসারী

হবে,এ রূপ মনে করা প্রাথমিক ও মৌলিক ভ্রান্তি। মুসলিম জাতি নামে অভিহিত এ বিশাল জনগোষ্ঠীটির অবস্থা এরূপ যে, তার হাজারে ৯৯৯ জন লোকই ইসলামের কোন জ্ঞানই রাখে না, হক ও বাতিল এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য কি তাও জানে না, আর তাদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানসিকতাও ইসলামের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়নি। পিতা থেকে পুত্র এবং পুত্র থেকে পৌত্র কেবল মুসলমানী নাম পুরুষাণুক্রমিকভাবে পেয়ে এসেছে বলেই তারা মুসলমান। তারা সত্যকে সত্য জেনে তা গ্রহণও করেনি, বাতিলকে বাতিল জেনে তা পরিত্যাগও করেনি। এ ধরনের মানুষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের কাছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পণ করে কেউ যদি আশা পোষণ করে যে, গাড়ীটা ইসলামের লক্ষ্য পানেই ধাবিত হবে, তা হলে তার আকাশ কুসুম কল্পনাকে অভিনন্দন জানাতে হয় বৈ কি।

৩. এবার আসুন, যে পদ্ধতি অনুসরণ করে তারা আপন খেয়াল মোতাবেক ইসলামী লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার আশা পোষণ করছে, সে পদ্ধতিটা একটু পর্যালোচনা করা যাক। তাদের প্রস্তাব এই যে, ইংরেজ সরকার যে গণতান্ত্রিক সংবিধান এখানে চালু করতে চায়, প্রথমে তা মেনে নিয়ে মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের নিজস্ব সরকার কায়েম হতে দেয়া হোক। অতপর এ জাতীয় সরকার যাতে পর্যায়ক্রমে ইসলামী সরকারে রূপান্তরিত হয় সে জন্য চেষ্টা করা হবে।[১] কিন্তু আসলে প্রথমে "ভারতের স্বাধীনতা" কামনাকারীদের বিভ্রান্তির মতই এটাও একটি বিভ্রান্তি। প্রথম গোষ্ঠীর প্রস্তাবে আমার যে আপত্তি, এ গোষ্ঠীর প্রস্তাবেও তাই। তাদের

---

১. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুসলিম লীগের কোন প্রস্তাবে এবং লীগের কোন দায়িত্বশীল নেতার ভাষণে আজ পর্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েম করাই তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। বরঞ্চ তারা বারংবার এ কথাই বলেছেন যে, তারা এমন একটা গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চান, যাতে অমুসলিমরাও অংশ নেবে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে মুসলমানদের অংশই প্রাধান্য পাবে। অন্য কথায়, মুসলিম সংখ্যাগুরু অধ্যুসিত প্রদেশগুলোর হিন্দু শাসন থেকে মুক্ত হওয়াতেই তারা পরিতুষ্ট। পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থা ভারতের মতই হবে। যখন আপত্তি তোলা হলো যে, ইসলামের দৃষ্টিতে অমুসলিমদের অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থার চাইতে মুসলমানদের অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থা কোনভাবেই উৎকৃষ্টতর নয় বরং অধিকতর ধিক্কারযোগ্য, তখন দায়িত্বশীল নেতারা কোন জবাবই দেননি। তবে পাকিস্তান পন্থীদের সর্বশেষ কাতারের লোকেরা, যারা আদৌ দায়িত্বশীল নন, তারা বললেন যে, মুসলিম সংখ্যাগুরুদের হাতে ক্ষমতা এলে আমরা শাসন ব্যবস্থা বদলাবার চেষ্টা করবো। উল্লেখ্য যে, এ নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত এ অবস্থাই বিরাজ করছিল। (নতুন।)

এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলোতে গণসার্বভৌমত্বের মতাদর্শের ভিত্তিতে স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। প্রস্তাবিত পাকিস্তানে যে ধরনের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিদ্যমান এ ধরণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তো আফগানিস্তান, ইরাক, তুরস্ক ও মিশরেও রয়েছে। বরঞ্চ সেখানে মুসলমানদের আরো বেশী সংখ্যাধিক্য বিদ্যমান। এখানে যে 'পাকিস্তান' চাওয়া হচ্ছে, তা ওসব দেশে আগে থেকেই রয়েছে। সেখানে মুসলমানদের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পথ কি মোটেই সুগম হয়েছে বা হবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায়? সুগম হওয়া দূরে থাক, আমি জিজ্ঞেস করি, আপনি সেখানে ইসলামী শাসনের কথা প্রচার করে ফাঁসি অথবা দেশান্তরের চেয়ে কম কোন শাস্তি পাওয়ার আশা করতে পারেন কি? আপনি যদি সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থেকে থাকেন, তা হলে এ প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব দেয়ার সাহস দেখাতে পারবেন না।

বস্তুত পরিস্থিতি যখন এই, তখন আপনাকে ভেবে দেখতে হবে যে, মুসলিম জাতির এ সব স্বাধীন সরকার কোন কারণে ইসলামী বিপ্লবের পথে অন্তরায়? এ বিষয়ে আপনি যতই চিন্তা-গবেষণা চালাবেন, এ প্রশ্নের একমাত্র জবাব এটাই পাবেন যে, আসলে প্রচলিত ভাষায় এবং জন্মগতভাবে মুসলমান হওয়া আর জীবন যাপনের পদ্ধতি এবং জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইসলামী হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। যারা চিন্তায় ও চরিত্রে মুসলমান নয়, বরং নিছক পারিভাষিক ও বংশগতভাবে মুসলমান, তারা যদি বাইরের কারো প্রভাব বিস্তার অথবা ক্ষমতা প্রয়োগে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করেও বসে এবং মুসলিম জনসাধারণ যদি আপন পসন্দ মাফিক সরকার গঠনের অবাধ অধিকার পেয়েও যায়, তাহলেও ইসলামী শাসন কায়েম হওয়া সম্ভব নয়। কারণ তারা আপন পার্থিব স্বার্থের পূজারী হয়ে থাকে। সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে নিজস্বার্থ বিসর্জন দেয়ার ক্ষমতা তো তাদের থাকেই না। বরঞ্চ যখনই তাদের পার্থিব স্বার্থের সাথে সত্য ও ন্যায়ের সংঘাত বাধে, তখন তারা ন্যায়ের পক্ষ ত্যাগ করে যেদিকে গেলে তাদের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার হবে, সে দিকেই যায়। যেখানে এ ধরনের স্বার্থান্ধ ও সুবিধাবাদী অসৎ চরিত্রের লোকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে, সেখানে সাধারণ নির্বাচনে জনগণের ভোটে, আর যাই হোক, নবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শাসন পরিচালনাকারী সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ লোকেরা কখনোই নির্বাচিত হবে না। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ব্যাপারটা দুধ মন্থন করে

মাখন বের করার সাথে তুলনীয়। দুধ যদি বিষমিশ্রিত হয়ে থাকে, তা হলে মাখন যে দুধের চেয়েও বিষাক্ত হবে, এটাই স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে, সমাজ যদি বিকারগ্রস্ত হয়, তাহলে তার ভোটে সে সব লোকই ক্ষমতায় আসবে, যারা উক্ত সমাজের বিকৃত রুচী ও প্রবৃত্তির অনুমোদন লাভ করতে পারবে। অতএব, যারা ভাবে যে, মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চলসমূহ হিন্দু সংখ্যাগুরুর শাসন থেকে মুক্ত হলে এবং সেখানে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চালু হলে আপনা থেকেই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তাদের ধারণা ভুল। আসলে এর পরিণতিতে মুসলমানদের কুফরী শাসন ছাড়া আর কিছু লাভ হবে না। একে ইসলামী শাসন নামে নামকরণ করা এ পবিত্র নামের অবমাননারই শামিল।

এ কথা অবশ্য সত্য যে, জনগণের নৈতিক ও মনস্তাত্বিক প্রশিক্ষণ দ্বারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দ্বারা এবং তাদের মানসিকতায় বিপ্লব সৃষ্টির মাধ্যমে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ ধরনের নৈতিক ও মানসিক বিপ্লব সৃষ্টিতে মুসলমানদের অনৈসলামিক সরকার কি আদৌ সহায়ক হবে? যারা বর্তমান বিকৃত ও বিপথগামী সমাজে বস্তুগত স্বার্থের আবেদন জানিয়ে ক্ষমতালাভে সফল হবে, তারা সরকারের অর্থ, উপায় উপকরণ ও ক্ষমতা জনগণের মানসিকতা পরিবর্তন ও তাদেরকে ইসলামী শাসন কায়েমের জন্য প্রস্তুত করার কাজে নিয়োজিত কোন আন্দোলনের সহায়তা-সহযোগিতায় ব্যয় ও প্রয়োগ করবে, এমন আশা কখনো করা যায় কি? সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা উভয়ের আলোকেই এর জবাব নেতিবাচক ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। বরঞ্চ সত্য কথা এই যে, এসব লোক এ বিপ্লবের সহায়তা করার পরিবর্তে উল্টো তার পথ রোধ করবে। কেননা তারা এটা ভালো করেই জানে যে, জনগণের মানসিকতায় যদি পরিবর্তন আসে, তা হলে সেই পরিবর্তিত সমাজে তাদের আর কোন উপযোগিতা ও কদর থাকবে না। শুধু তাই নয়, এর চেয়েও ভয়ংকর ব্যাপার এই যে, মুসলিম নামধারী হওয়ার কারণে তারা অমুসলিমদের তুলনায় অধিকতর নির্ভিকতা ও ধৃষ্টতা সহকারে ইসলামী শাসন কায়েমের যে কোন চেষ্টাকে বানচাল করবে। আর তাদের ইসলামী নাম এ জুলুমকে গোপন করার জন্য যথেষ্ট হবে। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি ইসলামী বিপ্লবের আকাংখা পোষণ করে এবং সে জন্য এ ধরনের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নিয়োজিত হয়—যা যে কোন অমুসলিম সরকারের চেয়েও অধিকতর ঔদ্ধত্য সহকারে এ লক্ষ্য অর্জনের পথ রোধ করবে,—সে ব্যক্তি নির্বোধ নয় কি?

ইসলামকে বিকৃত করার প্রস্তাব

এবার তৃতীয় গোষ্ঠীটার কথায় আসা যাক। এরা নানা ধরনের প্রস্তাব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে। কেউ কেউ ইসলামী মতবাদের সাথে অনৈসিলামিক মতবাদের জোড়াতালি লাগিয়ে একটা নতুন "মজাদার" খিচুড়ি তৈরী করার ইচ্ছা পোষণ করছে। "ভারতীয় ইসলাম" নামে এর একটা নতুন সংস্করণ বের করার কথাও কেউ কেউ ভাবছে। আবার কারো কারো বাসনা যে, ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থার মধ্য থেকে শুধু তার অর্থনৈতক ও রাজনীতিক মূলনীতিগুলো গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে এমন একটা নতুন রাজনৈতিক দল বানানো হোক, যাতে যোগদান করতে আকীদা–বিশ্বাস, ইবাদাত ও শরীয়াতের নির্দেশাবলী পালন করার বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এ সকল লোক নিজ ধারণামতে অত্যন্ত সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মনে করছে যে, কিছু লোকের মনে ইসলামের প্রতি যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে, তা এ উপায়ে ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। এভাবে তারা যখন ইসলামের কিছু অংশের প্রতি খানিকটা আকৃষ্ট হবে, তখন পূর্ণ ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়তে আর দেরী হবেনা।

কিন্তু আসলে এ সবই ভ্রান্ত ধারণা। নীতিগতভাবে যেমন একে সঠিক বলা যায় না, তেমনি বাস্তবতার বিচারেও এর কোন মূল্য নেই। আমার মতে এ জাতীয় সকল প্রস্তাব মন ও মস্তিষ্কের দুর্বলতার ফল।

নীতিগতভাবে আসলে ইসলামে কোন রদবদল, হ্রাসবৃদ্ধি এবং কোন পরিবর্তন ও সংশোধনের অধিকার আমাদের নেই। আমরা ইসলামের মালিক মোক্তার নই, তার প্রস্তুতকারক ও রচয়িতাও নই। ইসলাম আমাদের পণ্য নয় যে, বাজারে যেমন চাহিদা থাকে, সে অনুসারে এ পণ্য দ্রব্যকে প্রস্তুত করে বাজারজাত করবো। আমরা এর শুধু অনুসারী ও প্রচারক। ইসলামের যিনি মলিক। তিনি আকীদা, ইবাদাত ও আইন বিধানের এ পূর্ণ সমষ্টিকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন আমরা নিজেরাও যেন এর অনুসরণ করি আর অন্যদের কাছেও যেন তা প্রচার করি ও পৌঁছাই। এ সার্বিক জীবন বিধানে কোন সংশোধনী প্রয়োগ অথবা তার আসল স্বরূপ পাল্টে তাকে অন্য কোন রূপ দেয়ার আমাদের কোনই অধিকার নেই। এ বিধান যদি কারো নিতে হয় তবে তাকে এর পুরোটাই নিতে হবে এবং মালিক যেভাবে দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই নিতে হবে। যে ব্যক্তি এ পূর্ণাঙ্গ বিধানকে তার নির্দিষ্ট আকারে নিতে

রাজী হবে না, তাকে তোষামোদ করা এবং কম বা বেশী নিতে রাজী করার কোন দরকার নেই। ইসলাম হলো স্রষ্টার পক্ষ থেকে সৃষ্টির প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ। সৃষ্টিকে তোষামোদ করা ও রাজী করা স্রষ্টার কাজ নয়। সৃষ্টির কাজ হলো তার নির্দেশ হুবহু মেনে নিতে হবে। নচেত তার নিজেরই ক্ষতি হবে, স্রষ্টার কোন ক্ষতি সে করতে পারবে না। এ জন্য আল্লাহর তরফ থেকে যেসব রসূল দুনিয়ায় এসেছেন, তারা সকলেই আল্লাহর পুরো নির্দেশ হুবহু মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং সাফ সাফ বলে দিয়েছেন যে, ইচ্ছা হয় এটি নিয়ে নাও, ইচ্ছা হয় প্রত্যাখান কর। কিন্তু তোমাদের ইচ্ছামত এ বিধানে রদবদল করা যাবে না। রসূলের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের দায়িত্বও অনুরূপ।

ইসলামের সামগ্রিক বিধান থেকে শুধু তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূলনীতিগুলো গ্রহণ করা এবং তার ভিত্তিতে এমন একটা রাজনৈতিক দল গঠন করা যাতে যোগদান করার জন্য তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত কোনটার ওপরই ঈমান আনার প্রয়োজন হবে না এবং আনুষ্ঠানিক ইবাদাত ও শরীয়াতের বিধি-বিধান পালন করার কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না--এটা কত বড় অযৌক্তিক প্রস্তাব, একবার ভেবে দেখুন তো। প্রশ্ন এই যে, কোন কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ কি এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারে যে, একটা সামাজিক মতাদর্শ ও কর্মসূচীকে তার মৌল দর্শন তার নৈতিক বিধান এবং তার চরিত্র গঠনকারী মৌলিক উপাদানগুলো থেকে আলাদা করে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব? আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণা বাদ দেয়ার পর ইসলামের রাজনৈতিক বিধান বলতে আর কোন্ জিনিস অবশিষ্ট থাকে? কুরআনকে যদি আইনের উৎস না মানা হয় আর আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (সা)-কে রাজা (আল্লাহ) ও প্রজার (মানুষ) মধ্যে আদেশ জারী করার একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করা না হয়, তা হলে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা হবে কি বায়ুমন্ডলে? তাছাড়া এমন কোন একটি সামাজিক ও রাজনৈতক ব্যবস্থারও নাম উল্লেখ করা যাবে কি, যা কোন নৈতিক বিধানের সাহায্য ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম? যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপরেখা ইসলাম দিয়েছে, তা থেকে আল্লাহর কাছে মানুষের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহির অনুভূতি বাদ দেয়ার পর তাকে নৈতিক সহায়তা যোগানোর আর কোন উপায় অবশিষ্ট থাকে কি? নিছক বস্তুবাদী নৈতিক ধারণা বিশ্বাসের ভিত্তিতে এ বিধানকে কি একদিনের জন্যও কায়েম করা সম্ভব? যে বিশেষ ধরনের ব্যক্তিগত চরিত্র ও সামষ্টিক চরিত্র ইসলামী রাজনীতি ও তামাদ্দুনের

জন্য প্রয়োজন, তা নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ছাড়া আর কিসের মাধ্যমে তৈরী হতে পারে? আর সেই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চরিত্র তৈরী না হলে ইসলামী রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা কিভাবে চলতে পারে? সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি কেবল ডালপালার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বলে যে, এস, মূলের দরকার নেই, এ ডালপালা দিয়েই গাছকে প্রতিষ্ঠিত করি, তা হলে তা হবে শোচনীয় চিন্তাগত দৈন্যদশারই পরিচায়ক।

বাস্তবতার বিচারেও এ ধরনের যাবতীয় প্রস্তাব আগাগোড়া ভ্রান্ত। এর সাহায্যে আসল লক্ষ্যে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, পথিমধ্যে আমরাই হারিয়ে যেতে পারি, এমন আশংকা রয়েছে। রদবদল ঘটিয়ে যে তথাকথিত ইসলাম প্রচার করা হবে, একদিন সেটাই হয়ে দাঁড়াবে আসল মানদন্ড। যারা এ উদ্ভট ইসলামের প্রতি ঈমান এনে ইসলামী দলে যোগদান করবে তারা প্রকৃত ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে কখনো রাজী হবে না। এমনকি যেসব সুবিধাবাদী মুসলমান তাদের সাথে কমবেশী করার ব্যাপারে আপোষ রফা করেছিল, তারাও গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে যাবে। বস্তুত যে কাজ আপোষবাদী নীতির ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়, তাতে সব সময়ই এ ত্রুটিটা বিদ্যমান থাকে।

৬—সমস্যাবলীর পর্যালোচনা

যে সমস্যাগুলো দেখে ঘাবড়ে গিয়ে এ সব বাঁকা পথ অবলম্বন করা হচ্ছে, এবারে আসুন তার পর্যালোচনা করে দেখা যাক। আসলে এ সমস্যাগুলো কি এতই জটীল যে, তার সমাধান সম্ভব নয়?

পুনরাবৃত্তি থেকে বাঁচার জন্য আমি পাঠকগণকে আর একবার এতটুকু কষ্ট দিতে চাই যে, আলোচ্য নিবন্ধের ইতিপূর্বেকার যে অংশটিতে আমি এ সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করেছি তার ওপর আর একবার নজর বুলিয়ে নিন।

প্রথম সমস্যা

প্রথম সমস্যার সার সংক্ষেপ এই যে, ইসলাম শুধু সামাজিক–সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিয়েই ক্ষ্যান্ত থাকে না বরং সে সাথে সেই আকীদা–বিশ্বাস, আনুষ্ঠানিক ইবাদাত ও শরীয়াতের বিধি–নিষেধের একটা সমষ্টিও দেয় এবং তা গ্রহণ করার অর্থ হলো মানুষের

গোটা জীবনই পাল্টে যাওয়া। বলা হয় যে, এ জিনিসটা অন্যান্য আন্দোলনের মত দ্রুত প্রসারিত হতে বাধা দেয়। কিন্তু এ সমস্যাটা বাহ্যতঃ যতখানি জটীল মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে তা ততখানিই দুর্বল ও অসার।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, পৃথিবীতে কোন মতবাদ ও মতাদর্শ এমন নেই, যা বিচ্ছিন্নভাবে শুধুমাত্র বাস্তব সমস্যাবলীর সমাধান পেশ করে এবং নিজস্ব কিছু আকীদা-বিশ্বাস ও বিশেষ দর্শনের অধিকারী নয়। কতকগুলো ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক একটা কিছু মত অবলম্বন করা, মানুষের জন্য কর্মসূচী প্রণয়নে বদ্ধপরিকর যে কোন মতাদর্শের জন্য অপরিহার্য। আমাদের চার পাশের এ বিশ্ব প্রকৃতির অবকাঠামোটা কি ধরনের? এ অবকাঠামোতে মানুষ কোন্ পর্যায়ে রয়েছে? মানুষের জীবনের শেষ পরিণতি কি? জগতের সবকিছু তো মানুষের জন্য, কিন্তু স্বয়ং মানুষ কার বা কিসের জন্য? এ প্রশ্নগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো মানবজীবনের মৌলিক জিজ্ঞাসা। এসব জিজ্ঞাসার একটা কার্যকর সুরাহা (Workable Solution) না করে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক, শিক্ষাগত, ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা তৈরি করাই সম্ভব নয়। আর কোন মানুষ কোন বিধি-ব্যবস্থার শুধুমাত্র বাস্তব ও কর্মগত দিকগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেনা, যতক্ষণ সেই সাথে তার মৌলিক দর্শন তথা তার আকীদা-বিশ্বাস কে গ্রহণ না করে। সুতরাং একটা বিশ্বাসগত কাঠামো থাকা কেবল ইসলামেরই একক বৈশিষ্ট্য নয়। এদিক থেকে ইসলামের পথে যদি কোন সমস্যা অন্তরায় হয়ে থাকে, তবে এ ধরনের সমস্যা প্রত্যেক সামাজিক বিধানের পথেই অন্তরায়। প্রত্যেক সামাজিক বিধান কার্যত একটা ধর্মই বটে। এ ধরনের যে কোন বিধানকে মেনে নেয়া ধর্মান্তরিত হওয়ারই শামিল। কেউ যদি এরূপ বিধানের আনুগত্য অবলম্বন করার পরও সরলতার কারণে মনে করে এবং বলে যে, আমি আমার আগের ধর্মেই বহাল আছি, তবে তাতে কিছু এসে যায় না।

আমি একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে এ বিষয়টা আরো পরিষ্কার করে দিচ্ছি। কম্যুনিজম আপনার চোখের সামনেই রয়েছে। একেই উদাহরণ হিসেবে নিন। ইসলাম যেমন এক অতিন্দ্রীয় তত্ত্ব—এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর অস্তিত্ব ঘোষণার মধ্যে দিয়েই নিজ আদর্শের সূচনা করে, তেমনি আল্লাহর অস্তিত্ব নেই অথবা থাকলেও তা আমাদের জন্য নিষ্প্রয়োজন—এই তত্ত্ব থেকেই কম্যুনিজমের যাত্রা শুরু হয়। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী এই যে, এ পৃথিবীটা আল্লাহরই সাম্রাজ্য এবং এখানে মানুষ তারই শাসনাধীন প্রজা। পক্ষান্তরে

কম্যুনিজমের বক্তব্য এই যে, এ পৃথিবীটা নিছক ঘটনাক্রমে সংঘটিত ও আপনা আপনি সৃষ্ট একটা স্থান এবং মানুষ এখানে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও স্বয়ম্ভর (Independent)। ইসলামের বক্তব্য যেখানে এই যে, এখানে মানুষের কাজ করার জন্য আল্লাহর হেদায়াত প্রয়োজন এবং তা ওহির মাধ্যমে এসে থাকে, সেখানে কম্যুনিজমের বক্তব্য এই যে, কোন হেদায়াতেরও প্রয়োজন নেই, কোন ওহিও আসে না। যেখানে ইসলামের যাত্রা শুরু হয় এই বিশ্বাস থেকে যে, এ জীবনের পর আর একটা জীবন আছে এবং সেখানে মানুষকে বর্তমান জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপের হিসেব দিতে হবে, সেখানে কম্যুনিজমের যাত্রা আরম্ভ হয় ঠিক তার বিপরীত বিশ্বাস থেকে যে, এ জীবনই সব কিছু এবং এর পরে আর কোন হিসেব নিকেশের বালাই নেই। এখন ভেবে দেখুন, উভয় তত্ত্বই ইন্দ্রিয়ের নাগালের বাইরের অতি প্রাকৃতিক তত্ত্ব। দুটোর কোনটাই চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করা বা বস্তুগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সম্ভব নয়। এখন গতকাল পর্যন্ত যারা কম্যুনিষ্ট ছিল না তারা যদি কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ছাড়াই শুধুমাত্র যুক্তি এবং হৃদয়ের সাক্ষ্য ও প্রত্যয় দ্বারা কম্যুনিজমের ধারণা-বিশ্বাসকে গ্রহণ করতে পারে, তা হলে প্রশ্ন জাগে যে, আজ যারা মুসলমান নয়, তাদের পক্ষে আগামী কাল ওদুটো জিনিসের ভিত্তিতে অর্থাৎ যুক্তি ও প্রত্যয়ের আলোকে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীকে মেনে নেয়া সম্ভব হবে না কেন?

অনুরূপভাবে একজন পথপ্রদর্শক বা নেতার ওপর আস্থা স্থাপন করা উভয় মতাদর্শেরই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য। মুসলমান হওয়ার জন্য যদি আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান আনা অপরিহার্য হয়ে থাকে, তবে একজন কম্যুনিষ্টও মার্কসের ওপর ঈমান এনে থাকে। এক ব্যক্তি গতকাল পর্যন্ত মার্কসবাদী না থাকা সত্ত্বেও আজ মার্কসের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে যদি তাকে নিজের নেতা ও পথপ্রদর্শক মেনে নিতে পারে, তা হলে কাল পর্যন্ত যে ব্যক্তি মুসলমান ছিল না, সে আজ আল্লাহর রসূলের আদর্শ জীবন, শিক্ষা ও কর্ম দেখে তাকে নিজের নেতা ও পথপ্রদর্শক মেনে নেবে, এতে বাধা কোথায়?

দলীয় শৃংখলার (Party Disciplin) ব্যাপারটাও একই রকম। ইসলাম যদি স্বীয় দল বা সমাজভুক্তদেরকে কিছু আইনশৃংখলার অনুগত বানায়, তা হলে কম্যুনিষ্ট পার্টি কি তার দলভুক্তদেরকে নিজস্ব কিছু বিধি-নিষেধের আওতায় নিয়ে আসে না, যখন বহুলোক কম্যুনিজমের মতাদর্শে

বিশ্বাস স্থাপন করার পর কম্যুনিষ্ট পার্টির বিধি-বিধান বাস্তবায়িত করতে সম্মত হয়। তখন একমাত্র ইসলামের সামাজিক ও দলীয় বিধিমালাতে কোন্ জুজু লুকিয়ে রয়েছে যে, ইসলামের আদর্শকে জেনে বুঝে যারা তার প্রতি ঈমান আনতে প্রস্তুত হবে, তারা ঐ জুজু দেখামাত্রই সটকান দেবে?

এ উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বে বিশ্বাস আখেরাত ও নবীর অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব (Indisputable Leadership) ও কুরআনকে খোদায়ী হেদায়াতের সর্বশেষ উৎস হিসেবে বিশ্বাস করার অপরিহার্যতা এবং নামায, রোযা, হজ্জ্ব ও যাকাতের বিধির আনুগত্য ফরয হওয়া কাষ্মিনকালেও এমন কোন ব্যাপার নয় যে, এগুলোর প্রচার ও প্রসার এবং অমুসলিমদের এদিকে আকৃষ্ট হওয়ার পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়াবে। অতিন্দ্রীয় বিশ্বাস এবং সামাজিক রীতিনীতি অন্যান্য ধর্মে বা মতাদর্শেও রয়েছে। যে সকল মানুষ এ সব মতাদর্শে নিজেদের জীবনের সমস্যাবলীর সমাধানকে নিজের বুঝ অনুসারে সঠিক বলে অনুধাবন করতে পারে। তারা এর আকীদা-বিশ্বাস ও বিধি-বিধান উভয়টাই গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং ইসলাম যদি তাদের সামনে জীবন সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান দেয় এবং তাদের সাফল্য ও সৌভাগ্যের পথ স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়, তাহলে আকীদা-বিশ্বাস ও বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতা কেবলমাত্র ইসলামের ব্যাপারেই তাদের জন্য অস্বাভাবিক বাধা হয়ে দাঁড়াবে, এর কোনই কারণ নেই। বাধা যদি থেকে থাকে তবে প্রকৃতপক্ষে তা শুধু এতটুকুই যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে আপন পুরানো মতাদর্শ ত্যাগ করে নতুন মতাদর্শ গ্রহণ করা সাধারণত খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু যে আন্দোলন সারা দুনিয়ায় বিস্তৃতি লাভ করে, তাকে এ বাধার সম্মুখীন না হয়ে উপায় নেই। যারা কোন আন্দোলনের আনুগত্য করার সিদ্ধান্ত নেয়, তারা এ বাধা অতিক্রম করেই সামনে অগ্রসর হয়ে থাকে। সামনে বাধা দেখে যারা পথ পাল্টাতে চেষ্টা করে হয় তাদের ঈমানের দাবী মিথ্যা, নচেত তারা ভীরু ও অকর্মণ্য।

তবে ইসলামের ক্ষেত্রে এ বাধাটা আরো কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে এ জন্য যে, আমরা ইসলামের নামে একটা প্রাণহীন ও জমাট ধর্মাচারের অনুসারী হয়েপড়েছি।

এই প্রাণহীন ধর্মাচারের সর্ব প্রথম মৌলিক ত্রুটি এই যে, এতে ইসলামের আকীদা ও বিশ্বাসকে নিছক একটি ধর্মের (Religion)

অতিপ্রাকৃতিক ধ্যান–ধারণা (Dogmas) বানিয়ে রাখা হয়েছে। অথচ আসলে তা একটা পূর্ণাঙ্গ সমাজ দর্শন ও পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা কঠামোর যৌক্তিক ভিত্তি। অনুরূপভাবে এর ইবাদাত সমূহকেও নিছক পূজা ও উপাসনায় পরিণত করা হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ সব ইবাদাত ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মানসিক ও নৈতিক ভিত্তিসমূহকে মজবুত করার হাতিয়ার। ইসলামকে বিকৃত করার এ প্রক্রিয়ার ফল এ দাঁড়িয়েছে যে, একটা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার জন্য এ আকীদা ও ইবাদাত সমূহের কি প্রয়োজন। তা সাধারণ মানুষের কিছুতেই বুঝে আসে না।

এই বিকৃত ধর্মাচারের দ্বিতীয় মৌলিক গলদ এই যে, এতে ইসলামী শরীয়াতকে একটা যুক্তিহীন ও জমাট ধর্মশাস্ত্র করে রাখা হয়েছে। ইসলামের শাশ্বত মূলনীতির আলোকে যুগ সমস্যার সমধান খুঁজে বের করার জন্য নিরন্তর চিন্তা–গবেষণা পরিচালনার যে প্রক্রিয়া ইজতিহাদ নামে খ্যাত, তা শত শত বছর ব্যাপী পরিত্যক্ত হয়ে রয়েছে। আর এ কারণে ইসলাম একটা জীবন্ত আন্দোলন না হয়ে নিছক অতীতের স্মৃতি হিসেবে বেঁচে রয়েছে এবং ইসলামের শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যাদুঘরে পরিণত হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ লোকরা এ অবস্থা দেখে বড়জোর ঐতিহাসিক রুচিবোধের কারণে এর গুরুত্ব উপলব্ধির বহিপ্রকাশ ঘটাতে পারে। কিন্তু বর্তমানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা এবং ভবিষ্যতের বিনির্মাণের জন্য তারা ইসলাম থেকে পথনির্দেশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে, তা আশা করা যায় না।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে গলদটি এতে বিদ্যমান তা এই যে, খুঁটিনাটি বিষয়ের গুরুত্ব দেয়া, কুরআন ও হাদীসে অকাট্যভাবে নির্ধারিত হয়নি এমন সব জিনিস মনগড়াভাবে নির্ধারণ, এবং মূল প্রাণশক্তির চাইতে বাহ্যিক প্রদর্শনীর আলোকে দীনদারী বা ধার্মিকতার মান নির্ণয়ের ব্যাধি সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, তারা পরকে আপন বানানোর পরিবর্তে আপনকেই পর বানিয়ে চলেছে। এ ভ্রান্ত ধর্মাচারের পথিকৃতদের জীবনের হালচাল দেখে ও তাদের কথাবার্তা শুনে মানুষ এই ভাবনায় পড়ে যায় যে, এরা যে তুচ্ছ ও নগণ্য খুটিনাটির ওপর এত জোর দিচ্ছেন, সত্যিই কি ওগুলোর ওপরই মানবের অনন্তকালের ভালো–মন্দ ও সাফল্য–ব্যর্থতা নির্ভরশীল?

ইসলামের পথে এটা একটা মস্তবড় অন্তরায়। কিন্তু এর জন্য ইসলাম দায়ী নয় বরং আমরাই দায়ী। যে শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের জনগণের ইসলাম সংক্রান্ত ধারণাকে এত বিকৃত ও শরীয়াত সংক্রান্ত জ্ঞানকে এত সংকীর্ণ করে দিয়েছে, সে শিক্ষাপদ্ধতির পরিবতর্ন ও সংস্কার সাধন আমাদের কর্তব্য। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, যুক্তিবিহীনভাবে চাপিয়ে দেয়া আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটা জীবন্ত আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না। তার আকীদা-বিশ্বাসগুলোকে আমাদের যুক্তিযুক্ত প্রমাণাদি সহকারে পেশ করতে হবে। অতপর আকীদার সাথে ইবাদাতের এবং ইবাদাতের সাথে বাস্তব জীবনের আইন-বিধান ও রীতিনীতির যৌক্তিক সম্পর্ক করে দিতে হবে। অধিকন্তু ওসব আইন ও বিধানকে জীবনের সকল বাস্তব সমস্যায় প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিতে হবে যে, মানুষের সকল প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা এ বিধানে বিদ্যমান। কেবল তখনই লোকেরা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা বলে বুঝতে পারবে। আর বুঝতে যখন পারবে, তখন তা গ্রহণ করতেও প্রস্তুত হয়ে যাবে। এ গঠনমূলক কাজ কঠোর শ্রমসাপেক্ষ বলে লোকেরা এ পরিশ্রম এড়িয়ে সহজ ও তৈরী পথের দিকে ছুটে যায়। অথচ এ কথা ভেবে দেখে না যে, আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌছার পথ তৈরী করার কষ্টটুকু আমাদের না করেই উপায় নেই। কোন উচ্চ ও মহৎ লক্ষ্য নির্ধারণ যেই করুক, তাকেও কষ্টটুকু করতেই হয়েছে এবং আমরা যদি সত্যিই এ লক্ষ্যের অভিলাসী হয়ে থাকি তবে এ কাজের জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতেই হবে।

দ্বিতীয় সমস্যা

এবার, দ্বিতীয় সমস্যার পর্যালোচনা করা যাক। যে সমস্ত বিদ্বেষ ও গোড়ামী ইসলামের পথে অন্তরায় বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে, তার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ঃ

একধরনের গোড়ামী হলো মানুষ যে কোন নতুন জিনিসের সংস্পর্শে এলে অথবা বাপ-দাদার আমলে যা দেখেনি কিংবা নিজেও ইতিপূর্বে যার পরিচয় লাভ করেনি, সে জিনিস দেখতে পেলে তার প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠা। এ বিদ্বেষ ও গোঁড়ামী ইসলামের পথে নতুন কোন বাধা নয়। এ বাধা আগেও ছিল। তা ছাড়া আমি পূর্বেই আভাস দিয়েছি যে, এটা শুধু ইসলামের পথেই নয়, অন্যান্য আন্দোলনের পথেও বিদ্যমান। তবুও এটা এমন কোন সমস্যা নয়

যা দূর করা যায় না। এ বাধা সত্ত্বেও ইসলামের বিস্তৃতি আগেও ঘটেছে এখনও ঘটতে পারে।

দ্বিতীয় যে বিদ্বেষ ও গোঁড়ামী পরিদৃষ্ট হয়, সেটা আসলে ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হওয়ার কারণেই তা ইসলামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত কয়েক শতাব্দিতে মুসলমানরা আপন খেয়াল–খুশী ও প্রবৃত্তির তাড়নায় যেসব ইসলাম বিরোধী রীতিনীতি অবলম্বন করেছে এবং এখনও নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্র এবং সামষ্টিক আচরণ ও ভূমিকায় যে অনৈসলামী জীবনাদর্শের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে তারই প্ররোচনা ও উস্কানিতে এ সব বিদ্বেষ ও গোঁড়ামীর উৎপত্তি।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভারতবর্ষের মানুষ প্রকৃত ইসলামী শাসন, খাঁটি ইসলামী আখলাক ও সত্যিকার ইসলামী সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার স্বাদ গ্রহণের সুযোগ কখনো পায়নি। বিগত আমলে মুসলমান বাদশাহ, মুসলমান আমীর ওমরাহ, মুসলমান শাসক, কর্মচারী, সৈনিক, মুসলিম জমীদার ও সরদার এবং মুসলিম প্রজাগণ আপন আচরণ দ্বারা ইসলামের যে নমুনা পেশ করেছেন, তা কোনক্রমেই এ দেশের সাধারণ মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার যোগ্য ছিল না। বরঞ্চ বৈষয়িক স্বার্থের তাগিদে তাদের ও অমুসলিমদের মধ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী যে দ্বন্দ্ব সংঘাত চলতে থাকে, তা ইসলামের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছে।

এ ঐতিহাসিক পটভূমির পাশাপাশি আজকের এ যুগে মুসলমানরা ব্যক্তিগত জীবন ও সামষ্টিক আচরণ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ইসলামের যে উদাহরণ পেশ করছে তাও এতটা সৌন্দর্যমন্ডিত নয় যে. এ ধরনের নমুনা দেখে জনগণ এ আন্দোলনের প্রতি আসক্ত হয়ে যাবে, যার প্রতিনিধিত্ব এমন ভঙ্গীতে করা হচ্ছে। প্রশ্ন এই যে, ব্যক্তিগত জীবনে একজন সাধারণ মুসলমানকে একজন সাধারণ অমুসলিমের তুলনায়, কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ দেখতে পাওয়া যায় যে, লোকেরা তার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের উৎস খুঁজতে যাবে? তার ব্যবহারে, তার চরিত্রে, তার লেনদেনে কোথাও এমন সামান্যতম চমকপ্রদ কোন বৈশিষ্ট্য কি চোখে পড়ে যা দ্বারা ধারণা হতে পারে যে, এ ব্যক্তি অন্যদের চাইতে মহত্তর ও পবিত্রতর কোন আদর্শের অনুসারী? একজন মুসলিম জমীদার বা "সম্ভ্রান্ত" লোক, যাকে প্রচলিত ভাষায় "নীচাশয়" লোক বলেই সবাই জানে, সমপর্যায়ের একজন অমুসলিম "সম্ভ্রান্ত" ব্যক্তি বা সরদারের চাইতে অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শণে কি কোন অংশে কম যায়?

একজন মুসলমান ব্যবসায়ী বা পেশাজীবী একই পেশাভুক্ত একজন অমুসলিমের চাইতে কি বেশী সততা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়ে থাকে? একজন মুসলমান শাসক বা অফিসার নিজ ক্ষমতা প্রয়োগে সমপদমর্যাদার কোন অমুসলিমের চাইতে কি উত্তম কোন নৈতিক আদর্শের আনুগত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকে? কোন অফিসের সহকর্মী একজন অমুসলিম কর্মচারী যেসব দূর্নীতি, অপকর্ম ও অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে মুসলমান কর্মচারীরাও কি দিনরাত সেই সব হীন তৎপরতায় লিপ্ত থাকছে না? বৈধ অবৈধ সকল উপায়ে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের তুষ্ট করা, ন্যক্কারজনক ফন্দি-ফিকির দ্বারা ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের ক্ষতি করার চেষ্টা করা, তুচ্ছ বৈষয়িক স্বার্থের জন্য তুলকালাম কান্ড বাঁধানো---ইত্যাকার যেসব অভিযোগ অমুসলিমদের বিরুদ্ধে তোলা হয়, মুসলিম কর্মচারীরাও কি তাতে দিনরাত লিপ্ত নন? এভাবে ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী এ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন অমুসলিম যখন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কোন আলামত খুঁজে পায় না, সে নিজে যা কিছু করে মুসলমানদেরকেও যখন অবলীলাক্রমে সে সব কাজ করতে দেখে, যেসব হীন উদ্দেশ্যে ঝগড়া, কলহ, দ্বন্দ্ব, সংঘাত করতে সে অভ্যস্ত, অমুসলিমদেরকেও যখন সে সব উদ্দেশ্যে ঝগড়া কলহে লিপ্ত দেখতে পায়, তখন মুসলমানরা যে জীবনাদর্শের প্রতিনিধিত্বের দাবীদার, তার প্রতি তাকে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করার মত আর কোন্ জিনিস অবশিষ্ট রইল? বরঞ্চ একই আত্মপূজা ও পার্থিব স্বার্থ পূজার ক্ষেত্রে উভয় গোষ্ঠী যখন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী তখন প্রতিদ্বন্দ্বীর মতাদর্শ নিয়ে খোলা মনে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন কি? এক দিকে অতীতের পুঞ্জীভূত ঐতিহাসিক বিদ্বেষ ও হঠকারিতা, তদুপরি আজকের মনস্তাত্ত্বীক দ্বন্দ্ব---এই দুটো তার মনমগজকে ইসলামের জন্য অর্গলবদ্ধ করতে যথেষ্ট নয় কি?

ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে ব্যাপকতর জাতীয় গন্ডীতে মুসলমানরা এ যাবত যে নীতি অবলম্বনে অনমনীয় রয়েছে বরঞ্চ যাকে নিজেদের সামষ্টিক অস্তিত্বের রক্ষক ভেবে আসছে সেটি কি? সে জিনিসটিতে ইসলামের মূল তত্ত্ব ও উদ্দেশ্যের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয় না। কোন বক্তৃতা বিবৃতি ও প্রস্তাবে আপনি এমন একটি বাক্যও উচ্চারিত হতে দেখবেন না, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলমানরা পার্থিব স্বার্থের জন্য নয় বরং সমগ্র মানব জাতির সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণের নিমিত্ব বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক এবং তারা কেবলমাত্র সত্য ও ন্যায়ের আদর্শের জন্য সংগ্রামরত। এর বিপরীত আপনি দেখবেন যে, তারা অন্যান্য জাতির সাথে একই ধরনের ও

একই পর্যায়ের জাতীয়তাবাদী লড়াইতে লিপ্ত। উভয়ে একই স্তরে নেমে এসেছে, একই পর্যায়ে পার্থিব স্বার্থ নিয়ে টানাহেচড়া করছে, একই ধরনের ফন্দিফিকির, একই ভাষা, পরিভাষা এবং বিতর্কের একই কলাকৌশল অবলম্বন করছে এবং অমুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বীরা যে সমস্ত জিনিসের জন্য যাবতীয় লড়াই ঝগড়া, আহাজারীতে লিপ্ত, তারাও ঠিক সে সব জিনিসের জন্যই মাতম, বিলাপ ও ঝগড়া লড়াইতে লিপ্ত। এমতাবস্থায় যাদের সাথে মুসলমানরা পার্থিব স্বার্থের জন্য একই সমান্তরালে লড়ছে, যাদের সাথে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার নতুন ও পুরান সম্পর্ক রয়েছে, যাদের সাথে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নে বিবাদ বিসম্বাদ রয়েছে, তাদের পক্ষে এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোন আদর্শিক আন্দোলনের ডাক এলে তারা সে ব্যাপারে ঠিক তেমনিভাবে গোড়ামী ও বিদ্বেষমুক্ত মন নিয়ে সাড়া দিতে প্রস্তুত হবে, যেমন সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র অথবা অন্য কোন মতাদর্শের দাওয়াতে সাড়া দিতে প্রস্তুত হয়ে থাকে?

এ সব হঠকারিতা ও গোড়ামী ইসলামের পথে দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিবন্ধক। কিন্তু এর প্রতিকারের জন্য আমরা যদি এ হঠকারিতার উৎপত্তির কারণটি জিইয়ে রাখি, আর তার বিদ্যমানতার অজুহাত দেখিয়ে আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকি, তা হলে এ উপায়ে উক্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করা যাবে না। এর যথার্থ প্রতিকার এই যে, আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচরণ পদ্ধতিটা বদলাতে হবে এবং এভাবে সকল বিদ্বেষের মূলোৎপাটন করে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সোজা ও সরল পথ তৈরী করতে হবে। ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান, পারসিক, সকল অমুসলিম জাতির মধ্যে তীব্র বিদ্বেষ বিরাজমান দেখে যারা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে যে, এ অবস্থায় ইসলাম একটা নির্ভেজাল আদর্শবাদী আন্দোলন হিসেবে চলতে পারে না, তারা আসলে ঘটনাবলীকে পর্যবেক্ষণও করে ভ্রান্তভাবে, আর তা থেকে সিদ্ধান্তও নেয় ভ্রান্তভাবে। আমি একটু আগেই যুক্তিসহকারে প্রমাণ করেছি যে, এ বিদ্বেষ ও ঘৃণা ইসলামের মূল আদর্শ ও তার যথার্থ প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র দেখে সৃষ্টি হয়নি। (কেননা সে চরিত্র দেখার সৌভাগ্য এ দেশের মানুষের কমই হয়েছে।) যারা মুসলমান হয়েও অনৈসলামিক চালচলন অবলম্বন এবং খালেছ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার পরিবর্তে পার্থিব স্বার্থ ও প্রবৃত্তির খায়েশ চরিতার্থ করার জন্য কাজ করার মাধ্যমে ইসলামের ভুল প্রতিনিধিত্ব করে তাদের আচরণের দরুনই এ সব জাতি ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করেছে। সুতরাং এ ঘৃণা ও

বিদ্বেষ দূর করার সঠিক কর্মপন্থা এই যে, এখন থেকে আপন চরিত্র, কাজকর্ম, সামষ্টিক চেষ্টা ও তৎপরতার মধ্যে ইসলামের যথার্থ প্রতিফলন ঘটান। বিদ্বেষের অজুহাত খাড়া করে সে সব ভ্রান্ত কার্যকলাপ অব্যাহত রাখবেন না, যা বিদ্বেষের উৎপত্তি ঘটিয়েছে। যুক্তির খাতিরে যদি এ কথা মেনেও নেই যে, জাতিগত বিদ্বেষের এ পরিবেশে একটা খাঁটি আদর্শবাদী আন্দোলন হিসেবে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করা অসম্ভব, তা হলে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছাড়া মুসলমানদের পার্থিব স্বার্থের খাতিরে যে দ্বন্দ্ব সংঘাত আজ মুসলমান ও অমুসলমান জাতিসমূহের মধ্যে বিরাজ করছে এবং তাদের জাতীয়তাবাদী কর্মপদ্ধতির জবাবে পাল্টা একই ধরনের জাতীয়তাবাদী কর্মপদ্ধতি যদি মুসলমানরাও অবলম্বন করে, তা হলে এভাবে এ ঘৃণা–বিদ্বেষ কি কেয়ামত পর্যন্ত কখনো দূর হতে পারবে? যদি তা না পারে, তা হলে এ কথা আর বলবেন না যে, আজকের বিশেষ ধরনের পরিবেশের কারণে ইসলামকে একটা খালেছ আদর্শবাদী আন্দোলন হিসেবে চালু করা বর্তমানে সম্ভব নয়। বরং বলুন যে, ভবিষ্যতেও সব সময় এ ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করবে। আর যদি ইসলাম কেবল আপনাদেরই পৈতৃক উত্তরাধিকার হিসেবে থেকে যায়, তা হলে তা চিরকাল বনী ইসরাঈলের মত আপনাদের জাতীয় ধর্ম হয়ে থাকবে, কখনো তা বিশ্বজোড়া আন্দোলনে পরিণত হতে পারবে না।

এটা মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য যে, স্বার্থপরতার জবাবে পাল্টা স্বার্থপরতা এবং স্বজাতি প্রীতির জবাবে স্বজাতি প্রীতির উদ্ভব ঘটে থাকে। ঠিক এর বিপরীত অবস্থা হয় নিস্বার্থ সত্য নিষ্ঠার। সকল বিদ্বেষ, সংকীর্ণতা ও গোড়ামী এর সামনে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করে এবং একজন নিস্বার্থ সত্যনিষ্ঠ মানুষকে মানুষ প্রেম ও ভক্তি ছাড়া আর কিছু দেয়ার ক্ষমতাই রাখে না। মুসলমানরা যদি তাদের আসল বৈশিষ্ট্য বা মর্যদা অক্ষুণ্ন রাখতো তা হলে ভারতে তাদের বিরুদ্ধে আজ যে বিদ্বেষ ও গোঁড়ামী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার অভিযোগ করা হচ্ছে, তা কখনো মাথা তুলতে সমর্থ হতো না। কিন্তু তারা নিজেরাই তাদের সে মর্যাদা হারিয়েছে। পার্থিব লাভের আশায় অন্যান্য জাতির সাথে তারা লড়াইতে লিপ্ত হতে লাগলো এবং স্বনাতন সত্যের আদর্শের পরিবর্তে আপন ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থকে তারা নিজেদের চেষ্টা–সাধনার কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে নিল। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে অন্যদের মধ্যে যদি ঘৃণা–বিদ্বেষ ও বৈরী মনোভাব সৃষ্টি না হতো, তা হলে সেটাই হতো আশ্চর্যজনক। মুসলমানরা যে মহৎ আদর্শ ও মূলনীতির নাম উচ্চারণ করে থাকে, তা তারা

নিজেরাই মেনে চলে না। বরঞ্চ দিনরাত আপন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে তার বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে। যে মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা তারা প্রচার করে থাকে। কার্যত তাদের চেষ্টা-সাধনা সে উদ্দেশ্যে নিবেদিত নয়। বরং মুসলিম জনগণ ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে তাকে পেছনে ফেলে অন্যান্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পেছনে ছুটে চলেছে। এমতাবস্থায় যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেবল তাদের স্বপ্ন ও কল্পনার জগতে বিদ্যমান এবং যে আদর্শ কেবল তাদের মৌখিক প্রচারেই সীমিত, তার জন্য দাওয়াত দিলে তা সাধারণ মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার না করারই কথা। আর যদি তারা এ আহবানকারীকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করে এবং তার আহবানকে নিছক স্বার্থ তাড়িত ছলচাতুরী মনে করে প্রত্যাখ্যান করে, তা হলে তাতে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে?

একজন অমুসলিম যে মিঃ জিন্নার ১৪ দফা অথবা ২৪ দফার প্রতি সমর্থন দিতে পারে না, সে কথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।[১] তা ছাড়া মুসলিম লীগ, আহরার দল বা জমিয়তে ওলামার প্রস্তাবাবলিতেও এমন কোন বক্তব্য ছিল না, যার প্রতি কেউ ঈমান আনতে পারে। ঈমান আনার যোগ্য বক্তব্য যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা হচ্ছে কালেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। তবে সে জন্য শর্ত এই যে, এ কলেমার জন্য বাঁচতে এবং মরতে প্রস্তুত আছে এমন একটি দল বর্তমান থাকা চাই। কিন্তু তা আছে কোথায়? ইসলামের নির্ভেজাল আনুগত্য ও আল্লাহর দীনকে পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠা করাকে নিজের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনার লক্ষ্য ও কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে নিয়েছে এমন সংগঠন মুসলমানদের মধ্যে কোনটি? ইসলামের দাওয়াত ও তার সনাতন নীতিমালা বই কেতাবে পড়ে লোকেরা তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। কিন্তু তাকে কার্যে পরিণতকারী ও তার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সদা তৎপর

১· মিঃ জিন্নাহ ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যে ১৪ দফা দাবী পেশ করেছিলেন, এখানে তার কথাই বলা হচ্ছে। মিঃ জিঃ আল্লানার লেখা Pakistan Movement: Historic Documents নামক পুস্তকের ৭০-৭২ পৃষ্ঠায় এ দাবীসমূহের বিবরণ রয়েছে। এ দাবীসমূহ মনোনিবেশ সহকারে পড়লে বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র বৃটিশ সরকার ভারতে থাকাকালীন সময় পর্যন্তই এ সব অধিকার দ্বারা মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব ছিল। ভারত একটা স্বাধীন দেশে পরিণত হওয়ার পর এ রক্ষাকবচের কোন কার্যকারিতা থাকতো না। সুতরাং ইসলামের দাওয়াত দূরের কথা, খোদ মুসলমানদের শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচ হিসেবেও তার কোন মূল্য ছিল না।। (নতুন)

একটি সমাজ তারা কোথাও পায় না। এমতাবস্থায় তারা কোথায় যাবে এবং কোন্ সমাজে বাস করবে? যে সমাজ রাত দিন কেবল দুনিয়ার ধ্যান-ধান্দায় বিভোর এবং যার বাস্তব জীবন যাপন প্রণালী অবিকল অমুসলিমদের মতই, সেই সমাজে? মুসলমানদের একটি দল ভারত ভূখন্ডে ইংরেজের পরিবর্তে ভারতবাসীর শাসন কায়েম হোক--এই উদ্দেশ্যে লড়ছে। ঠিক এ জিনিসটি এক ব্যক্তি অমুসলিম দলগুলোতেও পায়। তা হলে, সে মুসলিম দলের কাছে কেন যাবে? মুসলমানদের আর একটি দল সংগ্রাম করছে এ উদ্দেশ্যে যে, হিন্দু জাতির মোকাবিলায় বংশগত ও জন্মগত মুসলমানদের পার্থিব স্বার্থ রক্ষা করা হোক। এ জিনিসটা স্বভাবতই একজন অমুসলিমের কাছে নিজের জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিপরীত মনে হয়। তা হলে তার কি ঠেকা পড়েছে যে, সে নিজ জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে আপনার জাতীয়তাবাদে ঈমান আনবে? মানুষকে মানুষের ও অন্যান্য সৃষ্টির গোলামী থেকে মুক্ত করার কাজে সক্রিয় সংগঠন আপনাদের মধ্যে আছে কোথায় যে, মানুষ তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এগিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়?

তৃতীয় সমস্যা

সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা আমাদের চিন্তাশীল লোকদের মাথায় সমাধানের অযোগ্য মনে হচ্ছে তা হলো এই যে, এখানে কোটি কোটি সংখ্যক মানুষের এমন এক জাতি বাস করে, যারা পুরোপুরি মুসলমানও নয়, আবার পুরোপুরি অমুসলমানও নয়। এ জাতিটির এখানে এভাবে বসবাস করার ফলে বহু সংখ্যক জটীল সমস্যার সৃষ্টি হয়ে গেছে। সে সব সমস্যার কোন সমাধানই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে নেতা ও কর্মী সকলেই কর্মগত নৈরাজ্যে ভুগছে। এ পরিস্থিতির দরুন সৃষ্ট কয়েকটা বড় বড় জটিলতা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরছি।

কিছু কিছু লোক মুসলমান শব্দটা দ্বারা বিভ্রাটে পড়ে যায় এবং ভাবে যে, আসল সমস্যা হলো মুসলমানদের পুনরুত্থান--ইসলামের পুনরুজ্জীবন (Revival) নয়। তারা মনে করে যে, মুসলমান নামধারী এ জাতিটাকে শক্তিশালী করা এবং তার উত্থান ও উন্নয়নই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ওটাই

ইসলামের পুনরুজ্জীবন। এ ভ্রান্ত ধারণার দরুন তারা "মুসলিম জাতীয়তাবাদ"এর প্রবক্তা হয়েছে। মুঞ্জে ও সাভারকর[১] যেমন হিন্দু জাতির উথানকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। মুসোলিনীর কাছে ইটালীয় জাতি এবং হিটলারের কাছে জার্মান জাতির উথান যেমন সর্বপ্রধান প্রশ্ন, ঠিক তেমনি আমাদের দেশের "মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের" কাছে এ মুসলিম জাতির উথানই প্রধানতম লক্ষ্য। কেননা তারা এ জাতিরই সন্তান এবং এ জাতির সাথেই ভাগ্য বিজড়িত। মুসলমানদের শিক্ষার ব্যবস্থা (তা সে শিক্ষা যে ধরনেরই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না), তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি (চাই তা হালাল বা হারাম যেভাবেই হোক না কেন) এবং তাদেরকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সংঘবদ্ধ করণে সর্বশক্তি নিয়োগ করার মাধ্যমে তাদেরকে একটা পরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত করাকেই তারা ইসলামের যথার্থ খেদমত মনে করে। আর এটা যখন তাদের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে নির্দিষ্ট হলো তখন কোন্ কৌশল এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সহায়ক হতে পারে, তা তারা অনুসন্ধান করা শুরু করলো। অতপর যেসব কলাকৌশল তাদের দৃষ্টিতে ইহজগতে জাতীয় উথানের জন্য কার্যকর মনে হলো, সেটাই তারা অবলীলাক্রমে ব্যবহার করতে আরম্ভ করলো, চাই তা তাদেরকে ইসলাম থেকে যত দূরে ঠেলে দিক না কেন। এ মানসিকতা স্যার সৈয়দ আহমদ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ মুসলিম নেতা, কর্মী ও সংগঠনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে। ইসলামের নামে যত কিছুই চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে, আসলে মুসলমানদের জন্যই চিন্তা করা হচ্ছে এবং ইসলামের বিধি-নিষেধের বন্ধনমুক্ত হয়েই করা হচ্ছে।

মুসলমানদের মধ্যে অপর একটি গোষ্ঠী রয়েছে, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারটাকে ঠিক এভাবে জগাখিচুড়ি করে ফেলে না। তবে তারা অন্য এক দিক দিয়ে ইসলামের ভবিষ্যতকে বর্তমান জন্মগত মুসলমানদের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। নিসন্দেহে তারা ইসলামের পুনরুজ্জীবনই কামনা করে। তবে তাদের ধারণা এই যে, আজ যারা জাতিগত ও বংশগতভাবে মুসলমান, তারা যত দিন পূর্ণাঙ্গ মুসলমান না হচ্ছে, ততদিন

---

১. এ ব্যক্তিদ্বয় সে কালের হিন্দু মৌলবাদী নেতা ছিল।

ইসলামের পুনরুজ্জীবন অসম্ভব। তারা মনে করে যে, বর্তমান মুসলমানদের সবাই চিন্তায়, কর্মে ও চরিত্রে সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হওয়ার উপায় নেই। আর এ কাজটা যেহেতু অত্যন্ত কঠিন, বরং অসম্ভব বলে মনে হয়, তাই তারা আসল লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর না হয়ে অন্যান্য বেহুদা কাজে বিভিন্ন আনুসঙ্গিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টায় আপন শক্তি–সামর্থ ব্যয় করছে।

আর একটি শ্রেণী রয়েছে, যাদের সামনে ইসলামী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রায় পুরোপুরিভাবেই স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা ঐ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য অগ্রসরও হতে চায়। কিন্তু এ প্রশ্ন তাদেরকে বারবার বিব্রত করে যে, আমাদের চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দ ও কর্মচঞ্চল কর্মীগণ সকলে যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম শুরু করে দেয়, তা হলে বর্তমান কুফরী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও তার ভবিষ্যত সংস্কার মূলক কর্মকাণ্ডে আমাদের মুসলিম জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিণতি কি দাঁড়াবে? এ প্রশ্নের গুরুত্ব তাদের দৃষ্টিতে এত বেশী যে, তারা তাদের অগ্রাভিযানের সংকল্প স্থগিত রেখে বলে যে, আগে এই পশ্নের সমাধান করে নিতে হবে এবং যখন তাদের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, কেবল তখনই মূল লক্ষ্যের দিকে যাত্রা শুরু করতে হবে।

কিন্তু এ সমস্ত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও চিন্তা–বিভ্রাট শুধুমাত্র অনৈসলামী চিন্তাভঙ্গী ও অনৈসলামী মানসিকতারই ফসল। খালেছ মুসলমান হিসেবে যদি দেখা যায়, তা হলে এ সমস্ত উদ্বেগ আমাদের জন্য উদ্বেগ থাকেই না। আমাদের সামনে কোন জাতির পুনরুজ্জীবন নয়, বরং ইসলামী আদর্শের পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। জাতীয়তার পরিভাষায় যারা চিন্তা ভাবনা করে থাকে, তাদেরকে যেসব সমস্যা বিব্রত ও উদ্বিগ্ন করে। জাতীয় পুনরুজ্জীবনের চিন্তা মাথা থেকে বের করে দেয়ার পর সে সব সমস্যা কর্পূরের মত উবে যায়। বস্তুত আমরা যখন ইসলামী আদর্শের অনুসারী এবং এ আদর্শের অগ্রগতিই যখন আমাদের সকলের কাম্য, তখন একটি অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থার সাথে জড়িত কিংবা ইসলামের মূলনীতির সাথে সংঘর্ষশীল কোন স্বার্থের প্রতি আমাদের আদৌ কোন আগ্রহ বা সহানুভূতি থাকতে পারে না। এর জন্য আমাদের মস্তিষ্ককে চিন্তা–ভাবনা করার বিন্দুমাত্রও কষ্ট আমরা দেবো না। ইসলাম বিরোধী নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত কলা–কৌশলের সাথেও আমাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। এক জাতির সাথে আর এক

জাতির বিরোধ এবং এক জাতির ওপর আর এক জাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তৎপরতাও আমরা সর্বতোভাবে পরিহার করবো। আমাদের যা কিছু আগ্রহ থাকবে কেবল ইসলামী চিন্তা ও কর্মের ব্যবস্থার প্রতি থাকবে, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের প্রতি থাকবে, এবং তাকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার চেষ্টা–সাধনার প্রতি থাকবে। মুসলমানদের সাথে আমাদের সম্পর্ক শুধু ততটুকুই থাকবে যতটুকু সম্পর্ক তারা ইসলামের সাথে রক্ষা করবে। যে মুসলমান নিজ প্রবৃত্তির খায়েশ ও আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কোন বস্তু, ব্যক্তি বা শক্তির গোলামী ত্যাগ করে কেবলমাত্র আল্লাহর গোলামীতে প্রবেশ করবে, সে হবে আমাদের ভাই ও বন্ধু—চাই সে বংশানুক্রমিক মুসলমানদের কেউ হোক কিংবা অমুসলিমদের মধ্য থেকে আগত কেউ হোক। আমরা জন্মগত মুসলমানদেরকেও এই একই আদর্শের দিকে আহবান জানাবো, অমুসলিমদেরকেও জানাবো। আমাদের কাছে ইসলাম শুধু জন্মগত মুসলমানদের আঁচলে বাঁধা জিনিস নয় যে, তারা জাগলে ইসলামও জাগবে, আর তারা না জাগলে ইসলামও জাগবে না। ইসলাম তাদের বাপ–দাদার খাস তালুক নয়। তারা যদি ইসলামের জন্য বাঁচতে ও মরতে প্রস্তুত হয় তবে আমরাও খুশী, আমাদের আল্লাহও খুশী। নচেত তারা যদি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে চায় হোক গিয়ে। আমরা আল্লাহর বাণী অন্য মানুষদের কাছে নিয়ে যাবো।

আমি যে কথা বলছি, অবিকল এটাই ছিল নবী ও রসূলদের কাজ এবং শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামও এ কর্মপন্থাই অবলম্বন করেছিলেন। কুরআনে যাদেরকে "আহলে কিতাব" বলা হয়েছে, তারাও তো পুরুষাণুক্রমিক মুসলমানই ছিল। তারা আল্লাহ্, ফেরেশতা, কিতাব, আখিরাত সবই মানতো। ইবাদাত ও শরীয়াতের বিধি–বিধানের গতানুগতিক আনুগত্যও তারা করতো। কিন্তু ইসলামের আসল প্রাণশক্তি, অর্থাৎ দাসত্ব ও আনুগত্যকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া এবং এ আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে অংশীদার না করা, এ জিনিসটা তাদের ভিতর থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। এখন ভেবে দেখুন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এই "জন্মগত মুসলিম জাতি"কে জাগ্রত করার কাজে নিজের সকল চেষ্টা–তৎপরতা নিয়োজিত করেছিলেন? কখনো নয়। তিনি কি এরূপ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, এ "জন্মগত মুসলমানদের" সবাই খাঁটি মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত এক কদমও সামনে অগ্রসর হবোনা? না, তাও তিনি করেননি? তিনি

কি এ সব "জন্মগত মুসলমানদের" পার্থিব সমস্যাবলীর সমাধান করা পর্যন্ত আল্লাহর দীন কায়েমের চেষ্টা স্থগিত রেখেছিলেন? না, তাও রাখেননি। তা হলে তিনি কি করেছিলেন? সবাই জানে যে, তিনি সকল সমস্যা বাদ দিয়ে "জন্মগত মুসলমান" ও অমুসলমান—সকলকে খালেছ আল্লাহর দাসত্ব কবুল করার দাওয়াত দিয়েছিলেন। যে ব্যক্তি এ দাওয়াত কবুল করলো এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যসব কিছুর দাসত্ব ও আনুগত্য পরিত্যাগ করলো, তাকে আপন জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। অতপর তাদের সবাইকে নিয়ে একযোগে আল্লাহর আনুগত্য প্রক্রিয়া তথা সত্য দীনকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত করেই ছাড়লেন।

অবিকল এ কর্মপন্থা অনুসরণ করাকেই আমি যথার্থ ও সঠিক মনে করি। নিজেও তা অনুসরণ করতে চাই, আর ইসলাম যাদের জীবনের পরম কাম্য তাদেরকেও এ কর্মপন্থা অনুসরণের পরামর্শ দেই।

(তরজুমানুল কুরআন, জানুয়ারী, ১৯৪১)

ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?[১]

স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার কর্মপন্থা সুস্পষ্টভাবে আমি এ প্রবন্ধে তুলে ধরতে চাই। আমি দেখতে পাচ্ছি, বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্রের নাম শিশুদের খেলনায় পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন পন্থা ও শ্রেণীর লোকেরা ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা ও তা প্রতিষ্ঠার খেয়াল ব্যক্ত করছেন। কিন্তু এ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে এমন সব অদ্ভুত পথ ও পন্থার প্রস্তাব তারা করছেন, যেসব পথ ও পন্থায় এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সে রকমই অসম্ভব, মটর গাড়ীতে করে আমেরিকায় পৌছা যেমন অসম্ভব। এরূপ অসার কল্পনার (Loose Thinking) কারণ হলো, কোনো না কোনো ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে তাদের অন্তরে এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার খায়েশ পয়দা হয়ে গেছে, যার নাম হবে "ইসলামী রাষ্ট্র"। কিন্তু এ রাষ্ট্রটির ধরন ও বৈশিষ্ট্য কি হবে, নিরেট বৈজ্ঞানিক (Scientific) পন্থায় তারা তা জানার চেষ্টা করেনি। আর এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিতই বা হয় কোন্ পন্থায়, তাও জানবার কোশেশ তারা করেনি। এমতাবস্থায়, বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বাভাবিক বিবর্তন

যে কোন ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থাই যে কৃত্রিম পন্থায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুমাত্র জ্ঞান রাখেন এমন সকলেই তা জানেন। রাষ্ট্র ব্যবস্থা এক জায়গা থেকে তৈরী করে এনে অন্য জায়গায় স্থাপন করার মতো কোনো বস্তু নয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থা তো কোনো সমন্বিত কর্ম প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটি সমাজের মধ্যকার নৈতিক চরিত্র,

---

১. এ প্রবন্ধটি ১৯৪১ সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্ট্রেচী হলে পাঠ করা হয়।

চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যগত কার্যকারণের নিয়মে জন্ম লাভ করে থাকে। এর জন্যে কিছু প্রাথমিক উপায় উপাদান (Prerequisites), কিছু সামাজিক ও সামষ্টিক চেষ্টা তৎপরতা এবং কিছু আবেগ উদ্দীপনা ও ঝোঁক প্রবণতা বর্তমান থাকা চাই, যেগুলোর সমন্বিত চাপের মুখে স্বাভাবিক পন্থায় রাষ্ট্র ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে থাকে। তর্ক শাস্ত্রে সূত্র বিন্যাসের ভিত্তিতে যেমন সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়, রসায়ন শাস্ত্রে রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উপাদানসমূহকে বিশেষ পন্থায় সংমিশ্রিত করলে যেমন সেগুলোর সমগুণ সম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থই প্রস্তুত হয়, ঠিক একইভাবে সমাজ বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী, একটি রাষ্ট্র কেবল সেই পরিবেশের দাবীর ফলশ্রুতিতেই জন্ম লাভ করে, যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় কোনো সামাজে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে। আর রাষ্ট্রের প্রকৃতি কি হবে? তাও সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সামাজের সেই পরিবেশ ও দৃষ্টিভংগি ওপর, যার চাপের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র জন্ম লাভ করেছে। যেমন, তর্ক শাস্ত্রে এক ধরনের সূত্র বিন্যাসের ফলশ্রুতিতে অন্য ধরনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ হতে পারে না। যেমন, রসায়ন শাস্ত্রে সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন রাসায়নিক উপাদানসমূহের সংমিশ্রণে একটি ভিন্নধর্মী যৌগিক পদার্থ তৈরী হতে পারে না। যেমন, লেবু গাছ লাগানোর পর তা বড় হয়ে আম ফলাতে পারে না। ঠিক তেমনি, উপায় উপাদান এবং কার্যকারণ যদি একটি বিশেষ প্রকৃতির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে হয়ে থাকে, আর সেগুলোর সমন্বিত কার্যক্রমও যদি হয় সেই বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রেরই আত্মপ্রকাশের অনুকূলে, তাহলে ক্রমবিকাশের পর্যায়সমূহ পার হয়ে রাষ্ট্র যখন পূর্ণতা লাভের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে, তখন এ সব উপায় উপাদান ও কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তা কিছুতেই হতে পারে না।

এ বক্তব্য থেকে আপনারা আমাকে অদৃষ্টবাদের (Determinism) প্রবক্তা মনে করবেন না। একথাও মনে করবেননা যে, আমি মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধিকারকে অস্বীকার করছি। নিসন্দেহে রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ধারণে ব্যক্তি ও সমষ্টির ইচ্ছাশক্তি এবং কার্যক্রমের ভূমিকা বিরাট। কিন্তু আমি আসলে একটি কথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করছি। আর তাহলো, যে ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থাই সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য হবে, প্রথম থেকেই ঠিক সে ধরনের রাষ্ট্রের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল উপায়-উপাদান সংগ্রহ করা এবং ঠিক সেই লক্ষ্যেই পৌছুবার মতো কর্মপন্থা অবলম্বন করা একান্ত অপরিহার্য।

আমরা যে বিশেষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই, সে প্রকৃতির রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে অবশ্যি ঠিক সে রকম আন্দোলন উত্থিত হতে হবে। সে রকম ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। সেই ধরনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নেতৃত্ব এবং সেই রকম সামাজিক কার্যক্রম ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কারণ, এগুলো এই বিশেষ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বাভাবিক দাবী। এ সকল উপায়-উপাদান ও কার্যকারণ যখন সমন্বিতভাবে সংগৃহীত ও হস্তগত হয় এবং এক দীর্ঘ প্রাণান্তকর চেষ্টা-সংগ্রামের পর তাদের মধ্যে এমন অপ্রতিরোধ্য শক্তি ও বলিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়ে যায়, যার ফলে তাদের গড়া এ সমাজে অন্য কোনো ধরনের বাতিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন এর অপরিহার্য স্বাভাবিক পরিণতিতে সেই বিশেষ রাষ্ট্র ব্যবস্থারই আত্মপ্রকাশ ঘটে, যার জন্যে এ সকল উপায়-উপাদন ও কার্যকারণের শক্তি সমন্বিত ও সমষ্টিগতভাবে চেষ্টা-সংগ্রাম চালিয়েছে। যেমন একটি বীজ। তার থেকে অংকুরিত হলো একটি গাছ। তার অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহ তাকে প্রতিপালিত করে পৌঁছে দিলো একটি পর্যায়ে। তখন এ গাছ থেকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মে সেই ফলই ফলতে থাকবে, যা ফলানোর জন্যে তার অভ্যন্তরীণ শক্তি ও উপায়-উপাদনসমূহ দীর্ঘদিন ধরে রস সিঞ্চন করে আসছিল। এ নিগূঢ় সত্য বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে আপনাকে একটি কথা স্বীকার করে নিতেই হবে। তাহলো, আন্দোলন, নেতৃত্ব, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক চরিত্র এবং কর্মপদ্ধতি ও কর্মকৌশলসহ প্রতিটি উপাদান যেখানে একটি বিশেষ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে সম্পূর্ণ অনুকূল ও উপযোগী তৎপরতায় বলিষ্ঠভাবে সক্রিয়, এ সবের পরিণামে সেখানে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার আশা করাটা মূর্খতা, খামখেয়ালী, অসার কল্পনা এবং অনভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আদর্শিক রাষ্ট্র

আমরা যে রাষ্ট্রকে "ইসলামী রাষ্ট্র" বলে আখ্যায়িত করছি, তার প্রকৃত স্বরূপটা কি? কী তার প্রকৃতি? কি তার ধরন? কি তার বৈশিষ্ট্য ও আসল পরিচয়? তা আমাদের ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার। ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, জাতীয়তাবাদের নাম গন্ধও এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ জিনিসটিই ইসলামী রাষ্ট্রকে অন্য সকল প্রকার রাষ্ট্র থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এ হচ্ছে

নিছক একটি আদর্শিক রাষ্ট্র। এ ধরনের রাষ্ট্রকে আমি ইংরেজীতে "Ideological State" বলবো। এরূপ আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের সাথে মানুষ পরিচিত ছিল না। আজও পৃথিবীতে এরূপ কোনো আদর্শিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত নেই। প্রাচীন কালে মানুষ বংশীয় বা শ্রেণীগত রাষ্ট্রের সাথে পরিচিত ছিলো। অতপর গোত্রীয় এবং জাতীয় রাষ্ট্রের সাথে পরিচিত হয়। এমন একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের কথা মানুষ তার সংকীর্ণ মানসিকতায় কখনো স্থান দেয়নি, যার আদর্শ গ্রহণ করে নিলে বংশ, গোত্র, জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশীদার হয়ে যাবে। খৃষ্টবাদ এর একটি অস্পষ্ট নকশা লাভ করেছিল। কিন্তু সেই পূর্ণাঙ্গ চিন্তা কাঠামো তারা লাভ করেনি, যার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ফরাসী বিপ্লবে আদর্শিক রাষ্ট্রের একটি ক্ষীণ রশ্মি মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল বটে, কিন্তু তা অচিরেই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অন্ধ গহ্বরে তলিয়ে যায়।[১] কমিউনিজম আদর্শিক রাষ্ট্রের ধারণা বিশেষভাবে প্রচার করে। এমনকি এ মতবাদের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপনেরও কোশেশ করে। এর ফলে বিশ্ববাসীর মনে আদর্শিক রাষ্ট্রের একটি ক্ষীণ ধারণাও জন্ম নিতে থাকে। কিন্তু অবশেষে এর ধমনীতেও ঢুকে পড়লো জাতীয়তাবাদের তীর্যক ভাবধারা। জাতীয়তাবাদ কমিউনিজমের আদর্শিক ধারণাকে ভাসিয়ে নিয়ে ডুবিয়ে দিলো সমুদ্রের তলদেশে। পৃথিবীর প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত একমাত্র ইসলামই হচ্ছে সেই আদর্শ পন্থা, যা জাতীয়তাবাদের যাবতীয় সংকীর্ণ ভাবধারা থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নিরেট আদর্শিক বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। আর একমাত্র ইসলামই হচ্ছে সেই মহান আদর্শ, যা গোটা মানব জাতিকে তার এ আদর্শ গ্রহণ করে অজাতীয়তাবাদী বিশ্বজনীন রাষ্ট্র গঠনের আহবান জানায়।

বর্তমান বিশ্বে যেহেতু এরূপ একটি রাষ্ট্রের ধারণা সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং যেহেতু বিশ্বের সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবস্থা এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাই কেবল অমুসলিমরাই নয় স্বয়ং মুসলমানরা পর্যন্ত এরূপ রাষ্ট্র এবং এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা (IMPLICATIONS) অনুধাবন করতে অক্ষম হয়ে

১: এ বিপ্লবের ভিত্তিই ছিলো ঘৃণা এবং বিদ্বেষের ওপর। তাই শুরু থেকেই নিজ জাতির লোকদের ওপর চরম অত্যাচার নির্যাতন চালানো হয় এবং এতো নির্মম গণহত্যা চালায়, যা নাকি চেংগিস এবং হালাকু খানের বর্বরতাকেও ম্লান করে দেয়। অতপর সে বিপ্লব জাতীয়তাবাদের দিকে মোড় নেয়। [গ্রন্থাকার]

পড়েছে। যারা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছে বটে, কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার ধারণা গ্রহণ করেছে পুরোপুরিভাবে ইউরোপীয় ইতিহাস, রাজনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান (Social Science) থেকে, তাদের মনমস্তিষ্কে এরূপ আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা কিছুতেই স্থান পেতে পারে না। উপমহাদেশের বাইরেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যেসব দেশ স্বাধীন হয়েছে, সে সব দেশেও এ ধরণের লোকদের হাতে যখন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এসেছে, জাতীয় রাষ্ট্র (National State) ছাড়া আর কোনো ধরনের রাষ্টের কথা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। তাদের মন–মস্তিষ্ক তো ইসলামের জ্ঞান, চেতনা এবং আদর্শিক রাষ্ট্রের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ উপমাহাদেশেও যারা সে ধরনের শিক্ষা–দীক্ষা লাভ করেছে, তারাও এ জটিল সমস্যায় জর্জরিত। ইসলামী রাষ্ট্রের নাম মুখে এরা উচ্চারণ করে বটে, কিন্তু যে শিক্ষা–দীক্ষায় বেচারাদের মস্তিষ্ক গঠিত হয়েছে, তা থেকে ঘুরে ফিরে সেই এক "জাতীয় রাষ্ট্রের" চিত্রই বার বার তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। জ্ঞানত কিংবা অজ্ঞতাবশত এরা কেবল জাতি পূজার (Nationalistic Ideology) বেড়াজালেই ফেঁসে যায়। তারা যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর কথাই চিন্তা করুক না কেন, তা করে থাকে জাতীয়তাবাদেরই ভাবধারার ভিত্তিতে। ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ গতানুগতিক ধারণা পোষণ করে। তারা মনে করে, 'মুসলমান' নামের যে 'জাতিটি' রয়েছে, তার হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিংবা অন্তত রাজনৈতিক নেতৃত্ব এলেই তা ইসলামী রাষ্ট্র হবে। আর এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে তারা যতোই চিন্তা–ভাবনা করে, অন্যান্য জাতির অবলম্বিত কর্মপন্থা ছাড়া নিজেদের সেই জাতিটির জন্যে অন্য কোনো কর্মপন্থাই তাদের নজরে পড়ে না। এ ধারণাই তাদের মগজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যেসব উপায়– উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে, তারাও সেসব উপায়–উপাদানের সমন্বয়েই তাদের জাতিটিকে গঠন করবে। তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করে দেয়া হবে।[১] তাদের

---

১ ১৯৪০ সালে যখন এ বক্তৃতাটি উপস্থাপন করা হয়, তখন এ উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে নিছক একটি জাতি মনে করে তাদেরকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সংগঠিত করার পরিণতি কারো বুঝে আসেনি বটে, কিন্তু ১৯৭১ সালে যখন ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মুসলমান থেকে মুসলমানকে বিভক্ত করে দিলো এবং স্বয়ং মুসলমানের হাতে মুসলমানের ইতিহাসের নজীরবিহীন গণহত্যা অনুষ্ঠিত হলো, তখন বিষয়টি সকলের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো। অতপর ১৯৭২ সালে বিশ্ববাসী সিন্ধুর ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চেহারাও দেখে নিল। এ আন্দোলনের দাবী ছিলো সিন্ধুভাষী সকল মুসলমান অমুসলমান এক জাতি। আর সেখানকার যেসব মুসলমান সিন্ধু ভাষী নয়, তারা ভিন্নজাতি এবং তাদের সিন্ধুতে থাকার অধিকার নেই। [গ্রন্থাকার]

মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি করা হবে। জাতীয় গার্ডবাহিনী সংগঠিত করা হবে। গঠন করা হবে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী। যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, সেখানে গণতন্ত্রের স্বীকৃত নীতি 'সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন' (Majority Rule) এর ভিত্তিতে তাদের জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হবে। আর যেখানে তারা সংখ্যালঘু, সেখানে তাদের "অধিকার" সংরক্ষিত হবে। তারা মনে করে, তাদের স্বাতন্ত্র্য ঠিক সেভাবে সংরক্ষিত হওয়া উচিত, যেভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে প্রতিটি সংখ্যালঘু জাতি (National Minority) নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চায়। তারা চায়, শিক্ষা, চাকুরী এবং নির্বাচনী সংস্থাসমূহে নিজেদের কোটা নির্ধারিত হবে। নিজেদের প্রতিনিধি নিজেরা নির্বাচন করবে। একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে মন্ত্রী সভায় তাদের শরীক করানো হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি জাতীয়তাবাদী চিন্তা তাদের চিন্তাশক্তিকে গ্রাস করে রেখেছে। এ সব জাতীয়তাবাদী চিন্তা প্রকাশ করার সময় তারা উম্মাহ, জামায়াত, মিল্লাত, আমীর, ইতায়াত প্রভৃতি ইসলামী পরিভাষাই মুখে উচ্চারণ করে। কিন্তু এ শব্দগুলো তাদের জন্যে জাতীয় ধর্মবাদের জন্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীরই সমার্থক। সৌভাগ্যবশত তারা এ শব্দগুলো পুরানো ভান্ডারে তৈরী করা–ই পেয়ে গেছে এবং এগুলো দিয়ে তাম্র মুদ্রার ওপর স্বর্ণমুদ্রার মোহরাংকিত করার সুবিধে পাচ্ছে।

আপনারা যদি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের সঠিক পরিচয় উপলব্ধি করে নিতে পারেন, তাহলে এ কথাটি বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না যে, এরূপ জাতীয়তাবাদী চিন্তাপদ্ধতি, কার্যসূচী এবং আন্দোলন প্রক্রিয়া দ্বারা আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া তো দূরের কথা, বরঞ্চ এ মহান কাজের সূচনাই হতে পারে না। সত্য কথা বলতে কি, জাতীয়তাবাদের প্রতিটি অংগ একেকটি তীক্ষ্ণধার কুঠারের মতো, যা আদর্শিক রাষ্ট্রের মূলে কুঠারাঘাত করে তাকে বিনাশ করে দেয়। আদর্শবাদী রাষ্ট্র যে ধারণা (IDEA) পেশ করে, তার মূল কথাই হচ্ছে, আমদের সামনে 'জাতি' বা 'জাতীয়তাবাদের' কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের সম্মুখে রয়েছে শুধু মানুষ বা মানব জাতি। তাদের কাছে আমরা এক মহান আদর্শ এ উদ্দেশ্যে পেশ ও প্রচার করবো যে, এ আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার মধ্যেই তাদের সকলের কল্যাণ ও সাফল্য নিহিত রয়েছে। এ আদর্শ গ্রহণকারী সকল মানুষ ঐ আদর্শিক রাষ্ট্রটি পরিচালনায় সমান অংশীদার।

এবার একটু চিন্তা করে দেখুন, যে ব্যক্তির মন-মগজ, ভাষা-বক্তব্য, কাজ-কর্ম, তৎপরতা প্রভৃতি প্রতিটি জিনিসের ওপর সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও জাতিপূজার মোহরাংকিত হয়ে আছে, সে কি করে এ মহান বিশ্বজনীন আদর্শিক দৃষ্টিভংগি নিয়ে চলতে সক্ষম হবে? সংকীর্ণ জাতি পূজায় অন্ধ বিভোর হয়ে সে নিজের হাতেই তো বিশ্বমানবতাকে আহবান জানাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। প্রথম কদমেই তো সে নিজের পজিশনকে ভ্রান্তির বেড়াজালে নিমজ্জিত করেছে। বিশ্বের যেসব জাতি জাতীয়তাবাদী বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে আছে, জাতি পূজা এবং জাতীয় রাষ্ট্রই যাদের সমস্ত ঝগড়া লড়াইর মূল কারণ, তাদের পক্ষে বিশ্ব মানবতাকে কল্যাণের আদর্শের প্রতি আহবান করা সম্ভব নয়। যারা নিজেদের জাতীয় রাষ্ট্র এবং নিজ জাতির অধিকারের জন্যে ঝগড়ায় নিমজ্জিত, তারা কি বিশ্বমানবতার কল্যাণের কথা চিন্তা করতে পারে? লোকদেরকে মামলাবাজী থেকে ফিরানোর আন্দোলন আদালতে মামলা দায়ের করার মাধ্যমে আরম্ভ করা কি যুক্তিসংগত কাজ হতে পারে?

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং মানুষের প্রতিনিধিত্ব ভিত্তিক রাষ্ট্র

ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তার গোটা অট্টালিকা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধারণার মূল কথা[১] হলো, বিশ্ব সাম্রাজ্য আল্লাহর। তিনিই এ বিশ্বের সার্বভৌম শাসক। কোনো ব্যক্তি, বংশ, শ্রেণী, জাতি, এমনকি গোটা মানব জাতিরও সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। আইন প্রণয়ন এবং নির্দেশ দানের অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট। এ রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে, এখানে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে। আর এ প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা মানুষ সঠিকভাবে লাভ করতে পারে মাত্র দুটি পন্থায়। হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি কোনো মানুষের নিকট আইন ও রাষ্ট্রীয় বিধান অবতীর্ণ হবে এবং তিনি তা অনুসরণ ও কার্যকর করবেন। কিংবা মানুষ সেই ব্যক্তির অনুসরণ ও অনুবর্তন করবে, যার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আইন ও বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। এ খিলাফত পরিচালনার কাজে এমন

---

১ বিস্তারিত জানার জন্যে আমার 'ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ' পুস্তিকাটি দেখুন। [গ্রন্থাকার]

সকল লোকই অংশীদার হবে, যারা এ আইন ও বিধানের প্রতি ঈমান আনবে এবং তা অনুসরণ ও কার্যকর করার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। তাদেরকে এরূপ স্থায়ী অনুভূতির সাথে এ মহান কার্য পরিচালনা করতে হবে যে, সামষ্টিকভাবে আমাদের সকলকে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেককে এর জন্যে সেই মহান আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে, গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই যার অবগতিতে রয়েছে। যার জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই গোপন থাকতে পারে না। মৃত্যুর পরও যার কর্তৃত্বের দাপট থেকে কোনো মানুষ রেহাই পাবে না। এ চিন্তা প্রতিটি মুহূর্ত তাদের এ অনুভূতিকে জাগ্রত রাখবে যে, মানুষের ওপর নিজেদের হুকুম ও কর্তৃত্ব চালানোর জন্যে, জনগণকে নিজেদের গোলাম বানানোর জন্যে, তাদেরকে নিজেদের সম্মুখে মাথা নত করতে বাধ্য করার জন্যে, তাদের থেকে ট্যাক্স আদায় করে নিজেদের জন্যে বিলাসবহুল অট্টালিকা নির্মাণ করার জন্যে, আর স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিলাসিতা, আত্মপূজা এবং হঠকারিতার সামগ্রী পুঞ্জিভূত করার জন্যে আমাদের ওপর খিলাফতের এ মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়নি। বরঞ্চ এ বিরাট দায়িত্ব আমাদের ওপর এ জন্যে অর্পিত হয়েছে, যেনো আমরা আল্লাহর বান্দাদের ওপর তাঁরই দেয়া ইনসাফ ভিত্তিক আইন ও বিধান কার্যকর করি এবং নিজেরা নিজেদের জীবনে তা পুরোপুরি অনুসরণ ও কার্যকর করি। এ বিধানের অনুসরণ অনুবর্তন এবং তা কার্যকর করার ব্যাপারে আমরা যদি বিন্দুমাত্র ত্রুটি করি, এ কাজে যদি অণু পরিমাণ স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা, বিদ্বেষ, পক্ষপাতিত্ব কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার অনুপ্রবেশ ঘটাই, তাহলে আল্লাহর আদালতে এর শাস্তি অবশ্যি আমাদেরকে ভোগ করতে হবে, দুনিয়ার জীবনে শাস্তি ভোগ থেকে যতোই মুক্ত থাকি না কেন।

এ মহান আদর্শের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় অট্টালিকা তার মূল ও কান্ড থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর শাখা প্রশাখা পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে ধর্মহীন রাষ্ট্র (Secular States) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়ে থাকে। তার গঠন প্রক্রিয়া, স্বভাব-প্রকৃতি সবকিছুই সেক্যুলার রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন এক বিশেষ ধরনের মানসিকতা। এক স্বতন্ত্রধর্মী চরিত্র বৈশিষ্ট্য। এক অনুপম কর্মনৈপুণ্য। এ রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, কোর্ট-কাচারী, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আইন-কানুন, কর, খাজনা পরিচালনা পদ্ধতি, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ, সন্ধি

প্রভৃতি সকল বিষয়ই ধর্মহীন রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি ইসলামী রাষ্ট্রের কেরানী, বরঞ্চ চাপরাশী হবারও যোগ্য নয়। সে রাষ্ট্রের পুলিশ ইনেস্পেক্টর জেনারেল ইসলামী রাষ্ট্রের একজন সাধারণ কনষ্টেবল হবারও যোগ্যতা রাখে না। ধর্মহীন রাষ্ট্রের ফিল্ড মার্শাল এবং জেনারেলরা ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ সিপাহী পদেও ভর্তি হবার যোগ্যতা রাখে না। তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো পদ পাওয়া তো দূরের কথা, তার মিথ্যাচার, ধোঁকাবাজি এবং বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হয়তো কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকেও রক্ষা পাবে না।

মোট কথা, ধর্মহীন সেক্যুলার রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী করে যেসব লোক তৈরী করা হয়েছে এবং সে ধরনের রাষ্ট্রের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে যাদের নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁরা সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক, ভোটার, কাউন্সিলার, কর্মকর্তা, সিপাহী, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তা, সেনা প্রধান, রাষ্ট্রদূত, মন্ত্রীবর্গ, মোটকথা নিজেদের সমাজ জীবনের প্রতিটি বিভাগ, পরিচালিকা যন্ত্রের প্রতিটি অংশ সম্পূর্ণ নতুনভাবে নিজস্ব আদর্শের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে হবে। এ রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রয়োজন এমন সব লোকের, যাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহর ভয়। যারা আল্লাহর সম্মুখে নিজেদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে বলে অনুভূতি রাখে। যারা দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের দৃষ্টিতে নৈতিক লাভ ক্ষতি পার্থিব লাভ ক্ষতির চাইতে অনেক মূল্যবান। যারা সর্বাবস্থায় সে সব আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি ও কর্মপন্থার অনুসরণ করবে, যা তাদের জন্যে বিশেষভাবে প্রণীত হয়েছে। যাদের যাবতীয় চেষ্টা-তৎপরতার একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বার্থের দাসত্ব আর কামনা-বাসনার গোলামীর জিঞ্জির থেকে যাদের গর্দান সম্পূর্ণ বিমুক্ত। হিংসা-বিদ্বেষ আর দৃষ্টির সংকীর্ণতা থেকে যাদের মন-মানসিকতা সম্পূর্ণ পবিত্র। ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার নেশায় যারা উন্মাদ হবার নয়। ধন-দৌলতের লালসা আর ক্ষমতার লিপ্সায় যারা কাতর নয়। এরূপ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে এমন নৈতিক বলিষ্ঠতার অধিকারী একদল লোক প্রয়োজন, পৃথিবীর ধনভান্ডার হস্তগত হলেও, যারা নিখাঁদ আমানতদার প্রমাণিত হবে। ক্ষমতা হস্তগত হলে জনগণের কল্যাণ চিন্তায় যারা বিনিদ্র রজনী কাটাবে। আর জনগণ যাদের সুতীব্র দায়িত্বানুভূতিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণাধীনে

নিজেদের জানমাল, ইজ্জত আবরুসহ যাবতীয় ব্যাপারে থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন এমন একদল লোকের, যারা কোনো দেশে বিজীয়র বেশে প্রবেশ করলে সেখানকার লোকেরা গণহত্যা, জনপদের ধ্বংসলীলা, যুলুম নির্যাতন, গুন্ডামী বদমায়েশী এবং ব্যভিচারের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হবে না। বরঞ্চ বিজিত দেশের অধিবাসীরা এদের প্রতিটি সিপাহীকে পাবে তাদের জানমাল, ইজ্জত আবরু ও নারীদের সতীত্বের পূর্ণ হিফাযতকারী। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তারা এতোটা সুখ্যাতি ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে যে, তাদের সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা নৈতিক ও চারিত্রিক মূলনীতির অনুসরণ এবং প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি পালনের ব্যাপারে গোটা বিশ্ব তাদের ওপর আস্থাশীল হবে। এ ধরনের এবং কেবল মাত্র এ ধরনের লোকদের দ্বারাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এরূপ লোকেরাই ইসলামী হুকুমাত পরিচালিত করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে ওসব বস্তুবাদী স্বার্থান্বেষী (Utilitarian Mentality) লোকদের দ্বারা এরূপ একটি ইসলামী রাষ্ট্র কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হতে পারে না। বরং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এরূপ লোকদের অস্তিত্ব অট্টালিকার অভ্যন্তরে উইপোকার অস্তিত্বের মতোই বিপজ্জনক। এরা পার্থিব স্বার্থ এবং ব্যক্তি ও জাতির স্বার্থে নিত্য নতুন নীতিমালা তৈরী করে। এদের মগজে না আছে আল্লাহর ভয়, না পরকালের। বরঞ্চ তাদের সমগ্র চেষ্টা-তৎপরতার এবং নিত্য নতুন পলিসির মূলকথা হচ্ছে কেবলমাত্র পার্থিব লাভ লোকসানের 'ধান্দা'।

ইসলামী বিপ্লবের পন্থা

এতোক্ষণ ইসলামী রাষ্ট্রের যে রূপরেখা অংকন করা হলো, তার পুরো চিত্র স্মরণ রেখে চিন্তা করে দেখুন, এ লক্ষ্যে পৌঁছুবার সত্যিকার কর্মপন্থা কি হতে পারে? আগেই বলেছি, কোনো একটি সমাজের মধ্যকার নৈতিক চরিত্র, চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যগত কার্যকারণের সমন্বিত কর্ম প্রক্রিয়ার ফলেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মে ঠিক সে ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে। একটি গাছ অংকুরিত হওয়া থেকে আরম্ভ করে পূর্ণাংগ গাছে পরিণত হওয়া পর্যন্ত যদি তা লেবু গাছ হিসেবে পরিগঠিত হয়ে থাকে, তবে ফল ফলানোর সময় হঠাৎ করে সে গাছ কিছুতেই আম ফলাতে পারে না। ঠিক তেমনি, ইসলামী রাষ্ট্রেরও

অলৌকিকভাবে আবির্ভাব ঘটে না। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে প্রথমে এমন একটি আন্দোলন উত্থিত হওয়া অপরিহার্য, যার বুনিয়াদ নির্মিত হবে সেই জীবন দর্শন, সেই জীবনোদ্দেশ্য, সেই নৈতিক মানদন্ড এবং সেই চারিত্রিক আদর্শের ওপর, যা হবে ইসলামের প্রাণশক্তির সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। কেবল সেসব লোকেরাই ঐ আন্দোলনের নেতা ও কর্মী হবার যোগ্যতা রাখবে, যারা মানবতার এ বিশেষ ছাঁচে ঢেলে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে প্রস্তুত হবে। সেই সাথে সমাজে অনুরূপ মন-মানসিকতা ও নৈতিক প্রাণশক্তি প্রচারের জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যাবে। অতপর এই একই বুনিয়াদের উপর এমন এক নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যা ঐ বিশেষ টাইপের লোক তৈরী করবে। যা থেকে সৃষ্টি হবে এমনসব মুসলিম বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ, আইনজ্ঞ, রাজনীতিবিদ, মোটকাথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় এমনসব বিশেষজ্ঞ তৈরী হবে, যারা নিজেদের মন-মানসিকতা, ধ্যানধারণা ও চিন্তা-দর্শনের দিক থেকে হবে পূর্ণ মুসলিম। যাদের ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে বাস্তবধর্মী এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নীল নকশা তৈরী করার থাকবে পূর্ণাংগ যোগ্যতা। যারা আল্লাহদ্রোহী চিন্তানায়কদের মোকাবেলায় নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব (Intellectual Leadership)কে বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার পূর্ণ সামর্থ রাখবে।[১]

এ চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতেই ইসলামী আন্দোলনকে সমাজের বুকে ছড়িয়ে থাকা ভ্রান্ত জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এ সংগ্রামে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে বিপদ মুসীবত ও অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে, ত্যাগ ও কুরবানীর নজরানা পেশ করে মার খেয়ে খেয়ে এবং জীবন দিয়ে দিয়ে নিজেদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও মজবুত সিদ্ধান্তের প্রমাণ পেশ করতে হবে। পরীক্ষার চুল্লীতে দগ্ধ হয়ে তাদের খাঁটি সোনায় পরিণত হতে হবে। যেন যে কোনো লোক তাদের নিখাঁদ খাঁটি (Finest Standard) সোনাই দেখতে পায়। সংগ্রামের ময়দানে যে আদর্শের পতাকাবাহী হিসেবে তারা অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের প্রতিটি কথা ও কাজে সে আদর্শ প্রতিফলিত হতে হবে। তাদের প্রতিটি কথা দ্বারা যেন দুনিয়ার সামনে এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এমন নিষ্কলুষ, নিস্বার্থ,

১. বিস্তারিত জানার জন্য আমার লেখা "নয়া নিযামে তা'লীম" পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

[গ্রন্থাকার]

সত্যবাদী, পূতচরিত্র, ত্যাগী, নীতিবান ও খোদাভীরু লোকেরা মানবতার কল্যাণের জন্যে যে আদর্শিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্‌বান জানাচ্ছে, তাতে অবশ্যি মানুষের জন্যে সুবিচার, শান্তি ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

এ ধরনের চেষ্টা সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজের ঐসকল লোকই ধীরে ধীরে এ আন্দোলনে শরীক হয়ে যাবে, যাদের প্রকৃতিতে সত্য ও সততার কিছু না কিছু উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। এর মোকাবেলায় হীন চরিত্র ও নিকৃষ্ট পথের অনুসারীদের প্রভাব ধীরে ধীরে সমাজ থেকে বিলীন হয়ে যেতে থাকবে। জনগণের চিন্তা–চেতনায় সৃষ্টি হবে এক প্রচন্ড বিপ্লব। সমাজ জীবনে উত্থিত হবে সেই বিশেষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার তীব্র দাবী। তখন এ পরিবর্তিত মানসিকতার সমাজে অপর কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু থাকার পথ হয়ে যাবে সম্পূর্ণ রুদ্ধ। অবশেষে, এক অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক পরিণতির ফলে সেই কাংখিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যার জন্যে দীর্ঘদিন থেকে যমীনকে তৈরী করা হয়েছে। এভাবে সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে পূর্বোল্লিখিত শিক্ষা ব্যবস্থার বদৌলতে, তা পরিচালনার জন্যে একেবারে নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী থেকে নিয়ে মন্ত্রী ও গভর্ণর পর্যায় পর্যন্ত সকল শ্রেণীর কর্মচারী ও কর্মকর্তা সেখানে মওজুদ পাওয়া যাবে।

এ হচ্ছে সেই বিপ্লবের চিত্র ও সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক পন্থা, যাকে ইসলামী বিপ্লব ও ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়। পৃথিবীর সকল বিপ্লবের ইতিহাস আপনাদের সামনে রয়েছে। এ কথা আপনাদের অজানা থাকার কথা নয় যে, একটি বিশেষ ধরনের বিপ্লব ঠিক সেই ধরনের আন্দোলন অনুরূপ নেতৃত্ব ও কর্মী বহিনী, অনুরূপ সামষ্টিক ও সামাজিক চেতনা এবং অনুরূপ সাংস্কৃতিক ও নৈতিক পরিবেশই দাবী করে। ফরাসী বিপ্লবের জন্যে সেই বিশেষ ধরনের নৈতিক ও মানসিক ভিত রচনারই প্রয়োজন ছিলো, যা তৈরী করেছিলেন রুশো, ভল্টেয়ার ও মন্টেস্কোর মতো দার্শনিক। কার্ল মার্ক্সের দর্শন এবং লেলিন ও ট্রটস্কির নেতৃত্ব আর হাজার হাজার সামজতান্ত্রিক কর্মীর ত্যাগের বদৌলতেই রুশবিপ্লব সম্ভব হয়েছিল, যারা নিজেদের জীবনকে সমাজতন্ত্রের ছাঁচে ঢেলে গঠন করেছিল। জার্মানীর জাতীয় সমাজতন্ত্রের পক্ষে সেই বিশেষ নৈতিক, মনস্তাত্বিক ও সাংস্কৃতিক মাটিতেই শিকড় গাড়া সম্ভব হয়েছিল, যা সৃষ্টি করেছিল হেগেল, ফিস্‌টে, গ্যেটে এবং নিটশের মতো অসংখ্য চিন্তাবিদদের দর্শন ও মতাদর্শ, আর হিটলারের দুর্ধর্ষ নেতৃত্ব। ঠিক তেমনি ইসলামী বিপ্লবও কেবল তখনি সংঘটিত হতে পারবে, যখন কুরআনী দর্শন ও

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর (স) আদর্শের ভিত্তিতে একটি প্রচন্ড গণআন্দোলন ডাথত হবে এবং সামাজিক জীবনের মানসিক, নৈতিক, মনস্তাত্বিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিসমূহকে সংগ্রামের প্রচন্ডতায় আমূল পরিবর্তিত করে দেয়া সম্ভব হবে। এ কথা অন্তত আমার বুঝে আসে না যে, কোনো জাতিপূজা ধরনের আন্দোলন দ্বারা কি করে ইসলামী বিপ্লব সংগঠিত হতে পারে? কারণ, এর পটভূমিতে তো রয়েছে সেই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, যা বর্তমানে আমাদের দেশে চালু রয়েছে। আর এ শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি তো সুবিধাবাদী নৈতিকতা (Utilitarian Morals) এবং প্রয়োগবাদী (Pragmatism) মানসিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাবেক ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মসিয়ে রোনোর মতো অলৌকিক পন্থায় আমি বিশ্বাস করি না[১] আমি এ নীতিতে বিশ্বাসী যে, চেষ্টা–সংগ্রাম যেমন হবে, ফলও ঠিক সে রকমই হবে।

অবাস্তব কল্পনা

কিছু লোকের ধারণা, মুসলমানরা সংগঠিত হলেই তাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তারা মনে করেন, মুসলমানরা এক কেন্দ্রে, এক প্লাটফরমে এবং একক নেতৃত্বের অধীনে একত্রিত হয়ে গেলেই "ইসলামী রাষ্ট্র" কিংবা "স্বাধীন ভারত স্বাধীন ইসলাম" এর উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে। কিন্তু মূলত এটা জাতি পূজা ধরনেরই প্রোগ্রাম। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তা অসার কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। জাতি হিসেবে যারাই নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, নিসন্দেহে এ ধরনের প্রোগ্রামই তারা গ্রহণ করবে। চাই তারা হিন্দু জাতি হোক বা শিখ। কিংবা জার্মান হোক বা ইতালীয়। আসলে, জাতির প্রেমে নিমজ্জিত নেতা ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারদর্শী হয়ে থাকে। কর্তৃত্ব চালানো এবং দল পরিচালনার যোগ্যতা পুরোমাত্রায় তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যে কোনো জাতির মস্তক উন্নত করার ব্যাপারে এ ধরনের নেতা খুবই উপযোগী হয়ে থাকে। চাই সে হিটলার হোক কিংবা মুসোলিনী। এরূপ হাজারো লাখো নওজোয়ান যদি অনুরূপ কোনো নেতার নেতৃত্বে সুশৃংখলভাবে আন্দোলন করতে পারে, তবে বিশ্বের বুকে যে কোনো জাতির

---

১. ফ্রান্স দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হবার কয়েকদিন পূর্বে মসিয়ে রোনো বেতার ভাষণে বলেছিলেনঃ "এখন কেবল অলৌকিকতাই ফরাসীকে রক্ষা করতে পারে আমি অলৌকিকতায় বিশ্বাসী।" সে সময় মসিয়ে রোনো ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

শির উন্নত হতে পারে। চাই তারা জাপানী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হোক, কিংবা চৈনিক, তাতে কিছুই যায় আসে না। একই ভাবে "মুসলমান" যদি একটি বংশগত কিংবা ঐতিহাসিক জাতির নাম হয়ে থাকে আর উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে সেই জাতিটির উন্নতি সাধন, তবে তার বাস্তব সম্মত উপায় সেটাই, যা প্রস্তাব করা হচ্ছে। এর ফলে একটি জাতীয় রাষ্ট্রও অর্জিত হতে পারে। কিংবা কমপক্ষে দেশ শাসনে ভাল একটা অংশীদারিত্ব লাভ হতে পারে। কিন্তু ইসলামী বিপ্লব এবং ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হবার দিক থেকে এটাকে প্রথম পদক্ষেপও বলা যেতে পারে না। বরঞ্চ এ এক বিপরীত পদক্ষেপ।

বর্তমানে মুসলমান নামে যে জাতিটি এ দেশে বাস করছে, তাতে ভালমন্দ সকল প্রকার লোকই বিদ্যমান রয়েছে। চরিত্রগত দিক থেকে কাফেরদের মধ্যে যতো প্রকার লোক পাওয়া যায়, তত প্রকার লোক এ জাতিটির মধ্যেও বর্তমান। কোনো কাফের জাতি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে যত লোক যোগাড় করতে পারবে, সম্ভবত এ জাতিটিও সে কাজের জন্যে তত লোক একত্র করতে পারবে। সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, জিনা, ব্যভিচার, মিথ্যা ও ধোঁকাবাজিসহ যাবতীয় নৈতিক অপরাধের কাজে এ জাতিটি কাফেরদের থেকে কিছুমাত্র কম পারদর্শী নয়। পেট ভর্তি করা এবং অর্থ উপার্জনের জন্যে কাফেররা যত পথ অবলম্বন করে, এ জাতির লোকেরাও ঠিক ততপথই অবলম্বন করে। জেনে বুঝে নিজ মোয়াক্কেলকে জিতানোর জন্যে একদল মুসলিম উকিল প্রকৃত সত্যকে চাপা দেবার সময় ঠিক ততটাই আল্লাহর ভয়হীন হয়ে থাকে, যতটা হয়ে থাকে একজন অমুসলিম আইনজীবী। একজন মুসলিম ধনশালী সম্পদের প্রাচুর্য দ্বারা এবং একজন মুসলিম শাসক ক্ষমতার দাপটে ঠিক সেসব কাজই করে, যা করে থাকে অমুসলিম ধনী আর শাসকরা। যে জাতি নৈতিক দিক থেকে এতোটা অধপতিত হয়েছে, তার সকল জগাখিচুড়ি চরিত্রের লোকদের একত্রিত ও সংগঠিত করে দিলেই, কিংবা রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে শৃগালের মতো চাতুর্য শিখিয়ে, অথবা সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেকড়ের মতো হিংস্র করে গড়ে তোলার মাধ্যমে জংগলের কর্তৃত্ব লাভ করা হয়তো সহজ হতে পারে। কিন্তু আমার কিছুতেই বুঝে আসে না, তাদের দ্বারা আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করার কাজ কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এমতাবস্থায় কে তাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেবে? কে হবে তাদের সম্মুখে শ্রদ্ধাবনত?

তাদের দেখে কার অন্তর হবে ইসলামের জন্যে আবেগাপ্লুত? তাদের "পবিত্র জীবন ধারার" মাধ্যমে يَدْخُلُونَ فِى دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا মনোমুগ্ধকর দৃশ্য কিভাবে দেখানো যেতে পারে? কোথায় স্বীকৃতি পাবে তাদের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব? নিজেদের মুক্তির জন্যে বিশ্বের কোন্ লোকেরা তাদের স্বাগত জানাবে? আল্লাহ্র কালেমার বিজয় যে জিনিসের নাম, তার জন্যে তো এমন সব কর্মী বাহিনীরই প্রয়োজন, যারা হবে আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। কোনো প্রকার লাভ ক্ষতির পরোয়া না করেই আল্লাহ্র আইন ও বিধানের ওপর যারা থাকবে অটল অবিচল। মূলত আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠার জন্যে এ রকম একদল লোকেরই প্রয়োজন। চাই তারা বংশগত মুসলমানদের মধ্য থেকেই এগিয়ে আসুক, কিংবা আসুক অপর কোনো জাতি থেকে, তাতে কিছুই যায় আসে না। আমাদের জাতি ওপরে বর্ণিত ধরনের পঁচিশ পঞ্চাশ লাখ লোকের মেলা অপেক্ষা এ রকম দশজন মর্দে মুমিন আল্লাহ্র দীনকে বিজয়ী করার কাজে অধিকতর মূল্যবান। সে রকম বিপুল তাম্রমুদ্রার ভান্ডার ইসলামের কোনো কাজে আসবে না, যেগুলোর ওপর স্বর্ণমুদ্রার মোহরাংকিত করা হয়েছে। মুদ্রার এ সব বহিরাংকন দেখার আগে ইসলাম জানতে চায়, এগুলোর অভ্যন্তরেও সত্যিই সোনা আছে কি? জাল স্বর্ণমুদ্রার বিরাট স্তুপ অপেক্ষা আল্লাহর দীনের কাজে একটি খাঁটি স্বর্ণমুদ্রা অধিকতর মূল্যবান।

এ ছাড়া আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনের জন্যে প্রয়োজন এমন নেতৃত্ব, যারা সে সব নীতিমালা থেকে এক ইঞ্চিও বিচ্যুত হতে প্রস্তুত নয়, যেগুলো প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। এ আদর্শিক দৃঢ়তার ফলে সকল মুসলমানকে যদি না খেয়েও মরতে হয়, এমনকি তাদেরকে যদি হত্যাও করা হয়, তবু তাদের নেতৃবৃন্দ বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি বরদাশত করতে প্রস্তুত হবে না। যে নেতৃত্ব কেবল জাতির স্বার্থ দেখে, আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে জাতির লাভালাভের জন্যে যে কোনো পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা বোধ করে না এবং যার অন্তর আল্লাহর ভয়শূন্য, আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠার মহান কাজে তা যে নিরেট অযোগ্য, সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অতপর দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা দেখুন। 'হাওয়ার গতি যে দিকে, চলো সবে সেদিকে', এ বিখ্যাত প্রবাদটির ওপর বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত। এ শিক্ষা ব্যবস্থা এ মহান ইসলামের সেবার জন্যে কি করে উপযুক্ত হতে পারে, যার অটুট ফায়সালা হচ্ছেঃ হাওয়ার গতি

যে দিকেই বয়ে যাক না কেন, তোমাদেরকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর নির্ধারিত পথেই চলতে হবে।

আমি আপনাদেরকে অত্যন্ত আস্থার সাথে বলছি, আপনাদের হাতে একখন্ড স্বাধীন ভূমির কর্তৃত্ব পরিচালনার দায়িত্ব যদি অর্পণ করাও হয়, আপনারা মাত্র একদিনও সে রাষ্ট্রটি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে চালাতে সক্ষম হবেন না। একটি ইসলামী রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনী, আইন আদালত, সামরিক বাহিনী, রাজস্ব, অর্থ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার জন্যে যে ধরনের পরিগঠিত মানসিকতা এবং উন্নত নৈতিক শক্তি সম্পন্ন একদল লোকের প্রয়োজন, তার কোনো ব্যবস্থাই আপনারা করেননি। বর্তমানে দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তা থেকে অনৈসলামী রাষ্ট্রের সচিব এবং মন্ত্রী পর্যন্ত সংগ্রহ হতে পারে। কিন্তু মনে কিছু করবেন না, তা থেকে একটি ইসলামী আদালতের চাপরাসী এবং ইসলামী পুলিশ বাহিনীর জন্যে সাধারণ কনেস্টেবল পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। এ তিক্ত সত্য কথাটি কেবল আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয় বরঞ্চ আমাদের প্রাচীন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। এ লোকগুলো তো কোনো প্রকার আন্দোলন এবং বিপ্লবেরই পক্ষপাতী নয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থা এতোটা প্রাচীন ও অকর্মণ্য হয়ে গেছে যে, আধুনিক কালের ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে বিচারপতি, অর্থমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা পরিচালক এবং রাষ্ট্রদূত সরবরাহ করার ব্যাপারে তা সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এভাবে কোনো একটি দিক থেকেও কোনো প্রকার প্রস্তুতি ছাড়াই যারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে, তাদের মন-মস্তিষ্কে যে ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো ধারণাই বর্তমান নেই, তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না।

কেউ কেউ এরূপ অসার কল্পনাও পোষণ করেন যে, অনৈসলামী ধাঁচে হলেও একবার মুসলমানদের একটা জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক। পরে ধীরে ধীরে শিক্ষা ব্যবস্থা ও নৈতিক চরিত্রের সংশোধনের মাধ্যমে সেটাকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা যাবে। কিন্তু ইতিহাস, রাষ্ট্র বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে সামন্য যা কিছু অধ্যয়ন করেছি, তার ভিত্তিতে আমি বলতে চাই, এ অসার কল্পনা কখনো বাস্তবরূপ লাভ করা সম্ভব নয়। এ কল্পনা যদি বাস্তবরূপ লাভ করে, তবে আমি মনে করবো সেটা এক অলৌকিক কাজ। এ কথা আমি আগেও বলেছি, রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমাজ জীবনের গভীর তলদেশ পর্যন্ত শিকড় গেড়ে থাকে। তাই যতক্ষণ না সমাজ জীবনে বিপ্লব

সাধিত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কৃত্রিম পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিপ্লব সাধন করা সম্ভব নয়। হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীযের মতো বিরাট যোগ্যতা সম্পন্ন শাসক পর্যন্ত এ পন্থায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর পক্ষে এক বিরাট সংখ্যক তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ীর সমর্থক থাকা সত্ত্বেও তিনি যে এ উদ্যোগে ব্যর্থ হলেন, তার কারণ হলো, সামগ্রিকভাবে তখনকার সমাজ এ পরিবর্তন ও বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। মুহাম্মাদ তুগলক এবং আলমগীরের মতো শক্তিশালী বাদশাগণ নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে উন্নত দীনদারীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোনো প্রকার পরিবর্তন ও বিপ্লব সাধন করতে পারেননি। খলীফা মামুনুর রশীদের মতো পরাক্রমশালী শাষক পর্যন্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন সাধন করা তো দূরের কথা, তার বাহ্যিক রূপটিতে সামান্য পরিবর্তন করতে চেয়েও ব্যর্থকাম হন। এ হচ্ছে সে সময়কার অবস্থা, যখন এক ব্যক্তির শক্তি ও ক্ষমতা অনেক কিছুই করতে পারতো। এমতাবস্থায় গণতান্ত্রিক নীতির ওপর যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হবে, এ বুনিয়াদী পরিবর্তন ও সংশোধনের কাজে তা কি করে সাহায্যকারী হতে পারে? এ কথা কিছুতেই আমার বুঝে আসে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা তো সে সব লোকদের হাতেই আসবে, যারা ভোটারদের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হবে। ভোটারদের মধ্যে যদি ইসলামী চিন্তা ও মানসিকতাই সৃষ্টি না হয়, যথার্থ ইসলামী নৈতিক চরিত্র গঠনের আগ্রহই যদি তাদের না থাকে এবং ইসলামের সেই নিরপেক্ষ ইনসাফ এবং তার অলংঘনীয় মূলনীতিসমূহ তারা মেনে চলতে প্রস্তুত না হয়, যেগুলোর ভিত্তিতে ইসলামী হুকুমাত পরিচালিত হবে, তবে তাদের ভোট দ্বারা কখনো খাঁটি মুসলমান নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে আসতে পারবে না। এ পন্থায় তো কেবল ঐসব লোকেরাই নেতৃত্ব হসিল করবে, যারা আদমশুমারী অনুযায়ী মুসলমান বটে, কিন্তু দৃষ্টিভংগি, কর্মনীতি এবং কর্মপন্থার দিক থেকে তাদের গায়ে ইসলামের বাতাসও লাগেনি। স্বাধীন মুসলিম দেশে এ ধরনের লোকদের হাতে নেতৃত্ব আসার অর্থ হচ্ছে আমরা ঠিক সে জায়গায়ই অবস্থান করবো, যেখানে অবস্থান করছিল অমুসলিম সরকার। বরং এ ধরনের মুসলিম সরকার আমাদেরকে তার চাইতে নিকৃষ্ট অবস্থায় নিয়ে যাবে। কেননা, যে "জাতীয় রাষ্ট্রের" ওপর ইসলামের লেবেল প্রদর্শন করা হবে, ইসলামী বিপ্লবের পথ রোধ করার ক্ষেত্রে তার দুঃসাহস হবে অমুসলিমদের চাইতেও অধিক। যেসব কাজে অমুসলিম সরকার কারাদন্ডের শাস্তি প্রদান করে, সে সব ব্যাপারে এ ধরনের

"মুসলিম জাতীয়তাবাদী সরকার" ফাঁসি ও নির্বাসনের শাস্তি প্রদান করবে। এরপরও এ ধরনের রাষ্ট্র ও সরকারের নেতরা বেঁচে থাকা অবস্থায় থাকবেন 'গাজী' আর মরণের পর 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি'। এ ধরনের "জাতীয় রাষ্ট্র" ইসলামী বিপ্লবের পক্ষে সামান্যতম সহায়ক হবে বলে চিন্তা করাটাও মারাত্মক ভুল। প্রশ্ন হলো, সেই রাষ্ট্রেও যদি আমাদেরকে সামাজিক জীবনের বুনিয়াদ পরিবর্তন করার সংগ্রাম করতেই হয় এবং রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ছাড়াই নিজেদের ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে তা করতে হয়, তবে আজ থেকেই আমরা সেই কর্মপন্থা অবলম্বন করব না কেন? তথাকথিত সেই মুসলিম রাষ্ট্রের অপেক্ষায় কেন আমরা সময় এবং তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় শক্তি ব্যয় করবো, যে রাষ্ট্র সম্পর্কে আমরা জানি, তা আমাদের উদ্দেশ্য হাসিলের পথে কোন উপকারে আসবে না, বরঞ্চ অনেকটা প্রতিবন্ধকই প্রমাণিত হবে?[১]

ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা

ইসলামী বিপ্লবের জন্যে সমাজ জীবনের আমূল পরিবর্তন এবং তা সম্পূর্ণ নতুন ভাবে পরিগঠন করার সঠিক পন্থা কি? এবার আমিসংক্ষিপ্তাকারে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বর্ণনার মাধ্যমে তা আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করতে চাই। তাছাড়া এ সংগ্রামকে সফলতার শিখরে পৌঁছে দেবার যথার্থ কর্মপন্থাই বা কি? তাও পরিষ্কার করতে চাই।

ইসলাম হচ্ছে সেই মহান আন্দোলনের নাম, যা মানব জীবনের গোটা ইমারত নির্মাণ করতে চায় এক আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের দৃষ্টিভংগির ওপর। সেই অতি প্রাচীন কাল থেকেই এ আন্দোলন এই একই ভিত্তি ও পন্থায় চলে আসছে আল্লাহর রাসূলগণই (প্রতিনিধিগণ) ছিলেন এ আন্দোলনের নেতা। তাই আমাদেরকেও যদি এ আন্দোলন পরিচালনা করতে হয়, তবে তা অবশ্যি এই সকল নেতৃবৃন্দের পদ্ধতিতেই করতে হবে। কারণ, এছাড়া এ বিশেষ ধরনের আন্দোলনের জন্যে অপর কোনো কর্মপন্থা নেই এবং হতে পারেনা।

এ প্রসংগে আম্বিয়ায়ে কিরামের (আঃ) পদচিহ্ন অনুসন্ধান শুরু করলেই আমাদেরকে একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাহলো, প্রাচীন কাল থেকে যেসব আম্বিয়ায়ে কিরাম অতীত হয়েছেন, তাঁদের কার্যক্রম সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত কিছুই জানতে পারিনা। কুরআনের সংক্ষিপ্ত ইশারা ইংগিত থেকে

১. পাকিস্তানের পঁচিশ বছরের ইতিহাসে এ কথা যে কি পরিমাণ প্রমাণিত হয়েছে, তা পাঠকগণের সামনেই রয়েছে। (গ্রন্থকার)

তাঁদের কার্যক্রম সম্পর্কে সামান্য ধারণা লাভ করা যায় বটে, কিন্তু তা দ্বারা পূর্ণাংগ স্কীম তৈরী করা যেতে পারেনা। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে সাইয়্যেদুনা ঈসা আলাইহিস সালামের কিছু বাণী পাওয়া যায় (যা তাঁর বাণী বলে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়), তা থেকে ইসলামী আন্দোলনের সূচনাকাল সম্পর্কে কিছুটা ইংগিত পাওয়া যায়। জানা যায়, একেবারে প্রারম্ভিক অধ্যায়ে এ আন্দোলন কিভাবে পরিচালনা করতে হয় এবং কি কি সমস্যার সম্মুখীন তাকে হতে হয়। কিন্তু আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়গুলো সম্পর্কে সেখানে কোনো ইংগিতই পাওয়া যায়না। কারণ, সেসব অধ্যায় ঈসা আলাইহিস সালামের জীবনে আসেনি।[১]

এ ব্যাপারে আমরা কেবল এক জায়গা থেকেই পূর্ণাংগ ও সুস্পষ্ট পথ নির্দেশনা পাই। তা হলো, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিন্দেগী। নিছক ভক্তি ও ভালবাসার কারণেই আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করছিনে, বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষেই এ আন্দোলনের যাবতীয় চড়াই উৎরাই ও বাধা-বিপত্তির জগদ্দলে ভরা দীর্ঘ পথ কিভাবে পাড়ি দিতে হবে, তা জানার জন্যে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে আমরা বাধ্য। ইসলামী আন্দোলনের সকল নেতার মধ্যে কেবলমাত্র মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহই (স) সেই একক নেতা, যাঁর জীবনে আমরা এ ইসলামী আন্দোলনের প্রারম্ভিক দাওয়াতী অধ্যায় থেকে নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাষ্ট্রের ধরন, শাসনতন্ত্র, অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র বিষয়ক পলিসি এবং আইন শৃংখলা ও প্রতিরক্ষা পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি অধ্যায় ও বিভাগ সম্পর্কে পূর্ণাংগ ও সুপ্রমাণিত বিস্তারিত তথ্যাবলী পাই। সুতরাং আমি এই একমাত্র উৎসটি থেকেই যথাযথ কর্মপন্থার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি।

আপনাদের জানা আছে, রসূলুল্লাহ (স) যখন ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে আদিষ্ট হন, তখন সারাবিশ্বে নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসংখ্য সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন ছিলো। রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যবাদ তখন বর্তমান ছিলো। শ্রেণী বৈষম্য চরম আকার ধারণ করেছিল।

---

১. যেহেতু এ আন্দোলনের প্রাথমিক অধ্যায়কে বুঝার জন্যে ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতিও উপকারী, তাই এ নিবন্ধের শেষে নিউ টেস্টামেন্টের মার্ক, মথি ও লূক থেকে কিছু উদ্ধৃতি সংযোজন করে দেয়া হলো।

[গ্রন্থকার]

অবৈধ অর্থনৈতিক ফায়দা (Economic Exploitation) লোটার প্রতিযোগিতা চলছিল। আর সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তার লাভ করেছিল নৈতিক অপরাধের জাল। স্বয়ং নবী করীমের (স) স্বদেশে ছিলো অসংখ্য জটিল সমস্যা। এ সব জটিল সমস্যার সমাধানের জন্যে দেশ ছিলো একজন সুযোগ্য লীডারের অপেক্ষায় উদগ্রীব।

তাঁর গোটাদেশ ও জাতি ছিলো অজ্ঞতা, নৈতিক অধপতন, দারিদ্র ও দীনতা এবং ব্যভিচার ও পারস্পরিক কলহ বিবাদে চরমভাবে নিমজ্জিত। কুয়েত থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণের গোটা উপকূল এলাকা এবং উর্বর শস্য শ্যামল ইরাক প্রদেশ পারস্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রেখেছিল জবর দখল করে। উত্তর দিকে রোম শাসকরা হিজাযের সীমানা পর্যন্ত বিস্তার করে রেখেছিল তদের সাম্রাজ্যবাদী থাবা। ইহুদী পুঁজিপতিরা স্বয়ং হিজাযের অর্থনীতিকেই করছিল নিয়ন্ত্রণ। গোটা আরবের লোকদের তারা আবদ্ধ করে রেখেছিল চক্রবৃদ্ধি সুদের অক্টোপাশে। তাদের শোষণ নিপীড়ন পৌঁছে গিয়েছিল চরম সীমানায়। পশ্চিম উপকূলের সোজা অপর পারে হাবশায় প্রতিষ্ঠিত ছিলো খৃষ্টান রাষ্ট্র। মাত্র কয়েক বছর পূর্বে এরাই আক্রমণ চালিয়েছিল মক্কায়। হিজায এবং ইয়েমেনের মধ্যবর্তী প্রদেশ নাজরানে বাস করতো এ খৃষ্টানদেরই স্বজতির লোকেরা। তাছাড়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ছিলো তারা জোটবদ্ধ। এমন এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশেই অবস্থান করছিলো তখনকার আরব দেশ, নবীর স্বদেশ।

কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্যে যে মহান নেতাকে নিযুক্ত করেন, তিনি গোটা বিশ্বের, এমনকি স্বদেশের এতোসব জটিল সমস্যার মধ্যে একটি সমস্যার প্রতিও মনোনিবেশ করেননি। সকল সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি কেবল একটি দিকেই মানুষকে আহবান জানালেনঃ

أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর সকল প্রভুত্ব শক্তিকে অস্বীকার করো, পরিত্যাগ কর এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব ও আনুগত্য মেনে নাও।"

এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর দৃষ্টিতে এই একটি ছাড়া অন্য সকল সমস্যার কোনো গুরুত্বই ছিল না, কিংবা কোনো গুরুত্ব পাবারই উপযুক্ত ছিল না।

আপনারা জানেন, পরবর্তীকালে তিনি এ সবগুলো সমস্যার প্রতি নযর দেন। একটি একটি করে সবগুলো সমস্যার সমাধান করেন। প্রাথমিক অবস্থায় এ সব সমস্যা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে শুধুমাত্র একটি বিষয়ের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেয়া এবং তার সমাধানেই সকল শক্তি নিয়োগ করার পেছনে ছিলো বাস্তব কারণ। এর মধ্যেই নিহিত ছিলো সকল সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি। ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের নৈতিক ও সামাজিক জীবনে যতো অধপতনই সৃষ্টি হোক না কেন, সেগুলোর মূলীভূত কারণ হলো, মানুষের নিজেকে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী (Independent) এবং দায়িত্বহীন (Irresponsible) মনে করা। অন্য কথায়, নিজেকেই নিজের ইলাহ বানিয়ে নেয়া। কিংবা এর কারণ হলো, মানুষ কর্তৃক বিশ্বজাহানের একমাত্র ইলাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য কাউকেও হুকুমকর্তা ও সার্বভৌম শক্তি হিসেবে মেনে নেয়া। চাই সে মানুষ হোক কিংবা অন্য কিছু। ইসলামের দৃষ্টিতে এ বুনিয়াদী ভুলকে তার অবস্থানের ওপর বহাল রেখে কোনো প্রকার বাহ্যিক সংশোধন দ্বারা ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক অধপতন ও বিপর্যয় বিদূরিত করার ব্যাপারে কিছুতেই সফলতা লাভ করা যেতে পারে না। এমতাবস্থায় এক স্থানে কোনো একটি অপরাধ দূর করা হলেও অন্য জায়গা দিয়ে তা মাথা গজিয়ে উঠবে। সুতরাং কার্যকর সংশোধনের সূচনা কেবল একটি পন্থায়ই করা যেতে পারে। আর তাহলো, মানুষের মন মগজ থেকে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতার ধারণা নির্মূল করে দিতে হবে। তার মগজে এ কথা বসিয়ে দিতে হবে যে, তুমি যে জগতে বাস করছো, তা কোনো সম্রাট বা শাসকবিহীন সাম্রাজ্য নয়। নিসন্দেহে এ জগতের একজন বাদশাহ রয়েছেন। তাঁর কর্তৃত্ব কারো স্বীকৃতির মুখাপেক্ষী নয়। তাঁর কর্তৃত্ব মিটিয়ে দেয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর সাম্রাজ্য থেকে অন্য কোথাও বেরিয়ে যাবার শক্তি তোমার নেই। তাঁর এ শাশ্বত ও অলংঘণীয় কর্তৃত্বের অধীনে অবস্থান করে নিজেকে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী মনে করাটা তোমার পক্ষে এক বিরাট বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার পরিণতি তোমাকেই ভোগ করতে হবে। তুমি যদি বুদ্ধিমান ও বাস্তববাদী হয়ে থাকো, তবে বুদ্ধিমত্তা ও বাস্তববাদিতার (Realism) দাবী হলো, সেই মহান সম্রাটের হুকুমের সম্মুখে মাথা নত করে দাও। তাঁর একান্ত অনুগত দাস হয়ে থাকো।

অপরদিকে, বাস্তবতার এ দিকটিও ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া দরকার। তাহলো, এ গোটা বিশ্বজগতের কেবলমাত্র একজনই সম্রাট, একজনই

মালিক এবং একজনই স্বাধীন সার্বভৌম কর্তা রয়েছেন। এখানে অপর কারো কর্তৃত্ব করার কোনো অধিকার নেই। আর বাস্তবেও এখানে অপর কারো কর্তৃত্ব চলে না। সুতরাং, তুমি তাঁর ছাড়া কারো দাস হয়ো না। অপর কারো কর্তৃত্ব স্বীকার করো না। অপর কারো সামনে মাথা নত করো না। এখানে "হিজ হাইনেস" কেউ নেই। সকল 'হাইনেস' শুধুমাত্র সেই একমাত্র সত্তার জন্যেই নির্দিষ্ট। এখানে 'হিজ হোলিনেস' কেউ নেই। সমস্ত 'হোলিনেস' কেবলমাত্র সেই একমাত্র শক্তির জন্যেই নির্ধারিত। এখানে 'হিজ লর্ডশীপ' কেউ নেই। পূর্ণাংগ 'লর্ডশীপ' কেবল সেই একমাত্র সত্তার। এখানে বিধানকর্তা কেউ নেই। আইন ও বিধানকর্তা কেবলমাত্র তিনি এবং কেবলমাত্র তাঁরই হওয়া উচিত। এখানে অন্য কোনো সরকার নেই। অন্নদাতা নেই। অলী ও কর্মকর্তা নেই। নেই কেউ ফরিয়াদ শুনার যোগ্য। ক্ষমতার চাবিকাঠি কারো কাছে নেই। কারো কোনো প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদা নেই। যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত সবাই এবং সবকিছু কেবল দাসানুদাস। সমস্ত মালিকানা, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের। তিনিই একমাত্র 'রব' এবং 'মাওলা'। সুতরাং তুমি সকল প্রকার গোলামী, আনুগত্য ও শৃংখলকে অস্বীকার করো। কেবলমাত্র তাঁরই গোলাম, অনুগত এবং হুকুমের অধীন হয়ে যাও। এটাই হচ্ছে সকল প্রকার সংস্কার সংশোধনের মূলভিত্তি। এ ভিত্তির ওপরই ব্যক্তিগত চরিত্র এবং সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণাংগ অট্টালিকা সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে ওঠে। হযরত আদম (আ) থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যতো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি হবে, তা সবই একমাত্র এ বুনিয়াদী পন্থায়ই সমাধান হওয়া সম্ভব।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো প্রকার পূর্ব প্রস্তুতি, ভূমিকা এবং প্রারম্ভিক কার্যক্রম ছাড়াই সরাসরি এ মৌলিক সংশোধনের আহবান জানান। এ আহবানের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত তিনি কোনো প্রকার বাঁকাচোরা পথ অবলম্বন করেননি। এ উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাজ করে মানুষের ওপর কৌশলগত প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেননি, যে প্রভাব দ্বারা লোকদের পরিচালনা করে ধীরে ধীরে স্বীয় লক্ষ্যে উপনীত হতে পারতেন। এ সবের কিছুই তিনি করেননি। বরঞ্চ আমরা দেখি, হঠাৎ আরবের বুকে এক ব্যক্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই।' তাঁর দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যেও এ মৌলিক ঘোষণার চাইতে নিম্নতর কোনো কিছুর প্রতি নিবদ্ধ হয়নি। কেবল

নবীসুলভ সাহসিকতা আর আবেগ উদ্যমই এর কারণ নয়। বস্তুত এটাই ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃত কর্মপন্থা। এ ছাড়া অন্যান্য উপায়ে যে প্রভাব, কার্যকরিতা ও কর্তৃত্ব সৃষ্টি হয়, এ মহান সংস্কার কাজের জন্যে তা কিছুমাত্র সহায়ক নয়। যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মৌলিক আদর্শ ছাড়া অন্য কোনো কারণে আপনার সহযোগী হয়, এ মহান পুনর্গঠনের কাজে তারা আপনার কোনো উপকারে আসতে পারে না।

এ মহান কাজে কেবল সে সব লোকই আপনার সহায়ক ও সহযোগী হতে পারে, যারা শুধুমাত্র 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর' আওয়ায শুনে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ মহাসত্যকেই জীবনের বুনিয়াদ ও জীবনোদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে নেয় এবং এরি ভিত্তিতে কাজ করতে প্রস্তুত হয়। সুতরাং, ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার জন্যে যে বিশেষ ধরনের চিন্তা ও কর্মকৌশল প্রয়োজন, তার দাবীই হচ্ছে, কোনো ভূমিকা ও উপক্রমণিকা ছাড়াই সরাসরি তাওহীদের এই মৌলিক দাওয়াতের মাধ্যমে কাজ আরম্ভ করতে হবে।

তাওহীদের এ ধারণা নিছক কোনো ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা নয়। বরঞ্চ এ হচ্ছে এক পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। এ দর্শন স্বেচ্ছাচারিতা এবং গাইরুল্লাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের ওপর সমাজ জীবনে যে কাঠামো বিনির্মিত হয়েছে, তাকে সম্পূর্ণ মূলোৎপাটিত করে দেয়। বিলকুল এক ভিন্ন ভিত্তি ও বুনিয়াদের ওপর গড়ে তোলে নতুন অট্টালিকা। আজ পৃথিবীর লোকেরা আপনাদের মুয়াযযিনের আশ্হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর বিপ্লবী আওয়াযকে নীরবে শুনে যায়। কারণ, ঘোষণাকারীও জানেনা সে কি ঘোষণা করছে? আর শ্রোতাদেরও নযরে পড়ে না এর কোনো অর্থ আর উদ্দেশ্য। কিন্তু ঘোষণাকারী যদি জেনে বুঝে ঘোষণা দেয় আর দুনিয়াবাসীও যদি বুঝতে পারে যে, এ ঘোষণাকারী বলছেঃ আমি কাউকেও বাদশাহ মানি না, শাসক মানি না। কোনো সরকারকে আমি স্বীকার করি না, কোনো আইন আমি মানি না। কোনো আদালতেরআওতাভুক্ত (Jurisdiction) আমি নই। কারো নির্দেশ আমার কাছে নির্দেশ নয়। কারো প্রথা আমি স্বীকার করি না। কারো বৈষম্যমূলক উচ্চ অধিকার, কারো রাজ শক্তি, কারো অতি পবিত্রতা এবং কারো স্বেচ্ছাচারী উচ্চক্ষমতা আমি মাত্রই স্বীকার করি না। এক আল্লাহ ছাড়া আমি সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। সকলের থেকে বিমুখ। ঘোষক আর শ্রোতারা যদি ঘোষণার এ প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারে, তবে কি আপনি মনে করছেন বিশ্ববাসী এ ঘোষণাকে সহজভাবে হজম করে নেবে? বরদাশত করবে নীরবে? বিশ্বাস

করুন, সে অবস্থায় আপনি কারো সাথে লড়তে যান বা না যান, বিশ্বাবাসী কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে। এ ঘোষণা উচ্চারণ করার সাথে সাথেই আপনি অনুভব করবেন, গোটা বিশ্ব আপনার দুশমন হয়ে গেছে। চতুর্দিক থেকে সাপ, বিচ্ছু আর হিংস্র পশুরা আপনাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করছে।

মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা) যখন এ আওয়ায উচ্চারণ করেছিলেন, তখনো ঠিক এই একই অবস্থা ও পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। ঘোষক জেনে বুঝেই ঘোষণা দিচ্ছিলেন। শ্রোতারাও বুঝতে পারছিল কি কথার ঘোষণা দেয়া হচ্ছে? তাই এ ঘোষণার যে দিকটি যাকে আঘাত করেছে, সেই উদ্যত হয়ে উঠেছে একে নিভিয়ে দেবার জন্যে। পোপ ও ঠাকুররা দেখলো এ আওয়ায তাদের পৌরহিত্যের জন্য। বিপজ্জনক। জমিদার মহাজনরা তাদের অর্থ–সম্পদের, অবৈধ উপার্জনকারীরা অবৈধ উপার্জনের, গোষ্ঠী পূজারীরা গোষ্ঠীগত শ্রেষ্ঠত্বের (Racial Superioity), জাতি পূজারীরা জাতীয়তাবাদের পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পথ ও মতের, মোটকথা এ আওয়ায শুনে সব ধরনের মূর্তি পূজারীরা নিজ নিজ মূর্তি বিচূর্ণ হবার ভয়ে আতংকিত হয়ে উঠলো। তাই এতোদিন পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধোমত্ত থাকা সত্ত্বেও, এখন সকল কুফরী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলো। 'আল কুফর মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ', এ নীতিকথাটি তারা বাস্তবে রূপ দিলো। এক নতুন আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে তারা সমবেত হয়ে গেলো এক প্লাটফরমে।

এ কঠিন অবস্থাতে মুহাম্মাদ (সা)–এর সাথী কেবল তারাই হলো, যাদের ধ্যান–ধারণা ও মন–মগজ ছিলো পরিষ্কার পরিশুদ্ধ। যাদের মধ্যে যোগ্যতা ছিলো সত্যকে বুঝার এবং গ্রহণ করার। যাদের মধ্যে সত্যপ্রিয়তা ছিলো এতোটা প্রবল যে সত্য উপলব্ধির পর সে জন্যে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেবার এবং মৃত্যুকে আলিংগন করবার জন্যে ছিলো তারা সদা প্রস্তুত। এ মহান আন্দোলনের জন্যে এ ধরনের লোকদেরই ছিলো প্রয়োজন। এ ধরনের লোকেরা দু'একজন করে আন্দোলনে আসতে থাকে। আর বৃদ্ধি পেতে থাকে সংঘাত। অতপর কারো রুজি রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কাউকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়। কেউ আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কারো ছুটে যায় বন্ধু, কারো হিতাকাংখী। কারো ওপরে আসে মারধর। কাউকেও করা হয় জিঞ্জীরাবদ্ধ। কাউকে পাথর চাপা দিয়ে শুইয়ে রাখা হয় তপ্ত বালুকার ওপর। কাউকেও জর্জরিত করা হয় গালি দিয়ে, কাউকেও বা পাথর দিয়ে। উৎপাটিত

করা হয় কারো চোখ। বিচূর্ণ করা হয় কারো শির। নারী, সম্পদ, ক্ষমতা, নেতৃত্ব এবং সকল প্রকার লোভনীয় জিনিস দিয়ে খরিদ করার চেষ্টাও করা হয় কাউকে। এ সকল অগ্নিপরীক্ষা ইসলামী আন্দোলনের ওপর এসেছে। আসা জরুরী ছিলো। এগুলো ছাড়া ইসলামী আন্দোলন না মজবুত হতে পারতো, আর না পারতো ক্রমবিকাশ ও প্রসার লাভ করতে।

এ সব অগ্নিপরীক্ষা ইসলামী আন্দোলনের জন্যে ছিলো খুবই সহায়ক। এ সব অগ্নিপরীক্ষার পয়লা ফায়দা এই ছিলো যে, এর ফলে ভীরু কাপুরুষ, হীন চরিত্র ও দুর্বল সংকল্পের লোকেরা এ আন্দোলনের কাছেই ঘেঁষতে পারিনি। ফলে সমাজের মণিমুক্তা গুলোই এসে শরীক হলো আন্দোলনে। আর এ মহান আন্দোলনের জন্যে প্রয়োজন ছিলো এদেরই। তাই যিনিই এ আন্দোলনে শরীক হলেন কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়েই তাকে শরীক হতে হয়েছে। বস্তুত এক মহান বিপ্লবী আন্দোলনের উপযোগী শ্রেষ্ঠ লোকদের বাছাইর জন্যে এর চাইতে উত্তম আর কোনো পন্থা হতে পারে না।

এ অগ্নিপরীক্ষার দ্বিতীয় ফায়দা হলো, এ চরম কঠিন অবস্থার মধ্যে যারা আন্দোলনে শরীক হয়েছে, তাঁরা কোনো প্রকার ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতীয় স্বার্থে নয়, বরঞ্চ কেবলমাত্র সত্যপ্রিয়তা এবং আল্লাহ ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্যেই এ ভয়াবহ বিপদ মুসীবত ও দুঃখ-লাঞ্ছনার মোকাবেলা করেছেন। এরই জন্যে তাদের সইতে হয়েছে শত অত্যাচার নির্যাতন। এরই জন্যে হতে হয়েছে আহত প্রহৃত। এরই জন্যে তাদের পড়তে হয়েছে কায়েমী স্বার্থবাদীদের হিংস্র কোপানলে। কিন্তু এর ফল হয়েছে শুভ। এর ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে ইসলামী আন্দোলনের উপযোগী মন-মানসিকতা। পয়দা হতে থাকে নিরেট ইসলামী চরিত্র। আল্লাহর ইবাদাতে সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হতে থাকে পরম আন্তরিকতা আর নিষ্ঠা। বস্তুত বিপদ মুসীবতের এ মহা প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ইসলামী চরিত্রও ভাবধারা সৃষ্টি হওয়া ছিলো এক স্বাভাবিক ব্যাপার। কোনো ব্যক্তি যখন একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্যে প্রবল উদ্যমে যাত্রা শুরু করে, আর তার সেই লক্ষ্য পথে যদি তাকে সম্মুখীন হতে হয় প্রাণান্তকর সংগ্রাম, চরম দ্বন্দ্বসংঘাত, অবর্ণনীয় বিপদ-মুসীবত, দুঃখ-কষ্ট, সীমাহীন হয়রানী, যাতনাকর আঘাত, অমানবিক কারা নির্যাতন, বিরামহীন ক্ষুধা আর দুঃসহনীয় নির্বাসনের, তবে এ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে তার সেই মহান লক্ষ্য ও আদর্শের সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রবলভাবে রেখাপাত করে তার হৃদয় মনে। তার মন-মগজ, শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হতে থাকে তার সেই মহান লক্ষ্যেরই

ফল্গুধারা। তার গোটা ব্যক্তিসত্তাই তখন তার জীবনোদ্দেশ্যের রূপ পরিগ্রহ করে। লক্ষ অর্জনের পরিপূর্ণতা সাধনের এ সময়টিতে তাদের ওপর ফরয করা হয় সালাত। এর ফলে দূর হয়ে যায় তাদের দৃষ্টির সকল সংকীর্ণতা। গোটা দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তি এসে নিবদ্ধ হয় আপন লক্ষের ওপর। যাকে তারা একচ্ছত্র সার্বভৌম শাসক বলে সীকার কর নিয়েছে, বার বার স্বীকৃতির মাধ্যমে তাদের ধ্যান–ধারণা ও মন–মস্তিকে বদ্ধমূল হয়ে যায় তাঁর প্রভুত্ব আর সার্বভৌমত্ব। যার হুকুম ও নির্দেশনার ভিত্তিতে আঞ্জাম দিতে হবে জীবন ও জগতের সকল কাজ, তিনি যে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবকিছুই অবহিত। তিনি যে বিচার দিনের সম্রাট। তিনি যে সকল বান্দাহর ওপর দোর্দন্ড প্রতাপশালী। এ কথাগুলো বদ্ধমূল হয়ে যায় তাদের মন ও মস্তিষ্কে। কোনো অবস্থাতেই তাঁর আনুগত্য ছাড়া অপর কারো আনুগত্যের বিন্দুমাত্র চিন্তাও তাদের অন্তরে প্রবেশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় সম্পূর্ণরূপে।

এ অগ্নিপরীক্ষা ও চরম সংঘাতের তৃতীয় সুফল ছিলো, এর ফলে একদিকে এ বিপ্লবী কাফেলায় যারা শরীক হচ্ছিল, বাস্তব ময়দানে তাদের হতে থাকে যথার্থ প্রশিক্ষণ। অপরদিকে দিনের পর দিন প্রসারিত সম্প্রসারিত হতে থাকে ইসলামী আন্দোলন। মানুষ যখন দেখতে থাকলো, কিছু লোক দিনের পর দিন মার খাচ্ছে। নির্যাতিত হচ্ছে। তখন স্বাভাবিকভাবেই এর মূলীভূত কারণ জানবার প্রবল আগ্রহ পয়দা হতে থাকে তাদের মনে। এ লোকগুলোকে নিয়ে কেন এতো হৈ হট্টগোল? এ প্রশ্নের জবাব পেতে উৎসুক হয়ে উঠে তাদের মন। অতপর তাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি যখন জানতে পারতো, আল্লাহর এ বান্দাগুলো কোনো নারী, সম্পদ, প্রতিপত্তি বা কোনো প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থের নয়, এক মহাসত্য তাদের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে এবং তারা তা একনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ধরে আছে বিধায় এভাবে তাদের অত্যাচারিত করা হচ্ছে, তখন স্বতই সেই মহাসত্যকে জানার জন্যে তাদের মন হয়ে উঠতো ব্যাকুল। অতপর যখন লোকেরা জানতে পারতো, সেই মহাসত্য হচ্ছে 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ', এ জিনিসই মানব জীবনে এমন ধরনের বিপ্লব সৃষ্টি করে আর এরই দাওয়াত নিয়ে এমনসব লোকেরা উত্থিত হয়েছে, যারা কেবল এ সত্যেরই জন্যে দুনিয়ার সমস্ত ফায়দা ও স্বার্থকে ভূলুণ্ঠিত করছে। নিজেদের জমি, মাল, সন্তান সন্তুতিসহ প্রতিটি জিনিস অকাতরে কুরবানী করছে। তখন তারা বিস্ময়ে অবিভূত হয়ে যেতো। খুলে যেতো তাদের চোখ। ফেটে যেতো তাদের মন–মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখা পর্দা। আর এ মহাসত্য তাদের

হৃদয়ের মধ্যে বিদ্ধ হতো তীরের তীব্র ফলকের মতো। এরি ফলে সকল মানুষ এ আন্দোলনে এসে শামিল হয়েছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কেবল সেই গুটিকয়েক লোকই এ আন্দোলনে শরীক হতে পারেনি, যাদেরকে আভিজাত্যের অহংকার, পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ আর পার্থিব স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এ ছাড়া সে সমাজের প্রতিটি নিস্বার্থ সত্যপ্রিয় লোককেই, কেউ আগে কেউ পরে, শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনে এসে শরীক হতে হয়েছে।

এ সময় আন্দোলনের নেতা নিজ ব্যক্তিগত জীবনের মাধ্যমে তার এ আন্দোলনের যাবতীয় মূলনীতি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে মানব সমাজের সম্মুখে তুলে ধরেন। তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ এবং চালচলন ও গতিবিধির মধ্যে ফুটে উঠতো ইসলামের প্রাণসত্তা। এতে লোকেরা বাস্তবভাবে বুঝতে পরতো ইসলাম কি জিনিস? এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। কিন্তু এ ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যাখ্যামূলক আলোচনার অবকাশ নেই। তাই অতি সংক্ষেপে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক এখানে উপস্থাপন করছি।

এ বিপ্লবী আন্দোলনের নেতার স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন তৎকালীন আরবের সর্বাধিক অর্থশালী মহিলা। তিনি তাঁর স্ত্রীর এ অর্থ-সম্পদ দিয়ে ব্যবসা করতেন। ইসলামের দাওয়াত শুরু করার পর তাঁর সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। কেননা, অনুক্ষণ দাওয়াতী কাজে ব্যস্ত থাকা এবং এর ফলে গোটা আরববাসীকে নিজের শত্রু বানিয়ে নেয়ার পর ব্যবসায়ের কাজে আর কিছুতেই চলা সম্ভব ছিল না। নিজেদের হাতে যা কিছু পূর্বের জমা ছিলো, আন্দোলন সম্প্রসারণের কাজে স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তা নিশেষ করে দেন। এরপর তাদেরকে এক চরম অর্থ সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। দীন প্রচারের কাজে তিনি যখন তায়েফ গমন করেন, তখন হিজাযের এক সময়কার এ বাণিজ্য সম্রাটের ভাগ্যে সোয়ারীর জন্যে একটি গাধা পর্যন্ত জোটেনি।

কুরাইশের লোকেরা তাঁকে হিজাযের রাজতখ্ত গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়। তারা বলে, আমরা আপনাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে নেব। আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে আপনার কাছে বিয়ে দেবো। সম্পদের স্তুপ আপনার পদতলে ঢেলে দেবো। এ সব কিছু আমরা আপনার জন্যে করবো। করবো একটি শর্তে।

তাহলো, এ আন্দোলন থেকে আপনাকে বিরত থাকতে হবে কিন্তু মানবতার মুক্তিদূত তাদের এ সব লোভনীয় প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। এ সবের পরিবর্তে তিনি তাদের উপহাস, তিরস্কার আর প্রস্তরাঘাতকেই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন।

কুরাইশ এবং আরবের সমাজপতিরা বললো, হে মুহাম্মাদ, আপনার দরবারে তো সব সময় কৃতদাশ, দরিদ্র এবং নীচু শ্রেণীর (নাউযুবিল্লাহ) লোকেরা বসে থাকে। এমতাবস্থায় আমরা কী করে আপনার দরবারে এসে বসতে পারি? আমাদের ওখানে যারা একেবারে নীচুশ্রেণীর, তারাই সব সময় আপনার চারপাশ ঘিরে থাকে। তাদেরকে আপনার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিন, তবেই আমরা আপনার কাছে আসতে পারি, কথাবার্তা বলতে পারি। কিন্তু গোটা মানবতার যিনি নেতা, যিনি এসেছেন মানুষের উঁচু নীচু শ্রেণীভেদ মিটিয়া দেবার জন্যে, তিনি তো কিছুতেই সমাজপতিদের মন রক্ষার জন্যে দরিদ্রদের বিতাড়িত করতে পারেন না।

এ বিপ্লবী আন্দোলনের মহান নেতা মুহাম্মাদ (সা) তাঁর আন্দোলনের ব্যাপারে স্বীয় দেশ, জাতি, গোত্র ও বংশের কারো স্বার্থেরই কোনো পরোয়া করেননি। আন্দোলনের ব্যাপারে কোনো স্বার্থের সাথেই তিনি আপোষ করেননি। তাঁর এ নৈতিক দৃঢ়তাই মানুষের মনে এক চরম আস্থার জন্ম দিলো যে, নিসন্দেহে মানুষের কল্যাণের জন্যে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। আর এ আস্থার ফলেই প্রত্যেকটি কওমের লোক এসে তাঁর আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। তিনি যদি কেবল নিজ খান্দানের কল্যাণ চিন্তা করতেন, তবে হাশেমী গোত্রের লোক ছাড়া আর কারোই এ আন্দোলনের প্রতি কোনো আগ্রহ থাকতো না। তিনি যদি কুরাইশদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যস্ত হতেন, তবে অকুরাইশ আরবরা তাঁর আন্দোলনে শরীক হবার কল্পনাই করতো না। কিংবা আরব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা যদি হতো তাঁর উদ্দেশ্য, তবে হাবশী বেলাল, রোমদেশী সুহাইব আর পারস্যের সালমানের (রা) কি স্বার্থ ছিলো তাঁর সহযোগিতা করার? বস্তুত, যে জিনিস সকল জাতির লোকদেরকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছে, তা ছিলো নিরেট আল্লাহ্র দাসত্বের আহবান। ব্যক্তিগত, বংশগত, গোত্রগত ও জাতিগত স্বার্থের ব্যাপারে পরিপূর্ণ অনাগ্রহ। গোটা মানবতাকে নিরেট আল্লাহ্র দাসত্বের প্রতি আহবানের ফলেই বংশ, বর্ণ ও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধরনের মানুষ এ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এর প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণোৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করতে বাধ্য হন, তখনো তাঁর শত্রুদের প্রচুর ধন–সম্পদ তাঁর নিকট আমানত ছিলো। এগুলো স্ব স্ব মালিকের কাছে ফেরত দেবার জন্যে তিনি হযরত আলীকে (রা) বুঝিয়ে দিয়ে যান। কোনো দুনিয়া পূজারী লোকের পক্ষে এ ধরনের সুযোগ হাতছাড়া করা সম্ভব নয়। সে সবকিছুই আত্মসাৎ করে সাথে নিয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর দাস তখনো স্বীয় জানের দুশমন ও রক্তপিপাসুদের সম্পদ তাদের হাতে পৌঁছে দেবার চিন্তা করেন, যখন তারা তাঁকে হত্যা করবার ফায়সালা গ্রহণ করেছে। নৈতিক চরিত্রের এ অকল্পনীয় উচ্চতা অবলোকন করে আরবের লোকেরা বিস্মিত না হয়ে পেরেছিল কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দু' বছর পর যখন বদর ময়দানে তারা তাঁর বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করেছিল, তখন তাদের মন হয়তো তাদের বলছিল, এ কোন্ মহামানবের সাথে তোমরা লড়ছো? সেই মহানুভবের বিরুদ্ধে তোমরা তরবারি উত্তোলন করছো, জন্মভূমি থেকে বিদায়ের কালেও যিনি মানুষের অধিকার ও আমানতের দায়িত্বের কথা ভোলেননি? হয়তো জিদের বশবর্তী হয়ে তখন তারা লড়াই করেছিল, কিন্তু তাদের বিবেক তাদের দংশন করছিল। আমার বিশ্বাস, বদর যুদ্ধে কাফিরদের পরাজয়ের নৈতিক কারণগুলোর মধ্যে এটাও ছিলো অন্যতম।

তের বছরের প্রাণান্তকর সংগ্রামের পর মদীনায় একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ আসে। এ সময় আন্দোলনে এমন আড়াইশ তিনশ লোক সংগৃহীত হয়ে গিয়েছিল, যারা ইসলামের পূর্ণ প্রশিক্ষণ পেয়ে এতোটা যোগ্য হয়েছিল যে, তারা যে কোনো অবস্থা ও পরিস্থিতিতে মুসলমান হিসেবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম ছিলো। একটি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে এ লোকগুলো পুরোপুরি তৈরী করা ছিলো। সুতরাং সেই কাংখিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দেয়া হলো। দশ বছর পর্যন্ত স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) এ রাষ্ট্রের নেতৃত্ব প্রদান করেন। এ সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি তাদেরকে রাষ্ট্রের সকল বিভাগ ইসলামী পদ্ধতিতে পরিচালনা করার প্রশিক্ষণ দিয়ে যান। এ যুগটি ছিলো ইসলামী আদর্শের তাত্ত্বিক ধারণার (Abstract Idea) স্তর পেরিয়ে পূর্ণাঙ্গ সমাজ কাঠামোর স্তরে পৌঁছার যুগ। এ যুগে রাষ্ট্র ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, সমর ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতি সকল বিষয়ে ইসলামের নীতি ও পলিসি সুস্পষ্ট রূপরেখা লাভ করে। জীবনের প্রতিটি বিভাগের মূলনীতি প্রণীত হয়। সে সব মূলনীতিকে বাস্তবে রূপদানও করা হয়। এ বিশেষ পন্থা ও পদ্ধতিতে কাজ করার জন্যে শিক্ষা

দীক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কর্মী বাহিনী তৈরী করা হয়। এ লোকেরাই বিশ্ববাসীর সম্মুখে ইসলামী শাসনের এমন আদর্শ নমুনা পেশ করেছিল যে, মাত্র আট বছর সময়কালের মধ্যে মদীনার মতো একটি ক্ষুদ্রায়তনের রাষ্ট্র গোটা আরব রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেখান থেকেই যে লোক ইসলামের বাস্তবরূপ দেখতে পেলো এবং এর শুভ পরিণাম অনুভব করতে পারলো, সে স্বতই বলে উঠলো, প্রকৃতপক্ষে এরই নাম মানবতা। এরি মধ্যে রয়েছে মানবতার কল্যাণ। দীর্ঘকালব্যাপী যারা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো, শেষ পর্যন্ত তাদেরকেও এ মহান আদর্শ গ্রহণ করতে হয়েছিল। খালিদ বিন ওলীদ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়। আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা ইসলাম কবুল করে নেয়। আবু সুফিয়ান ইসলামের পক্ষে এসে যায়। হযরত হামযার (রা) হন্তা ওহাশী ইসলামের বিধান গ্রহণ করে নেয়। হযরত হামযার (রা) কলিজা ভক্ষণকারীনী হিন্দাকেও শেষ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির সত্যবাণীর সম্মুখে মাথা নত করে দিতে হয়, যার চাইতে ঘৃণিত ব্যক্তির তার দৃষ্টিতে আর কেউই ছিল না।

ঐতিহাসিকরা ভুল করেই তখনকার যুদ্ধগুলোকে বিরাট গুরুত্ব দিয়ে আলোকপাত করেছেন। এ ভুলের কারণে লোকেরা মনে করে বসেছে, আরবের সেই মহান বিপ্লব যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছে। অথচ আসল ব্যাপার এর সম্পূর্ণ উল্টো। সেই আট বছরে যে যুদ্ধগুলো দ্বারা আরবের যুদ্ধবাজ কওমগুলো তিরস্কৃত হয়েছিল, তার সবগুলোতে উভয় পক্ষের হাজার বারশ'র বেশী লোক নিহত হয়নি। পৃথিবীর বিপ্লব সমূহের ইতিহাস যদি আপনার জানা থাকে তবে আপনাকে অবশ্যি স্বীকার করতে হবে, এ বিপ্লব রক্তপাতহীন বিপ্লব (Bloodless Revolution) নামে আখ্যায়িত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া এ বিপ্লবের ফলাফলও পৃথিবীর সকল বিপ্লবের চাইতে ভিন্নধর্মী। এ বিপ্লব দ্বারা কেবল রাষ্ট্র ব্যবস্থারই পরিবর্তন হয়নি। বরং মানুষের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-ভাবনাও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এতে মানুষের দৃষ্টিভংগি পাল্টে যায়। চিন্তা পদ্ধতি বদলে যায়। জীবন যাপন পদ্ধতির পরিবর্তন হয়ে যায়। নৈতিক চরিত্রের জগতে আসে আমূল পরিবর্তন। স্বভাব ও অভ্যাস যায় পাল্টে। মোট কথা, এ মহান বিপ্লব গোটা জাতির কায়া পরিবর্তন করে দেয়। ব্যভিচারী নারী সতীত্বের রক্ষক হয়ে যায়। মদ্যপায়ী মাদকবিরোধী আন্দোলনের পতাকাবাহী হয়ে যায়। আগে যে চুরি করতো, এ বিপ্লব তার মধ্যে আমানতদারীর অনুভূতি এতোটা তীব্রভাবে জাগ্রত করে দেয় যে, এখন

সে এ ভেবে বন্ধুর বাড়ীর খানা খেতেও দ্বিধান্বিত হয়, না জানি এটাও অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ ভক্ষণ বলে গণ্য হয়ে যায়। এমনকি এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালাকে কুরআনের মাধ্যমে তাদের আশ্বস্ত করতে হয়েছে যে, এ ধরনের খাবার খেতে কোনো দোষ নেই।[১] ডাকাত ও ছিনতাইকারীরা এমন অনুপম দীনদার ও বিশ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, ইরান বিজয়ের সময় এদেরই একজন সাধারণ সৈনিক কোটি কোটি টাকা মূল্যের রাজমুকুট হস্তগত হবার পর, তা রাতের অন্ধকারে কম্বলের নিচে লুকিয়ে সেনাপতির নিকট পৌঁছে দেয়। সে এ গোপনীয়তা এ জন্যে অবলম্বন করেছিল, যাতে করে এ অস্বাভাবিক ঘটনা দ্বারা লোক সমাজে তার অমানতদারীর খ্যাতি ছড়িয়ে না পড়ে। তার ইখলাস বা নিয়তের নিষ্ঠার মধ্যে 'রিয়া' ও প্রদর্শনী মনোবৃত্তির কলঙ্ক লেগে না যায়। যাদের কাছে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য ছিল না, যারা নিজ হাতে স্বীয় কন্যাদের জীবন্ত কবর দিতো, তাদের মধ্যে জীবনের নিরাপত্তা ও মর্যাদাবোধ এমন তীব্রভাবে জাগ্রত হয়েছিল যে, নির্দয়ভাবে একটি মুরগী জবাই করতে দেখলেও তাদের কাছে চরম কষ্ট লাগতো। যাদের গায়ে কখনো সত্যবাদিতা ও ন্যায়-পরায়ণতার বাতাস পর্যন্ত লাগেনি, তাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও সত্যবাদিতার এমন উচ্চতম বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছিল যে, খায়বরের সন্ধির পর এদের তহসীলদার ইহুদীদের কাছ থেকে সরকারী রাজস্ব আদায় করতে গেলে ইহুদীরা তাকে এ উদ্দেশ্যে একটা মোটা অংকের অর্থ দিতে চায়, যাতে করে সে সরকারী পাওনা কম করে নেয়। কিন্তু সে তাদের মুখের ওপর উৎকোচ নিতে অস্বীকার করে দেয় এবং উৎপন্ন ফসল তাদের ও সরকারের মধ্যে সমান দু' স্তূপে বন্টন করে তাদেরকে যে কোনো একস্তূপ গ্রহণ করার অধিকার প্রদান করে। মুসলিম তহসীলদারের ইনসাফ ও সততার এ চরম পরাকাষ্ঠা দেখে ইহুদীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল, আর অজ্ঞাতেই তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, 'এ ধরনের আদল ও ইনসাফের ওপরই আসমান ও যমীন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।' তাদের মধ্যে এমন সব শাসনকর্তার আবির্ভাব ঘটে, যাদের কোনো প্রাসাদ ছিল না। বরঞ্চ তারা জনগণের সাথে বসবাস করতেন এবং তাদের মতো সাধারণ কুটীরেই বাস করতেন। পায়ে হেঁটে হাটবাজারে যেতেন। দরজায় দ্বাররক্ষী রাখতেন না। রাত দিন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যে কেউ যখন ইচ্ছা

১ দেখুন সূরা নূর, আয়াতঃ ৬১।

তাদের সাথে সাক্ষাত করতে পারতো। তাদের মধ্যে এমন সব ন্যায়পরায়ণ বিচারপতির আবির্ভাব ঘটে, যাদেরই একজন জনৈক ইহুদীর বিরুদ্ধে স্বয়ং খলীফার দাবী এ কারণে খারিজ করে দেন যে, খলীফা স্বীয় গোলাম এবং পুত্র ব্যতিত আর কাউকেও সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করাতে পারেননি।[১] তাদের মধ্যে এমন সব সেনাপতির আবির্ভাব ঘটে, যাদেরই একজন কোনো একটি শহর থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে শহরবাসীদের থেকে আদায়কৃত সমস্ত জিনিস এ বলে তাদের ফেরত দিয়ে যান যে, এখন থেকে যেহেতু আমরা তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে পারবো না, সে কারণে তোমাদের থেকে আদায়কৃত কর আমাদের হাতে রাখার কোনো অধিকার নেই। এমনি করে তাদের মধ্যে জন্ম নেয় অসংখ্য নির্ভীক রাষ্ট্রদূত। এদেরই একজন ইরানী সেনাধ্যক্ষের ভর দরবারে ইসলাম বর্ণিত মানবিক সাম্যনীতি নির্ভীকভাবে প্রকাশ করেন। তীব্র সমালোচনা করেন ইরানী শ্রেণী বৈষম্যের। আল্লাহ জানেন, সেদিনকার এ ঘটনায় কতো ইরানী সিপাহীর অন্তরে এ মানবধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ জাগ্রত হয়েছিল। ইসলামী বিপ্লব তাদের মধ্যে এমন সব তীব্র নৈতিক দায়িত্বানুভূতি সম্পন্ন নাগরিকের জন্ম দেয়, যাদের দ্বারা হাত কাটা এবং পাথর মেরে হত্যা করার মতো অপরাধ সংঘটিত হয়ে যাবার পরও, নিজেরাই এসে নিজেদের ওপর দণ্ড প্রয়োগের দাবী করতে থাকে, যাতে করে তাদের চোর বা ব্যভিচারী হিসেবে আল্লাহর আদালতে হাজির হতে না হয়। ইসলামী বিপ্লব এমন সব আদর্শ সিপাহীর জন্ম দেয়, যারা বেতন বা কোনো পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্যে যুদ্ধ করেনি। বরঞ্চ কেবলমাত্র সেই মহান আদর্শের জন্যে যুদ্ধ করেছে, যার প্রতি তারা ঈমান এনেছিল। বেতন ভাতা তো তারা গ্রহণ করেইনি, তদুপরি নিজ খরচে তারা যুদ্ধের ময়দানে যেতো এবং গনীমাতের মাল হস্তগত হলে, তা সরাসরি সেনাপতির দরবারে এনে হাজির করতো। নিজে হস্তগত করতো না।

এখন বলুন, সামাজিক চরিত্র ও সমষ্টিগত মানসিকতার এ আমূল পরিবর্তন কি শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা সম্ভব ছিলো? ইতিহাস আপনাদের সম্মুখে রয়েছে। এমন কোনো উদাহরণ কি আপনারা তাতে পেয়েছেন যে, শুধুমাত্র তরবারি কোনো মানব গোষ্ঠীর মধ্যে এরূপ আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে?

---

১. এটা হযরত আলীর (রা) খিলাফত কালের ঘটনা।

মূলত এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার, যেখানে প্রথম তের বছরে মাত্র আড়াইশ তিনশ' লোক সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে পরবর্তী দশ বছরে গোটা দেশ মুসলমান হয়ে গেলো। এর রহস্য উদঘাটনে ব্যর্থ হয়ে লোকেরা নানা প্রকার অমূলক অবাস্তব ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করে থাকে। অথচ এর কারণ দিবালোকের মতো পরিষ্কার, সুস্পষ্ট। যতোদিন এ নতুন আদর্শ অনুযায়ী মানব জীবনের বাস্তব রূপায়ণ লোকেরা দেখতে পায়নি, ততোদিন এ অভিনব আন্দোলনের নেতা আসলেই কি ধরনের সমাজ গড়তে চান, তা তারা বুঝে উঠতে পারেনি। এ সময় নানা প্রকার সন্দেহ সংশয় তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কেউ বলতো, এতো কেবল কবির কল্পনাবিলাস। কেউ বলতো, এটা তো কেবল তাবার জাদুগিরি। কেউ বলতো, লোকটি আসলে পাগল হয়ে গিয়েছে। আবার কেউ তাকে নিছক একজন কল্পনাবিলাসী (Visionary) লোক বলে ঘোষণা করতো।

এ সময় কেবল অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভাবান লোকেরাই ঈমান এনেছিল। যারা বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলেন, এ আদর্শের মধ্যেই রয়েছে মানবতার কল্যাণের প্রকৃত চিহ্ন। কিন্তু যখন এ কল্পিত আদর্শের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো, লোকেরা স্বচক্ষে এর বাস্তব চিত্র দেখতে পেলো এবং তাদের চোখের সামনে এর সীমাহীন সুফল দেখতে পেলো, তখন তারা বুঝতে পারলো, আল্লাহর এ বান্দাহ এ মহান সমাজ গঠনের জন্যেইতো এতো দুঃখ-কষ্ট আর অত্যাচার নির্যাতন সয়ে আসছেন। এরপর জিদ আর হঠকারিতার ওপর অটল থাকার আর কোনো সুযোগই থাকলো না। যার কপালেই দুটি চোখ ছিলো, আর চোখের মধ্যে জ্যোতি ছিলো, তার পক্ষে এ চোখে দেখা বাস্তবতাকে অস্বীকার করার আর কোনো উপায়ই ছিল না।

বস্তুত ইসলাম যে সমাজ বিপ্লব সংঘটিত করতে চায়, এ হলো তার সঠিক পন্থা এ হচ্ছে সেই বিপ্লবের রাজপথ। এ পন্থায়ই তার সূচনা হয় আর এ ক্রমধারায়ই হয় তা বিকশিত। এ বিপ্লবকে একটা মু'জিযা মনে করে লোকেরা বলে বসে, এ কাজ এখন আর সম্ভব নয়। এটাতো নবীর কাজ। নবী ছাড়া তা করা সম্ভব নয়। কিন্তু ইতিহাসের অধ্যয়ন আমাদের এ কথা পরিষ্কার করে বলে দেয়, এ বিপ্লব এক স্বাভাবিক বিপ্লব। এর মধ্যে কার্যকারণ পরম্পরার পূর্ণ যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই। আজো যদি ঐ একই

পদ্ধতিতে কাজ করি, তবে একই ধরনের ফলাফল প্রকাশ হতে পারে। তবে, এ কথা সত্য এ কাজের জন্যে প্রয়োজন ঈমান, ইসলামী চেতনা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, মজবুত ইচ্ছাশক্তি এবং ব্যক্তিগত আবেগ-উচ্ছাস ও স্বার্থের নিশর্ত কুরবানী। এ কাজের জন্যে এমন একদল দুসাহসী যুবকের প্রয়োজন, যারা সত্যের প্রতি ঈমান এনে তার ওপর পাহাড়ের মতো অটল হয়ে থাকবে। অন্য কোনো দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে না। পৃথিবীতে যাই ঘটুক না কেন, তারা নিজেদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পথ থেকে এক ইঞ্চিও বিচ্যুত হবে না। পার্থিব জীবনে নিজেদের ব্যক্তিগত উন্নতির সকল সম্ভাবনাকে অকাতরে কুরবানী করে দেবে। স্বীয় সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও আপনজনের স্বপ্ন সাধ বিচূর্ণ করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের বিচ্ছেদ বিরাগে চিন্তিত হবেনা। সমাজ, রাষ্ট্র, আইন, জাতি, স্বদেশ, যা কিছুই তাদের উদ্দেশ্য পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, তারই বিরুদ্ধে লড়ে যাবে। অতীতেও এ ধরনের লোকেরাই আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করেছে। আজো এ ধরনের লোকেরাই আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করবে। এ মহান বিপ্লব কেবল এ ধরনের লোকের দ্বারাই সংঘটিত হতে পারে।

(তরজুমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ইং)

সংযোজন[১]

উপরোক্ত নিবন্ধে ইসলামী বিপ্লবের কর্মপন্থা সম্পর্কে যে স্পষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করা হলো, যদিও বিষয়টি পরিজ্ঞাত হবার জন্যে তাই যথেষ্ট, তারপরও এ সম্পর্কে হযরত মসীহ আলাইহিস সালামের কিছু বক্তব্য বিশেষ পরস্পরার সাথে এখানে উল্লেখ করা উপযোগী মনে করছি। তাঁর এ বক্তব্যগুলোতে ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক অধ্যায়ের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। সাইয়্যেদুনা মসীহ আলাইহিস সালাম যে পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে ফিলিস্তিনবাসীদের কাছে 'হুকুমাতে ইলাহিয়ার' দাওয়াত পেশ করেছিলেন, যেহেতু তার সাথে আমাদের বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতির মিল রয়েছে, সে জন্যে তাঁর কর্মপন্থার মধ্যে আমাদের জন্যে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ পাওয়া যেতেপারে।[২]

> একজন আলেম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মূসার দেওয়া হুকুমের মধ্যে সবচেয়ে দরকারী হুকুম কোনটা'? উত্তরে ঈসা বলিলেন, সবচেয়ে দরকারী হুকুম এই, 'ইস্রায়েলীয়রা শুন, প্রভু, যিনি আমাদের খোদা,[৩] তিনি এক; আর তোমার সমস্ত অন্তর, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন এবং সমস্ত শক্তি দিয়া, প্রভু, যিনি তোমার খোদা, তাঁহাকে মহব্বত করিবে।' তখন সেই আলেম বলিলেন, 'হুজুর, খুব ভাল কথা আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন, খোদা এক এবং তিনি ছাড়া আর কোনো খোদা নাই।' (মার্ক/ ১২ ঃ ২৮-৩২) "প্রভু, যিনি তোমার খোদা, তাঁহাকেই তুমি সেজদা করিবে,কেবল তাহারই সেবা করিবে।" (লূক/৪ঃ ৮)

১· আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে পঠিত মূল নিবন্ধে এ অংশটুকু ছিল না। পরবর্তীতে নিবন্ধটি প্রকাশকালে এ অংশ সংযোজন করে দিয়েছি। [গ্রন্থকার]

২· এখান থেকেসামনের দিকে বাইবেলের (নিউ টেস্টমেন্ট) যতোগুলো উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে, সেগুলোর বংগানুবাদ হংকং থেকে মুদ্রিত ও বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা "ইঞ্জিল শরীফ" থেকে হুবহু প্রদত্ত হলো। [অনুবাদক]

৩· খোদা বা খোদাবন্দ শব্দটি 'ইলাহ' শব্দের সমার্থক।

"এই জন্যে তোমরা এইভাবে মুনাজাত কারও, আমাদের বেহেস্তী পিতা[১], তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক। তোমার রাজ্য আসুক। তোমার ইচ্ছা যেমন বেহেস্তে, তেমনি দুনিয়াতেও পূর্ণ হোক।" (মথি/৬ ঃ ৯-১০)

শেষ বাক্যটিতে হযরত মসীহ (আ) তাঁর উদ্দেশ্যের কথা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। সাধারণভাবে খোদার বাদশাহী বলতে কেবল তাঁর আধ্যাত্মিক বাদশাহীর যে ভ্রান্ত ধারণা প্রচার লাভ করেছে, এ বাক্য তা পুরোপুরি খন্ডন করে দিয়েছে। পৃথিবীতে খোদার আইন ও শরয়ী বিধানের তেমনি প্রতিষ্ঠাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো যেমনি সমগ্র সৃষ্টির ওপর তাঁর প্রাকৃতিক আইন কার্যকর রয়েছে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই তিনি লোকদের তৈরী করছিলেন।

"আমি দুনিয়াতে শান্তি দিতে আসিয়াছি, এই কথা মনে করিওনা; আমি শান্তি দিতে আসি নাই। বরং মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে আসিয়াছি; ছেলেকে পিতার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে, বউকে শ্বাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে আসিয়াছি। নিজের পরিবারের লোকেরাই মানুষের শত্রু হইবে।

যে কেহ আমার চাইতে পিতা মাতাকে বেশী মহব্বত করে, সে আমার উপযুক্ত নয় আর যে কেহ ছেলে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশী মহব্বত করে সে আমার উপযুক্ত নয়। যে নিজের ক্রুশ লইয়া।[২]

আমার পথে না চলে, সেও আমার উপযুক্ত নয়। যে কেহ নিজের জীবন রক্ষা করিতে চায়, সে তাহার সত্যিকারের জীবন হারাইবে; কিন্তু যে কেহ আমার জন্যে তাহার জীবন কোরবানী করিতে রাজী থাকে, সে তাহার সত্যিকারের জীবন রক্ষা করিবে।" (মথি/১০ ঃ ৩৪-৩৯)

"যদি কেহ আমার পথে আসিতে চায়, তবে সে নিজের ইচ্ছামতো না চলুক;[৩] নিজের ক্রুশ বহন করিয়া আমার পিছে আসুক। (মথি/১৬ঃ ২৪)

---

১. বনী ইসরায়ীলীরা প্রতীকীভাবে খোদার জন্যে 'পিতা' শব্দ ব্যবহার করে থাকে তারা তাঁকে সমগ্র সৃষ্টির পিতা বলে থাকে। এর অর্থ এ নয় যে, সমগ্র সৃষ্টি তাঁর সন্তান।

২. নিজের ক্রুশ নিয়ে চলার অর্থ হলো মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকা।

৩. অর্থাৎ আত্মপূজা ও ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করুক।

"তাই ভাইকে এবং পিতা ছেলেকে মারিয়া ফেলিবার জন্যে ধরাইয়া দিবে। ছেলেমেয়েরা পিতা–মাতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহাদের খুন করাইবে। আমার জন্যে সকলে তোমাদের ঘৃণা করিবে, কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকিবে, সে উদ্ধার পাইবে।" (মথি/১০ ঃ ২১–২২)

"দেখ, আমি নেকড়ে বাঘের মধ্যে ভেড়ার মতো তোমাদের পাঠাইতেছি। সাবধান থাকিও, কারণ মানুষ বিচার সভার লোকদের হাতে তোমাদের ধরাইয়া দিবে এবং তাহাদের মজলিশখানায় তোমাদের বেত মারিবে। আমার জন্যই শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের লইয়া যাওয়া হইবে।" (মথি/ ১০ ঃ ১৬–১৮)

"যে আমার নিকট আসিবে, সে যেন নিজের পিতা–মাতা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, এমনকি নিজেকে পর্যন্ত যেন আমার চেয়ে কম প্রিয় মনে করে। তাহা না হইলে সে আমার উম্মত হইতে পারে না। যে লোক নিজের ক্রুশ বহন করিয়া আমার পিছনে না আসে, সে আমার উম্মত হইতে পারে না।

আপনাদের মধ্যে যদি কেহ একটা উঁচু ঘর তৈরী করিতে চায়, তবে সে আগে বসিয়া খরচের হিসাব করে। সে দেখিতে চায় যে, উহা শেষ করিবার জন্য তাহার যথেষ্ট টাকা আছে কিনা। তাহা না হইলে, সে ভিত্তি গাঁথিবার পরে যদি সেই উঁচু ঘরটা শেষ করিতে না পারে, তবে যাহারা উহা দেখিবে তাহারা সকলে তাহাকে ঠাট্টা করিবে। তাহারা বলিবে, 'লোকটা গাঁথিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু শেষ করিতে পারিল না।' সেইভাবে আপনাদের মধ্যে যদি কেহ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার সমস্ত কিছু ছাড়িয়া না আসে, তবে সে আমার উম্মত হইতে পারে না।" (লূক/১৪ ঃ ২৬–৩৩)

এ সবগুলো আয়াত এ কথাই প্রমাণ করে যে, মসীহ (আ) কেবল একটি ধর্ম প্রচারের জন্যেই অবির্ভূত হননি, বরঞ্চ গোটা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করাই ছিলো তার মূল উদ্দেশ্য। তাই, গোটা রোম সাম্রাজ্য, ইহুদী রাষ্ট্র এবং ফকীহ ও ফরীশীদের নেতৃত্ব, এক কথায় সকল আত্মপূজারী ও স্বার্থান্বেষীদের সাথে সংঘাত সংঘর্ষের সমূহ আশংকা ছিলো বিদ্যমান। তাই তিনি সুস্পষ্টভাবে সবাইকে বলে দিচ্ছিলেন, আমি যে কাজ

করতে যাচ্ছ তা সাংঘাতিক বিপজ্জনক। আমার সাথে কেবল তাদেরই আসা উচিত যারা এ সকল বিপদ মুসীবত বরদাশত করতে পস্তুত হবে।

"তোমাদের সংগে যে খারাপ ব্যবহার করে, তাহার বিরুদ্ধে কিছুই করিও না। বরং যে কেহ তোমার ডান গালে চড় মারে, তাহাকে অন্য গালেও চড় মারিতে দিও। যে কেহ তোমার কোর্তা লইবার জন্যে মামলা করিতে চায়, তাহাকে তোমার চাদরও লইতে দিও। যে কেহ তোমাকে তাহার বোঝা লইয়া এক মাইল যাইতে বাধ্য করে, তাহার সংগে দুই মাইল যাইও।" (মথি/৫ ঃ ৩৯–৪১)

"যাহারা কেবল দেহ ধ্বংস করে, কিন্তু রূহকে ধ্বংস করতে পারে না, তাহাদের ভয় করিওনা। যিনি দেহ ও রূহ দুইটিই দোযখে ধ্বংস করিতে পারেন, বরং তাহাকেই ভয় কর।" (মথি/১০ঃ২৮)

"এই দুনিয়াতে তোমরা নিজেদের জন্য ধনসম্পদ জমা করিও না। এখানে মরিচায় ধরে ও পোকায় নষ্ট করে এবং চোর ঢুকিয়া চুরি করে। বরং বেহেস্তে তোমাদের ধন জমা করো।" (মথি/৬ঃ১৯–২০)

"কেহ দুই মনিবের সেবা করিতে পারে না। খোদা এবং ধন সম্পত্তি এই দুইয়েরই এক সংগে সেবা করিতে পার না। কি খাইবে বলিয়া বাঁচিয়া থাকিবার বিষয়ে, কিংবা কি পরিবে বলিয়া দেহের বিষয়ে চিন্তা করিওনা। বনের পাখীদের দিকে তাকাইয়া দেখ; তাহারা বীজ বুনেনা, ফসল কাটেনা গোলাঘরে জমাও করেনা, আর তবু তোমাদের বেহেস্তী পিতা তাহাদের খাওয়াইয়া থাকেন। তোমরা কি তাহাদের চেয়ে আরও মূল্যবান নও? তোমাদের মধ্যে কে চিন্তা ভাবনা করিয়া নিজের আয়ু এক ঘন্টা বাড়াইতে পারে? কাপড় চোপড়ের জন্য কেন চিন্তা কর? মাঠের ফুলগুলির কথা ভাবিয়া দেখ, সেইগুলি কেমন করিয়া বাড়িয়া উঠে। তাহারা পরিশ্রম করেনা, সূতাও কাটেনা। কিন্তু তোমাদের বলিতেছি, সোলায়মান রাজা এত জাঁকজমকের মধ্যে থাকিয়াও এইগুলির একটার মতোও নিজেকে সাজাইতে পারেন নাই। মাঠের যে ঘাস আজ আছে, আর আগামীকাল চুলায় ফেলিয়া দেওয়া হইবে, তাহা যখন খোদা এইভাবে সাজান; তখন ওহে অল্প বিশ্বাসীরা, তিনি যে তোমাদের নিশ্চয়ই সাজাইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমরা প্রথমে খোদার রাজ্যের বিষয়ে এবং তাহার ইচ্ছামতো চলিবার জন্য ব্যস্ত হও।

তাহা হইলে ঐ সমস্ত জিনিষও তোমরা পাইবে।" (মথি/১৬ ঃ ২৪–৩৩)

"চাও, তোমাদের দেওয়া হইবে; খোঁজ কর, পাইবে; দরজায় আঘাত কর, তোমাদের জন্য খোলা হইবে।" (মথি/৭ ঃ ৭)

সাইয়্যেদুনা ঈসা (আ) বৈরাগ্যবাদ, ত্যাগ এবং আজন্ম কৌমার্যের শিক্ষাদান করেছেন বলে সাধারণে ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছে। অথচ এ বিপ্লবের সূচনাকালে লোকদের ধৈর্য, কষ্ট, সহিষ্ণুতা এবং আল্লাহ নির্ভরতার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান ছাড়া কোনো গত্যন্তরই ছিল না। যেখানে একটি রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা পূর্ণ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং মানবজীবনের সমস্ত উপায়-উপকরণ কব্জা করে রেখেছে, সেখানে কোনো একটি দল পূর্ণাংগ বিপ্লব সাধনের জন্যে অগ্রসর হতে পারে না, যতোক্ষণ না সে মন-মগজ থেকে জানমালের মহব্বত দূরে নিক্ষেপ করবে, দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদ বরদাশত করার জন্যে প্রস্তুত হবে, বহু পার্থিব লাভ কুরবানী করতে এবং অসংখ্য পার্থিব ক্ষতি স্বীকার করতে তৈরী হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে সমকালীন প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অর্থই হলো, সমস্ত বিপদ মুসীবত নিজেদের ওপর ডেকে আনা। এ মহান কাজের জন্যে যারা উত্থিত হবে, তাদেরকে এক থাপ্পড় খেয়ে আরেক থাপ্পড়ের জন্যে অবশ্যি প্রস্তুত থাকতে হবে। জামা হাতছাড়া হলে চোগা হারাবার জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে। খাদ্য ও পোশাকের চিন্তা থেকে তাদেরকে মুক্ত থাকতে হবে। সমকালীন জীবিকার ভাণ্ডার যাদের মুষ্টিবদ্ধে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আবার তাদের থেকে অন্ন বস্ত্র লাভ করার আশা করা যেতে পারে না। তাই কেবল সেই ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম, যে এ সব উপায়-উপকরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে, কেবল এক আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হয় যাবে।

"তোমরা যাহারা ক্লান্ত ও বোঝা বহিয়া বেড়াইতেছ, তোমরা সকলে আমার নিকট আস; আমি তোমাদের বিশ্রাম দিব। কারণ আমার জোয়াল বহন করা সহজ ও আমার বোঝা হাল্কা।" (মথি/১১ ঃ ২৮–৩০)

সম্ভবত এর চাইতে সংক্ষেপে এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় হুকুমাতে ইলাহীয়ার মেনিফেষ্টো সংকলন করা যেতে পারে না। মানুষের ওপর মানুষের জোয়াল অত্যন্ত কঠিন এবং ভারী। এ বোঝার তলায় পিষ্ট মানুষকে হুকুমাতে ইলাহীয়ার নকীব যে সংবাদ শুনাতে পারেন, তা হলো, যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার জোয়াল আমি তোমাদের ওপর রাখতে চাই, তা যেমনি কোমল তেমনি হালকা।

"অইহুদীদের মধ্যেই রাজারা প্রভুত্ব করেন, আর তাহাদের শাসনকর্তাদের উপকারী নেতা বলা হয়। কিন্তু তোমাদের মধ্যে এই রকম হওয়া উচিত নয়। তোমাদের যে সবচেয়ে বড়, সে বরং সবচেয়ে যে ছোট তাহারই মত হোক, আর যে নেতা সে সেবাকারীর মত হোক।" (লুক/২২ ঃ ২৫-২৬)

মসীহ আলাইহিস সালাম তার সাথীদেরকেই (হাওয়ারী) এ সব উপদেশ দিতেন। এ বিষয়ে ইঞ্জিলগুলোতে বেশ কিছু বাণী বর্তমান রয়েছে। সেগুলোর সারকথা হলো, ফেরাউন এবং নমরূদদের হটিয়ে তোমরা নিজেরাই আবার ফেরাউন নমরূদ হয়ে বসো না।

"মূসার শরীয়ত শিক্ষা দিবার ব্যাপারে আলেমরা ও ফরীশীরা[১] মূসার জায়গায় আছেন। এই জন্য তাহারা যাহা কিছু করিতে বলেন, তাহা করিও এবং যাহা পালন করিবার আদেশ করেন, তাহা পালন করিও। কিন্তু তাহারা যাহা করেন, তোমরা তাহা করিওনা। কারণ তাহারা মুখে যাহা বলেন, কাজে তাহা করেন না। তাহারা ভারী ভারী বোঝা বাঁধিয়া মানুষের কাঁধে চাপাইয়া দেন, কিন্তু সেইগুলি সরাইবার জন্য নিজেরা একটা আংগুল নাড়াইতেও চান না। লোকদের দেখাইবার জন্যই তাহারা সমস্ত কাজ করেন। পাক কিতাবের আয়াত লেখা তাবিজ তাহারা বড় করিয়া তৈরী করেন। আর নিজেদের ধার্মিক দেখাইবার জন্য চাদরের কোনায় কোনায় লম্বা ঝালর লাগান। ভোজের সময়ে সম্মানের জায়গায় এবং মজলিসখানায় প্রধান আসনে তাহারা বসিতে ভালবাসেন। তাহারা হাটে বাজারে সম্মান খুঁজিয়া বেড়ান আর চান, যেন লোকেরা তাহাদের ওস্তাদ (রাব্বী) বলিয়া ডাকে।"

"ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, ধিক আপনাদের। আপনারা। লোকদের সামনে বেহেস্তী দরজা বন্ধ করিয়া রাখেন। তাহাতে নিজেরাও ঢুকেন না, আর যাহারা ঢুকিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহাদেরও ঢুকিতে দেন না।"

"ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, ধিক আপনাদের! একটি মাত্র লোককে আপনাদের ধর্মমতে আনিবার জন্যে আপনারা দুনিয়ার কোথায় না যান। আর সে যখন আপনাদের ধর্মমতে আসে, তখন আপনারা নিজেদের চেয়ে তাহাকে অনেক বেশী করিয়া দোজখী করিয়া তোলেন।"

---

১. শরীয়াতের ধারক-বাহকদের ফরীশী বলা হয়।

"আপনারা নিজেরা অন্ধ অথচ অন্যদের পথ দেখান। একটা ছোট মাছিও আপনারা ছাঁকেন অথচ উট গিলিয়া ফেলেন।"

"ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, ধিক আপনাদের! আপনারা চুন লাগানো সাদা কবরের মত, যাহার বাহিরের দিকটা সুন্দর, কিন্তু ভিতরে মরা মানুষের হাড় গোড় ও সমস্ত রকম ময়লায় ভরা। ঠিক সেইভাবে বাহিরে বাহিরে আপনারা লোকদের চোখে ধার্মিক, কিন্তু ভিতরে ভণ্ডামি ও পাপে পূর্ণ।" (মথি/২৩ ঃ ২–২৮)

সে সময়কার আলেম ও শরীয়াতের ধারক বাহকদের এ ছিলো অবস্থা। ইলমের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কেবল আত্মপূজার কারণে তারা ছিলো গুমরাহ, পথভ্রষ্ট। সাধারণ লোকদেরও তারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করছিল, আর এ বিপ্লবের পথে রোমের কাইজারদের থেকেও তারা বড় প্রতিবন্ধক ছিলো।

"তখন ফরীশীরা চলিয়া গেলেন এবং কেমন করিয়া ঈসাকে তাঁহার কথার ফাঁদে ফেলা যায়, সেই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাহারা হেরোদের[১] দলের কয়েকজন লোকের সংগে নিজেদের কয়েকজন শাগ্রেদকে ঈসার নিকট পাঠাইলেন। তাহারা ঈসাকে বলিল, 'হুজুর, আমরা জানি, আপনি একজন সৎলোক। খোদার পথের বিষয়ে আপনি সত্যভাবে শিক্ষা দিয়া থাকেন। লোকে কি মনে করিবে না করিবে, তাহাতে আপনার কিছু যায় আসে না। কারণ আপনি কাহারও মুখ চাহিয়া কিছু করেন না। তাহা ইহলে আপনি বলুন, রোম সম্রাটকে কি কর দেওয়া হালাল? আপনার কি মনে হয়? তাহাদের খারাপ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ঈসা বলিলেন, 'ভণ্ডেরা, কেন আমাকে পরীক্ষা করিতেছ? যে টাকায় কর দিবে তাহার একটা আমাকে দেখাও।' তাহারা একটা দীনার ঈসার নিকট আনিল। তখন ঈসা তাহাদের বলিলেন, 'ইহার উপর এই ছবি ও নাম কাহার?' তাহারা বলিল, 'রোম সম্রাটের'। ঈসা তাহাদের

---

১. মসীহ আলাইহিস সালামের যুগে ফিলিস্তিনের এক অংশে ভারতের দেশীয় রাজ্যের ন্যায় একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এটি রোম সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করতো। এর প্রতিষ্ঠাতা হেরোদের নামে সাধারণত এটিকে হেরোদী রাষ্ট্র বলা হতো। হেরোদের দল বলতে সেই রাষ্ট্রের পুলিশ বা সি, আই, ডির লোক বুঝানো হয়েছে।

বলিলেন, 'তবে যাহা সম্রাটের তাহা সম্রাটকে দাও, আর যাহা খোদার তাহা খোদাকে দাও।" (মথি/২২ ঃ ১৫–২১)

এ ঘটনা থেকে জানা যায়, মূলত এটা ছিলো একটা ষড়যন্ত্র। ফরীশীরা আন্দোলন পাকা হবার আগেই সরকারের সাথে হযরত ঈসার (আ) সংঘর্ষ বাধিয়ে দিতে এবং আন্দোলন শিকড় গেড়ে বসার আগেই সরকারী শক্তি দ্বারা তাকে মূলোৎপাটিত করে দিতে চাইছিল। সে কারণে হেরোদী রাষ্ট্রে সিআইডিদের সামনে রোম সম্রাটকে কর দেয়া বৈধ কিনা, সে প্রশ্ন তারা উত্থাপন করেছিল। জবাবে হযরত ঈসা (আ) যে নিগূঢ় অর্থবহ কথাটি বলেছিলেন, বিগত দুহাজার বছর থেকে খৃস্টান অখৃষ্টান সকলে তার এই অর্থই করে আসছে যে, ইবাদাত কর খোদার আর আনুগত্য কর সমকালীন প্রতিষ্ঠিত সরকারের। কিন্তু আসলে তিনি একথাও বলেননি যে, রোম সম্রাটকে কর দেয়া বৈধ। কারণ এমনটা বলা ছিলো তাঁর দাওয়াতের পরিপন্থী। আর তাকে ট্যাক্স না দেওয়ার কথাও তিনি বলেননি। কারণ তখনও পর্যন্ত তাঁর আন্দোলন এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি যে, তিনি কর প্রদান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত দিতে পারতেন। এ জন্যেই তিনি তখন একটি সূক্ষ্ম কথা বলে দিলেন যে, কাইজারের নাম এবং ছবি তাকে ফেরত দাও। আর খোদা যে নিখাঁদ সোনা তৈরী করেছেন, তা তার পথে ব্যয় করো।

তাদের এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবার পর তারা স্বয়ং মসীহ আলাইহিস সালামের জনৈক সাহাবীকে ঘুষ দিয়ে এমন এক সময় মসীহ আলাইহিস সালামকে গ্রেফতার করিয়ে দিতে সম্মত করায়, যখন গণবিদ্রোহের কোনো আশংকা থাকবে না। তাদের এ ষড়যন্ত্র সফল হয়। ইহুদী সক্রীটু হযরত মসীহকে গ্রেফতার করিয়ে দেয়।

> "তখন সেই সভার সকলে উঠিয়া ঈসাকে প্রধান শাসনকর্তা পীলাতের নিকট লইয়া গেলেন। তাহারা এই কথা বলিয়া ঈসার বিরুদ্ধে নালিশ জানাইতে লাগিলেন, 'আমরা দেখিয়াছি, এই লোকটা সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের লোকদের লইয়া যাইতেছে। সে সম্রাটকে কর দিতে নিষেধ করে এবং বলে, সে নিজেই মসীহ, একজন রাজা।'
>
> তখন পীলাত প্রধান ইমামদের এবং সমস্ত লোকদের বলিলেন, 'আমিতো এই লোকটির কোন দোষই দেখিতে পাইতেছি না।' কিন্তু তাহারা জিদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এহুদিয়া প্রদেশের সমস্ত জায়গায় শিক্ষা দিয়া

সে এ লোকদের ক্ষেপাইয়া তুলিতেছে। গালীল প্রদেশ হইতে সে শুরু করিয়াছে, আর এখন এখানে আসিয়াছে।'

কিন্তু লোকেরা ঈসাকে ক্রুশের উপর মারিয়া ফেলিবার জন্য চীৎকার করিতে থাকিলো এবং শেষে তাহারা চেঁচাইয়া জয়ী হইল।" (লূক/২৩ ঃ ১-২৩)

এভাবেই ঐ সমস্ত লোকদের হাতে মসীহ আলাইহিস সালামের মিশনের পরিসমাপ্তি ঘটে, যারা নিজেদেরকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উত্তরাধিকারী মনে করতো। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ অনুযায়ী মসীহ আলাইহিস সালামের নবুয়াতকাল ছিলো দেড় থেকে তিন বছরের মতো। এ সংক্ষিপ্ত সময়কালে তিনি ঐ পরিমাণ কাজ করেছিলেন, যতোটা করেছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা) তাঁর মক্কী জীবনের প্রাথমিক দুই তিন বছরে। কোনো ব্যক্তি যদি ইঞ্জিলের ওপরোল্লিখিত আয়াতগুলোর সাথে কুরআন মজীদের মক্কী সূরা সমূহ এবং মক্কায় অবস্থানকালীন হাদীসগুলোকে মিলিয়ে দেখেন, তবে তিনি এতদোভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্য দেখতে পাবেন।

একটি সত্যনিষ্ঠ দলের প্রয়োজন

পৃথিবীতে বর্তমানে একটা মহাপ্রলয় চলছে।* এর উদ্দেশ্য কি কেবল বিশ্ববাসীকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দেয়া অথবা প্রলয়ের পর ভালো একটা কিছু সৃষ্টি করা--তা আমরা জানি না। তবে বাইরের লক্ষণ দেখে আঁচ করা যায়, এ যাবত যে সভ্যতার ধ্বজাধারীরা মানব জাতির নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে, তাদের আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এসেছে। তাদের পরীক্ষার মিয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। আল্লাহর শাশ্বত বিধান অনুযায়ী তাদেরকে ও তাদের এ জাহেলী সভ্যতাকে পৃথিবীতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থেকে হটিয়ে দেয়ার সময় আগত প্রায়। পৃথিবীতে তাদের দায়িত্ব পালনের যেটুকু সুযোগ পাওয়া দরকার ছিল তা তারা পেয়েছে। নিজেদের যাবতীয় গুণপনা এবং সমস্ত প্রচ্ছন্ন যোগ্যতা ও প্রতিভাকে তারা সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়েছে। তাদের ভেতর হয়তো এমন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই যা প্রকাশ পায়নি। তাই মনে হচ্ছে, খুব শিগ্‌গীর পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে তারা অপসারিত হবে। বিশ্বব্যাপী তাদের এ ব্যাপক পরাজয়ের মহড়া সম্ভবত এ জন্যেই চলছে, যাতে করে তারা নিজেদের মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা নিজেরাই করে রেখে যেতে পারে। এরপর সারা দুনিয়ায় আবার একটা অন্ধকার যুগও এসে যেতে পারে, যেমন সর্বশেষ ইসলামী আন্দোলনের পতন ও বর্তমান জাহেলী সভ্যতার আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ে এসেছিল। আবার এ ভাঙ্গার ভেতর দিয়ে নতুন করে একটা গড়ার পালাও শুরু হতে পারে।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্র (National Socialism) এবং কমিউনিজমের যে শক্তিগুলো আজ পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত, তারা আসলে আলাদা আলাদা সভ্যতার ধারক নয়। তাই তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে

---

* এ প্রবন্ধ লেখার সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। লেখক সে দিকেই ইংগিত করেছেন।

ভালোটিকে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। আসলে এরা একই সভ্যতার তিনটে শাখা। বিশ্ব প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে এদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন। একই জীবন দর্শন ও একই নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে এদের কাঠামো তৈরী হয়েছে। মানুষকে পশু মনে করা, বিশ্বজগতকে স্রষ্টা বিহীন ঠাওরানো, প্রকৃতি–বিজ্ঞান থেকে মানব জীবন পরিচালনার জন্য আইন আহরণ করা এবং অভিজ্ঞতা, স্বার্থপরতা ও প্রকৃতির লালসাকে নৈতিকতার ভিত্তিরূপে গণ্য করা—এ সবই হলো এ তিনটি সংঘর্ষশীল আদর্শের সাধারণ উপাদান। এদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এ জাহেলী সভ্যতা সর্বপ্রথমে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাতন্ত্রের বীজ বপন করেছিল। তার ফলে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী মানবজাতি এর হাতে নিষ্পেষিত ও নির্যাতিত হতে থাকে। এর যুলুম ও নিষ্পেষণ যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে শুরু করে তখন ঐ একই সভ্যতা সমাজতন্ত্রকে তার প্রতিকারের উপায় হিসেবে পেশ করে। কিন্তু এ প্রতিকার যে মূল রোগের চেয়েও মারাত্মক তা অল্পদিনেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। অবশেষে সেই একই সভ্যতার পক্ষ থেকে ফ্যাসিবাদ অথবা জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্র নামে প্রতিকারের দ্বিতীয় উপায় উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, জাহেলিয়াত জননীর এ সর্বশেষ সন্তানটি নাশকতা ও বিপর্যয় সৃষ্টিতে আগের দু' সন্তানকেও হার মানিয়েছে।

এভাবে যে সভ্যতা মানুষকে লাগামহীনভাবে বিচরণশীল পশু মনে করে দুনিয়ার বুকে আপন দায়িত্ব পালন করা শুরু করেছে এবং মানুষকে পররাজ্য গ্রাস থেকে শুরু করে জঘন্যতম নৃশংসতা পর্যন্ত কোন মানবতা বিধ্বংসী ব্যাধি উপহার দিতে বাদ রাখেনি,—তাকে পরীক্ষা করে দেখার আর কোন অবকাশই নেই। এ সভ্যতা বাস্তবিক পক্ষে তার সকল শাখা প্রশাখা সমেত স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছে। তার পরীক্ষা–নিরীক্ষার মিয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তার কাছে এখন আর এমন কোন দাওয়াই অবশিষ্ট নেই, যা সে মানব জাতির সমস্যা সমাধানের জন্য দিতে পারে। তবুও যদি ধরে নেয়া যায় যে, নিজের আয়ুষ্কাল আরো কিছুটা বাড়িয়ে নেয়ার জন্য সে আরো একটা 'ইজম' বা মতবাদ হাজির করবে, তাহলেও আল্লাহ নিজের গড়া পৃথিবীটাকে নৈরাজ্য দিয়ে ভরে তোলার আরো সুযোগ তাকে দেবেন তা মনে হয় না। হতে পারে, বর্তমান সংঘর্ষের পর এর শাখা প্রশাখাগুলোর মধ্যে কোনোটা অবশিষ্ট্য থেকে যাবে। তবে তা যে খুবই ক্ষণস্থায়ী হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সেই শাখার মধ্য থেকে শিগ্‌গীরই আগুনের শিখা বেরুবে এবং সেই আগুনেই সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

এখন প্রশ্ন হলো, এ সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর দুনিয়াতে কি আবার কোন অন্ধকার যুগ শরু হবে, না নতুন কোন গঠন প্রক্রিয়া দানা বাঁধবে? এ প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করে দুটো জিনিসের ওপর।

প্রথমত, বর্তমান নিরেট জাহেলিয়াতের ব্যর্থতার পর আগেকার ভ্রান্ত মতবাদগুলোর চেয়ে ভালো কোন মতবাদ মানুষের হস্তগত হবে কিনা, মানুষ যার কাছ থেকে কল্যাণ লাভের আশা করবে। যার ভিত্তিতে একটি শক্তিমান ও জীবন্ত সভ্যতা গড়ে ওঠা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয়ত, একটি নতুন মতাদর্শের ভিত্তিতে নতুন সভ্যতা বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক জিহাদ পরিচালনার যে যোগ্যতা ও ক্ষমতা প্রয়োজন এবং যে প্রখর ধীশক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তির দরকার সেই শক্তি ও যোগ্যতা সম্পন্ন একটি মানব গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটবে কিনা। এ মানব গোষ্ঠীর নৈতিক গুণাবলী বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার ধারকদের ঘৃণ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তুলনায় অনেক ভালো ও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হবে।

এ ধরনের কোন একটা মতাদর্শ যদি সত্যিই সময় মত হস্তগত হয়ে যায় এবং তার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের জন্য একটি অভীপ্সিত সত্যনিষ্ঠ দল তৎপর হয়ে ওঠে তাহলে অবশ্যই মানবজাতি আবার একটা অন্ধকার যুগের খপ্পরে পড়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। অন্যথায় এ অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার হাত থেকে তাকে রক্ষা করার ক্ষমতা কারোর নেই।

আজ মানবজাতি এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। মানুষ মানুষের সাথে বন্য পশুর চেয়েও হিংস্র আচরণ করছে। আদিম ও অসভ্য যুগেও মানুষ এ ধরনের নির্মমতা ও নৃশংসতার আশ্রয় নেয়নি। মানুষের আজকের নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতার নজীর বন্য পশুদের মধ্যেও পাওয়া যাবে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষের ফল দাঁড়িয়েছে বোমা মেরে দেশের পর দেশ জ্বালিয়ে দেয়া এবং ট্যাংক চালিয়ে নিরীহ জনগণকে পিষ্ট করা। মানুষের সাংগঠনিক যোগ্যতাকে আজ সভ্যতা বিধ্বংসী আগ্রাসী সেনাবাহিনী সংগঠনের কাজে লাগানো হচ্ছে। ভয়াবহ মারণাস্ত্র তৈরী আজকের শিল্পোন্নতির অন্যতম ফসলে পরিগণিত হয়েছে। প্রচারযন্ত্রগুলো পৃথিবী ব্যাপী মিথ্যা রটনা ও জাতিতে জাতিতে রেষারেষী, হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির চরম পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে। এ সব

কিছু মিলে আজ যে বিভীষিকাময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তা কোন মানুষকে হতাশার গভীর আবর্তে তলিয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট। এ অবস্থা মানুষকে ভগ্নহৃদয় করার এবং নিজের সমস্ত যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে তাকে চরম নৈরাশ্যে নিমজ্জিত করার ক্ষমতা রাখে। আর এ নৈরাশ্যের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে মানবজাতি চরম বিতৃষ্ণায় বহু শতাব্দীকালের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন ও অচেতন হয়ে যাবে।

আমি আগেই বলেছি যে, এহেন শোচনীয় ও বেদনাদায়ক পরিণতি থেকে মানব-জাতিকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হলো, একটি গঠন মূলক মতাদর্শের সক্রিয় হয়ে ওঠা ও একটি সত্যনিষ্ঠ জন গোষ্ঠীর আবির্ভাব।

কিন্তু সেই সম্ভাব্য মতাদর্শ—যা আজকের পরিবেশে সাফল্যমন্ডিত হতে সক্ষম-কোন্‌টি?

এ ক্ষেত্রে যদি আদিম অংশীবাদী জাহেলিয়াতের কথা পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, প্রাচীন যুগে বহু বড় বড় সভ্যতা জন্ম দেয়া সত্ত্বেও তা এখন মৃত। এর পুনরুজ্জীবনের আর কোন সম্ভাবনা নেই। শিরক বা অংশীবাদ নির্মূল হয়ে গেছে। অজ্ঞ মানুষের জীবনে এর কিছু প্রভাব থাকলেও বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীজনদের এখন আর এতে বিশ্বাস নেই। বিশ্বজগতের পরিচালনায় অনেকগুলো মাবুদ নিয়োজিত রয়েছে এবং দেবদেবী বা আত্মাদের হাতে মানুষের কল্যাণ অকল্যাণের চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে এমন অলীক খেয়ালে তারা আর মত্ত থাকতে প্রস্তুত নয়, তাছাড়া অংশীবাদী ধ্যান-ধারণা দ্বারা মানব জীবনের জটিল সমস্যাবলীর সমাধান হতে পারে না, এটা একটা বাস্তব সত্য। সমাধান তো দূরের কথা এর ফলে সমস্যাগুলো আরো জটিল হয়ে পড়ে। আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সমস্যা মানব জাতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতির অভাব। অংশীবাদ এ সমস্যার কোন সমাধানতো করেই না, বরং তা অধিকতর অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টিতেই নিয়োজিত। সুতরাং কোন অংশীবাদী মতাদর্শের আজকের বিশ্বে প্রতিপত্তি ও আধিপত্য লাভের কোনই অবকাশনেই।

এরপরে আসে বৈরাগ্যবাদের সম্ভাব্য ভূমিকার কথা। বৈরাগ্যবাদ কোন শক্তি বলে গণ্য হয়নি, এখনো হতে পারে না। জন্মান্তরবাদ, অহিংসাবাদ, সর্বেশ্বরবাদ ইত্যাকার মতবাদগুলো--যা মানবাত্মাকে হিমাগারে পাঠিয়ে দেয়, সাহস ও উৎসাহকে স্তিমিত ও নিস্তেজ করে এবং মানুষের

চিন্তাশক্তিকে অলীক কল্পনার উন্মত্ততায় মাতিয়ে অকর্মণ্য ও নির্জীব করে রাখে,—এতটা জীবনী শক্তিই নেই যা পৃথিবীর কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও পরিচালনাভার গ্রহণে সক্ষম কোন সভ্যতা জন্ম দিতে পারে। কোন যাদুকর এগুলোর মৃত দেহে প্রাণ-সঞ্চারের হাজারো চেষ্টা করলেও এগুলো কখনো জ্ঞান, তপস্যা ও ত্যাগের স্তর ছাড়িয়ে একটি গঠনমূলক কৃষ্টির পত্তন, একটি ন্যায়নিষ্ঠ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং একটি গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে না। কাজেই এ সব মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া একমাত্র মৃত ও পতনোন্মুখ জাতিদের পক্ষেই সম্ভব। কোন জীবন্ত ও উদীয়মান জাতি এর প্রতি কোন রকম আকর্ষণ অনুভব করতে পারে না।

আর নিরেট জাহেলিয়াতের (যা আদৌ কোন আধ্যাত্মিকতা ও অতি প্রাকৃতিক সত্তায় বিশ্বাস করে না এবং জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বস্তু নির্ভর মনে করে) পর্যালোচনায় গেলে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, এ সম্পর্কে বিশ্ববাসীর এত বেশী তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, তারা অচিরেই এ থেকে চূড়ান্তভাবে নিরাশ হয়ে যাবে। নিরেট জাহেলিয়াতের দরুনই মানুষ নিজেকে পশু ভাবতে শিখেছে আর সে জন্য পশুদের জীবন থেকেই আহরণ করেছে সে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং যোগ্যতমের বাঁচার অধিকার ইত্যাকার মতবাদ। নিজেকে পশু ভাবার কারণেই বস্তুগত স্বার্থ উদ্ধার ও জৈবিক লালসা চরিতার্থ করাকে সে জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হিসেবেই নির্ধারণ করেছে, অভিজ্ঞতা ও স্বার্থসিদ্ধিকে গ্রহণ করেছে নৈতিকতার উৎস ও ভিত্তি হিসেবে, আর মানুষের চেয়ে উচ্চতর কোন সার্বভৌম শক্তির কর্তৃত্ব না মানাই হয়েছে তার নীতি। এর ফল যা হবার তাই হয়েছে এবং তা অত্যন্ত বিষময় হয়েই দেখা দিয়েছে। এ সব মতবাদের দরুন মানুষের মধ্যে জাতীয় ও বর্ণগত আভিজাত্যবোধ ও একদেশদর্শিতার প্রসার ঘটেছে। জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্ম হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও অর্থনৈতিক শোষণের মত মারাত্মক আপদ মাথা তুলেছে। নিজস্ব ব্যাপারে ব্যক্তি থেকে শুরু করে বড় বড় জাতি ও সাম্রাজ্য পর্যন্ত নৈতিকতার কোন তোয়াক্কা করে না। সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার এই যে, মানুষ সত্যি সত্যি পশুর মত কাজ করা শুরু করেছে এবং অন্যান্য মানুষের সাথে পাশবিক ও যান্ত্রিক আচরণে প্রবৃত্ত করেছে। এ সব মতবাদ সমাজে হয় গণতন্ত্রের নামে একজনের ওপর আর একজনের অত্যাচারের, অবৈধ আয়ের এবং অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা করার

অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে, নয়তো সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের নামে মানুষকে ছাগল ভেড়ার পালের মত একটি স্বৈরচারী দলের হাতে সপে দিয়েছে, যেন তাদেরকে যেদিক খুশী তাড়িয়ে নেয়া যায় অথবা তাদের সাহায্যে যেমন খুশী স্বার্থ উদ্ধার করা যায়। এ মতবাদগুলোর এই যে পরিণতি দেখা দিয়েছে তা কোন আকস্মিক ভুল-ভ্রান্তির ফল নয় বরং ঐ বিষবৃক্ষেরই স্বাভাবিক বিষফল। সুতরাং মানুষ যেমন এ যাবত এগুলো থেকে কোন কল্যাণ লাভ করতে পারেনি, তেমনি ভবিষ্যতেও পারবে না। বস্তুত মানুষ সম্পর্কে এরূপ পশুসুলভ ধারণা, জীবন ও জগত সম্পর্কে এমন জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং এহেন অভিজ্ঞতা ও স্বার্থপরতা ভিত্তিক নৈতিকতার ভিত্তিতে এমন কোন সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভবই নয়—যা মানুষের জন্য যথার্থ কল্যাণ বয়েআনতেপারে।

এ সব মতবাদ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর মানবজাতি একমাত্র এমন একটি মতবাদ থেকে সার্বিক কল্যাণ আশা করতে পারে যার বৈশিষ্ট্য হবে নিম্নরূপঃ

—সে মতবাদ মানুষকে মানুষই মনে করবে, পশু নয়। মানুষকে নিজের সম্পর্কে ভালো জ্ঞান পোষণে উদ্বুদ্ধ করবে। পাশ্চাত্যের জড়বাদী দর্শন যেমন মানুষকে নিছক পশুরূপে গণ্য করে, খৃষ্টবাদ যেমন তাকে 'জন্মগত পাপী' বলে মনে করে এবং হিন্দু দর্শন যেমন তাকে 'পুনর্জন্মবাদের শৃংখলাবদ্ধ' মনে করে, এ মতবাদ তেমন মনে করবে না, বরং তাকে এ সবের অনেক উর্ধে মনেকরবে।

—সে মতবাদ মানুষকে চরম স্বেচ্ছচারী ও লাগামহীন জীব মনে করবে না, বরং তাকে বিশ্ব সম্রাটের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধীন ও তাঁর নিকট দায়ী বলে ঘোষণাকরবে।

—সে মতবাদ মানুষকে এক বাস্তব ও কার্যোপযোগী নৈতিক বিধানের আওতাধীন করবে এবং তাকে সেই নৈতিক বিধানে আপন প্রকৃতির খেয়ালখুশীমত রদবদল করতে দেবেনা।

—সে মতবাদ বস্তুগত ভিত্তিতে মানব জাতিকে বিভক্ত করবে না বরং তার পরিবর্তে মানবজাতির ঐক্যের জন্য এমন একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি গড়ে তুলবে, যার ওপর মানবজাতি সত্যিই ঐক্যবদ্ধ হতে সক্ষম।

—সমাজ জীবনের জন্য সে মতবাদ যেসব মূলনীতি দেবে তার আলোকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ও জাতিতে জাতিতে সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

—সে মতবাদ মানুষকে আত্মতুষ্টি ও আত্মপূজার চেয়ে উচ্চতর জীবন লক্ষ্য এবং জীবনের জড়বাদী ও বস্তুবাদী মূল্যবোধের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মূল্যবোধ শিক্ষাদেবে।

—সর্বোপরি সে মতবাদ মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তামাদ্দুনিক উন্নতিতে শুধু সাহায্যই করবে না, বরং সুষ্ঠু ও নির্ভুল পথনির্দেশও দেবে। মানবজাতিকে নৈতিক ও বস্তুগত উভয় দিক দিয়ে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়েনিয়েযাবে।

এ ধরনের মতবাদ ইসলাম ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মানবজাতির ভবিষ্যৎ এখন ইসলামের ওপরই নির্ভরশীল। মানুষের নিজের রচিত সমস্ত মতবাদ ব্যর্থ হয়ে গেছে। সে সব মতবাদের একটিরও আর সাফল্যের কোন অবকাশ নেই। এমনকি মানুষের মধ্যে এখন সেই উৎসাহ-উদ্দীপনাও নেই যে, নতুন করে কোন মতবাদ রচনা করবে এবং তার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিজের ভাগ্যকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেবে। এমতাবস্থায় যে মতবাদ ও মতাদর্শের ওপর মানুষ নিজের সার্বিক কল্যাণের জন্য নির্ভর করতে পারে, যে মতবাদ সমগ্র মানব জাতির জন্য এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থায় পরিণত হতে সক্ষম এবং যে মতবাদ গ্রহণ করে মানবজাতি সর্বগ্রাসী ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে পারে, তা একমাত্র ইসলাম ছাড়া আর অন্য কিছুই হতে পারে না।

তাই বলে এ কথা ভেবে নেয়া ঠিক হবে না যে, পৃথিবীটা ইসলামের কাছে আত্মসমর্পনের জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে ; কেবল ইসলামের গুণাবলী বর্ণনা করে ইসলামের ওপর ঈমান আনার জন্য একটা দাওয়াতনামা প্রচার করতে পারলেই হলো, তাহলেই এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা একে একে তার বশ্যতা স্বীকার করতে শুরু করবে। যে সভ্যতা একদা জাঁকালোভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তার পতন হঠাৎ এমন আকস্মিকভাবে হয় না। অনুরূপ পরবর্তী সভ্যতার উত্থানও এমন নাটকীয়ভাবে হয় না। কাল যেখানে ধু ধু মাঠ ছিল, আজ সেখানে রাতারাতি আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের জোরে এক সুবিশাল প্রাসাদ গড়ে উঠলো, এমনটি হয় না।

একটি পতনোন্মুখ সভ্যতা আপন ধ্যান-ধারণা ও রীতিনীতির বদৌলতে সুদীর্ঘকালব্যাপী মানুষের মন-মগজ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমাজ- সভ্যতার ওপর প্রভাবশীল থাকতে পারে। সে প্রভাব আপনা আপনি দূর হয় না, শক্তি প্রয়োগে দূর করতে হয়। অনুরূপভাবে পতনোন্মুখ সভ্যতার ধারক-বাহকরা অবধারিত পতনের মুখেও বহু বছর যাবত পৃথিবীর ওপর আপন আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। তারা স্বেচ্ছায় হটে যায় না, তাদেরকে হটিয়ে দিতে হয়। একইভাবে নতুন সভ্যতার রূপরেখার ওপর একটি সভ্যতার প্রাসাদ গড়ে তোলাও চাট্টিখানি কথা নয়। আরাম কেদারায় বসে তা গড়া যায় না। সে জন্য প্রয়োজন হয় শক্তিশালী আন্দোলনের, প্রয়োজন হয় কঠোর সমালোচনা এবং জরাজীর্ণ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার ও নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার অক্লান্ত ও অব্যাহত প্রয়াসের। নতুন জ্ঞান ও চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে একদিকে পুরনো ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করতে হয়, অপর দিকে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাকে নির্দিষ্ট চিন্তাধারার আলোকে নতুন করে গড়ে তুলতে হয়। এভাবে সমগ্র সমাজের মনোজগতে এমন আধিপত্য বিস্তারের প্রয়োজন হয় যার ফলে সকলেই সেই বিশেষ পদ্ধতিতেই ভাবতে ও অনুভব করতে আরম্ভ করে। আগে যে মূল্যবোধ ও মানদণ্ডে মানুষকে যাচাই করা হতো তা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়ে নতুন মূল্যবোধ ও মানদণ্ড চালু করতে হয়। তার ভিত্তিতে নতুন চরিত্র ও নতুন প্রকৃতি সম্পন্ন মানুষ তৈরী করতে হয়। একদিকে পুরনো সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমূলে উৎখাত করতে ও অপরদিকে নতুন মূলনীতির আলোকে গোটা সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়।

সুতরাং বিশ্ববাসীকে সম্ভাব্য অন্ধকার যুগ থেকে বাঁচাতে ও ইসলামের অমূল্য রত্নে ভূষিত করতে হলে এই সুষ্ঠু ও নির্ভুল মতবাদটি হস্তগত হওয়াই যথেষ্ট নয়,-সেই সাথে তার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নিষ্ঠাবান ও সৎ মানবগোষ্ঠীর এগিয়ে আসাও প্রয়োজন। এ জন্য প্রয়োজন এমন একটি কর্মী বাহিনীর যাদের ঐ মতাদর্শের ওপর সাচ্চা ঈমান ও অবিচল আস্থা রয়েছে। তাদেরকে সবার আগে প্রমাণ করে দেখাতে হবে ঐ মতাদর্শের প্রতি তাদের নিজেদের ঈমান কতখানি মজবুত। যে শক্তি ও কর্তৃত্বের প্রতি তাদের বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে, আগে নিজেরাই তার অনুগত ও ফরমাবরদার হবে। যে নীতি ও নৈতিকতাকে তারা সঠিক ও বিশুদ্ধ বলে বিশ্বাস ও প্রচার করছে আগে নিজেরাই হবে তার যথার্থ অনুসারী। যে জিনিসকে তারা ফরয বা অবশ্য

করণীয় বলে জেনেছে প্রথমে নিজেরাই তা মেনে চলবে এবং যাকে তারা হারাম বা অবৈধ মনে করছে আগে নিজেরাই তা বর্জন করে চলবে। এভাবে ঐ আদর্শের প্রতি নিজেদের নিষ্ঠা আগে প্রমাণ করে দেখাতে না পারলে তার ওপর তাদের আস্থা আছে কিনা, সেটাই হয়ে পাড়বে সন্দেহযুক্ত। তেমন হলে অন্যেরা তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে এগিয়ে আসতে চাইবে না। কিন্তু শুধু এটুকুই যথেষ্ট নয়, এ পতনোন্মুখ সভ্যতা, সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার সাথে ও তার অনুসারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদও করতে হবে। এ ব্যবস্থার সাথে তাদের যে সুযোগ–সুবিধা, স্বার্থ, আশা–আকাংখা ও আরাম–আয়েশ জড়িত রয়েছে তাও পরিত্যাগ করতে হবে। এভাবে একটা প্রতিষ্ঠিত বিজয়ী সভ্যতার সাথে সংঘাত ও বিদ্রোহের অনিবার্য ফল হিসেবে যেসব ক্ষয়ক্ষতি, বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে, তাও ক্রমে ক্রমে বরদাশ্‌ত করে নিতে হবে। একটা খারাপ ব্যবস্থার আধিপত্য উৎখাত করতে ও তার জায়গায় একটা সুষ্ঠু ও ভালো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে যা যা করা দরকার অতপর তাও তাদের করতে হবে। এ ধরনের একটা বিপ্লবাত্মক কার্যক্রমে অংশ নিতে গিয়ে বহু মূল্যবান সম্পদ ও সময় ব্যয় করতে হবে, মস্তিষ্ক ও শরীরের সব রকমের শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। জেল–যুলুম, নির্বাসন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি এবং পরিবার পরিজনের জান–মালের সর্বনাশ হওয়ার আশংকাও দেখা দেবে।

এমন কি সময়ে প্রাণও দিতে হবে। এ সব পথ অতিক্রম না করে পৃথিবীতে কোন বিপ্লব কখনো সাধিত হয়নি, আজও হতে পারে না। একটা সুষ্ঠু ও সুন্দর মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এরূপ নিবেদিত প্রাণ একদল লোক যতক্ষণ এগিয়ে না আসবে, ততক্ষণ সে মতবাদ যতই উঁচুদরের হোক না কেন, বই–কিতাবের পাতা থেকে নেমে সরাসরি মাটিতে শিকড় গেড়ে বসতে পারে না। মতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য তার নীতিমালার শক্তিমত্তা যতখানি প্রয়োজন, উক্ত মতবাদে বিশ্বাসী মানুষগুলোর চরিত্রের বলিষ্ঠতা, কর্মোদ্দীপনা এবং ত্যাগ ও কুরবানীর সমন্বিত শক্তিও ঠিক ততখানি প্রয়োজন। জমিতে ফসল উৎপাদনের প্রক্রিয়া এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভালো ফসল উৎপাদনে সুষ্ঠু কৃষি পদ্ধতি, উত্তম বীজ, সামঞ্জস্যপূর্ণ আবহাওয়া––এ সবেরই যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু মাটি শুধু এতেই সন্তুষ্ট হয় না। সে এতটা বাস্তববাদী যে, কৃষক যতক্ষণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অটুট ধৈর্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা তার ওপর নিজের অধিকার প্রমাণ না করে ততক্ষণ সে তাকে সোনালী ফসলে পরিপূর্ণ মাঠের ডালি উপহার দিতে রাজী হয় না।

এভাবে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা এবং কুরবানী ও আত্মত্যাগের প্রেরণা প্রত্যেক মতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য, চাই তা সত্য হোক অথবা বাতিল। কিন্তু বাতিল মতবাদের তুলনায় সত্য মতবাদ প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠা ও ত্যাগের প্রয়োজন অনেক বেশী। বস্তুত সত্য এক অতি সূক্ষ্মদর্শী ও দক্ষ স্বর্ণকার। সে বিন্দুমাত্র ভেজালও গ্রহণ করতে রাজী হয় না। সে চায় একেবারে নির্ভেজাল খাঁটি সোনা। কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে সমস্ত মেকী পুড়ে গিয়ে খাঁটি সোনা বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত সে তাকে বাজারে ছাড়তে দিতে ও তার নামে চালু হতে দিতে প্রস্তুত হয় না। মেকীর দায়িত্ব নিতে সে নারাজ।

কেননা সে সত্য। সে বাতিলের ন্যায় জাল মুদ্রা বা ভেজাল সোনা বাজারে ফেরী করে বেড়াতে পারেনা। এজন্যই কুরআন একাধিকবার বলেছেঃ

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ -

"তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ, মুমিনদেরকে সেই অবস্থায় থাকতে দেয়া আল্লাহর রীতি নয়। (অর্থাৎ মুমিন ও মুনাফিক মিলেমিশে থাকা) খাঁটি ও মেকী বাছাই না করে আল্লাহ্ ক্ষান্ত হবেন না।"(আলে-ইমরান আয়াত ঃ ১৭৯)

اَحَسِبَ النَّاسُ اَن يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ-

"লোকেরা কি ভেবেছে যে, 'ঈমান এনেছি' বললেই পরীক্ষা না করেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ তাদের পূর্ববর্তীদের (অর্থাৎ যারাই ঈমান আনার দাবী করেছে।) আমি পরীক্ষা না করে ছাড়িনি। কাজেই এটা অবধারিত সত্য যে, কে সত্যবাদী কে মিথ্যাবাদী তা আল্লাহ নির্ণয় করবেনই।" (আন কাবুত ঃ ২-৩)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ - (البقرة : ٢١٤)

তোমরা কি মনে করেছ যে, এখনই তোমরা বেহেশতের ছাড়পত্র পেয়ে যাবে? অথচ তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর দিয়ে যে অবস্থা গেছে

তোমাদের ওপর দিয়ে তা এখনও যায়নি। তাদের ওপর এমন বিপদ-মসীবত এসেছে যে, তারা নাজেহাল হয়ে পড়েছে এবং রাসূল ও তাঁর সঙ্গী মু'মিনরা চিৎকার করে বলে উঠেছেঃ আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে"? (বাকারা ঃ ২১৪)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً - (التوبة : ١٦)

"তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ এখনও আল্লাহ্ যাচাই করে দেখলেন না তোমাদের মধ্যে কে জিহাদের দায়িত্ব পালন করেছে এবং আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের ছাড়া আর কারো সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখেনি।" (তওবাহ ঃ ১৬)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَا اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ط وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ط اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ - (العنكبوت : ١٠-١١)

"কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান এনেছি। কিন্তু যখনই আল্লাহ্‌র পথে তাদের নির্যাতন করা হয়েছে, তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্‌র আযাবের মত ভয় করেছে। আবার যদি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে বিজয় আসে তা হলে ঐ লোকেরাই এসে বলে, আমরা তোমাদের সাথেই ছিলাম। আল্লাহ্ কি দুনিয়াবাসীর মনের অবস্থা অবগত নন? আসল ব্যাপার হলো, মু'মিন কে, আর মুনাফিক কে, তা আল্লাহ্ অবশ্যই নির্ণয় করে ছাড়বেন।" (আনকাবুত ঃ ১০-১১)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ لا الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ * قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ * اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قف وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ-

"আমি অবশ্যই তোমাদের ভীতিজনক অবস্থা, ক্ষুধা এবং জানমাল ও উৎপাদনে ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়ে পরীক্ষা করবো। এ সব অবস্থার মধ্যেও যারা ধৈর্যধারণ করে এবং বিপদ-মুসিবত এলেও যারা বলে, আমরা আল্লাহ্‌রই

জন্য এবং আল্লাহ্‌র কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও। এ ধরনের লোকদের ওপর তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও করুণাধারা বর্ষিত হয় এবং তারাই হয় সুপথ প্রাপ্ত।" (বাকারা ঃ১৫৫-১৫৭)

এ সব কথা বলার সাথে সাথে কুরআন এ সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছে যে,-

وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَا نْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لٰكِن لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ -

"আল্লাহ্ যদি চাইতেন তবে নিজেই তাদের পর্যুদস্ত করে দিতেন। তবে তোমাদের এক দলকে দিয়ে অন্যদলকে পরীক্ষা করাই আল্লাহ্‌র রীতি"। (মুহাম্মদঃ ৪)

অর্থাৎ এরূপ ভেব না যে, আল্লাহ নিজে তার বিরুদ্ধাচরণকারীদের দমন করতে পারেন না বলে তোমাদের সাহায্য চান। তিনি এমন শক্তিশালী যে, ইচ্ছা করলে চোখের ইশারাতেই তাদের ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং নিজের মনোনীত জীবন ব্যবস্থা নিজেই কায়েম করে দিতে পারেন। কিন্তু এ জিহাদ, পরিশ্রম এবং ত্যাগ ও কুরবানীর দায়িত্ব তোমাদের ওপর এ জন্যই অর্পণ করেছেন যে, মানুষকে দিয়ে মানুষের পরীক্ষা নেবেন এটাই তাঁর ইচ্ছা ও লক্ষ্য। বাতিলপন্থীদের সাথে মু'মিনদের সংঘাত ও সংঘর্ষ না ঘটা পর্যন্ত এবং সেই সংঘর্ষের ফলে বিপদ-মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত কে সাচ্চা মু'মিন এবং কে মিথ্যা ঈমানের দাবীদার তা নির্ণীত হওয়া সম্ভব নয়। আর যতক্ষণ অযোগ্য লোকদের মধ্য থেকে যোগ্য লোকেরা বাছাই হয়ে বেরিয়ে না আসবে ততক্ষণ খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারে এমন একটা সংগঠন তৈরী হওয়াও অসম্ভব।

সুতরাং এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, একটা সঠিক ও নির্ভুল মতবাদ হস্তগত হবে কি হবে না সেটা সমস্যা নয় এবং দুনিয়ার ভবিষ্যত তার ওপর নির্ভরও করছে না। কেননা তেমন একটা নির্ভুল মতবাদ যথারীতি বিদ্যমান। আসল সমস্যা হলো, সাচ্চা ঈমানের বলে বলীয়ান এমন একদল মানুষ সংঘবদ্ধ হবে কিনা যারা প্রতিজ্ঞায় অটল, লক্ষ্যে অবিচল এবং আল্লাহ্‌র পথে সর্বস্ব বিসর্জন দিতেও কুন্ঠিত নয়। বস্তুত এ প্রশ্নের জবাবের ওপরই দুনিয়ার ভবিষ্যত নির্ভরশীল।

কেউ কেউ আমাদের বলেন, এমন চারত্রের লোক এ যুগে কোথায় পাওয়া যাবে? এ জাতীয় লোক ইতিহাসের এক শুভ মুহূর্তে পয়দা হয়েছিল। তারপর স্রষ্টা আর তেমন লোক তৈরী করেন না। মানুষ তৈরীর সেই মডেলটি অতপর চিরদিনের জন্য পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু আসলে এ কথা ঠিক নয়। এটা একটা অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। নিজেদের ব্যাপারে যারা নৈরাশ্যে ভোগেন কেবল তাদের মনেই বাসা বেঁধেছে এ অলীক ধারণা। সকল যুগেই সব ধরনের যোগ্যতার অধিকারী লোক দুনিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে। মুনাফিক প্রকৃতির লোক এবং আয়েশী ও দুর্বলচেতা লোক যেমন সব সময়ই পাওয়া যেত এবং আজও পাওয়া যায়, তেমনি একটি মতাদর্শের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার পর তাকে বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে এমন লোকও প্রত্যেক যুগেই পাওয়া যেত এবং আজও পাওয়া যায়। আজ প্রত্যেকেই স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে, হিটলারের প্রতি ও জার্মান আধিপত্যবাদের ওপর ঈমান আনার কারণে একজন দু'জন নয় বরং হাজার হাজার লোক উড়োজাহাজ থেকে সরাসরি শত্রুর দেশে লাফিয়ে পড়ছে। অথচ তারা জানে যে, সেখানে অসংখ্য দুশমন শিকারীর ন্যায় তাদের জন্য ওঁৎ পেতে রয়েছে। রুশ বিপ্লবের ইতিহাস পড়লে জানা যায়, হাজার হাজার মানুষ বিপ্লবী মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে একাধিক্রমে অর্ধশতাব্দী ব্যাপী সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করেছে। তাদের সাইবেরিয়ার কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে। ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে। নির্বাসন দণ্ড নিয়ে তারা দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে। ব্যক্তিগত সুখ, স্বাচ্ছন্দ ও আশা-আকাংখার মুখে ছাই দিয়ে ভিটে বাড়ী থেকে উচ্ছেদ হওয়াকে তারা হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে। অথচ তখনো জার সাম্রাজ্যের পতনের কথা কারো কল্পনায়ও আসতো না। দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, খোদ ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। রক্তপাত ও সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করা যাবে এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এখানকার একদল তরুন সব রকমের ঝুঁকি নিয়েছিল। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের খাতিরে তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করাসহ যে কোন রকমের মারাত্মক পরিণতির মুখোমুখি হতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। এমন কোন বিপদ-মুসিবতের কথা উল্লেখ করা যাবে না যা তারা বরণ করে নেয়নি। কারাগারে লোমহর্ষক নির্যাতন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ফাঁসির কাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন কোনটাই বাদ যায়নি। তাদের কর্মপদ্ধতি ভুল ছিল কি নির্ভুল ছিল, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তবে জীবনের একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করার পর তার পেছনে

জানমাল ও ব্যক্তিগত আশা–আকাংখা বিসর্জন দেয়া এবং সীমাহীন দুর্ভোগ ও দুঃখ–যাতনা ভোগ করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার দুর্লভ গুণ যে আজও মানুষের মধ্যে একেবারে অনুপস্থিত নয়, সেটা এ থেকে অবশ্যই প্রমাণিত হয়।

গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সময় এ ভারতবর্ষেরই কত লোক পুলিশী জেল–যুলুম, সহায়–সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। বারদুলীর কৃষকদের জমিজমা, সহায়–সম্পদ, গবাদি পশু এমনকি ঘরের আসবাবপত্র ও ঘটিবাটি পর্যন্ত নিলাম ও বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা তাতে বিচলিত হয়নি। ধীর শান্তভাবে সবকিছু বরদাশত করেছে। এ ইতিহাস কার অজানা? এরপরও কোন্ যুক্তিতে বলা যায় যে, ত্যাগ–তিতিক্ষা ও কুরবানীর যে গুণ আগেকার মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, আজকের যুগের মানুষ তা থেকে বঞ্চিত? হিটলার, কার্ল মার্কস ও গান্ধীর ওপর 'ঈমান' এনে মানুষ যদি এতসব অসাধ্য সাধন করতে পারে, তাহলে আল্লাহর ওপর ঈমান এনে কি কিছুই করতে পারে না? স্বদেশের মাটির প্রতি যদি মানুষের এতবেশী আকর্ষণ থেকে থাকে যে, তার জন্য মানুষ জানমালের ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের প্রতি কি এতটুকু আকর্ষণও সৃষ্টি হতে পারে না? কাজেই ভীরু কাপুরুষ ও দুর্বলচেতা লোকদের এ কথা বলার কোনই অধিকার নেই যে, এই মহৎ কাজ সমাধা করতে যেসব বীর পুরুষের প্রয়োজন, তা কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য নিজেদের বেলায় তারা হযরত মূসা (আ)–এর সহচরদের ভাষায় বলতে পারেঃ

اذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ –

"যাও তুমি আর তোমার রব লড়াই করগে, আমরা এখানেই বসে রইলাম।" (মায়েদা ঃ ২৪)

১৪

পাকিস্তান দাবীকে ইয়াহুদীদের জাতীয় রাষ্ট্রের দাবীর সাথে তুলনা করা ভুল

প্রশ্ন

আমাদের আকীদাহ হচ্ছে, হযরত আদম (আ)–কে যে পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে, মুসলমান তারই উত্তরাধিকারী। মুসলমানের জীবনোদ্দেশ্য হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তোষ অর্জন, তাঁর পবিত্র আইন–কানুন অনুযায়ী চলা এবং অন্যদের সে অনুযায়ী চলতে উদ্বুদ্ধ করা। তাই তার সৃষ্টিগত উদ্দেশ্যই হলো গোটা বিশ্বের ওপর আল্লাহর কানুনকে বিজয়ী করবে এবং বিজয়ী রাখবে।

কিন্তু মিঃ জিন্নাহ এবং আমাদের অন্যান্য মুসলিম লীগী ভায়েরা পাকিস্তান দাবী করছে, যা নাকি গোটা ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তাদের ধারণা অনুযায়ী এতে করে মুসলমানরা শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে। বিশুদ্ধ দীনি দৃষ্টিভংগি অনুযায়ী তাদের এ ধ্যান–ধারণা কি আপত্তিকর নয়?

ইয়াহুদী জাতি অভিশপ্ত জাতি। আল্লাহ পাক তার জন্যে পৃথিবীকে সংকীর্ণ করে দিয়েছেন এবং যদিও তাদের মধ্যে বিশ্বের সেরা সেরা পুঁজিপতি এবং জ্ঞান–বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বহু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ বর্তমান রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর এক ইঞ্চি যমীনও তাদের দখলে নেই। তাদের জাতীয় আবাসভূমির জন্যে আজ তারা কখনো ইংরেজদের কাছে এবং কখনো মার্কিনীদের নিকট ভিক্ষাচাইছে।

আমার মতে মুসলমান, অন্যকথায় মুসলিম লীগও আজ সে কাজই করছে। ইহুদীদের মত তারা কখনো হিন্দুদের কাছে আবার কখনো ইংরেজদের কাছে পাকিস্তান ভিক্ষা চাচ্ছে। এটা কি একটি অভিশপ্ত জাতির অনুকরণ নয়? একটি অভিশপ্ত জাতির অনুকরণ কি মুসলমানদেরকেও তাদের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেবে না।?

জবাব

পাকিস্তান দাবী সংক্রান্ত আমার বিস্তারিত ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা আপনি আমার 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে[১] দেখুন। আমার মতে পাকিস্তান দাবীর সাথে ইয়াহুদীদের জাতীয় আবাসভূমির তুলনা খাটে না। ফিলিস্তিন মূলত ইয়াহুদীদের জাতীয় আবাসভূমি নয়। তারা সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর দু'হাজার বছর অতীত হয়ে গেছে। ফিলিস্তিনকে যদি তাদের আবাসভূমি বলা যেতে পারে তবে তা সেই অর্থেই বলা যেতে পারে, যে অর্থে জার্মানীর আর্য বংশোদ্ভূত লোকেরা মধ্য এশিয়াকে নিজেদের জাতীয় আবাসভূমি বলতে পারে। ইয়াহুদীদের আসল অবস্থা এ নয় যে, একটি দেশ সত্যি তাদের জাতীয় আবাসভূমি এবং সেটার স্বীকৃতি তারা নিতে চায়। বরঞ্চ তাদের প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এই যে, একটি দেশ তাদের জাতীয় আবাসভূমি নয়, অথচ তারা দাবী করছে যে, আমাদেরকে দুনিয়ার বিভিন্ন কন্দর থেকে উঠিয়ে এনে সে দেশটিতে বসবাস করতে দেয়া হোক এবং শক্তি বলে সেটাকে আমাদের জাতীয় আবাসভূমি বানিয়ে দেয়া হোক। পক্ষান্তরে পাকিস্তান দাবীর ভিত্তি হচ্ছে এই যে, যে অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেটা কার্যতই মুসলমানদের জাতীয় আবাসভূমি। মুসলমানদের বক্তব্য তো কেবল এতোটাকু যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভারতের অন্যান্য এলাকার সাথে একত্রে থাকলে তাদের জাতীয় আবাসভূমির রাজনৈতিক মর্যাদায় যে ক্ষতি সাধিত হবে তাকে সে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা হোক এবং সংযুক্ত ভারতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিবর্তে হিন্দু ভারত এবং মুসলমান ভারতের দুটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক। অন্য কথায় মুসলমানরা এ কথা বলছে না যে, আমাদের জন্যে একটি জাতীয় আবাসভূমি তৈরি করা হোক। বরঞ্চ তারা বলছে, আবাসভূমি কার্যত বর্তমান আছে। সেখানে পৃথকভাবে নিজেদের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার লাভ হওয়া উচিত। এটা এ রকমই একটা জিনিস, যা আজকাল বিশ্বের প্রতিটি জাতিই চায়। মুসলমানদের মুসলমান হওয়ার বিষয়টাকে উপেক্ষা করে যদি তাদেরকে কেবলমাত্র একটি জাতি হিসেবে দেখা হয়, তবে তাদের এ দাবী যে যথার্থ সে ব্যাপারে আর কোন কথা চলে না। বিশ্বের কোন জাতি অপর জাতির ওপর

---

১. গ্রন্থটি এ গ্রন্থের সাথে একীভূত হয়েছে।—অনুবাদক

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব চালাবে--নীতিগতভাবে আমি এর বিরোধী। আমার মতে নীতিগতভাবে প্রত্যেক জাতিরই এ অধিকার রয়েছে যে, তার রাজনীতি ও অর্থনীতির বাগডোর তার নিজেরই মুষ্টিবদ্ধে থাকবে। এ কারণেই একটি জাতি হিসেবে যদি মুসলমানরা এরূপ দাবী করে, তবে অন্যান্য জাতির বেলায় এরূপ দাবী করা যেরূপ সঠিক, তেমনি করে মুসলমানদের ব্যাপারেও তাসঠিক।

এ জিনিসকে উদ্দেশ্য বানানোর ব্যাপারে আমাদের যে আপত্তি তা কেবল এই যে, মুসলমানরা একটি আদর্শিক দল এবং আদর্শিক ব্যবস্থার আহবায়ক ও পতাকাবাহী দল হওয়ার মর্যাদাকে উপেক্ষা করে শুধু একটি জাতি হবার মর্যাদা অবলম্বন করেছে। তারা যদি নিজেদের প্রকৃত মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতো, তবে তাদের জন্যে জাতীয় আবাসভূমি এবং তার স্বাধীনতার প্রশ্ন হতো একটি নগণ্য প্রশ্ন, বরঞ্চ আসলে এ প্রশ্ন তাদের মধ্যে সৃষ্টিই হতো না। এখন তারা সংখ্যায় কোটি কোটি হওয়া সত্ত্বেও একটি ক্ষুদ্র মানচিত্রে নিজেদের জন্যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র লাভকে নিজেদের চূড়ান্ত লক্ষ্য মনে করছে। কিন্তু তারা যদি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আহবায়কের ভূমিকা অবলম্বন করে, তবে একজন মুসলমানই সমগ্র বিশ্বের ওপর নিজের, অর্থাৎ তার সে জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে যার সে আহবায়ক, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীদার হতে পারে এবং সঠিক পন্থায় প্রচেষ্টা চালালে তা প্রতিষ্ঠা করতেও সক্ষম হতেপারে।

(তরজুমানুল কুরআন, রজব-শাওয়াল, ১৩৬৩ হিঃ; জুলাই-অক্টোবর, ১৯৪৪ইং)

মুসলিম লীগের সংগে মতপার্থক্যের ধরন

প্রশ্ন[১]

ভারতীয় মুসলমানরা বর্তমানে যে অবস্থায় নিমজ্জিত রয়েছে, সে অবস্থায় থেকে কোন্ সব নীতি সীমারেখা ও বুনিয়াদের ওপর ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও দৃষ্টিভংগি অনুযায়ী তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংশোধন সম্ভব? মেহেরবানী করে নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলোর ওপর বিস্তারিতভাবে আপনার মতামত লিপিবদ্ধ করুনঃ

ক· এমন একটি কার্যকর বাস্তবসম্মত সংবিধানের প্রস্তাব করুন, যার মাধ্যমে জাতীয় জাগরণের একক উদ্দেশ্যের জন্যে বিভিন্ন ফেরকা ও পন্থার মুসলমানদের একতাবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করা যায়।

খ· এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নীল নকশা তৈরী করুন যা ইসলামের মূলনীতির সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গ· ভারতবর্ষের মুসলমানরা যে বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত রয়েছে, সেকথা মনে রেখে বলুন, তারা যদি এবং যখন এমন সব স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জন করে যেখানে তারা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তবে তাদের জন্যে কি এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে যেখানে ধর্ম এবং রাজনীতির মধ্যে সুসম্পর্ক এবং সহাবস্থানের একটি সন্তোষজনক পরিবেশ সৃষ্টি হবে?

১· এ হচ্ছে মূলত মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহি পরিষদের পক্ষ থেকে প্রচারিত একটি প্রশ্নমালা। অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে তরজুমানুল কুরআনের সম্পাদকের নিকটও এর একটি কপি পাঠানো হয়েছিল।

ঘ· ইসলামের নীতিমালা, ঐতিহ্য এবং ধ্যান–ধারণা অনুযায়ী এমন একটি স্কীম প্রণয়ন করুন, যা মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে।

ঙ· সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ অর্থাৎ ওয়াকফ কৃত সম্পত্তি সমূহ এবং অন্যান্য আয়ের উৎসসমূহকে একটি কেন্দ্রের অধীনে এমনভাবে সংগঠিত ও সমন্বিত করার পন্থা ও কাঠামো প্রণয়ন করুন যাতে এ সব প্রতিষ্ঠানের ওপর দখলদার লোকদের অনুভূতি, প্রবণতা, উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভংগির প্রতি খেয়াল থাকবে।

জবাব

আমাদের পক্ষ থেকে এ প্রশ্নমালার নিম্নরূপ জবাব পাঠানো হয় ঃ

আপনি যে বিস্তারিত প্রশ্নমালা পাঠিয়েছেন, তা মূলত একটি বড় প্রশ্নের অংশবিশেষ। তবে কি এটাই উত্তম হয় না যে, এ সব প্রশ্নকে পৃথক পৃথক গ্রহণ করে পৃথক পৃথক মত প্রকাশ করার পরিবর্তে সেই বড় প্রশ্নটি নিয়েই আলোচনা করা যাক, আপনার এ প্রশ্নগুলো যার বিভিন্ন অংশমাত্র। আর সেই বড় প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, মুসলমান কিভাবে সেই প্রকৃত মুসলমান হবে যে রকম মুসলমান বানানো কুরআনের আসল উদ্দেশ্য। এটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন। এ প্রশ্নের সমাধান হলে অন্য সকল প্রশ্নের সমাধান এমনিতেই হয়ে যাবে।

আমার নিকট এ প্রশ্নের সহজ–সরল এবং স্পষ্ট জবাব হচ্ছে এই যে, সর্বপ্রথম ইসলামকে এবং ইসলাম মানুষের নিকট যা কিছু দাবী করে সেগুলোকে সুস্পষ্টভাবে মুসলমানদের সম্মুখে পেশ করা হোক এবং সেগুলো বুঝে শুনে গ্রহণ করার দাবী তাদের নিকট করা হোক। অতপর যারা জেনে–বুঝে তা কবুল করবে তাদেরকে একটি দল হিসেবে সংগঠিত করার কাজ আরম্ভ করা হোক। আর বাকী মুসলমানদের জন্যে অবিরামভাবে দাওয়াত ও প্রশিক্ষণের কাজ এ উদ্দেশ্যে চালিয়ে যেতে হবে যে, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আমাদের দলে শামিল করে নিতে হবে।

এ দলের সামনে একটিই উদ্দেশ্য থাকবে। অর্থাৎ ইসলামকে একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পৃথিবীতে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা। এর মূলনীতি হবে একটাই। অর্থাৎ নির্ভেজাল ইসলামের অনুসরণ। (আমাদের এ চলার পথ

অন্যদেরকে সন্তুষ্ট করুক বা না করুক সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা চলবে না)। এ দলকে অনৈসলামের সাথে সর্ব প্রকার আপোষ সমঝোতা (Compromige) এবং মিশ্রণ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করতে হবে। এরূপ মহান উদ্দেশ্য ও আদর্শের ভিত্তিতে যে দল কাজ করবে তার কাছে প্রথমত এসব প্রশ্নই সৃষ্টি হবে না, যা আপনার মনে উদিত হয়েছে। এর মধ্য থেকে কোন একটি প্রশ্ন উদয় হলেও তার ধরন ঐরকম হবে না, যেমন করে আপনার মনে সৃষ্টি হচ্ছে। এদের কোন নতুন স্কীম তৈরি করতে হবে না। বরঞ্চ শুধুমাত্র সেই শক্তিই সরবরাহ করতে হবে যদ্দারা তৈরি করা স্কীমকে কার্যকর করা যাবে। বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের স্কীম বাস্তবায়নের অনুকূল কিনা–এরকম চিন্তাই তারা করবে না শক্তির মাধ্যমে তারা প্রতিকূল পরিবেশ পাল্টে দেবে, যাতে করে স্কীম বাস্তবায়নের জন্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে বাধ্য হয়। মোদ্দাকথা, আপনরা যে দৃষ্টিভংগি অবলম্বন করেছেন, এ বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভংগি হবে এর চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

আমার মনে হয়, আপনারা এমন এক গোলকধাঁধায় পড়েছেন, যার কোন সমাধান সম্ভবত আপনারা খুঁজে পাচ্ছেন না। সেই গোলকধাঁধা হচ্ছে এই যে, আপনারা একদিকে এ গোটা কওমকে 'মুসলমান' হিসেবে গ্রহণ করছেন, যার ৯৯% জন ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, ৯৫% জন ইসলাম বিমুখ এবং ৯০% জন ইসলাম বিমুখীতার ব্যাপারে অনড়। অর্থাৎ তারা নিজেরাই ইসলামের পথে চলতে চায় না এবং সে উদ্দেশ্যও তারা সাধন করতে চায় না যে জন্যে তাদেরকে মুসলমান বানানো হয়েছিল। অপরদিকে সামগ্রিকভাবে বিরাজিত বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতিকে সামান্য রদবদল করেই আপনি তা গ্রহণ করতে চাচ্ছেন এবং সাথে সাথে এটাও চাচ্ছেন যে, অবস্থা এ রকমই থাকুক, তবে এর মধ্য থেকে ইসলামী স্কীম বাস্তবায়নের কোন সুযোগ বের হয়ে আসুক। আপনাদের জন্যে এটাই এক বিরাট গোলকধাঁধা। এ জন্যেই আমার ধারণা, আপনাদের পেশ করা সমস্যাবলীর কোন সমাধান পাওয়া আপনাদের জন্যে সম্ভব নয়।

প্রশ্ন

আপনার জানা রয়েছে যে, মুসলিম লীগ কাজ এগিয়ে নেয়ার জন্যে একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করেছে এবং পরিষদ মুসলমানদের সংস্কার ও উন্নতির জন্যে বিভিন্ন সাব কমিটি গঠন করেছে। এর মধ্যে একটি সাব

কমিটি গঠন করা হয়েছে ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার সংস্কার সংশোধনের উদ্দেশ্যে। এ কমিটির আহবায়কের নিকট থেকে আপনি সম্ভবত একটি প্রশ্নমালা[১] পেয়েছেন। এ প্রশ্নমালাকে বিশেষ মনোনিবেশের দাবীদার মনে করবেন এবং সর্ব প্রকার মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে চিন্তাগত সহযোগিতা করবেন। পাশ্চাত্যের নাস্তিক্যবাদী সয়লাবের মোকাবেলায় যে মুসলমানরা এখনো নিজেদের ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছে এটাকে সৌভাগ্য মনে করা উচিত। এ সংকটকালে যদি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করা না হয়, তবে আমাদের যুককরাও তুরস্ক এবং ইরানের পদাংক অনুসরণ করার আশংকা রয়েছে।

জবাব

আপনার পত্র পাওয়ার পূর্বেই আমি লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট উল্লিখিত প্রশ্নমালার জবাব পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনারা কখনো এমনটি মনে করবেন না যে, কোন প্রকার মতপার্থক্যের কারণে আমি এ কাজে অংশ গ্রহণ করছি না। প্রকৃতপক্ষে অপারগতা হচ্ছে এই যে, আমি বুঝতেই পারিছিনে, আমি কিভাবে অংশগ্রহণ করবো। আধা কর্মপন্থা (Half measures) আমার মনে কোনোই আবেদন সৃষ্টি করে না। আপোষমূলক কাজেও (Patchword) আমার কোন প্রকার আগ্রহ নেই। আপনাদের কার্যনির্বাহী কমিটির দৃষ্টিভঙ্গীতো এরকমই। যদি পূর্ণ ভাংগা এবং পূর্ণ গড়ার দৃষ্টিভঙ্গী থাকতো, তবে আমি জীবন বাজি রেখে প্রতিটি কাজ আঞ্জাম দিতে প্রস্তুত থাকতাম। কিন্তু এখানেতো গোটা দেহ অক্ষুন্ন রেখে কেবল তার অংশ বিশেষের পরিবর্তন সাধন লক্ষ্য। এরূপ কাজের জন্যে কোন বাস্তব কর্মপন্থা এবং ফলদায়ক পরিণতি চিন্তা করতে আমার মস্তিষ্ক অক্ষম। এ অধ্যায়ে আমার জন্য এটাই ভাল যে, কোন বাস্তব খেদমত আঞ্জাম দেয়ার পরিবর্তে একজন শিক্ষার্থীর মত দেখবো যে, আপনাদের এ আংশিক সংস্কার সংশোধন কাজের কি ফল দাঁড়ায়। আর এর উদ্যোক্তারা এটাকে বাস্তবায়িত করে কি পরিণতি সৃষ্টি করে। এ পন্থায় যদি সত্যিই কোন সুফল পাওয়া যায়, তবে এটা হবে আমার জন্যে একটি বাস্তব উদাহরণ এবং সে অবস্থা দেখে হয়তো আমি আমার "সার্বিক পরিবর্তন নীতি" থেকে "আংশিক পরিবর্তন নীতির" দিকে ধাবিত (Convert) হবো।

(তরজুমানুল কুরআন, রজব–সাওয়াল, ১৩৬৩ হিঃ; জুলাই–অক্টোবর, ১৯৪৪ইং)

---

১ এ হচ্ছে সেই প্রশ্নমালা, জবাবসহ ইতিপূর্বে যেটি আমরা উল্লেখ করেছি।

সমকালীন রাজনৈতিক সমস্যার ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর নীতি

প্রশ্ন

বর্তমানে[১] ভারতবর্ষের মুসলমানরা দুটি ফিতনায় নিমজ্জিত। প্রথমটি হচ্ছে কংগ্রেসের স্বদেশী আন্দোলনের ফিতনা। এ ফিতনা ভারতবাসীর সামষ্টিক জীবনকে এক জাতিত্ব এবং পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে চায়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে মুসলিম লীগ পরিচালিত মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এ আন্দোলনের পিঠে ইসলামের লেবেল আঁটা আছে বটে, কিন্তু, এর ভিতরে ইসলামের অন্তরাত্মাই অনুপস্থিত। আপনার "মুসলমান আওর মওজুদাহ সিয়াসী কাশমাকাশ" গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে আমাদের নিকট এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এ উভয় আন্দোলনই ইসলামের খেলাফ। কিন্তু হাদীসে আছে, মানুষ যখন দু'টি পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তখন যেনো ছোটটি গ্রহণ করে। কংগ্রেসের আন্দোলন তো নিরেট কুফরী আন্দোলন। তার সহযোগিতা করা মুসলমানদের জন্যে মৃত্যু সমতুল্য। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের আন্দোলন যদিও অনৈসলামী কিন্তু তার দ্বারা তো আর ভারতের দশকোটি মুসলমানের জাতীয় সত্তা খতম হয়ে যাওয়ার আশংকা নেই। তবে কি আমাদের জন্যে এটা উচিত নয় যে, আমরা মুসলিম লীগের বাইরে থাকবো বটে, কিন্তু তার

---

১. উল্লেখ্য এটা ১৯৪৫ সালের কথা। এসময় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মুসলমানদের জন্যে একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে।

সহযোগিতা করবো। এখন ভারতবর্ষে নির্বাচনী তোড়জোড় শুরু হয়েছে।[১] আর এ নির্বাচন সিদ্ধান্তকারী নির্বাচন। একদিকে লীগ বিরোধী সমস্ত শক্তি একজোটে মুসলিম লীগকে ধরাশায়ী করার চেষ্টা করছে। এতে যদি তারা সফল হয়, তবে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই হবে যে, কংগ্রেসের একক জাতীয়তার আন্দোলন জবরদস্তি মুসলমানদের ওপর চেপে বসবে। অপরদিকে মুসলিম লীগ প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে, মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং তারা নিজেরাই নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। এ উভয় বিষয়ের ফায়সালা ভোটারদের রায়ের ওপর নির্ভর করছে। এমতাবস্থায় আমাদের সিদ্ধান্ত কি হওয়া উচিত? আমরা কি মুসলিম লীগের পক্ষে নিজেরাও ভোট দেবো এবং অন্যদেরও দিতে বলবো? নাকি নীরব ভূমিকা পালন করবো? আর নাকি আমরা নিজেরা নিজেদের প্রতিনিধি দাঁড় করাবো?

জবাব

আপনার মনমানসিকতায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা প্রভাব বিস্তার করে আছে। এ কারণে আপনার দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের মুসলমানরা শুধুমাত্র দুটি ফিতনায় নিমজ্জিত রয়েছে। অথচ আপনি যদি আরো একটু প্রশস্ত দৃষ্টিতে তাকাতেন, তবে এই ফিতনা ছাড়াও নৈতিক, চৈন্তিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসংখ্য ফিতনা আপনি দেখতে পেতেন। এ সব ফিতনা মুসলমানদের আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী করে রেখেছে। মূলত, এ এক প্রাকৃতিক শাস্তি, যা আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে এমন প্রতিটি জাতিই ভোগ করে থাকে, যারা আল্লাহ্র কিতাবের বাহক হওয়া সত্ত্বেও তার অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়া নেয় এবং তার দাবী অনুযায়ী চলতে কুণ্ঠিত হয়। মুসলমান কেবল তখনই রক্ষা পেতে পারে যখন সে এই মৌলিক যুলুম ও অপরাধ থেকে বিরত থাকবে, যার ফলে তার ওপর এ ফিতনা চেপে বসেছে এবং ঐ কাজ করার জন্যে দণ্ডায়মান হবে, যে জন্যে তাকে আল্লাহ্র কিতাব প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সে যদি এ কাজ করতে প্রস্তুত না হয় তবে যতোটা তদবীর আর প্রচেষ্টাই করা হোক না কেন, বিশ্বাস করুন, কোন একটি ফিতনার প্রতিরোধ হবে না, বরঞ্চ প্রতিটি তদবীর আরো অনেকগুলো ফিতনার জন্ম দেবে।

---

১. ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

- আপনি যে প্রশ্নগুলো রেখেছেন, সে সম্পর্কে আমি পরিষ্কারভাবে দু'টি কথা বলে দিতে চাই, যাতে আর ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে আপনার এবং আপনার মতো করে যারা চিন্তা করছেন তাদের মধ্যে কোন প্রকার জটিলতা সৃষ্টি না হয়।

প্রথমত, জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সঠিকভাব অনুধাবন করুন। কোন দেশের সমসাময়িক সমস্যাকে সামনে রেখে সাময়িক তদবীর-প্রচেষ্টা দ্বারা তার সমাধান করার জন্যে এ জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তার প্রতিষ্ঠার পিছে এ উদ্দেশ্য ও কার্যকর ছিল না যে, উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করার জন্যে যখন যে নীতি অবলম্বন করলে সুবিধা হয়, তখন তা-ই অবলম্বন করা হবে। এ জামায়াতের সম্মুখে রয়েছে তো একটি মাত্র বিশ্বজনীন চিরন্তন সমস্যা। সকল দেশ ও জাতির সর্বকালীন সমস্যাই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর সে সমস্যা হচ্ছে এই যে, মানুষের পার্থিব কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি কোন্ জিনিসের মধ্যে নিহিত রয়েছে? এ জামায়াতের নিকট সমস্যাটির একটিই মাত্র সমাধান রয়েছে। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর সকল বান্দাহ্কে (যাদের মধ্যে ভারতবর্ষের মুসলমানরাও শামিল রয়েছে।) সঠিক অর্থে আল্লাহর বন্দেগী অবলম্বন করতে হবে এবং গোটা ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের সকল বিভাগকে সেই সব মূলনীতির অনুবর্তনকারী বানিয়ে দিতে হবে যা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতে বর্তমান রয়েছে। এই একমাত্র সমস্যা এবং তাঁর এই একমাত্র সমাধান ছাড়া দুনিয়ার অপর কোন জিনিসের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। যিনি আমাদের সংগে চলতে চান, সকল দিক থেকে দৃষ্টি গুটিয়ে এনে তাঁর পূর্ণাংগ মনোনিবেশকে এক মুখী করে এই একমাত্র রাজপথে অগ্রসর হওয়া তার জন্যে অবশ্য কর্তব্য। আর যিনি স্বীয় চিন্তা ও কর্মকে এতোটা একই সমতলে আনতে সক্ষম নন, যার মনকে নিজ দেশ কিংবা জাতির সমকালীন ও সাময়িক সমস্যা বার বার ব্যস্ত করে তোলে এবং যার কদম বার বার পিচ্ছিল খেয়ে সেই সব পথ ও পন্থার দিকেই চলে যায় যা বর্তমান দুনিয়ার প্রচলিত রয়েছে, সে সব হাংগামী আন্দোলনে গিয়ে দিল ঠাণ্ডা করাই তার জন্যে অধিক উপযোগী।

দ্বিতীয়ত ভোট এবং নির্বাচনের ব্যাপারে আমাদের নীতি স্পষ্টভাবে বুঝে নিন। সম্মুখের এ নির্বাচন কিংবা ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য এ ধরনের সকল নির্বাচনের গুরুত্ব যা কিছুই থাকুক না কেন এবং সেগুলোর যে ধরনের প্রভাবই আমাদের জাতি ও দেশের ওপর পড়ুক না কেন, সর্বাবস্থায়ই একটি

আদর্শিক সংগঠন হওয়ার কারণে কোন সাময়িক সুবিধার জন্যে আমাদের পক্ষে সেই আদর্শের কোরবানী দেয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, যার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি। বর্তমান কুফরী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের ভিত্তিই হচ্ছে এই যে, এ রাষ্ট্র ব্যবস্থা 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর জনগণ যে পার্লামেন্টকে ভোটের মাধ্যমে আইন প্রণয়নের নিঃশর্ত অধিকার প্রদান করে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উর্ধতন সনদ কুরআন সুন্নাহর বিধান তার নিকট স্বীকৃত নয়। পক্ষান্তরে আমাদের তাওহীদি আকীদার বুনিয়াদী দাবী হলো, সার্বভৌমত্ব জনগণের নয়, বরঞ্চ সার্বভৌমত্ব আল্লাহর এবং চূড়ান্ত নির্দেশনামা হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব। আইন-কানুন যা কিছুই প্রণয়ন করতে হোক না কেন, তা হবে আল্লাহর কিতাবের অধীন থেকে, তা থেকে মুক্ত স্বাধীন হয়ে নয়। এ এক মৌলিক বিষয়। এটা সরাসরি আমাদের ঈমান ও মৌলিক আকীদার সংগে সম্পর্কিত। ভারতবর্ষের আলেম ও সাধারণ মুসলমানরা যদি এ সত্যকে উপেক্ষা করে এবং সাময়িক কল্যাণকে ঈমানের দাবীর ওপর অগ্রাধিকার দেয়, তবে তারা তাদের আল্লাহর সম্মুখেই এর জবাবদিহি করবে। কিন্তু আমরা কোন ফায়দার লালসায় এবং কোন ক্ষতির আশংকায় এ আদর্শিক প্রশ্নে বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে কোন প্রকার সমঝোতা করতে পারি না। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন, তাই তাওহীদি আকীদাহ বিশ্বাস নিয়ে আমরা কিভাবে (জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে) এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারি? একদিকে আমরা আল্লাহর বিধান থেকে মুক্ত হয়ে আইন প্রণয়ন করাকে শির্‌ক বলে ঘোষণা করছি, অপর দিকে স্বয়ং আমাদের নিজেদের ভোটেই ঐ সমস্ত লোকদের আইন সভার সদস্য নির্বাচিত করবো যারা আল্লাহর ক্ষমতা ও ইখতিয়ারকে খেয়ানত ও পদদলিত করার জন্যে পার্লামেন্টে যেতে চায়। এমনটি করা কি আমাদের জন্যে বৈধ হতে পারে? আমরা যদি আমাদের ঈমান-আকীদার ব্যাপারে সত্যবাদী হই, তাহলে এ ব্যাপারে আমাদের জন্যে কেবল একটিই পথ খোলা আছে। আর তা হচ্ছে, আমাদের সমস্ত শক্তি সামর্থ কেবলমাত্র এ মূলনীতির স্বীকৃতি লাভের জন্যেই ব্যয় করবো যে, সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট এবং আইন প্রণিত হবে কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে। যতোক্ষণ না এই মূলনীতি মেনে নেয়া হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোন নির্বাচন এবং ভোট প্রদানকে বৈধ মনে করি না। অবশ্য এই মূলনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা আলাদা কথা।

(তরজুমানুল কুরআন, রমজান-শাওয়াল, ১৩৬৪ হিঃ; সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৪৫)

কুফরী রাষ্ট্রের বিধানসভায় (PARLIAMENT) মুসলমানের অংশ গ্রহণের প্রশ্ন

প্রশ্ন

আপনার লিখিত 'ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ' বইটি পড়ার পর আমার অন্তরে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আইন ও বিধান তৈরী করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে নির্দিষ্ট। এ প্রকৃত সত্যের বিপরীত আদর্শ ও নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত আইন পরিষদের সদস্য হওয়া শরীয়াতের সম্পূর্ণ খেলাফ। কিন্তু এ ব্যাপারে একটি সন্দেহ থেকে যায়। তা হচ্ছে এই যে, সকল মুসলমানই যদি বিধান সভায় অংশগ্রহণকে হারাম মনে করে তা বর্জন করে, তাহলে তো মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রকাশ থাকে যে, রাজনৈতিক শক্তির মাধ্যমেই জাতিসমূহের সাফল্য ও উন্নতি লাভের কাজ করা সম্ভব হতে পারে। আমরা আমাদের রাজনৈতিক শক্তি পুরোটাই যদি অন্যদের হাতে ছেড়ে দেই, তার ফল (Result) এ দাঁড়াবে যে, তারা মুসলিম বিদ্বেষের কারণে এমনসব আইন কানুন চালু করবে এবং এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলবে, যার অধীনে মুসলমানরা সম্পূর্ণ অবদমিত ও শৃংখলিত হয়ে থাকবে। মুসলমানদের এ রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কবল থেকে মুক্তির জন্য আপনি কি চিন্তা করে রেখেছেন?

জবাব

আপনার প্রশ্নে আপনি ভুল চিন্তাপদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। আপনি তো ঐ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ভ্রান্ত বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, যেখানে মানুষ নিজেরাই নিজেদের আইন প্রণয়নকারী হয়ে বসে কিংবা অন্য মানুষকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে। আপনি এ কথাও বুঝতে সক্ষম হয়েছেন, সার্বভৌমত্ব এবং আইন ও বিধান প্রণয়ের অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট। আর

মানুষের কাজ হচ্ছে তাঁর হুকুমের অনুবর্তন করা, হুকুম প্রণয়ন করা নয়। এখন আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন, যে মুসলমানের কল্যাণের কথা আপনি ভাবছেন, তাদেরকে কি উদ্দেশ্যে 'মুসলিম' নামের একটি দল বানানো হয়েছে? এ উদ্দেশ্যে নয়কি যে, তারা কুরআন থেকে প্রমাণিত সত্য জীবন ব্যবস্থাকে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করবে, দুনিয়াকে তার পতাকা তলে শামিল করবে, নিজেদের যিন্দেগীকে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে এবং দুনিয়ার বুকে তাকে চালু করার জন্যে নিজেদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করবে? নাকি এ উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত, পৃথিবীর যে বাতিল ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত থাকুক না কেন (এবং তাদের গাফলাতির কারণেই কায়েম হয়ে থাকুক না কেন), তার সাথে সমঝোতা করে চলা, তাকে মান্য করে চলা এবং তাকে উৎখাত করার চেষ্টা- সংগ্রাম থেকে এ কারণে বিরত থাকার জন্যে যে, হয়তোবা এতে তাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে?

যদি প্রথম উদ্দেশ্যই সঠিক হয়ে থাকে, তবে মুসলমানরা আজ যা কিছু করছে সবই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত। তাদের স্বার্থ যদি এ ভ্রান্তির সাথেই সম্পর্কিত হয়ে থাকে, তবে এমন স্বার্থ কিছুতেই পরোয়া করার যোগ্য নয়। এমতাবস্থায় একজন প্রকৃত মুসলিমের কাজ হচ্ছে, নিজ জাতির সংগে মিলে জাহান্নামের পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে তিনি সত্য জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। তার জাতি তার এ কাজে সহযোগিতা করুক কিংবা না করুক তাতে তার কিছুই যায় আসে না।

কিন্তু আপনি যদি শেষোক্ত উদ্দেশ্যের সমর্থক হয়ে থকেন, তবে আমার বলার কিছু নেই। সত্যকে সত্য জানা সত্ত্বেও আপনি যদি কেবল জাতীয় স্বার্থে সত্যের বিপরীত পথ অবলম্বন করতে চান, তবে আপনি তা করতে পারেন।

অনেকেই এ আশংকাবোধ করছেন, আমরা যদি এসেম্বলী থেকে দূরে থাকি, তবে অমুসলিমরা তা দখল করে নিয়ে তারা একাই রাষ্ট্রের মালিক ও পরিচালক হয়ে বসবে। আমরা যদি রাষ্ট্রের একটি পূর্ণ অংশ না হই তবে অন্যরা সে স্থান দখল করে নেবে। এভাবে যিন্দেগীর সমস্ত কল-কব্জা দখল করে নিয়ে তারা আমাদের অস্তিত্বকেই বিলীন করে দেবে। এমনকি ইসলামের নাম নেবার মতোও কোন লোক বাকী থাকবে না।

কিন্তু এ আশংকা বাস্তবে যতোটা না ভয়াবহ তার চাইতে অধিক ভয়াবহ হচ্ছে লোকদের খামখেয়ালীপনা। আমরা যদি একথা বলতাম, একটা

নেগেটিভ পলিসি অবলম্বন করে মুসলমানরা জীবনের সকল কর্মকাণ্ড থেকে হাত গুটিয়ে ঘরের কোণে বসে পড়ুক, তখন এ আশংকার কোন সত্য ভিত্তি থাকতে পারতো। কিন্তু আমরা এ নেগেটিভ নীতি অবলম্বনের সাথে সাথে একটি পজেটিভ কর্মসূচীও পেশ করছি। আর তা হচ্ছে, মুসলমানরা এ বাতিল রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার পরিবর্তে দুনিয়াতে সত্য জীবন ব্যবস্থা (দীন ইসলাম) প্রতিষ্ঠার জন্যে সুসংগঠিত চেষ্টা সংগ্রাম আরম্ভ করে দিক। অন্যান্য জাতির মতো নিজেদের পার্থিব স্বার্থের জন্যে দ্বন্দ্ব–সংঘাতে লিপ্ত হবার পরিবর্তে তাদের সম্মুখে সত্য জীবন ব্যবস্থা তুলে ধরুক, যার অনুসরণ অনুবর্তনের মধ্যে গোটা মানব জাতির কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তারা কুরআনের মাধ্যমে, সীরাতে রাসূলের মাধ্যমে, ইসলামী চরিত্র অবলম্বনের মাধ্যমে চিন্তা ও চরিত্রের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে আপ্রাণ চেষ্টা–সংগ্রাম চালিয়ে যাক।

আমাদের এ দাওয়াতের দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারেঃ

একটি প্রতিক্রিয়া এই হতে পারে যে, গোটা ভারতবর্ষের দশ কোটি মুসলমান একই সাথে আমাদের এ দাওয়াত কবুল করে নেবে। মানসিক, নৈতিক এবং আমলী দিক থেকে তারা ইসলামের প্রকৃত আহবায়ক হয়ে যাবে। এরা হচ্ছে সেই দশ কোটি মুসলমান, যাদের নিকট রয়েছে বস্তুগত সহায় সম্পদ এবং মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা আর হাত পায়ের শক্তির অভাবতো তাদের নেই–ই। এমতাবস্থায় তারা সবাই মিলে একই সাথে যদি আমাদের দাওয়াত কবুল করে (বাহ্যিকভাবে যার কোন সম্ভাবনা নেই), তবে যেখানে আপনি সন্দেহ করছেন, কিছু আপনাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে, তার বিপরীত আমি বিশ্বাস রাখি যে, এক্ষেত্রে শুধু ভারতবর্ষই নয়, বরঞ্চ বিশ্বের এক বিরাট অংশ আমাদের হস্তগত হয়ে যাবে। সহসাই ভারতের সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুর ঝগড়া থেমে যাবে। কোন শক্তিই ভারতবর্ষে নিরেট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে ঠেকাতে পারবে না। অল্প সময়ের মধ্যেই সকল মুসলিম রাষ্ট্রের কায়া পরিবর্তন হয়ে যাবে। যেসব শক্তি আজ দুনিয়ার বুকে সাম্রাজ্যবাদী থাবা বিস্তার করে আছে, তারা কিছুতেই তিরস্কৃত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে না।

দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া এই হতে পারে (আর এখন এমনটি হবার সম্ভাবনাই বেশী) যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা পবিত্র আত্মা এবং উন্নত মন মানসিকতার

অধিকারী, ধীরে ধীরে তারা আমাদের দাওয়াত কবুল করতে থাকবেন। আর যতোক্ষণ না সুসংগঠিত সৎ লোকদের একটি শক্তিশালী দল তৈরি হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ মুসলমানরা তেমনি করে নেতাদের অনুসরণ করতে থাকবে, দীর্ঘদিন থেকে যেমনি অনুসরণ করে আসছে এবং এখনো করছে। এ কথা পরিষ্কার, আপনি যে বিপদের আশংকা করছেন, এমতাবস্থায় সে আশংকা থাকতে পারে না। কেননা ভুল পথে পরিচালিত বিরাট সংখ্যক মুসলমান সেসব কাজ করার জন্যে বর্তমান থাকবে, যেসব কাজ না করার কারণে আপনি মনে করবেন যে, মুসলমানদের স্বার্থ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এ কথা নিশ্চিত যে, এ সবগুলো কাজও যদি পুরোদমে হতে থাকে, আর সেই একটি কাজই যদি না হয়, যেদিকে আমরা আহবান করছি এবং এ সাথে আমরাও যদি এ প্রকৃত কাজ এবং তার দাবী থেকে চক্ষু বন্ধ করে কেবল জাতি এবং তার স্বার্থের চিন্তায় ভ্রান্তপথে ধাবিত হই, যা নাকি বর্তমানে ইসলাম এবং মুসলমানদের স্বার্থের নামে হচ্ছে, তবে বিশ্বাস করুন, ইসলামের পতাকা উত্তোলিত হওয়া তো দূরের কথা, গোটা মুসলিম জাতি ইয়াহুদীদের মতো চরম লাঞ্ছনা ও অধপতনের হাত থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না, আল্লাহর কিতাব নিজেদের কাছে রেখেও তার দাবী পূর্ণ করা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের ফলে তাদের ভাগ্যে যা ঘটেছে।

(তরজুমানুল কুরআন, মুহাররম–১৩৬৫ হিঃ; ডিসেম্বর, ১৯৪৫ ইং)

শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে অনৈসলামী পার্লামেন্টের সদস্য পদ

প্রশ্ন

"মুসলমান হবার কারণে কোন মুসলমানের জন্যে (বৃটিশ ভারতের) পার্লামেন্টের মেম্বার হওয়া জায়েয কিনা? যদি জায়েয না হয়ে থাকে, তবে কেন? এখানে মুসলমানদের দু'টি বড় দল থেকে পার্লামেন্টের সদস্যপদের জন্যে লোকেরা প্রার্থী হচ্ছে এবং ভোট লাভের জন্যে আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। এমনি করে আলেমদের দাবীও এটাই। মোটামুটিভাবে যদিও এ কথা জানি, মানুষের সার্বভৌমত্বের মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত পার্লামেন্ট এবং তার সদস্য পদ দু'টোই শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। কিন্তু এ ব্যাপারে যতোক্ষণ না যুক্তিসংগত কারণ দেখাতে পারছি, ততোক্ষণ ভোটদানের দাবী থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন।

শরীয়তের দৃষ্টিতে এ সরকারের অধীনে চাকুরী করা বৈধ কিনা এ বিষয়টাও জানা দরকার। মোটামুটিভাবে এ ব্যাপারেও নাজায়েযের পক্ষেই আমার মত। কিন্তু আমার সামনে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ নেই।"

জবাব

নীতিগতভাবে এ কথা স্পষ্টই জেনে নিন যে, বর্তমানকালে যতোগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (যেগুলোর একটি শাখা বর্তমান ভারতীয় পার্লামেন্ট), সেগুলো এ বৈশিষ্ট্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নাগরিকরা তাদের নিজেদের যাবতীয় পার্থিব বিষয় সম্পর্কে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক যাবতীয় নীতিমালা এবং সেগুলোর ওপর বিস্তারিত আইন প্রণয়নের অধিকার নিজেদেরই মুষ্ঠিবদ্ধে রাখে। এ ব্যবস্থার আইন প্রণয়নের জন্যে জনমতের চাইতে উচ্চতর কোন সনদের প্রয়োজন হয় না। এ

মতবাদ ইসলামী মতাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামে তাওহীদী আকীদার এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হচ্ছে, সকল মানুষ এবং গোটা দুনিয়ার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্। হুকুম ও বিধানকর্তা একমাত্র আল্লাহ। হেদায়াত এবং হুকুম দান শুধু মাত্র তাঁরই কাজ। আর মানুষের কাজ হলো, তারা তাঁরই হেদায়াত এবং ফরমান থেকে নিজেদের জন্যে আইন–কানুন গ্রহণ করবে। মতের স্বাধীনতা কেবল সেটুকুই অবলম্বন করবে, যেটুকু স্বয়ং আল্লাহ্ই তাদের প্রদান করেছেন। এ মতাদর্শের দৃষ্টিতে যাবতীয় আইন ও বিধানের উৎস এবং যিন্দেগীর সকল বিষয়ের নির্দেশিকা হলো আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তার রসূলের সুন্নাহ। এ মতাদর্শ থেকে দূরে সরে প্রথমোক্ত গণতান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করা যেনো তাওহীদী আকীদা থেকেই বিচ্যুত হওয়া। এ জন্যে আমি বলছি, যেসব আইন সভা বা পার্লামেন্ট বর্তমানকালের গণতান্ত্রিক আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোর সদস্যপদ হারাম এবং এর সদস্য পদের জন্যে ভোট দেয়াও হারাম কেননা, ভোট দেয়ার অর্থই হচ্ছে, আমরা আমাদের রায় দ্বারা এমন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করছি, যার কাজ হবে বর্তমান প্রশাসন ও বিধানের অধীনে আইন প্রণয়ন ও আইন জারি করা, যা নাকি আকীদাগতভাবে সরাসরি তাওহীদের বিপরীত। যদি কোন আলেম এটাকে বৈধ মনে করেন তবে, তার নিকট থেকেই এর স্বপক্ষে দলিল–প্রমাণ দাবী করুন। আপনি এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার লেখা "সিয়াসী কাশমাকাশ ৩য় খণ্ড" এবং "ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ" গ্রন্থদ্বয় পাঠ করুন।

এ ধরনের ব্যাপারে এটা কোন দলিলই নয়, যেহেতু এ ব্যবস্থা আমাদের ওপর চেপে রয়েছে এবং যেহেতু জীবনের সকল বিষয় এর সাথে সম্পর্কিত, সে জন্যে আমরা যদি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করি এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণের চেষ্টা না করি তবে আমাদের অমুক অমুক ক্ষতি হয়ে যাবে। যা মূলত হারাম, এ রকম দলিল–প্রমাণ দ্বারা তা কোন অবস্থাতেই বৈধ করা যেতে পারে না। তাহলে তো শরীয়তের এমন কোন হারামই আর বাকী থাকবে না সুবিধা ও প্রয়োজনের কারণে যাকে হালাল বানিয়ে নেয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে হারাম জিনিস ব্যবহারের অনুমতি শরীয়তে রয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আপনি নিজে গাফলতি করে নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে বাধ্য হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। অতপর এটাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে সমস্ত হারামকে নিজের জন্যে হালাল বানিয়ে নিতে থাকবেন এবং সেই 'বাধ্য হওয়ার' পরিবেশকে খতম

করার জন্যে কোন প্রচেষ্টা চালাবেন না, পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। এখন মুসলমানদের ওপর যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা চেপে বসে আছে এবং যার চেপে বসাকে তারা নিজেদের জন্যে 'বাধ্য হবার' দলিল বানাচ্ছে, তা তো তাদের নিজেদেরই গাফলতির পরিণাম ফল। এখন যেখানে তাদের সবটুকু সময়, যোগ্যতা ও শক্তি–সামর্থের পুঁজিকে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন এবং খালেস ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত করা উচিত সেখানে তারা এর পরিবর্তে বাধ্য হওয়াকে দলিল বানিয়ে এ বাতিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে অংশীদার হবার এবং তাকে আরো মজবুত এবং স্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে।

আপনি দ্বিতীয় যে জিনিসটা জানতে চেয়েছেন, তার জবাব হলো, ব্যক্তিগতভাবে একজন মুসলমান বেতন বা পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে কোন অমুসলমানের চাকুরী বা কাজ করে দেয়ার ব্যাপারে একমত বা চুক্তিবদ্ধ হওয়াতে দোষ নেই। তবে শর্ত হচ্ছে, সেই কাজ বা চাকুরী কোন অবস্থাতেই সরাসরি হারামের সাথে সম্পর্কিত হতে পারবে না। কিন্তু একদল আলেম এর ভিত্তিতে কুফরী রাষ্ট্রে চাকুরীকে বৈধ আখ্যায়িত করার যে প্রয়াস চালাচ্ছেন, তা সহীহ নয়। তারা সেই মৌলিক পার্থক্যটাই উপেক্ষা করছেন যা একজন অমুসলিম ব্যক্তি এবং একটি অনৈসলামী সরকারের সামষ্টিক কার্যক্রমের সাথে জড়িত। একটি অনৈসলামী রাষ্ট্র তো প্রতিষ্ঠিতই হয় এ জন্যে, যেনো ইসলামের পরিবর্তে অনৈসলামী, আনুগত্যের পরিবর্তে নাফরমানী এবং আল্লাহর খেলাফতের পরিবর্তে মানব জীবনে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ প্রকাশ পায়। এ রাষ্ট্রের সার্বিক কার্যক্রমই এ উদ্দেশ্যে কাজ করে। এটা পরিষ্কার কথা, এ সবগুলো জিনিসই হারাম এবং সকল হারামের চাইতে বড় হারাম। সুতরাং এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে এ রকম কোন পার্থক্য করা যেতে পারে না যে, অমুক বিভাগের কাজ জায়েয ধরনের আর অমুক বিভাগের কাজ নাজায়েয ধরনের। কারণ এ সবগুলো বিভাগ সমন্বিতভাবে একটি বিরাট আল্লাহদ্রোহী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই প্রতিষ্ঠিত রাখছে। ব্যাপারটা সঠিকভাবে বুঝবার জন্যে একটা উদাহরণই যথেষ্ট মনে করছি। কোন একটি প্রতিষ্ঠান যদি মুসলমান সাধারণের মধ্যে কুফরীর প্রসার এবং তাদেরকে মুরতাদ বানানোর উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এ প্রতিষ্ঠানের কোন হালাল ধরনের কাজও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন মুসলমানের জন্যে বৈধ হতে পারে না। কেননা সে কাজটিও এ প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার জন্যে প্রয়োজনীয়।

(তরজুমানুল কুরআন, মুহাররম, ১৩৬৫ হিঃ; ডিসেম্বর, ১৯৪৫ ইং)

শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পন্থা

প্রশ্ন

নিম্নে দু'টি সন্দেহের কথা উল্লেখ করছি। মেহেরবানী করে এ বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট করবেনঃ

১· তরজুমানুল কুরআনের গত সংখ্যায় একজন প্রশ্নকারীর এ প্রশ্ন প্রকাশ হয়েছে যে, নবী পাক (সা)-কে কোন সুসংগঠিত রাষ্ট্র শক্তির মুকাবিলা করতে হয়নি। অথচ হযরত ইউসূফের (আ) সামনে ছিলো এক সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা। তিনি যখন পূর্ণ রাষ্ট্র ক্ষমতা তার হাতে ন্যস্ত করার ব্যাপারে রাষ্ট্রকে সম্মত পেলেন, তখন তিনি এগিয়ে গিয়ে তা কবুল করেন। প্রথমে ঈমানদার সৎ লোকদের একটি জামায়াত তৈরী করতে হবে এ পন্থা তিনি অবলম্বন করেননি। আজকের যুগেও কি তাঁর অনুসৃত সে নীতি অবলম্বন করা যেতে পারে না? কেননা বর্তমানে রাষ্ট্র ব্যবস্থা তো আগের তুলনায় আরো অধিক মজবুতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে?"—এ প্রশ্নের জবাবে আপনি যা কিছু লিখেছেন, তাতে আমি পূর্ণ আশ্বস্ত হতে পারিনি। আমার জিজ্ঞাসা এই যে, আমাদেরকে হযরত ইউসুফ (আ)-এর অনুসরণ কেন করা উচিত? আমাদের জন্যে তো শুধু মাহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর (সা) অনুসরণই ওয়াজিব। তিনি তো মক্কাবাসীদের বাদশাহীর প্রস্তাব প্রত্যাখান করে নিজস্ব পন্থায় পৃথক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফায়সালা করেন এবং বর্তমানে আমাদের জন্যেও এটাই একমাত্র কর্মপন্থা। আমার এ মত কতটা সঠিক কিংবা কতটা ভুল মেহেরবানী করে বিস্তারিতভাবে জানাবেন।

২· আপনি আরো লিখেছেন ঃ 'কোন এক পর্যায়ে গিয়ে যদি এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, প্রচলিত সাংবিধানিক পন্থায় বাতিল রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে আমাদের আদর্শের ছাঁচে ঢেলে গড়া সম্ভব, তখন আমরা সে সুযোগ গ্রহণে দ্বিধা করবো না।' এ বাক্য দ্বারা লোকদের এ ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে যে, জামায়াতে

ইসলামীও পার্লামেন্টে আসার জন্যে অনেকটা প্রস্তুত এবং জামায়াত নির্বাচনকে জায়েয মনে করছে। এ বিষয়ে জামায়াতের নীতি সম্পর্কে আলোকপাতকরুন।

জবাব

সকল নবীই আমাদের জন্যে অনুসরণীয়। স্বয়ং নবী পাক (সা) কেও এ নির্দেশই দেয়া হয়েছিল যে, "সেই পন্থা ও তরীকায় চল যা ছিল আম্বিয়ায়ে কিরামের পন্থা ও তরীকা।" কোন নবী কোন বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন বলে যদি আমরা কুরআন থেকে অবগত হই এবং কুরআন যদি সেই কর্মপন্থাকে মনসুখ ঘোষণা না করে থাকে তবে সেটাও আমাদের জন্যে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা)–এর অনুসৃত পন্থার মতোই দীনি কর্মপন্থ

নবী করীম (সা)–কে যে বাদশাহী প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছিল তা ছিল এই শর্ত সাপেক্ষে যে, আপনি এ দীন এবং এর প্রচার বন্ধ করুন, তাহলে আমরা সবাই মিলে আপনাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে নেবো। হযরত ইউসুফ (আ)–এর সামনেও যদি এ শর্ত পেশ করা হতো তবে তিনি সেই বাদশাহীকে অভিশপ্ত মনে করতেন, যেমন মনে করেছিলেন নবী পাক (সা)। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ)–কে যেসব ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল সেগুলো ছিল নিঃশর্ত এবং প্রতিবন্ধকতাহীন। তা গ্রহণের সাথে সাথে তিনি রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সত্য দীন মুতাবিক পরিচালনার ক্ষমতাও লাভ করেছিলেন। এমনটি যদি নবী পাক (সা)–এর সামনেও পেশ করা হতো তবে তিনিও তা গ্রহণ করতেন এবং বিনা কারণে লড়াই করে সেই জিনিস লাভ করার প্রয়োজন পড়তো না যা এমনি তাঁকে দেয়া হচ্ছিল। একইভাবে জনমতের সাহায্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তগত করে নিরেট ইসলামী বিধানের ভিত্তিতে তা পরিচালনা করার সুযোগ যদি আমাদেরও আসে তবে তা গ্রহণ করতে আমরা কোন প্রকার দ্বিধা করবনা।

২· নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া এবং পার্লামেন্টে যাওয়ার উদ্দেশ্য যদি হয় অনৈসলামী সংবিধানের অধীনে একটি ধর্মহীন (Secular) গণতান্ত্রিক (Democratic) রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করতে হবে, তবে সেটা আমাদের তাওহীদী আকীদাহ এবং আমাদের দীনের সম্পূর্ণ খেলাফ। কিন্তু আমারা যদি কখনো দেশের জনমতকে আমাদের আকীদাহ ও নীতির পক্ষে এতটা ব্যাপকভাবে একমত করতে পারি যার ফলে আমাদের জন্যে রাষ্ট্রীয়

সংবিধানে পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে, তখন এ পন্থা অবলম্বন না করার কোন কারণ থাকবে না। বিনা লড়াইতে সোজা পন্থায় যে জিনিস লাভ করা সম্ভব, তাকে বিনা কারণে বাঁকা আঙুলে বের করার হুকুম শরীয়াহ আমাদের দেয়নি। কিন্তু এ কথা ভালভাবে বুঝে নিন, এ কর্মপন্থা আমরা কেবল তখনই অবলম্বন করবো, যখনঃ

একঃ দেশে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে শুধু জনমত সৃষ্টি হলেই সে ব্যবস্থা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে;

দুইঃ দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে আমরা দেশবাসীর একটা বিরাট সংখ্যক লোককে আমাদের ধ্যান–ধারণার সংগে একমত করতে পারবো এবং অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্ব সাধারণের পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপিত হবে;

তিনঃ নির্বাচন এ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হবে যে, দেশের ভবিষ্যত রাষ্ট্র ব্যবস্থা কোন ধরনের শাসনতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

(তরজুমানুল কুরআন, মুহাররম, ১৩৬৫ হিঃ; ডিসেম্বর, ১৯৪৫ইং)

১৯৪৬-এর নির্বাচন ও জামায়াতে ইসলামী (ফেব্রুয়ারী-১৯৪৬)

(১৯৪৬-এর নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগের কট্টোর সমর্থক এক ব্যক্তি জামায়াতে ইসলামীর নীতির সমালোচনা করে এক নিবন্ধ লিখেছিলেন। নিম্নে উক্ত নিবন্ধ ও তার জবাব হুবহু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।)

অর্ধ সাপ্তাহিক কওছার পত্রিকার ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৫ সংখ্যায় একটি প্রশ্নের জবাবে লেখা মাওলানা মওদূদীর যে নিবন্ধটি ছাপা হয়েছিল, ইদানিং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। মাওলানা সাহেব নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ও ভোট প্রদানকে হারাম আখ্যায়িত করে বলেছেন যে-

"ভোট এবং নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের নীতি সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নিন। আসন্ন নির্বাচন অথবা ভবিষ্যতের নির্বাচন সমূহ যত গুরুত্বপূর্ণই হোক এবং আমাদের দেশ ও জাতির ওপর তার যে ধরনের প্রভাবই পড়ুক, একটি আদর্শবাদী দল হিসেবে, আমরা যেসব নীতি ও আদর্শের প্রতি ঈমান এনেছি, কোন সাময়িক স্বার্থের তাগিদে তা বিসর্জন দেয়া আমাদের পক্ষে কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। বর্তমান শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমরা এ জন্যই সংগ্রামরত যে, এ শাসন ব্যবস্থা জনগণের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং জনগণের নির্বাচিত পার্লামেন্ট বা আইনসভাকে তা আইন রচনার এমন শর্তহীন অধিকার প্রদান করে যে, তার জন্য কোন উচ্চতর সনদ সে স্বীকারই করে না। পক্ষান্তরে আমাদের স্বীকৃত আদর্শ তাওহীদের মূলকথা এই যে, সার্বভৌমত্ব জনগণের নয়, বরং আল্লাহ্র। আর আল্লাহ্র কিতাবকেই আইনের

সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত সনদ মানতে হবে। আইন রচনার কাজ যেটুকুই হোক, তা আল্লাহ্র কিতাবেরই আওতাধীন হতে হবে, তা থেকে বেপরোয়া হতে পারবে না।"

বর্তমান যুগের আলেমগণ, কংগ্রেসীই হোন কিংবা আহ্‌রারী, বেরেলবীই হোন কিংবা দেওবন্দী, হরেক রকমের রাজনৈতিক মতামতের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আইনসভায় অংশ গ্রহণ বা অন্তর্ভূক্তির ব্যাপারে কার্যত একমত। সরাসরি প্রত্যাখ্যান ও বয়কটের আওয়াজ পাঠানকোট ছাড়া আর কোথা থেকেও ওঠেনি। আর তাও কেবল প্রত্যাখ্যান পর্যন্তই। একটা তত্ত্ব হিসাবে এ নিয়ে এখনো প্রয়োজনীয় আলোচনা হয়নি। নিম্নে আমি সংক্ষেপে নিজের অভিমত ব্যক্ত করছি। জ্ঞানীজনের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হলে এর বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় যুক্তি—প্রমাণ সহকারে প্রকাশিত হতে পারে।

আইনসভার সদস্যদের যদি আইন রচনার শর্তহীন ও অবাধ ক্ষমতা থেকে থাকে, তা হলে এ ক্ষমতার অবাধ ও শর্তহীন হওয়া দ্বারাই তাদের সঠিক আইন রচনার স্বাধীনতা পর্যাপ্তভাবে নিশ্চিত হয়। অর্থাৎ তারা এমন আইন রচনার ক্ষমতা লাভ করবেন, যাতে "আল্লাহ্র কিতাবকেই চূড়ান্ত সনদ মানা হবে এবং আইন রচনার কাজ কেবলমাত্র আল্লাহ্র কিতাবের অধীনেই হবে, তা থেকে বেপরোয়া নয়।" কেননা পৃথিবীতে আল্লাহ্র আইনের দায়িত্ব আল্লাহ্র বান্দাদেরকেই পালন করতে হবে। ক্ষমতা ও এখতিয়ার যদি সৎ বান্দাদের হাতে আসে তা হলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্র যমীনে সততারই প্রসার ঘটবে এবং অসততার উচ্ছেদ ঘটতে থাকবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেনঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

"যাদেরকে আমি যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে।"

সুতরাং এ মহত্তম লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইতিবাচক দিক তো এটাই যে, এমন লোকদের নির্বাচনের চেষ্টা করতে হবে, যারা আল্লাহ্র মর্জি মোতাবেক কাজ করবেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস হয় এবং নেতিবাচক দিক এই যে, এমন লোকদের নির্বাচিত হওয়া ও ক্ষমতা লাভ প্রবলভাবে প্রতিরোধ করতে হবে,

যারা এর বিপরীত কাজ করবে বলে মনে হয়। বিচ্ছিন্নতা, বয়কট ও নিষ্ক্রীয়তার বৈধতা কোনভাবেই প্রমাণিত হতে পারে না। সৎ ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের ক্ষমতায় আসার ব্যাপারে সহযোগিতা না করা হলে তা হবে সৎ কাজে সহযোগিতার যে নির্দেশ কুরআনে দেয়া হয়েছে তার বরখেলাফ। আর যদি ময়দান খালি ছেড়ে দিয়ে খারাপ লোকদেরকে সুযোগ করে দেয়া হয় তবে সেটা হবে "সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে নিষ্ক্রীয় ও উদাসীন থাকার" অপরাধ।

তবে যদি বর্তমান দলসমূহের মধ্যে কোনটাই সহযোগিতা লাভের যোগ্য সাব্যস্ত না হয়, তা হলে জামায়াতে ইসলামীরই ময়দানে আসা উচিত, যেন জামায়াত "সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র কিতাবই আইন রচনার ভিত্তি ও উৎস" এ তত্ত্বের স্বীকৃতি আদায়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পারে। তা সত্ত্বেও সর্বশক্তি নিয়োগের জন্য বয়কট ও বর্জনের ময়দান সন্ধান করা অবশ্যই ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ব্যাপার।

যদি প্রতিটি ব্যাপারকেই সাময়িক আখ্যায়িত করে মুসলমানদেরকে তা থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেয়া হয়, তা হলে মুসলমানদের বসবাসের জন্য এমন এক জগত খুঁজতে হবে, যেখানে দিন রাতের আবর্তন হয় না এবং যা স্থান কালের বাধ্যবাধকতার উর্ধে। তা ছাড়া এ কথাটাও ভাবতে হবে যে, ইসলামের সর্বব্যাপী বিধান কি এতই অক্ষম যে, নিত্যকার সমস্যাবলীকে আপন কালজয়ী ও শাশ্বত আইন দ্বারা সমাধান করতে পারে না? বিচ্ছিন্নতা কোন ক্রমেই এ সমস্যার সমাধান বলে বিবেচিত হতে পারে না। এ বিধানের সাথে হয় প্রতিরোধ ও প্রত্যাখ্যানের আচরণ করতে হবে, নচেত গ্রহণ ও প্রত্যয়ের সম্পর্ক থাকতে হবে। পরিপূর্ণ প্রতিরোধ যদি সম্ভব নাও হয়, তবুও মুসলমান যথাসাধ্য কাজ করতে বাধ্য।

এ ব্যাপারে প্রায়শ অনন্যোপায় অবস্থা ও স্বাধীন অবস্থার বিষয় আলোচনায় এসে থাকে। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, শ্রদ্ধেয় মাওলানা মওদূদী সাহেব নিজের বহুসংখ্যক লেখায় আক্ষেপ করে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমানে ভারতে এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে ইসলামী আইন অবাধে চালু করা যেতে পারে। সত্যিই বর্তমান সরকারের আওতায় থাকা অবস্থায় এবং প্রচলিত আইন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীন জীবন যাপন করে আমাদের সকল শক্তি ও সহায়–সম্পদকে বাতিল ব্যবস্থার

হাতিয়ারে পরিণত হওয়া থেকে মুক্ত রাখা বাস্তবিক পক্ষেই অসম্ভব। ভারতের এ বিরাট ও বিশাল উপমহাদেশে এক ইঞ্চি যমীনও এমন খুঁজে পাওয়া যাবে না যা এ বাতিল ব্যবস্থার প্রভাব থেকে মুক্ত। তথাপি গুরুদাসপুর জেলার পাঠানকোটের নিকটে এক টুকরো যমীনকে দারুল ইসলামে পরিণত করা হচ্ছে এবং প্রচলিত শয়তানী ব্যবস্থার যাবতীয় খারাপ বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও তার মধ্যে সেই দারুল ইসলাম বিদ্যমান। এটা এ অনন্যোপায় অবস্থারই পরিণতি যে, যে জিনিস পূর্নাঙ্গভাবে অর্জন করা সম্ভব নয় তা যতটা পারা যায় অর্জন করা দরকার।

মাওলানা দারুল ইসলামের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তা থেকে বৈরাগ্যবাদ ও মান্ধাতা আমলের কূপমন্ডূকতার সন্দেহও অপোনোদন করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অনেক ধর্মপ্রাণ লোকেরা ভুলবশত যেমন ভাবেন, অবিকল সাহাবায়ে কেরামের সময়কার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তাকে একটা নির্জীব অবস্থায় বহাল রাখা নয়। বরং তিনি-

اَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ ـ

(বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় যত পার, শক্তি ও অশ্ববাহিনী যোগাড় কর, যেন তোমরা আল্লাহর দুশমনকে ও নিজেদের দুশমনকে আতংকিত করতে পার।)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতির রাজ্যের প্রত্যেক নতুন শক্তি ও অধিকারকে ইসলামী বিধানের আওতাধীন ব্যবহার করাই প্রকৃত ইসলাম। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন যে, "রেডিও স্বয়ং অপবিত্র জিনিস নয়। বরং যে কৃষ্টি রেডিওর পরিচালককে প্রমোদ বিলাসীদের রক্ষক অথবা মিথ্যা প্রচারক বানায়, সেই কৃষ্টিই অপবিত্র।" (দারুল ইসলাম পত্রিকা, পৃঃ ২০)

তিনি আরো বলেছেনঃ

"এই শক্তিগুলো তো তরবারীর মত। যে তা ব্যবহার করবে সেই সফল হবে। চাই সে অপবিত্র উদ্দেশ্যে ব্যবহার করুক অথবা পবিত্র উদ্দেশ্যে। যার উদ্দেশ্য মহৎ সে যদি সেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে

এবং তরবারী ব্যবহার না করে, তবে এটা তারই ত্রুটী এবং এ ত্রুটির শাস্তি তাকে পেতেই হবে। কেননা এ বস্তু প্রধান জগতে আল্লাহর যে নিয়ম বিধি চালু রয়েছে, সেটা কারুর খাতিরে পাল্টানো যায় না।" (উক্ত পত্রিকা পৃঃ ২০)

আমার কথা হলো, আইন্ সভার অবাধ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অথবা সরকারী প্রশাসনিক ক্ষমতাও তরবারী বিশেষ। এই তরবারী যদি আপনার মত বিশুদ্ধ চিন্তার অধিকারী লোককের করতলগত হওয়ার সুযোগ আসে, তবে সে সুযোগ হাতছাড়া করা এবং তা দ্বারা সম্ভাব্য ফায়দা অর্জন করা থেকে বিরত থাকা কিভাবে বৈধ হতে পারে? বাতিলের প্রতিরোধ এবং হককে বিজয়ী করার ঝামেলা থেকে স্বেচ্ছায় দূরে থেকে নির্ঝঞ্ঝাট ঘরের কোণে লুকানোর এ একটা বিজ্ঞজনোচিত চেষ্টা নয় তো?

একটি পবিত্র দল যদি নিজের পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে, নোংরা মতলবধারী লোকদের জন্য স্বেচ্ছায় ময়দান ছেড়ে দেয় এবং বাতিলের গাড়ীর সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির পরিবর্তে তার চাকার সাথে নিজেকে নিশ্চলভাবে বেঁধে দেয়াকেই দীনদারী ও ইসলামের খিদমত মনে করে, তা হলে এ বস্তু প্রধান জগতে আল্লাহর বিধি মোতাবেক তাকে কি সাজা ভোগ করতে হবে না?

মুসলমানদেরকে অনৈসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এবং একটা নির্ভেজাল ইসলামী পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়–বস্তুত সম্ভব যে নয় তা সুস্পষ্ট––তা হলে এটা কি ধরনের নীতি যে, যে সহযোগিতা দ্বারা এ রাষ্ট্র ব্যবস্থা যথাযথভাবে উপকৃত হয়ে ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে, সে সহযোগীতা তো অব্যাহত রাখা হবে, আর যে সব ব্যবস্থা অবলম্বনে কিছুটা ইসলামী স্বার্থ অর্জনের আশা করা যায় তা থেকে সেচ্ছায় বঞ্চিত থাকা হবে? 'কওসার' পত্রিকার বক্তব্য অনুসারে এ আচরণকে অগ্রগতির নীতি না বলে স্থবীরতা ও নিক্রীয়তার নীতি বলাইযুক্তিযুক্ত।

কওসারের একই সংখ্যার সম্পাদকীয়তে মাওলানা নাসরুল্লাহ খান আজীজও এ বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করেছেন। সে আলোচনা পড়লে আরো দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার হতে হয় এবং ইতিপূর্বে নিক্রীয়তা ও স্থবীরতার যে ধারণা জন্মেছিল তা আর ধারণার পর্যায়ে থাকে না, বরং সে ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে। তিনি জিহাদের জন্য দুটো শর্ত আরোপ করেছেন। লিখেছেনঃ

"এ জন্য দু'টো শর্ত জরুরী। প্রথমত তা স্বাধীন শাসকের নেতৃত্বে হওয়া চাই। অন্য কোন পরাক্রান্ত ও চাপিয়ে দেয়া শাসন ব্যবস্থার অধীন যেহেতু স্বাধীন শাসকের অস্তিত্ব অসম্ভব, তাই সে ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা অশান্তি ও অরাজকতার নামান্তর। এটা বৈধ নয়।"

এ নির্দেশের আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। স্বাধীন শাসকের নেতৃত্ব ছাড়া জিহাদ অরাজকতার শামিল। অথচ অন্য একটা পরাক্রান্ত ও জেঁকে বসা শাসনের অধীন স্বাধীন শাসকের বিদ্যমানতা সম্ভব নয়।[১]

এ শর্তটাকে যদি যথার্থ বলে মেনে নেই, তা হলে ইসলামী শাসন কায়েমের একটা উপায়ই শুধু অবশিষ্ট থাকে। সেটি এই যে, পরাক্রান্ত শাসন ব্যবস্থার পরিচালকবৃন্দ দয়া করে সেচ্ছায় মুসলমানদের ওপর থেকে নিজেদের প্রতাপশালী শাসনের অবসান ঘটাবেন এবং তাদেরকে পূর্ণ স্বাধীন পরিবেশে থাকতে দিয়ে শান্তশিষ্ট হয়ে কোথাও উধাও হয়ে যাবেন, যাতে করে মুসলমানরা একটা স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার আইনসম্মত অধিকার লাভ করে। এর পর জেহাদের আবশ্যকতা আর থাকবে কিনা সে ভিন্ন কথা। তবে জিহাদ হালাল হওয়ার জন্য এটাই শর্ত। শরীয়াত সম্মত এ ফতোয়া যদি কোন অপরহেজগারের কাছে সন্দেহজনক মনে হয়, তা হলে এ ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না যে, অনৈসলামিক ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিরোধের মুখে ও অনৈসলামিক পরিবেশে যেমন দারুল ইসলাম কায়েম করা শুধু সঙ্গতই নয় বরং অত্যাবশ্যক মনে হয় এবং সেই অনৈসলামিক ব্যবস্থার সৃষ্ট যাবতীয় শক্তি ও সরঞ্জাম দ্বারা কাজ নেয়াকে প্রকৃত ইসলাম ও কাজ না নেয়াকে ধ্বংসাত্মক আখ্যায়িত করা হয়। তেমনি আইনসভা থেকে নিজের অংশ আদায় করা ও তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করাই যুক্তি ও ইনসাফের দাবী বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

মুসলিম লীগের তৈরী করা বর্তমান পরিবেশ এমন এক পর্যায়ে পৌছেছে যে, পল্লী অঞ্চলের নিরক্ষর ভূস্বামীগণ—যারা বংশীয় আভিজাত্য ও রেষারেষীতে আরবের বেদুঈনদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়—তাদের সামনে

---

১. এখানে দু'টো আলাদা বিষয়ের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়েছে। কওসার সম্পাদক যে জিহাদের কথা আলোচনা করেছেন, তা হলো সশস্ত্র যুদ্ধ, চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম অর্থে ব্যবহৃত জিহাদ নয়। শেষোক্ত ধরনের জিহাদের জন্য স্বাধীন শাসকের শর্ত আরোপের পক্ষে কেউ মত দেয়নি। (পুরানো)

যদি এক দিকে কোন অধার্মিক নওয়াব এবং অপর দিকে একজন আলেম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী হতো, তা হলে তারা অবশ্যই আলেমকে বিজয়ী করে ছাড়তো। এ দুর্লভ সুযোগের সদ্ব্যবহার এবং জনগণকে ধর্মীয় নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত রাখার দায়দায়িত্ব শুধু তাদের ওপরই বর্তাবে, যারা শুধু নিজেদের স্বাচ্ছন্দের খাতিরে আলেমদেরকে বয়কট করার পরামর্শ দিচ্ছেন।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম اجْعَلْنِى عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ (আমাকে কোষাগারের দায়ীত্ব দাও) বলে অনৈসলামিক সরকারের একটি বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সর্বোচ্চমানের দক্ষ ব্যবস্থাপনা দ্বারা পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।

হযরত মূসা (আঃ) اَدُّوْا اِلَىَّ عِبَادَ اللّٰهِ (আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে সমর্পণ কর) এবং (اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ) (বনী ইসরাইল সম্প্রদায়কে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও) এ দাবী ক্রমাগত জানিয়ে একটি অসভ্য ও অসৎ মানবগোষ্ঠীকে সেই দেশেরই একাংশে রেখে সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান বানানোর চেষ্টা করেন।

রোগীকে নিরাময় করতে হলে তার দেহের ভেতরকার অন্ত্রগুলোকে পরিশুদ্ধ করেই তা করতে হয়। প্রতিবেশীর ঘরে যত উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান ঔষধই থাকুক এবং তা যত সুশৃংখল ও সুবিন্যস্তভাবেই সাজিয়ে রাখা হোক, অন্য বাড়ীর রোগী তাতে রোগমুক্ত হতে পারে না।

জবাব

এ নিবন্ধটা আসলে একাধিক ভুল ধারণার সমষ্টি। ছোটখাট ব্যাপারগুলো বাদ দিয়ে আমি শুধু তিনটে বড় বড় ও মৌলিক ভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করবো।

একঃ লেখকের পয়লা ভুল এই যে, "যদি আইনসভার সদস্যদের আইন প্রণয়নের শর্তহীন অধিকার থাকে, তা হলে এ অধিকারটার শর্তহীন হওয়া দ্বারাই এটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, তারা সঠিক আইন প্রণয়নে স্বাধীন থাকবে। অর্থাৎ এমন আইন রচনায় তাদের নিরংকুশ ও অবাধ ক্ষমতা থাকবে যার চূড়ান্ত ও সর্বশেষ সনদ হবে আল্লাহর কিতাব।" আপাত দৃষ্টিতে এ কথাটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কিন্তু এর সামান্য বিশ্লেষণ দ্বারাই অতি সহজে বুঝা যায় যে, এটা আসলে ভুল বুঝাবুঝি ছাড়া আর কিছু নয়। স্বাধীনতার একটা

ব্যাখ্যা এই যে, মানুষ ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীগতভাবে কোন কাজ করা বা না করার ক্ষমতার অধিকারী হবে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, মানুষ ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীগতভাবে নিজের এরূপ নীতি নির্ধারণ করে নেবে এবং এ নীতি অনুসারে কাজ করবে যে, সে আপন কার্যকলাপে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বয়ং নিজস্ব খেয়াল খুশী ও বিবেচনা ছাড়া কোন ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ থেকে আদেশ বা নিষেধ গ্রহণে বা নিজ কার্যকলাপের ব্যাপারে পথনির্দেশ অর্জনে বাধ্য নয়। এ দু' ধরনের ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমটা হলো মানুষের স্বাভাবিক দায়িত্বের ভিত্তি। এ দায়িত্বের ভিত্তিতেই তার ওপর আল্লাহর বিধান আরোপিত। এ স্বাধীনতা মুমিন হবার জন্য যেমন জরুরী, তেমনি কাফের হবার জন্যও অপরিহার্য। একে ঈমান ও ইসলামের পথেও ব্যবহার করা যায়। আবার কুফরী ও নাফরমানীর জন্যও কাজে লাগানো যায়। খোদ্ এ স্বাধীনতাকে কুফরীও বলা যায় না, ঈমানও বলা যায় না। বরং এটি উভয়ের জন্য পূর্বশর্ত। এ স্বাধীনতা ছাড়া কোন ব্যক্তি বা সমাজ ঈমানের পথেও চলতে পারে না, কুফরীর পথেও নয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের স্বাধীনতা সৃষ্টিতই একটা কাফের সুলভ স্বাধীনতা। কোন ব্যক্তি বা সমাজ একে একটা আদর্শ বা নীতি হিসেবে গ্রহণ করলে তার সুস্পষ্ট অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে ঈমানের পরিবর্তে কুফরীর পথ অবলম্বন করলো। কেননা মানুষ নিজের জন্য আল্লাহর হেদায়াতের অপরিহার্যতা প্রত্যাখ্যান করে নিজের চিন্তা ও কর্মে স্বেচ্ছাচারমূলক আচরণ করলে সেই আচরণটিকেই কুফরী বলা হয়। কুফরী এ ছাড়া আর কোন জিনিসের নাম নয়।

এখন দেখতে হবে যে ভারতে বর্তমানে যে শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে স্বাধিকারমূলক শাসন কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে এবং আগামীতে যে রূপরেখার আলোকে তার বিকাশ ঘটানো হচ্ছে, তা কি শুধু প্রথম প্রকারের স্বাধীনতার ভিত্তিতেই, না তাতে দ্বিতীয় প্রকারের স্বাধীনতাও অন্তর্ভুক্ত? ভারতের বর্তমান শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুমাত্র অবগত আছে এমন ব্যক্তিমাত্রেই জানে যে, এই শাসন ব্যবস্থার পুরোটাই ইহকাল সর্বস্ব ধর্মহীন রাষ্ট্র সংক্রান্ত মতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে এ ব্যবস্থার আরো যেটুকু বিকাশ সাধিত হচ্ছে, সে ক্ষেত্রেও এ কথা মৌলিক তত্ত্ব ও আদর্শরূপে গ্রহণ করা হয়েছে যে, একে ইহলোক সর্বস্ব ও ধর্মহীন রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত্তিতেই গড়া হবে। অর্থাৎ এতে দেশবাসীর শুধু যে আপন ইচ্ছা মোতাবেক শাসনতন্ত্র গ্রহণেরই স্বাধীনতা থাকবে তা নয়, বরং তার ভিত্তি আবশ্যিকভাবে জনগণের

সার্বভৌমত্বের মতবাদের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হবে (এবং আজও রয়েছে)। আইন প্রণয়নে জনগণের মতামতের ঊর্ধে কোন ঐশী কিতাব বা ঐশ্বরীক প্রত্যাদেশের শরণাপন্ন হবার প্রয়োজন নেই। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে এ গোটা শাসন ব্যবস্থাই মূলত একটা কুফরী শাসন ব্যবস্থা। এর ভিত্তি আর ইসলামের ভিত্তি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। ইসলামী মূল তত্ত্বকে মেনে নিয়ে এ ব্যবস্থায় প্রবেশ করা সম্পূর্ণরূপে ঈমান বিরোধী কাজ। এ আওয়াজ যদি শুধু "পাঠানকোট" থেকে উঠে থাকে, তা হলে সেটা বেচারা পাঠানকোটের দোষ নয়। অন্য যেসব জায়গা থেকে এ আওয়াজ ওঠা উচিত ছিল অথচ ওঠেনি, দোষটা আসলে সেই সব জায়গারই।

এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা যে, আমরা এ শাসন ব্যবস্থার ভেতরে প্রবেশ করে[১] একে ইসলামমুখী করে নেবো। এর মৌলিক মতাদর্শকে মেনে না নিয়ে এর ভেতরে প্রবেশ করাই সম্ভব নয়। আর এর মৌলিক আদর্শকে মেনে নেয়া ইসলামের মূল তত্ত্বকে অস্বীকার করার শামিল। সুতরাং মুসলমান হিসেবে আমাদের জন্য এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই যে, বাইরে থেকেই[২] এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে এবং আমাদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা প্রয়োগ করে প্রথমে এ মূলনীতির পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করতে হবে যে, আইন প্রণয়ন আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে নিরপেক্ষ নয় বরং তার অধীন হওয়া চাই। আর শাসন ক্ষমতার ব্যাপারে দেশবাসীর যে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব থাকবে, সেটা হবে অন্য দেশ ও অন্য জাতির মোকাবিলায়--আল্লাহর মোকাবিলায় নয়। তাত্ত্বিক ও আদর্শিক দিক বাদ দিলেও বাস্তবতার বিচারেও এটা সম্পূর্ণরূপে একটা ভ্রান্ত কৌশল যে, প্রচলিত কুফরী শাসন ব্যবস্থাধীন আইন সভায় প্রবেশ করার পর আমরা উপরোক্ত আদর্শের স্বীকৃতি আদায় করতে সচেষ্ট হবো। মূল তত্ত্বের দিক দিয়ে যেসব দল প্রচলিত শাসন পদ্ধতির সাথে একমত এবং কেবলমাত্র খুটিনাটি সংস্কারমূলক কাজে নিজেদের স্বতন্ত্র মতাদর্শ পোষণ করে, শুধুমাত্র সে সব দলই এ ধরনের পার্লামেন্টারী কর্মপদ্ধতি দ্বারা উপকৃত হতে সক্ষম। পক্ষান্তরে যে দল এ গোটা শাসন পদ্ধতিকেই আদর্শিকভাবে পাল্টে দিতে চায়, তার জন্য পার্লামেন্টারী কর্মনীতি

১· অর্থাৎ এর কার্যকরীতায় অংশ গ্রহণ করে।

২· 'বাইরে থাকা' দ্বারা আমি সরকারী অবকাঠামোর বাইরে থাকাকে বুঝিয়েছি--সরকারের অধীন যে সার্বিক সামাজিক ও পৌর ব্যবস্থা চালু রয়েছে তার বাইরে নয়।

কোন রকমেই লাভজনক হতে পারে না। তাকে তো অনিবার্যভাবে বৈপ্লবিক কর্মপন্থাই অনুসরণ করতে হয়। অর্থাৎ তাকে প্রচলিত শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অসন্তোষ সৃষ্টি করতে হয় এবং দেশবাসীর মনে তাকে বদলাবার একটা অদম্য আকাংখা জাগিয়ে তুলতে হয়। অতপর বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে এমন কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হয়, যা দ্বারা শাসন ব্যবস্থা কার্যকরভাবে পরিবর্তিত হতে পারে।

দুইঃ লেখক দ্বিতীয় যে ভ্রান্তিতে লিপ্ত, তা এই যে, তার মতে বর্তমান কুফরী শাসনতন্ত্র অনুসারে যে আইনসভাগুলো গঠিত হয়েছে, সেগুলিতে ভালো লোকদেরকে নির্বাচিত করে পাঠানো দ্বারাই এ শাসন ব্যবস্থার সংশোধন সম্ভব। যেহেতু জামায়াতে ইসলামী এ পদ্ধতি অবলম্বন করেনি, তাই তিনি মনে করেন যে, এ দলটি নিছক বিচ্ছিন্নতা ও নেতিবাচক ভূমিকা অবলম্বন করেছে। অথচ এ ভূমিকা দ্বারা সংশোধন তো মোটেই হবে না, অধিকন্তু ক্ষমতার অস্ত্র খারাপ লোকদের হাতে গিয়ে তা বাতিল ব্যবস্থাকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্যবহৃত হবে। আসলে এ ভ্রান্তির শিকার শুধু বর্তমান প্রবন্ধকার নন, বরং অনেকেই এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা করছেন। এর আসল কারণ স্থূল দৃষ্টি এবং চিন্তা ও গবেষণার স্বল্পতা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তারা এটা বুঝতেই চেষ্টা করেন না যে, কোটি কোটি মুসলমান থাকতে এ কুফরী ব্যবস্থা এ দেশে চালু হয়ে গেল কিভাবে? শুধু তাই নয়, দেশে যখন যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার হচ্ছে, সে সবও এ কুফরী মতাদর্শের ভিত্তিতেই সম্পন্ন হচ্ছে। এর কারণ কি? এ প্রশ্ন নিয়ে তাঁরা যদি কিছুমাত্রও চিন্তা-ভাবনা করতেন, তা হলে তারা নিজ থেকেই এ কথা বুঝতেন যে, এ বিভ্রান্তির আসল কারণ হলো, মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে ইসলামী চেতনা মৃত কিংবা আধমরা হয়ে গেছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুসারে চলা এবং তার জন্য বাঁচা ও মরার সংকল্প তাদের এত দুর্বল হয়ে গেছে যে, তা প্রায় বিলুপ্তির পর্যায়ে উপনীত। তা ছাড়া তারা ভারতের অমুসলিম অধিবাসীদেরকেও সত্য জীবন ব্যবস্থা বুঝানোর এবং তা গ্রহণ করার দাওয়াত দেয়ার কোন চেষ্টা করেনি। এ জন্য মুসলমানদের নিজেদের জীবনও চিন্তায় চরিত্রে ও সংস্কৃতিতে বেশীর ভাগ অনৈসলামিক হয়ে গেছে। আর ভারতের সমগ্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক

জীবনও কুফরী মতাদর্শের অনুসারী হয়ে গড়ে উঠেছে। এখন এই সর্বব্যাপী বিভ্রান্তি ও তার কুফলের প্রতিকার এরূপ চেষ্টা তদবীর দ্বারা হওয়া সম্ভব নয় যে, কুফরীতে নিমজ্জিত এ কাঠামোতে আমরা গুটিকয় মুমিনকে পাঠিয়ে দিলাম। একজন নেককার মুমিনের পক্ষে এ কাঠামোর অনৈসলামিক ভিত্তিগুলোকে মেনে নিয়ে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে রাজী হওয়াই সম্ভব কি করে হয়, সে প্রশ্ন না হয় ক্ষণিকের জন্য উপেক্ষা করা গেল। ধরে নেয়া যাক, শীয়াদের রীতি অনুসারে প্রকৃত ধারণা বিশ্বাসকে মনে মনে রেখে বাইরে কুফরীর ভান করে কতিপয় মুমিন এ কাঠামোর ভেতরে ঢুকে পড়তে রাজী হয়েই গেল। তা হলে, দেখতে হবে যে, এ কৌশল দ্বারা লাভ কি হতে পারে?

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন দলের নিজস্ব নীতি ও আদর্শ অনুসারে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভবই নয় যতক্ষণ সে গোটা শাসনকাঠামোকে মুঠোর মধ্যে নিতে সক্ষম না হয়।

আর শাসন কাঠামোকে পুরোপুরিভাবে কবৃজা করার জন্য আইন সভায় ঐ দলের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা অপরিহার্য।

এ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের ব্যাপক অংশে মুসলমানদের পক্ষে অসম্ভব। কেননা বর্তমানে ইসলাম এ দেশে এমন একটা আদর্শবাদী আন্দোলনের পর্যায়ে নেই, যার পতাকাবাহীরা দেশবাসীকে কেবল আপন আদর্শের ভিত্তিতে সার্বজনীন আবেদন জানাতে পারে এবং সেই আবেদনকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার সমর্থন লাভের আশা করতে পারে। বর্তমানে তো ইসলাম ভারতের এমন একটি জনগোষ্ঠীর ধর্ম, যা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে দ্বন্দ্বসংঘাতে লিপ্ত। তাই কোন গোষ্ঠী যদি এখন খালেছ ইসলামী আদর্শকে পুঁজি করে নির্বাচনের ময়দানে অবতীর্ণ হয়। তা হলে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারক-বাহকদের মতো তাকেও কেবলমাত্র মুসলমান জাতির ভোটের ওপরই নির্ভর করতে হবে। আর এ জাতি যে দেশের বিশাল এলাকায় নিজেই সংখ্যালঘু, তা তো সর্বজন বিদিত।

বাকী রইল, মুসলিম সংখ্যাগুরু অধ্যুষিত অঞ্চলের কথা। সে সব অঞ্চল যদি পাকিস্তানের আকারে স্বাধীনতা অর্জন করে এবং একটা স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদাও লাভ করে, তা হলেও যে গোষ্ঠী খালেছ ইসলামী আদর্শের

ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাইবে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করা সে অঞ্চলেও কোন সম্ভাবনা নেই। কেননা ঐ সব অঞ্চলে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য পুরোপুরিভাবে মুসলমানদের জনমতের ওপরই নির্ভরশীল থাকতে হবে। অথচ মুসলিম জনমত বর্তমানে একেবারেই ইসলামের প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত, ইসলামী চেতনা ও অনুভূতি তাদের প্রায় শূন্যের কোঠায় এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের মহৎ উদ্দেশ্যের চাইতে পার্থিব স্বার্থ ও কামনা–বাসনার প্রেমে তারা অতিমাত্রায় বিভোর। আপোষহীনভাবে নির্ভেজাল ইসলামী আদর্শের আলোকে কাজ করতে অভিলাসী, এমন একটি দলের পক্ষে এ ধরনের জনমত দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে নির্বাচিত হওয়া প্রায় অসম্ভব।

এতদসত্ত্বেও যদি এ ধরনের একটা গোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে নির্বাচিত হয়েও যায়। তা হলে বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিরাজমান তাতে স্বাধীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। কেননা আহমকের স্বর্গে বসবাসকারীরা স্বপ্নে যত সবুজ বাগানই দেখুক না কেন, স্বাধীন পাকিস্তান (যদি তা সত্যি সত্যি হয়েও যায়) অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত্তিতেই গঠিত হবে এবং সেখানে অমুসলিমরা মুসলমানদের মতই সমঅধিকার নিয়ে সরকারের অংশীদার হবে। আর পাকিস্তানে অমুসলিমদের সংখ্যা এত কম এবং তাদের প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এত দুর্বল হবে না যে, ইসলামী শরীয়াতকে রাষ্ট্রীয় আইন এবং কুরআনকে সেই গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামোর সংবিধানে পরিণত করা যাবে।[১]

১. উল্লেখ্য যে, এ প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। তখন পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ করার কোন ধারণাই সৃষ্টি হয়নি এবং মুসলিম লীগের প্রস্তাবিত মুসলিম এলাকার মধ্যে সমগ্র আসামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সময়ে প্রস্তাবিত পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে অমুসলমানদের সংখ্যানুপাত ছিল ৩৭৯৩ ভাগ এবং পূর্বাংশে ৪৮·৩১ ভাগ। উপরন্তু উভয় অংশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক দিক দিয়ে অমুসলিমরা এত শক্তিশালী ছিল যে, তাদের সেই জনশক্তি ও প্রতাপের উপস্থিতিতে পাকিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা উত্থাপন করা ভারতের বাদবাকী অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের মতই দুরূহ ছিল। ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝিতে যখন বংগ, আসাম ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করা হলো, তখনই পরিস্থিতি নতুন মোড় নিল। অধিকন্তু, দেশ বিভাগের প্রাক্কালে যখন অকল্পনীয়ভাবে জনসংখ্যার জবরদস্তি স্থানান্তর ঘটলো, তখন পরিস্থিতির আরো একটা পরিবর্তন সূচিত হলো। এভাবে পূর্বাঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ এবং পশ্চিমাংশে শতকরা ৯৮ ভাগে গিয়ে দাঁড়ালো। এতদসত্ত্বেও পাকিস্তানের ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে যে কত রকমের জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তা এখন আর কারো অজানা নেই। (নতুন)

আমরা এ বাস্তব সমস্যাগুলো বুঝি বলেই আমাদের কাছে এ সব কৌশল সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও বৃথা, যদিও সম্মানিত প্রবন্ধকার এবং তার সমমনা লোকেরা এ কৌশলগুলোকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অব্যর্থ উপায় মনে করে আশান্বিত হয়ে বসে আছেন। আমাদের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার একমাত্র পথ এই যে, বর্তমানে ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেভাবে চলছে এবং যে পথ ধরে তা অগ্রসরমান বলে মনে হচ্ছে, সে দিকে আপাতত আমরা ভ্রুক্ষেপ না করে যে মৌলিক কাজ দ্বারা দেশের সার্বিক জীবন ধারায় ইসলামী বিপ্লব সংঘঠিত হতে পারে, সেই কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করি। মুসলমানদের যেসব দল ও গোষ্ঠী প্রকৃত পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করতে পরছে না, তারা নিজেদের কর্মপন্থার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। যেভাবে তারা কাজ করতে চায় করুক। আমরা অনর্থক তাদের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে চাই না। আমরা এটা জানি যে, অতীতের ভুলভ্রান্তির দরুন বর্তমানে খুব তাড়াতাড়ি বড় রকমের কোন শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব নয়। ইসলামের লক্ষ্য অর্জনের খাতিরে চলমান ঘটনাবলীতে কমের পক্ষে যতটুকু প্রভাব আরোপ করা কাম্য, তার উপযোগী শক্তি উৎপন্ন করা বর্তমানে অসাধ্য। এ জন্য আমরা চলমান রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নাকগলানোকে সময়ের অপচয়ও মনে করি। আর যেহেতু বর্তমানে আমরা নিজেদের আদর্শকে বিসর্জন দেয়া ছাড়া রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশ নিতে অক্ষম, সে কারণেও আমরা ওটা এড়িয়ে যেতে চাই। এ ছাড়া আমরা এটাও জানি যে, আজ রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান যে রকমই করা হোক এবং ভবিষ্যতে তার ফলাফল যত ভয়াবহই হোক, আমরা যদি আমাদের অভিষ্ট কর্মসূচী ঠিকমত বাস্তবায়িত করে যেতে থাকি তা হলে ঘটনাস্রোত একদিন ভিন্নখাতে প্রবাহিত না হয়ে পারবে না এবং আজ আমরা প্রচলিত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব–সংঘাত থেকে দূরে থাকার কারণে আমাদের যে ক্ষতি হবে, তা একদিন পুরণ হয়ে যাবে। আমাদের সেই কর্মসূচী সংক্ষেপে এইঃ

(ক) মুসলমানদের এ বিরাট জনসমষ্টির মধ্য থেকে যোগ্য ও ঈমানদার লোকদেরকে বাছাই করে উঁচুমানের নৈতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংগঠিত করা এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে খোদ ইসলামকেই একটা আদর্শবাদী আন্দোলন হিসেবে তুলে ধরার যোগ্য করে গড়ে তোলা।

(খ) এ গোষ্ঠীর মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী চেতনা ও উপলব্ধির সঞ্চার করা, কোন্‌টা ইসলাম আর কোন্‌টা ইসলাম নয়, সে সংক্রান্ত জ্ঞান দান করা, তাদের প্রচলিত গতানুগতিক নৈতিক মূল্যবোধ পরিবর্তন করে আসল ও নির্ভেজাল মূল্যবোধ তাদের মন–মগজে বদ্ধমূল করা। তাদের মধ্যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের অদম্য সংকল্প (অস্পষ্ট ও অবচেতন সংকল্প নয়, বরং সুস্পষ্ট ও সচেতন সংকল্প) জাগরুক করা এবং তাদের সাধারণ মতামত এভাবে গড়ে তোলা যে, দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিপ্লব করা সম্ভব হলে খালেছ ইসলামী পদ্ধতিতে আন্দোলনকারী দল ছাড়া অন্য কোন গোষ্ঠী যেন তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে বা তাদের সামনে অনৈসলামিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পেশ করে তাদের কাছ থেকে ভোট আদায় করতে না পারে। আর যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কার্যোপযোগী না হয়, তা হলেও তারা যেন ইসলামী বিপ্লবের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

(গ) মুসলমান ও অমুসলমানদের বর্তমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে ভারতের অমুসলিম জনগোষ্ঠীতে যে ঘৃণা–বিদ্বেষ জন্ম লাভ করেছে, তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে অমুসলিমদের সামনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও তার নৈতিক ভিত্তিগুলোকে তুলে ধরতে হবে। সর্বোচ্চ দক্ষতা ও কুশলতা, কঠোর পরিশ্রম এবং পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাতে হবে, যাতে করে অমুসলিমদেরও একটা সৎ ও ন্যায়পরায়ণ গোষ্ঠী ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ও তার প্রতিষ্ঠাকামী হয়ে যায়। ফলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র বর্তমান মুসলিম জনমতের ওপর নির্ভরশীল থাকবে না। বরং আজ যেসব অমুসলিম জাতি ভারতে বিদ্যমান, যারা মুসলমানদের বর্তমান জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের কারণে ইসলামের বিরুদ্ধে মারাত্মক শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। তাদের জনমতও এর সমর্থক হয়ে যাবে।

এ কর্মসূচীতে যখন আমরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সফলতা লাভ করবো (এবং যে পদ্ধতিতে আমরা কাজ করে চলেছি তাতে শেষ পর্যন্ত সফল হবো বলেই আমার বিশ্বাস) তখন আমরা দেশের পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করবো যে, শুধুমাত্র জনমতের ইচ্ছা–আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সংবিধানে কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব কিনা। যদি তা সম্ভব হবার মত পরিস্থিতি বিরাজ করে, তা হলে আমরা প্রচলিত শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন এবং ইসলামী মূলনীতির আলোকে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী

দেশের সাধারণ জনমতের সামনে পেশ করবো। সেই পরিবর্তনের পক্ষে আমরা জনমতকে গঠন করবো এবং দেশের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র কি হবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এমন একটা নয়া গণপরিষদ গঠনের জন্য সমকালিন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করবো। এ গণপরিষদের নির্বাচনে আমরা যাতে জনমতের আনুকূল্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারি এবং ইসলামী মূলনীতির আলোকে দেশের শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারি, সে জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চালাবো।

অনেকে এ কর্মসূচীকে অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী মনে করেন এবং এর বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ করতে দুই তিন শতাব্দী লেগে যেতে পারে বলে আশংকা করেন। এ জন্য তাদের মতে এটা কোন বাস্তব কর্মসূচী নয়। একে তারা নিছক আকাশকুসুম কল্পনা মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এ কর্মসূচীতে একটিমাত্র কাজই কিছুটা সময় সাপেক্ষ। সেটি হলো, ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে এক ব্যাপক ও সর্বাত্মক আন্দোলনের উপযুক্ত ও সুষম সংগঠক ও পরিচালক হতে পারে এমন একটি চরিত্রবান ও সত্যনিষ্ঠ দল সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ দেয়া। এ ধরনের একটি দল সংগঠিত করার পর শুকনো তৃণলতায় দাবানল যেমন দ্রুত ছড়ায় এ আন্দোলন তেমনি দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। সুনির্দিষ্ট সময় চিহ্নিত করে ভবিষ্যদ্বাণী করা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে এ কথা নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, এ প্রাথমিক স্তর অতিবাহিত করার পর আমাদের মনজিলে মকসূদ বা গন্তব্যস্থল অত দূরে থাকবে না। যতটা অনেকে কাজ না করেই দূরে ভাবে। তবুও যদি তা দূরেই থাকে তবে যেহেতু ওটাই একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল গন্তব্য, তাই ঐ গন্তব্যের দিকে ছুটতে ছুটতে মরে যাওয়া আমাদের মতে জেনে শুনে ভ্রান্ত অথচ সহজগম্য পথে শক্তি ব্যয় করার চাইতে--অন্য কথায়, অজ্ঞতার বশে আহমকের স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য শক্তি-সামর্থের অপচয় ঘটানোর চাইতে উত্তম।

তিনঃ তৃতীয় যে ভুল ধারণায় প্রবন্ধকারসহ বহুসংখ্যক সরল প্রাণ মুসলমান আক্রান্ত, তা এই যে, মুসলিম লীগের সৃষ্টি করা বর্তমান পরিবেশ এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে, প্রচলিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ইসলামী লক্ষ্য অর্জনের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে এমন একটা সত্যনিষ্ঠ মুমিনগোষ্ঠীর সাধারণ মুসলমানদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসা সম্ভব। এ কারণেই তাঁরা বলে থাকেন যে, এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে অথচ তোমরা তা হাতছাড়া করতে চলেছ। অন্ধ বিশ্বাসের কথা আলাদা যে, সে ক্ষেত্রে তদন্ত ও

অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন থাকে না। যখন কোন আন্দোলন ব্যাপক হৈ চৈ ও হট্টগোলের মধ্য দিয়ে ঝড়ের বেগে চলে, তখন সাধারণ মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের হুজুগে মেতে ওঠা অনিবার্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমরা যখন অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে মুসলিম লীগের সৃষ্ট পরিবেশটা নিরীক্ষণ করি, তখন কোন সুবর্ণ সুযোগ দূরে থাক, মামুলী ধরনের সুযোগেরও কোন হদিস পাই না।

মুসলিম লীগের আন্দোলন সম্পর্কে সর্বপ্রথম এ কথা অনুধাবন করা দরকার যে, তার মৌলিক তত্ত্ব ও মতাদর্শ, তার সাংগঠনিক কাঠামো, তার মেজাজ ও প্রাণশক্তি, তার কর্মপ্রনালী ও লক্ষ্য--সবই একটি জাতীয় ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরই অনুরূপ। এটা অবশ্য ভিন্ন কথা যে, এ আন্দোলন মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলন এবং মুসলমানদের সব কিছুই "ইসলামী" লেবেলযুক্ত হয়ে থাকে। তাই যৌক্তিকতা বিচার না করেই অনর্থক একে ইসলামী আন্দোলন ধরে নেয়া হয়েছে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইসলামী আন্দোলন গুণগতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস হয়ে থাকে। সে গুণপনার কোন চিহ্নও মুসলিম লীগের জাতীয় আন্দোলনে পাওয়া যায় না। আর ইসলাম স্বীয় বিশিষ্ট কর্মপদ্ধতি দ্বারা যে লক্ষ্য বিন্দুতে উপনীত হতে চায়, একটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে সে লক্ষ্যবিন্দুতে উপনীত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রত্যেক লক্ষ্যের নিজস্ব স্বভাব–প্রকৃতি অনুযায়ী তার এক স্বতন্ত্র পথ থাকে। আপনি যদি ইসলামের লক্ষ্যস্থলে পৌছতে চান তবে আপনাকে ইসলামী আন্দোলনেরই সুনির্দিষ্ট পথ জানতে ও বুঝতে হবে এবং সেই পথ ধরেই এগুতে হবে। জাতীয়তাবাদী পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে আপনি জাতীয়তার লক্ষ্যবিন্দুতে পৌছতে পারেন। কিন্তু সেই পথ ধরে আপনি ইসলামের লক্ষ্যস্থলে পৌছতে পারবেন এমন ধারণা করা চরম মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। এ বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার সুযোগ এখানে নেই। আমি ইতিপূর্বে সর্বস্তরে বলেছি যে, একটি আদর্শবাদী আন্দোলন ও একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কি পার্থক্য। প্রয়োজন হলে পুনরায় সেটা ব্যাখ্যা করতে পারি। এখানে আমি শুধু এতটুকু সংক্ষেপে স্পষ্ট করে বলে দেয়া যথেষ্ট মনে করি যে, একটি আদর্শবাদী আন্দোলনের কর্মীদেরকে যদি এ কথা জানানো হয় যে, একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তোমাদের জন্য চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, তবে সেটা কোন প্রাজ্ঞতা ও বাস্তবতাবোধের পরিচায়ক হবে না। এর উদাহরণ ঠিক এ রকম যে

একজন কোলকাতা গমনেচ্ছুকে জানানো হলো যে, করাচীর ট্রেন এক্ষুণি যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

তাদের এ সুসংবাদ হয়তো বা খানিকটা যথার্থ হতে পারতো যদি মুসলমানদের এ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অন্তত দ্বিতীয় পর্যায়ে হলেও ধর্মীয় ভাবধারার প্রবল প্রভাব ও প্রেরণা বিদ্যমান থাকতো। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এখানে তাও বিদ্যমান নেই। বরঞ্চ এ কথা বলাই অধিকতর নির্ভুল হবে যে, মুসলিম লীগ প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদেরকে ইসলাম ও তার কৃষ্টি থেকে এবং তার নির্দেশাবলীর আনুগত্য থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। এ কথা সত্য যে, সাধারণ মুসলমানদের ভাবাবেগকে উস্কিয়ে দেয়ার জন্য এ দল ইসলামের নাম খুবই ঘন ঘন উচ্চারণ করে থাকে এবং লীগের শীর্ষ নেতাদের প্রগাঢ় ধর্মীয় আবেগ প্রতিফলিত হয় এমন প্রর্দশনীমূলক কথাবার্তাও মাঝে মধ্যে প্রচারণা করা হয়। কিন্তু এ সব প্রচারণা শুধুমাত্র স্থূলদর্শী লোকদেরকেই প্রতারিত করতে সক্ষম। প্রকৃত সত্য যা, তা সকলের সামনেই সুস্পষ্ট। লীগের নেতৃত্ব, তার নীতি নির্ধারণ, তার গোটা সাংগঠনিক কাঠামোর কর্মতৎপরতা এবং তার সমগ্র চালিকা শক্তি বর্তমানে মুসলিম জাতির এমন একটি শ্রেণীর হাতে নিবদ্ধ যা জীবনের যাবতীয় বিষয়ে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে ইহলৌকিক (Secular) দৃষ্টিভঙ্গীতে ভাবতে ও কাজ করতে অভ্যস্ত, ইসলামের পরিবর্তে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ও তার অনুসারী, ধর্মীয় বন্ধনের পরিবর্তে জাতীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে মুসলমানদের পক্ষ সমর্থন করে থাকে অবিকল জাতীয়তাবাদীদের মতই। শুধু যে এ গোষ্ঠীটি নিজে প্রকাশ্যে ইসলামী আদর্শ ও নির্দেশাবলীর বরখেলাপ আচরণ করতে কোন ভয়ভীতি ও দ্বিধা-সংকোচ বোধ করে না তা নয়, বরঞ্চ তার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের কারণে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলামের নির্দেশাবলী লংঘনের প্রবণতা নির্ভিকতা ও ধৃষ্ঠতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি ক্রমশ নির্জীব ও নিস্তেজ হয়ে চলেছে এবং তারা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এমন এক মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে যা মূলত একটা জড়বাদী মানসিকতা। কিন্তু "মুসলিম জাতির স্বার্থ" এবং "মুসলিম জাতির অস্তিত্বের দীর্ঘস্থায়ীত্ব" ইত্যাদি ধূয়া তুলে, তাকে মিথ্যা "ইসলামী" আলখেল্লা পরানো হচ্ছে। এ কথা সত্য যে, এ পরিস্থিতি সৃষ্টি মুসলিম লীগের একক অবদান নয়, বরং যেসব ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের হাতে খেলাফত আন্দোলনের সময় থেকেই মুসলমানদের নেতৃত্বের বাগডোর ছিল এবং যারা মুসলমানদের সাধারণ আবেগ

অনুভূতির বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের চরম ভ্রান্ত মতাদর্শের ওপর জিদ ধরে মুসলমানদেরকে জবরদস্তি ধর্মহীন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের কোলে ঠেলে দিয়েছিল তাদের নির্বুদ্ধিতাও এ জন্য সমভাবে দায়ী। তবে কারণ যা-ই হোক, এটা বাস্তব ঘটনা যে, মুসলীম লীগের সৃষ্ট বর্তমান পরিস্থিতি ইসলামের অনুকূল নয় বরং চরম প্রতিকূল ও অনুপযোগী। এ পরিবেশে সত্যিকার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে আন্দোলন করার সুযোগ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। আমি স্বীকার করি যে, মুসলিম লীগের ভেতরে এমন লোকদেরও একটা বিরাট গোষ্ঠী রয়েছে, যারা নিষ্ঠাবান সাচ্চা মুসলমান এবং আন্তরিকতার সাথেই ইসলামের বিজয় কামনা করেন। কিন্তু তাদের সরলতা দেখে আমার বড়ই দুঃখ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে তুরস্কের বিপুল সংখ্যাক সরল প্রাণ মুসলমান যে ভুল করেছিলেন এবং তার শোচনীয় পরিণতি ভোগ করেছিলেন, মুসলিম লীগের এ সরলমনা লোকগুলিও সেই একই নির্বুদ্ধিতার পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন। সেই তুর্কী মুসলমানরাও এভাবেই জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে (জানা কথা যে, "মুসলিম জাতির" নিরাপত্তা নিশ্চিত করা স্বভাবতই একটা পবিত্র ধর্মীয় কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে।) মোস্তফা কামাল ও তার জাতীয়তাবাদী দলের হাতে নেতৃত্ব সমর্পণ করেছিলেন। তারাও এভাবে ধর্মীয় যুক্তি দেখিয়ে ধর্মহীনতার পথে কামাল পাশার প্রতিটি পদক্ষেপকে বরদাশত করে চলেছিলেন। এভাবেই তারাও নিজেদের মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিতেন যে, আপাতত জাতিকে রক্ষা করাটাই বড় কথা। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা এ পাপিষ্ঠ লোকটিকে দিয়ে স্বীয় ধর্মের সহায়তা করছেন। এ স্তরটা অতিক্রম করার পর আল্লাহ চাহেতো আমাদের কাফেলার যাত্রাপথের মোড় পরিবর্তিত হয়ে ইসলামমুখী হবে। কিন্তু সেই কাফেলা একবার নিজেকে বেদ্বীন নেতৃত্বের হাতে সমর্পণ করার পর ইসলামের দিকে অগ্রসর হবার সুযোগ আর তার ভাগ্যে জোটেনি।

এবার ধর্মীয় দিক বাদ দিয়ে নিছক জাতীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম লীগের সৃষ্ট পরিবেশ বিচার করুন। মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যাপক জাতীয় তৎপরতার সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা যে বাহ্যত একটা কেন্দ্রীয় শক্তির আওতাধীন এসে গেছে--এটা মুসলিম লীগের যত বড় চমকপ্রদ কৃতিত্বই হোক না কেন, এ কথা সত্য যে, এ আন্দোলন নিছক বেগতিক অবস্থায় মরিয়া হয়ে কিছু করার একটা উত্তেজনা বিশেষ এবং এটা হিন্দু জাতীয়তাবাদের ক্রমবর্ধমান সয়লাবের আতংকের ফলশ্রুতি স্বরূপ

মুসলমানদের মধ্যে জেগে উঠেছে। এ উত্তেজনার পেছনে না আছে কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা, না আছে কোন সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য[১] না আছে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শক্তি সরবরাহ করতে সক্ষম কোন গঠনমূলক চেষ্টা–সাধনা, না আছে নির্ভরযোগ্য চরিত্র ও সুশৃংখল চিন্তার অধিকারী কোন কর্মী বাহিনী, আর না আছে একটা গণআন্দোলন পরিচালনার যোগ্য কোন নেতৃত্ব। আসলে মুসলমানদের মধ্যে যে আলোড়ন ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, সেটা লীগ ও তার নেতৃত্ব চিন্তা–ভাবনা করে কোন পরিকল্পনা মোতাবেক সৃষ্টি করেনি, বরং হিন্দুদের জাতীয় সাম্রাজ্যবাদী উত্থান এবং তাদের নেতৃবৃন্দের সংকীর্ণমনা রাজনীতির দরুন মুসলমানদের মধ্যে আপনা আপনি একটা শংকানুভূতি ও অশান্ত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। আর এ অবস্থায় যখন মুসলমানরা দেখলো যে, খেলাফত আন্দোলনের সময় থেকে তারা যেসব ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতার শরণাপন্ন হচ্ছিল, তারা আর কোন কাজে আসছে না। তখন যে নেতাই তাদের দিকে এগিয়ে এসে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাকেই তারা নেতৃত্বের আসনে বরণ করে নিয়েছে। এখন এটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে যে নেতৃত্ব তাদের ভাগ্যে জুটেছে, তা কেবলমাত্র সভাসমিতি করা ও আইন সভার জন্য সংগ্রাম করা ছাড়া অন্য কোন রণকৌশল ও প্রস্তুতি গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। আর যেহেতু এই খেলা একেবারেই অপরিকল্পিতভাব এবং পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই খেলা হয়েছে, তাই এদ্বারা মুসলমানদের জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতা আরো বেশী করে ফাঁস হওয়া এবং তাদের মনোবল আরো বেশী করে ভেঙ্গে যাওয়া ছাড়া আর কোন লাভ হয়নি। সবচেয়ে দুঃখজনক যে ব্যাপারটা লীগের বর্তমান নেতৃত্বের চরম অযোগ্যতা প্রমাণিত করেছে, তা হলো সমাজতন্ত্রীদের ব্যাপারে লীগের নীতি। এ গোষ্ঠীর সম্পর্কে এটা প্রমাণিত সত্য যে, এর সমস্ত আনুগত্য ও সহানুভূতি রাশিয়ার প্রতি নিবেদিত। এমনকি এর নেতৃত্বের বাগডোরও রাশিয়ার মুঠোর মধ্যে নিবদ্ধ। যে জাতি নিজ বাসভূমিতে স্বাধীন হতে বা স্বাধীন থাকতে ইচ্ছুক সে বিদেশী শক্তির তাবেদার কোন গোষ্ঠীকে নিজের ভেতরে লালন করতে

১· জবাবে বলা হতে পারে যে, পাকিস্তান তো একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য। কিন্তু একটা উদ্দেশ্যের নাম পাওয়া গেলেই তার এই অর্থ হয় না যে, ওটা একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য। যে জিনিসকে পাকিস্তান নাম দেয়া হয়েছে। তা যে অস্পষ্ট সে ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। পাকিস্তানের আসল অর্থ সম্ভবত একটা গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সরলমনা মুসলমানরা, যারা ইসলামী শাসন কায়েমের আশায় প্রতীক্ষারত, তারা পাকিস্তানের প্রতি বিতৃষ্ণ ও হতাশ হয়ে যাবে এ আশংকায় এ কথাটা স্পষ্ট করে বলা হয় না। (পুরানো)

ও বিকশিত হতে দিতে পারে না। এ জন্যই কংগ্রেস তাদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে এবং হিন্দুদের মধ্যে তাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার দরজা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ যেখানে নিজের কোন নির্ভরযোগ্য কর্মী গড়ার কোন চেষ্টাই করেনি এবং তার নির্বাচনের প্রচারণা চালাতে যে ব্যক্তিই এগিয়ে আসছে, অন্ধের মত তাকেই কাজে লাগাচ্ছে, সেখানে এই সমাজতন্ত্রীদেরকে সে নিসংকোচে দলভুক্ত করেছে।[১] সে এ কথা ভেবেও দেখেনি যে, নিজের পাকিস্তানে সে এমন একটি শক্তির তল্পীবাহকদেরকে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দিচ্ছে, যে শক্তি ইরানে আপন আধিপত্য প্রায় পুরোদস্তুর সংহত করে নিয়েছে এবং এখন সেই শক্তি ও পাকিস্তানের মধ্যে একমাত্র আফগানিস্তানের ক্ষণভঙ্গুর প্রাচীর ছাড়া আর কোন প্রতিবন্ধক নেই। এমনকি মুসলিম লীগের এই ক্ষীণদৃষ্টি নেতৃত্ব বিশ্বাসঘাতকতার এমন নগ্ন নজীরও দেখতে পায়নি যে, ভারতে মুসলিম জাতীয়তাবাদের বুলি কপচানো এ কম্যুনিষ্টরা ইরান ও তুরস্কে রাশিয়ার আগ্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে টুঁশব্দটিও উচ্চারণ করে না। বরং রাশিয়ার পক্ষেই তারা সাফাই গায় আর ইরান ও তুরস্ককে দোষী সাব্যস্ত করে। এ দ্বারাও কি বুঝা যায় না যে, কাল যদি এই রাশিয়া পাকিস্তানে নাকগলাতে শুরু করে, তা হলে এ কম্যুনিষ্ট চরদের ভূমিকা কি হবে?

আমি আগেই বলেছি যে, ইসলাম এবং তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিষয় বিবেচনা আপাতত বাদ রাখুন। কেননা সে দিক থেকে যে মুসলিম লীগ মুসলিম জাতিকে বহু দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু নিছক জাতীয় স্বার্থের কথাও যদি বিবেচনা করা হয়, তবে আমি এমন কিছু দেখতে পাই না যাতে এ ধারণা গ্রহণ করা যায় যে, মুসলিম লীগ একটা অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এ দলে আজ হয়তো কিছু পরস্পর বিরোধী মতাদর্শের লোক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একমত ও একজোট হতে পেরেছে। কিন্তু কাল এই সমস্ত লোক ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোন একটা গঠনমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে ও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করতে পারবে সে সম্ভাবনা সুদূর পরাহত

(তরজুমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬)

---

১ এ ক্ষেত্রে একটি আকর্ষণীয় মজার ব্যাপার এই যে, লীগের গঠনতন্ত্রে কম্যুনিষ্টদের দলভুক্ত হওয়াতে কোন বাধা নেই। যেহেতু মুসলিম লীগ ইসলামকে বাদ দিয়েই গঠিত হয়েছে তাই এ দলে ভর্তি হওয়ার জন্য ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তার আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা নেই। মুসলমানের মত নাম থাকলেই এ দলে যোগদান করা যায়, চাই আল্লাহ, আখেরাত ও রসূলকে অস্বীকারই করা হোক। (পুরানো)

দেশ বিভাগের প্রাক্কালে ভারতের মুসলমানদেরকে প্রদত্ত সর্বশেষ পরামর্শ

(১৯৪৭ সালের ২৬শে এপ্রিল মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর অধিবেশনেপ্রদত্ত ভাষণ)

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ! বর্তমানে আমরা ভারতের ইতিহাসের একটা অতিশয় নাজুক ও চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারক স্তর অতিক্রম করছি। এ স্তর একাধারে ভারতের অধিবাসীদের ভাগ্য এবং আমাদের এ আন্দোলনের ভবিষ্যত নির্ধারণে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে। এ জন্য যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমরা কাজ করতে চাই, যে পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে, এ পরিস্থিতি ও পরিবেশ যে খাতে প্রবাহিত হচ্ছে এবং যার মধ্য দিয়ে আমাদের পথ খুঁজে নিতে হবে, তাকে আজ আমাদের অত্যন্ত সচেতনতার সাথে উত্তম রূপে উপলব্ধি করা খুবই জরুরী। আমাদের প্রতিটি কর্মীকে পূর্ণ প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে জেনে নিতে হবে বর্তমান ও ভবিষ্যত পরিস্থিতিতে তাকে কি কর্মকৌশল অবলম্বন করতেহবে।

আমাদের এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আপনাদের সবারই জানা আছে। আমাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই যে, যে নির্ভুল ও সঠিক জীবন যাপন পদ্ধতি ইসলাম নামে পরিচিত, তাকে আমরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত করবো, আমাদের কথা ও কাজ দ্বারা তাকে সঠিক ও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দেব, একমাত্র এ জীবন পদ্ধতিতেই যে, দুনিয়ার সকল মানুষের মুক্তি ও সুখ সমৃদ্ধি নিহিত, সে ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবো

এবং প্রচলিত বাতিল মতবাদসমূহের পরিবর্তে ইসলামী মতাদর্শভিত্তিক সত্য ও ন্যায়সঙ্গত জীবন ব্যবস্থা চালু করার জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করবো। এ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত আমাদেরকে যদিও সারা দুনিয়ায় ও সমগ্র মানব জাতির মধ্যে কাজ করতে হবে। কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র হলো আমাদের জন্মভূমি, যার ভাষা আমাদের মাতৃভাষা, যেখানকার রীতি প্রথা ও লোকাচার আমাদের কাছে সুপরিচিত, যেখানকার মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা অবহিত এবং যেখানকার সমাজ ব্যবস্থার সাথে আমাদের জন্মগত যোগসূত্র রয়েছে। স্বয়ং নবীদের জন্যও আল্লাহ তাদের জন্মভূমিকেই কর্মক্ষেত্র ও দাওয়াতের ময়দান নির্ধারিত করেছিলেন। অথচ তাদের বাণী মূলত সারা দুনিয়ার জন্যই নিবেদিত ছিল। কোন নবীকে তাঁর জন্মভূমির অধিবাসীরা যতক্ষণ তাড়িয়ে না দেয় অথবা তিনি নিজে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে সর্বাত্মক ও চূড়ান্ত চেষ্টা–সাধনা করার পর তাদের সম্পর্কে নিরাশ হয়ে না যান, ততক্ষণ কোন নবীর পক্ষে তাঁর এ স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যাওয়া বৈধ ছিল না। এ জন্য আল্লাহ আমাদের বসবাসের জন্য যে যমীন নির্বাচন করেছেন, এ যমীনই আমাদের এ সংগঠনেরও স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র। সমগ্র সংগঠনের কর্মক্ষেত্র সমগ্র দেশ। প্রত্যেক এলাকার সদস্যদের কর্মক্ষেত্র তাদের নিজ নিজ এলাকা। প্রত্যেক শহর, নগর ও গ্রামের সদস্যদের কর্মক্ষেত্র তাদের নিজ নিজ আবাসভূমি। আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য, যেন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যতক্ষণ এমন অবস্থার সৃষ্টি না হয় যে, সেখানে টিকে থাকা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে কিংবা সেখানে দীনের দাওয়াতের সাফল্যের আদৌ কোন আশা না থাকে, ততক্ষণ সেখানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে সংস্কার ও সংশোধনের দাওয়াত দেয়া এবং ইসলামী বিপ্লব সংঘটনের চেষ্টা অব্যাহত রাখি। ভবিষ্যত ঘটনা প্রবাহে আপনারা অনেক সময় হিজরত ও দেশত্যাগের কথা শুনবেন। এটাও বিচিত্র নয় যে, সাধারণ হুজুগের বশে অথবা কাল্পনিক বিপদাশংকায় আতংক গ্রস্থ হয়ে আপনাদের অনেকের পা পিছলে যাওয়ার উপক্রম হবে। কিন্তু যে গুরু দায়িত্ব আপনারা কাঁধে চাপিয়ে নিয়েছেন তার দাবী এই যে, আপনাদের যিনি যেখানে আছেন তিনি যেন সেখানেই অবিচল থাকেন এবং ইসলামের দাওয়াতকে নিজ এলাকার জনজীবনে বিজয়ী করার চেষ্টা করেন। কোন জাহাজের একজন নির্ভিক ক্যাপ্টেন যেমন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জাহাজকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন এবং নিমজ্জমান জাহাজ থেকে তিনিই সবার শেষে বেরিয়ে আসেন আপনাদের ঠিক

তেমনিভাবে দায়িত্ব পালন করা উচিত। যে লক্ষ্যের প্রতি আপনারা ঈমান এনেছেন, তার দাবী এই যে, আপনারা যে এলাকার বাসিন্দা, সেখানকার জীবনধারাকে পাল্টানোর এবং সঠিক পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন। সেই এলাকার প্রতি আপনার একটা দায়িত্ব এবং আপনার কাছে সেই এলাকাবাসীর একটা প্রাপ্য রয়েছে। আপনার দায়িত্ব পালনের উপায় এই যে, ঐ এলাকার জনজীবনে যেসব অনাচার ও বিশৃংখলা রয়েছে, তা দূর করার জন্য আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। আর এলাকাবাসীর প্রাপ্য দেয়ার পন্থা এই যে, যে হেদায়াত লাভের সৌভাগ্য আপনার হয়েছে, তার সুফল সর্বপ্রথম আপনি তাদেরকাছেপৌছাবেন।

ভারতে বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিরাজমান তা বাহ্যিক বিচারে আমাদের দাওয়াতের পক্ষে অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তার প্রভাবে আপনাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ছে। দেশের বিভিন্ন জাতি জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থপরতা দ্বারা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের উন্মত্ততা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এর কারণে তাদের দ্বারা এমন সব অপকর্ম সংঘটিত হচ্ছে, যা পশুদের জন্যও লজ্জাকর। জাতিগত বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব–কলহ যুদ্ধের এবং যুদ্ধ পাশবিকতা ও হিংস্রতার রূপধারণকরেছে।

পূর্বে তো প্রত্যেক সম্প্রদায় পরস্পরের বিরুদ্ধে বক্তব্য ও পাল্টা বক্তব্য পেশ করতো এবং তা নিয়ে তিক্ত বাকবিতন্ডার ধারাবাহিকতা চলতো। কিন্তু এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, এ সব ভিন্ন ভিন্ন জাতি পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা নিজেদের নেতৃত্বের দায়িত্ব এমন সব নেতা ও সাংবাদিকের হাতে অর্পণ করেছে, যারা প্রতিনিয়ত স্বার্থান্ধ, জাতীয়তাবাদের মদ উৎকট ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষ মিশিয়ে পান করাচ্ছে এবং তাদের মাত্রাতিরিক্ত জাতীয় উচ্চাভিলাসের সাফাই গাইতে গিয়ে ইনসাফ ও নৈতিকতার সকল সীমা লংঘন করে চলেছে। তাদের মনে এখন আর নৈতিক আদর্শবোধের কোন স্থান নেই। যাবতীয় নৈতিক মূল্যবোধ এখন জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতার অধীন হয়ে পড়েছে। যা কিছু জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার পক্ষে যায়, সেটাই এখন সব চেয়ে বড় নৈতিকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে, চাই তা মিথ্যাচার হোক, বিশ্বাস ঘাতকতা হোক, যুলুম হোক, নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা হোক, অথবা এমন কিছু হোক, যা পৃথিবীর চির পরিচিত ও সর্বজনমান্য নৈতিকতার নিরীখে সর্বকালেই খারাপ ও ঘৃণ্য

বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। অপর দিকে সত্যবাদিতা, ন্যায়নীতি, সততা, দয়া, মহানুভবতা, মানবতা সবই পাপ ও অন্যায় রূপে গণ্য হয়েছে, যদি তা জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থের পরিপন্থী অথবা জাতীয় আশা আকাংখা ও অভিলাস চরিতার্থির প্রতিবন্ধক হয়।

এহেন পরিস্থিতিতে এমন কোন আন্দোলনের পক্ষে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন, যা সকল জাতিগত বিভেদ-বৈষম্যকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র মনুষ্যত্বকে সম্বোধন করে, যা জাতিগত আকাংখা ও অভিলাসকে অগ্রাহ্য করে খালেছ সত্যের আদর্শের দিকে আহবান জানায় এবং জাতীয় গোষ্ঠীগত স্বার্থপরতার জাল ছিন্ন করে বিশ্বজনীন ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ততার এ যুগে এ ধরনের আবেদনে কর্ণপাত করতে হিন্দু ও মুসলমানের কেউই প্রস্তুত নয়। মুসলমানরা বলে তোমরা আমাদেরই জাতির লোক। তোমাদের কর্তব্য ছিল জাতির পতাকার তলে সমবেত হয়ে জাতীয় সংগ্রামে অংশ নেয়া। তা না করে এই যে আলাদা একটা দল গঠন করে ধর্ম, নৈতিকতা এবং সত্য ও ন্যায়ের আদর্শের বুলি কপচাতে আরম্ভ করেছ, এর অর্থ কি? তোমাদের এ বেসুরো আওয়াজে জাতির শক্তি বিক্ষিপ্ত হচ্ছে এবং জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি হচ্ছে। কাজেই আমাদের বিবেচনায় তোমরা জাতীর শত্রু—যদিও আমরা যে ইসলামের নামে বর্তমান জাতীয় সংগ্রামে লিপ্ত, সেই ইসলামের দাওয়াতই তোমরা দিচ্ছ। অপরদিকে হিন্দুদের কাছে যেয়ে দেখুন। তারা ভাবে যে, এদের কথা তো মনকে আকৃষ্ট করে বটে। তবে এ দাওয়াতকে একটু পরখ করে দেখা দরকার। কেননা এরাও তো আমাদের শত্রুপক্ষেরই লোক, যাদের সাথে আমাদের লড়াই চলছে। এ আদর্শিক আবেদন ও মুসলিম জাতীয়তার প্রসার ঘটানোরই আরেকটা ফন্দি কিনা, কে জানে?

কিন্তু এ পরিস্থিতি যতই মনোবল ভঙ্গকারী ও ধৈর্য সাপেক্ষ হোক না কেন, তা কোন মতেই চিরস্থায়ী নয়। অনতিবিলম্বেই এর পরিবর্তন ঘটবে। বর্তমানে আপনাদের জন্য সঠিক কর্মপন্থা এই যে, ধৈর্য ও চরিত্র মাধুর্য দ্বারা কাজ চালিয়ে যান। যারা গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চায় তাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া চাইনা। অজ্ঞ লোকদের বিরোধিতায় উত্তেজিত হবেন না। যাদের মধ্যে শত্রু মিত্রের পার্থক্য বুঝার ক্ষমতাও অবশিষ্ট নেই এবং যারা উন্মত্ততার আবেগে ভালোমন্দ বাছাই করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে, তারা যদি মূর্খতা ও গোয়ার্তুমীতে লিপ্ত হয় তা হলে আপনি ভদ্র জনোচিতভাবে

তাদের মোকাবেলা থেকে সরে দাঁড়ান এবং তাদের বাড়াবাড়িকে নীরবে বরদাশত করে যান। সেই সাথে মুসলিম ও অমুসলিম সমাজের সেই সব বিবেকবান লোকের কাছে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আপন দাওয়াত পেশ করতে থাকুন, যারা যুক্তিপূর্ণ কথা শুনতে ও তা খোলামনে বিবেচনা করতে প্রস্তুত। এই পদ্ধতিতে কাজ চালিয়ে গেলে এক দিকে আপনার চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব যেমন স্বীকৃত হবে, অপরদিকে তেমনি অনাগতকালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাফল্যজনক কাজ সম্পাদনের জন্য যে মানসিক অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন, তাও খানিকটা তৈরী হয়ে যাবে।

যে পরিবর্তনের প্রতি আমি ইংগীত করছি তা এই যে, অচিরেই দেশ বিভক্ত হয়ে যাবে। হিন্দু সংখ্যাগুরু এলাকা হিন্দুদের এবং মুসলিম প্রধান এলাকা মুসলমানদের দখলে যাবে আলাদা আলাদাভাবে। উভয় জাতি নিজ নিজ ভূখন্ডে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম হবে এবং নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে নিজেদের রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। এ বিরাট পরিবর্তন এ যাবতকার পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দেবে। আর এর কারণে হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য জাতির সমস্যাবলীর গুণগত পরিবর্তন ঘটবে। তারা সম্পূর্ণ নতুন এক পরিবেশের সম্মুখীন হবে। এ যাবত তারা নিজ নিজ জাতীয় আচরণ, আন্দোলন ও সাংগঠনিক অবকাঠামোকে যে আকারে কায়েম করে রেখেছিল, তা অনেকাংশে নিরর্থক ও অকর্মণ্য হয়ে যাবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের সকলকেই ভেবে দেখতে হবে যে, এ যাবত তারা যা করেছে, তা তাদেরকে কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে এবং এখন জীবনের এই নতুন পর্বে তাঁদের কর্মপদ্ধতি কি হওয়া উচিত। আজকের সঞ্চিত ও বদ্ধমূল ধারণা-বিশ্বাস কাল হয়ে যাবে সম্পূর্ণ অর্থহীন। আজকের প্রচলিত মতবাদ ও মতাদর্শের সেদিন আর কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না। আজকের শ্লোগানগুলো তখন অচল মুদ্রার রূপ ধারণ করবে, যাকে কেউ আর আমলই দেবে না। আজকের জাতীয় আন্দোলন ও সংগঠনগুলো যে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা আপনা আপনি ধ্বসে যাবে। তাই আজকের নেতৃত্ব শুধু যে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করবে তাই নয়, বরং যারা আজকের নেতাদেরকে ত্রাণকর্তা মনে করছে, কাল তারা তাদেরকেই আপন আপদ-বালাই ও দুঃখ-কষ্টের আসল কারণ মনে করতে আরম্ভ করবে।

অনাগত সেই যুগে হিন্দু ভারত ও মুসলিম ভারতের অবস্থা পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের হবে। কিন্তু যেহেতু আমাদেরকে উভয়

এলাকাতেই কাজ করতে হবে, তাই আমাদেরকেও দু' রকমের পদ্ধতিতে আন্দোলন চালাতে হবে। এমনকি সংগঠনের কাঠামোকেও দুইভাগে ভাগ করতে হতে পারে, যাতে করে প্রতিটি অংশ নিজ নিজ এলাকার অবস্থা অনুসারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিজেই নিতে পারে এবং মানানসই নীতি অবলম্বন করতে পারে। মুসলিম এলাকা সম্পর্কে আমি এ অধিবেশনে কোন আলোচনা করবো না। কেননা সে জন্য আসন্ন উত্তর পশ্চিম ভারতীয় সাংগঠনিক অঞ্চলের সম্মেলনই হবে উপযুক্ত স্থান। আপনাদের সামনে আমি শুধু হিন্দু ভারত সম্পর্কেই বক্তব্য রাখবো যে, এখানে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য অদূর ভবিষ্যতে কি ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হতে যাচ্ছে এবং সেই পরিস্থিতিতে আপনাদেরকে কিভাবে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

সর্বপ্রথম মুসলমানদের ব্যাপারেই আসা যাক। হিন্দু প্রধান এলাকায় মুসলমানরা অচিরেই উপলব্দি করতে পারবে যে, যে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ইতিপূর্বে তারা আপন জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল তা তাদেরকে এক অচিন মৃত্যুপুরীতে রেখে গেছে। আর জাতীয় সংগ্রামের নামে যে বিচার–বিবেচনাহীন হুজুগে লড়াই তারা এ যাবত চালিয়ে এসেছে, তা তাদেরকে এক চরম সর্বনাশা পরিণতিতে এনে ঠেকিয়েছে। যে গণতান্ত্রিক নীতিমালার ভিত্তিতে দীর্ঘকাল ব্যাপী ভারতের রাজনৈতিক বিকাশ সাধিত হচ্ছিল এবং যাকে স্বয়ং মুসলমানরাও জাতীয় পর্যায়ে মেনে নিয়ে নিজেদের দাবীনামা তৈরী করেছিল, তাকে এক নজর দেখেই বুঝা যেত যে, এ সব নীতিমালার ভিত্তিতে গঠিত শাসন ব্যবস্থায় যা কিছু পাওয়া যায়, কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠরাই পায়। সংখ্যালঘুরা ছিটে ফোটা কিছু পেলেও পায় ভিক্ষার আকারে এবং পরমুখাপেক্ষী হিসেবে--প্রতিপক্ষ বা অংশীদার হিসেবে নয় এবং অধিকার হিসেবেও নয়। এ ব্যাপারটা ছিল প্রকাশ্য, সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত সত্য অথচ মুসলমানরা জেনে শুনেও সে সম্পর্কে উদাসীন রইল এবং দু'তরফা বোকামী করে বসলো। এক দিকে তারা শাসনপদ্ধতির প্রশ্নে পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রীতি–নীতির ওপরই রাজী হয়ে গেল। অপর দিকে নিজেদের পক্ষ থেকেই দেশবিভাগের এরূপ ফর্মূলা পেশ করলো যে, যেখানে আমরা সংখ্যাগুরু, সেখানে আমরা শাসক থাকবো আর তোমরা থাকবে শাসিত। আর যেখানে তোমাদের সংখ্যাধিক্য সেখানে তোমরা শাসক হবে আর আমরা থাকবো শাসিত। কয়েক বছরব্যাপী তিক্ত ও রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ চলার পর এখন সেই দু'তরফা বোকামী 'সাফল্যে' দোর গোড়ায় উপনীত

হয়েছে। সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোতে বসবাসরত মুসলমানরা যে জিনিসের জন্য স্ব–উদ্যোগে সংগ্রাম করছিল, তা এখন হাতের মুঠোর কাছে চলে এসেছে। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাধীন ও সার্বভৌম সরকার, যার অধীন তারা একটা জাতি হিসেবে শাসিত হবে। আর তাও সেই সংখ্যাগুরুর অধীন যার বিরুদ্ধে তারা সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে।

মুসলিম সংখ্যাগুরু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে যে রাষ্ট্র গঠিত হতে যাচ্ছে, তা হবে হিন্দুদের জাতীয় রাষ্ট্র। জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র নামক মতবাদকে হিন্দু ও মুসলমানরা একযোগে স্বীকৃতি দান ও তাকে আপন জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার পর তার ভিত্তিতে যে জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হবে, সে রাষ্ট্র নিজ ভূখণ্ডে এমন কোন জাতির অস্তিত্ব বরদাশত করতে পারে না যা নিজেকে শাসক জাতি থেকে পৃথক স্বতন্ত্র জাতীয়তার অধিকারী বলে পরিচয় দেয় এবং সেই সাথে নিজের বিশিষ্ট জাতীয় দাবী দাওয়াও উত্থাপন করে। দেশে যতক্ষণ একটা বিদেশী জাতির শাসন কার্যকরভাবে চালু ছিল এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতি তার অধীন শাসিত ছিল, কেবল ততক্ষণই এ দাবী তোলার অবকাশ ছিল। শুধুমাত্র তখনই সংখ্যালঘু জাতি সংখ্যাগুরু জাতির ন্যায় নিজের স্বতন্ত্র জাতীয়তার দাবী জানাতে সক্ষম এবং কমবেশী নিজের কিছু স্বতন্ত্র অধিকার আদায় করে নিতে পারে। কিন্তু যখন গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে দেশবাসীর স্বাধীন সরকার গঠিত হবে, তখন হিন্দু ভারত সংখ্যাগুরুর জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হবেই এবং সেখানে কোন সংখ্যালঘুর পৃথক জাতীয়তা এবং স্বতন্ত্র জাতীয় দাবী–দাওয়ার কোন অবকাশ থাকবে না। জাতীয় রাষ্ট্র এ ধরনের কোন জাতীয়তার স্বীকৃতি দিয়ে তার দাবী–দাওয়া কখনো পূরণ করে না। বরং সে প্রথমত এ চেষ্টাই চালায় যাতে সংখ্যালঘুর পৃথক সত্তা বিলোপ করে তাকে নিজ জাতীয়তায় বিলীন করে নিতে পারে। আর সে যদি ততটা শক্ত প্রাণ হয় যে, বিলীন হতে চায় না, তা হলে তাকে দমিয়ে দিতে চেষ্টা করে, যাতে সে স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা ও সেই সুবাদে স্বকীয় জাতীয় দাবী–দাওয়ার আওয়াজ তুলতেই না পারে। অবশেষে এ দমন প্রক্রিয়ার ভেতরেও সে যদি চিল্লাতেই থাকে, তা হলে জাতীয় রাষ্ট্র তাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নির্মূল করার চেষ্টা শুরু করে দেয়। হিন্দুদের জাতীয় রাষ্ট্রে মুসলিম সংখ্যালঘুর এ পরিণতি অত্যাসন্ন। তার সামনেও কার্যত এই তিনটে বিকল্প পথই তুলে ধরা হবেঃ

পৃথক জাতীয় সত্তার দাবী আর সেই সুবাদে স্বকীয় অধিকারের আবদার তাকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং তারপর রাষ্ট্রের জাতীয়তায় নিজেকে বিলীন করে দিতে হবে।

এ কাজে সে যদি প্রস্তুত না হয়, তা হলে তাকে যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে শুদ্র ও অচ্ছুতদের মত অবস্থায় রাখা হবে।

নচেত তাকে উৎখাত করার কার্যক্রম চালু করে দিতে হবে, যাতে শেষ পর্যন্ত জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে তার নাম-চিহ্নও আর অবশিষ্ট না থাকে।

পাশ্চাত্য মডেলের একটা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জাতীয়তার ভিত্তিতে নিজের রাজনৈতিক কার্যক্রমের ইমারত গড়ে তোলার চেষ্টার এ পরিণতি হওয়া অবধারিত। এ কার্যক্রম যখন গ্রহণ করা হচ্ছিল এবং তার এ পরিণাম যখন অনেক দূরে অবস্থিত ছিল, প্রজ্ঞা ও অর্ন্তদৃষ্টির চোখ দিয়ে তখনই তা দেখা যেত। কিন্তু তখন তার দেখতে অস্বীকার করা হয়েছিল এবং যারা দেখিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল তাদেরকে দুশমন ভাবা হয়েছিল। এখন এ ফলাফল একেবারেই চোখের সামনে এসে গেছে। দুঃখের বিষয় যে, এটা এখন শুধু দেখলেই চলবে না, ভোগও করতে হবে।

মুসলমানদের রাজনৈতিক দিক নির্দেশনার জন্য এখন যারা সবার আগে দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী হলো "জাতীয়তাবাদী" মুসলমানদের গোষ্ঠী। বৃটিশ আমলে খান বাহাদুর সাহেবরা যে ভূমিকা পালন করেছে এ গোষ্ঠী আগামীতে সেই ভূমিকাই পালন করবে। এ গোষ্ঠী মুসলিম জনগণকে প্রথম পথটি অর্থাৎ নিজেদের জাতীয় স্বকীয়তার দাবী ও স্বতন্ত্র জাতীয় দাবী-দাওয়া ত্যাগ করে সেচ্ছায় ও সাগ্রহে সোজাসুজি রাষ্ট্রীয় জাতীয়তায় বিলীন হয়ে যাওয়ার পথ অবলম্বন করতে আহবান জানাবে। এ গোষ্ঠীর আহবানে এ যাবত কেউ কর্ণপাত করেনি। তবে আমার আশংকা, ভবিষ্যতে এদের আহবান অনেকাংশে গৃহীত হবে। কেননা ভবিষ্যতে তারাই সরকারের ঘনিষ্ট লোক হয়ে দাঁড়াবে। তাদের মাধ্যমেই চাকুরী, ঠিকাদারী ও বিদ্যালয়ের গ্রান্ট ইত্যাদি পাওয়া যাবে। শাসক জাতি ও শাসিত জাতির মধ্যে তারাই হবে যোগাযোগের মাধ্যম ও সেতুবন্ধন। তাদের চেষ্টায় মুসলমানদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে এত নীচে নামিয়ে দিতে সক্ষম হবে যে, তাদের পুরুষরা হবে মহাশয় আর তাদের বউঝীরা হবে শ্রীমতী। পোশাকে, ভাষায়, লোকাচারে ও ধ্যান-ধারণায়--এক কথায় সবকিছুতেই তারা শাসক জাতির

সাথে এত বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ হবে যে, কে কোন্ জাতির লোক, তা চেনাই কষ্টকর হয়ে পড়বে। যে জাতির একটা বিরাট অংশ ইতিপূর্বে মিষ্টার ও মিস্ হতে পেরেছে, তার পক্ষে এ নতুন পরিবর্তন অসম্ভব হবে কেন? বিশেষত আগামীতে যখন জীবিকা, উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন এর ওপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। তবে সামগ্রিকভাবে গোটা মুসলিম জাতি এভাবে আত্মসমর্পণে রাজী হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি না। জাতীয় পর্যায়ে তারা এ স্বকীয়তা বিলোপ প্রক্রিয়ার প্রতিরোধ করতেই সচেষ্ট থাকবে।

প্রতিরোধের জন্য প্রথম প্রথম তারা বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দেরই শরণাপন্ন হবে। তবে মুসলমানরা আপন অভিজ্ঞতা দ্বারা খুব শীঘ্রই বুঝতে পারবে যে, এখন এ গোষ্ঠীর রাজনীতি অনুসরণ করলে সরাসরি ধ্বংসের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। সংখ্যাগুরুর জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাস করে সংখ্যালঘু যদি জাতীয় সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তবে চর্তুদিক থেকে তাকে পিষ্ট করা ও নির্মূল করা হবে, সামষ্টিক জীবনের প্রত্যেক অংশ ও বিভাগ থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হবে। সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে, এমন কি অচ্ছুতের চেয়েও নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়া হবে। এর পরও যদি তার আওয়াজ উঠতে থাকে তবে তাকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে যে, আকাশ ও পৃথিবীতে তার জন্য বিলাপ করার মত কেউ থাকবে না।

সংখ্যালঘু মুসলমানদের এ পরিণতি থেকে রক্ষা করার তিনটে উপায় নির্দেশ করা হয়ে থাকেঃ

প্রথমত পাকিস্তান রাষ্ট্র ভারত রাষ্ট্রের সাথে এ মর্মে সমঝোতায় উপনীত হবে যে, তোমরা ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘুর সাথে যে আচরণ করবে, আমরা পাকিস্তানের হিন্দু সংখ্যালঘুর সাথে সেই আচরণ করবো। এভাবে হিন্দুরা পাকিস্তানে যে সাংবিধানিক নিরাপত্তা লাভ করবে, ভারতের মুসলমানরাও তা লাভ করবে। তবে আপাত দৃষ্টিতে এ প্রস্তাব যতই চমকপ্রদ মনে হোক, আমি নিশ্চিত এবং অভিজ্ঞতা থেকেও প্রমাণিত হবে যে, আগামীতে এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে।[১] আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে,

---

১. এ ব্যাপারে পাকিস্তানের উদ্যোগে ১৯৫০ সালের এপ্রিলে লিয়াকত নেহরু চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। কিন্তু এর দ্বারা ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘুর জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কতটুকু করা সম্ভব হয়েছে তা সবার জানা। (নতুন)

ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই পাশ্চাত্য ধাঁচের রাজনীতির পথে ধাবমান। এ ধাঁচের রাজনীতির যে কুফল পাশ্চাত্যে দেখা দিয়েছে এখানেও তা দেখা দিতে বাধ্য। সংখ্যালঘুর পৃথক জাতিসত্তা এবং জাতীয় অধিকার ও দাবী–দাওয়া বেশী দিন সহ্য করা মুসলমানদের জাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষেও সম্ভব হবে না। হিন্দু জাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষেও নয়। বিশেষত এ উভয় সংখ্যালঘু যখন স্বজাতীয় বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাতবে এবং স্বদেশের সরকারের পরিবর্তে বিদেশী সরকারের সাথে দহরম মহরম পাতাবে, তখন তাদের অস্তিত্ব ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের জন্যই অসহনীয় হয়ে উঠবে। শুরুতে উভয় রাষ্ট্র নিজ নিজ সংখ্যালঘুকে যতই সন্তোষজনক শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচ দিয়ে থাকুক না কেন, কার্যক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে তা বিলুপ্ত করা হবে। নিত্য নৈমিত্তিক আচার আচরণে ও ব্যবহারে সংখ্যালঘুর উচ্ছেদকামী নীতি প্রচলিত হয়ে যাবে। উভয় সরকার নিজ নিজ জাতীয় সংখ্যালঘুর খাতিরে পরস্পরের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। শেষ পর্যন্ত হয় উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হবে যার ফলাফল সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়—নচেৎ উভয় সরকারকে এ মর্মে সম্মত হতে হবে যে, এক সরকার হিন্দুদের সাথে এবং অপর সরকার মুসলমানদের সাথে যেমন আচরণ করতে চায়করুক।

দ্বিতীয় যে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা বলা হয়ে থাকে, তা এই যে, জাতিসংঘ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সাহায্য নেয়া হবে। কিন্তু এ কর্তৃপক্ষের স্বভাব যাদের কিছুমাত্র জানা আছে, তারা সহজেই আন্দাজ করতে পারে যে, এ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে একটি নিপীড়িত জাতি কত দিন বেঁচে থাকতে সক্ষম। প্রথমত জাতিসংঘ কর্তৃপক্ষের কাছে কেবলমাত্র খুব বড় ও মারাত্মক ধরনের যুলুমের ব্যাপারেই নালিশ করার অবকাশ রয়েছে। প্রতিদিনকার ছোট খাট ঘটনা একত্রিত হয়ে যত বড় যুলুমেরই রূপ ধারণ করুক না কেন, এখানকার প্রচলিত বিধি–ব্যবস্থায় তা নালিশযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। আর বাহ্যদৃষ্টিতে খুবই নির্দোষ এবং পাশ্চাত্য মানদণ্ডে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক বলে বিবেচিত হয় এ ধরনের কিছু নীতি যদিও আমাদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের জাতীয় ও ধর্মীয় জীবনের জন্য ধ্বংসাত্মক–তবুও তা ওখানে আলোচনার যোগ্য নয়। তা ছাড়া জাতিসংঘের প্রশাসন এখন পর্যন্ত এটা প্রমাণ করতে পারেনি যে, তা একেবারে পরিপূর্ণ ও নির্ভেজাল ইনসাফ ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রস্তুত রয়েছে। এর সদস্যরা আপোষহীনভাবে শুধু মূল ঘটনাটা কি এবং তাতে

ইনসাফের দাবী কি, তাই দেখে না, বরং এটাও বিবেচনা করে যে, যে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তার সাথে আমাদের নিজেদের সরকারের সম্পর্ক কিরূপ এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করা আমাদের সরকারের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর না কল্যাণকর। এমতাবস্থায় জাতিসংঘ প্রশাসনের চোখে আগামীতে ভারত ও পাকিস্তানের আপেক্ষিক (Relative) মর্যাদা কি হবে এবং কার বক্তব্য সেখানে বেশী গুরুত্ব পাবে তা বলা যায় না।

প্রস্তাবিত তৃতীয় ব্যবস্থা হলো হিজরত ও নাগরিক বিনিময়। হিজরত অর্থ মুসলমানদের স্বেচ্ছায় ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তানে গিয়ে বসতি স্থাপন করা। আর নাগরিক বিনিময় অর্থ হলো, উভয় সরকার কর্তৃক পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট বিধিগত কাঠামোর আওতাধীন নিজ নিজ জাতিভুক্ত নাগরিকদেরকে নিজ ভূখন্ডে এনে পুনর্বাসিত করা। এ দুটোর মধ্যে হিজরত কার্যোপযোগী বটে। কিন্তু তা দ্বারা ভারতের মুসলমানদের সমস্যার কোন সমাধান হবে না। কেননা সে ক্ষেত্রে একে শুধুমাত্র সে সব লোকই কার্যকরী করতে পারবে, যারা যথেষ্ট বিত্তশালী কিংবা অত্যাচারে অতিমাত্রায় অতীষ্ট হয়ে উঠেছে। অথবা যখন যা মনে চায় তখন তাই করার মনোবৃত্তির অধিকারী কিছু ভাগ্যান্বেষী মানুষ। সাধারণ মুসলিম অধিবাসীরা বর্তমানে যেখানে বসবাস করছে, সেখানেই বসবাস করতে থাকবে। নিজ উদ্যোগে ব্যাপকভাবে দেশ ত্যাগ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। অবশ্য বিহার প্রভৃতি জায়গার মত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি কোথাও দেখা দিলে সেটা ভিন্ন কথা। এবার দেখা যাক নাগরিক বিনিময়ের প্রস্তাব কতখানি বাস্তব। আমার তো মনে হয় না যে, আগামী ৫০ বছর পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের সরকারদ্বয় সাড়ে চার কোটি মুসলমান এবং আড়াই তিন কোটি অমুসলিমকে এপার থেকে ওপারে এবং ওপার থেকে এপারে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে। আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক হলেও তা করতে পারবে না। তবুও যদি কেউ এ আশার ওপর নির্ভর করে বাঁচতে চায়, তবে বাঁচুক।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বৃটিশ আমলে যেমন চলেছে, তেমনি ভারতের জাতীয় সরকার গঠিত হওয়ার পরও চলতে পারবে, এ ধারণা যে কয়টি সম্ভাব্য ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে করা হচ্ছে, তার স্বরূপ উপরোক্ত আলোচনায় উদঘাটিত হয়েছে। মুসলমানরা অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা বশত এ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারছে না। কিন্তু অচিরেই এ বাস্তবতাকে তারা

মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে। তখন নিম্ন লিখিত তিন উপায়ের যে কোন একটি অবলম্বন না করে তাদের গত্যান্তর থাকবে না।

প্রথমত ঃ কংগ্রেসপন্থী অখন্ড ভারতীয় "জাতীয়তাবাদী" মুসলমানদের নীতি অবলম্বন করে হিন্দু জাতীয়তায় বিলীন হয়ে যেতে প্রস্তুত হওয়া।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম লীগ অনুসৃত "মুসলিম জাতীয়াবাদের" বর্তমান কার্যক্রম অব্যাহত রেখে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া।

তৃতীয়তঃ জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদী কর্মপন্থা ও কার্যক্রম এবং এ সংক্রান্ত দাবী–দাওয়া পরিত্যাগ করে ইসলামের নেতৃত্ব মেনে নেয়া। আর এর দাবী এই যে, মুসলমানদের নিজ জাতীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সংগ্রাম পরিচালনার পরিবর্তে শুধুমাত্র ইসলামের মৌলিক দাওয়াত পেশ করার কাজে সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা উচিত। জাতি হিসেবে আপন চরিত্রে, কার্যকলাপে ও সামষ্টিক জীবনে তাদের ইসলামের সাক্ষ্য দেয়া উচিত, যাতে দুনিয়ার মানুষ বিশ্বাস করতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে এ জাতি কেবল নিজ স্বার্থের জন্য নয় বরং বিশ্ববাসীর কল্যাণার্থে এবং তাদের সংস্কার ও সংশোধনের জন্যই আপন জীবনকে উৎসর্গ করেছে। আর যে আদর্শ ও মূলনীতি তারা পেশ করছে, প্রকৃতপক্ষে তা মানব জীবনকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে মহত্তম ও উৎকৃষ্টতম মানে উন্নীত করতে সক্ষম।

এ শেষোক্ত পথটাই মুসলমানদের জন্য অতীতেও মুক্তির একমাত্র পথ ছিল আর এখনো আছে। আমি কয়েক বছর ধরে তাদেরকে এদিকেই আহবান জানাচ্ছি। তারা যদি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পথ অবলম্বন না করে এ পথ অবলম্বন করতো, আর বিগত দশ বছরে যেভাবে তারা গোটা জাতীয় শক্তিকে এ পথে নিয়োজিত করেছে, সেভাবে যদি এ পথে নিয়োজিত করতো, তা হলে আজ ভারতের রাজনীতির মানচিত্রই অন্য রকম হতো, এবং ছোট ছোট দুটো পাকিস্তানের বদলে সমগ্র ভারতের পাকিস্তানে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিত। কিন্তু আমার এ আহবান তখন তাদের কাছে একজন শত্রুর অথবা উন্মাদ বন্ধুর আহবান মনে হয়েছিল। এখন পরিস্থিতি তাদেরকে এমনভাবে ঘেরাও করেছে যে, বাধ্য হয়ে ইসলামের পথ অবলম্বনের পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছে। এখন তাদের বাঁচার পথ একটাই অবশিষ্ট রয়েছে। তা হলো ইসলামের পথ– আসল প্রকৃত ও নির্ভেজাল ইসলামের পথ। অন্যান্য পথ হয় আত্মহত্যার পথ, নতুবা মৃত্যুদন্ড অথবা স্বাভাবিক মৃত্যুর পথ।

যে সময়টির আমি পূর্বাভাস দিচ্ছি, তা এখন অত্যাসন্ন। ভারতের চলমান রাজনীতির যুগের অবসান হয়ে যখনই নতুন যুগের সূচনা হবে, সংখ্যালঘু এলাকাগুলোতে মুসলমানরা তাদের সত্যিকার নৈরাশ্যজনক অবস্থান সর্বতোভাবে অনুভব করতে আরম্ভ করবে। এটা হবে একটা বিরাট আন্দোলনের পতনের সময় এবং এটা খেলাফত আন্দোলনের পতনের চেয়েও কয়েকগুণ বেশী ভয়াবহ ও বিপজ্জনক হবে। খেলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতায় মুসলমানদের মধ্যে যে স্থবিরতা ও বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল, তা ক্ষতিকর হলেও ধ্বংসাত্মক ছিল না। এখন যদি পুনরায় কোথাও সেই অবস্থার উদ্ভব হয়, তা হলে নিশ্চয়ই তা ধ্বংসাত্মক হয়ে দেখা দেবে। বর্তমান সময় পর্যন্ত যারা মুসলমানদের নেতৃত্বে বহাল রয়েছেন, মুসলমানরা তাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে নতুন কোন ভ্রান্ত নেতৃত্ব ও আশার আলো যদি না পায়, তা হলে তাদের ওপর হতাশা ও নৈরাজ্য জেকে বসবে। কেউ জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের দিকে ছুটবে, কেউ কম্যুনিষ্টদের দিকে অগ্রসর হবে। কেউ হিজরত করতে প্রস্তুত হবে কেউ হতাশাগ্রস্ত হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে পড়বে, আবার কেউ বা চরম ভগ্ন হৃদয়ে অথবা নিছক বেকুফের মত হতবুদ্ধি হয়ে হেরে যাওয়া জাতীয় সংগ্রামকে পুনরুজ্জীবিত করে শুধু নিজের জন্য নয় বরং নিজের হাজার হাজার নিরপরাধি ভাইএর জন্যও ধ্বংস ডেকে আনবে। সেই নাজুক মুহূর্ত সামাল দেয়ার জন্য এখন থেকেই এমন একটা সুসংবদ্ধ সংগঠন প্রস্তুত থাকা দরকার, যা সচেতন মুসলমানদের সামনে যথা সময়ে একটা নিখুঁত ও নির্ভুল কর্মসূচী পেশ করতে পারবে, যা তাদের ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার উপক্রম জনশক্তিকে ভ্রান্ত ও অপরিপক্ক কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করে একটা উজ্জ্বল লক্ষ্যের চার পাশে সমবেত করতে পারবে এবং তাদেরকে হতাশার পর প্রকৃত সাফল্যের সুসংবাদ দিতে পারবে। আমি দোয়া করি, যেন আপনাদের এ সংগঠনই সেই কাজটি সম্পন্ন করার সুযোগ ও সামর্থ লাভ করে এবং সেই কঠিন মুহূর্ত আগমনের পূর্বে এতটা শক্তিশালী, সুসংগঠিত ও প্রস্তুত হয়ে যায়, যাতে কাজটি আঞ্জাম দিতে পারে।

এবার আসুন, হিন্দু ভারতের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যত কি, তাও একটু পর্যালোচনা করে দেখি। আমি আপনাদেরকে প্রায়ই বলে থাকি যে, ইসলামী বিপ্লবের সফলতার যতটুকু সম্ভাবনা মুসলিম সংখ্যাগুরু অধ্যুষিত এলাকায় রয়েছে, প্রায় ততখানি সম্ভাবনা অমুসলিম সংখ্যাগুরু অধ্যুষিত এলাকায়ও রয়েছে। আমার এ কথাকে অনেকে আকাশকুসুম কল্পনা বলে

মনে করেন। কেউ কেউ এমনও ভাবেন যে, এটা বোধ হয় আমাদের বুদ্ধির অগম্য কোন সুফীতত্ব। কেননা তারা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায় যে, সংখ্যাগুরু অমুসলিমেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটা অটুট, ঐক্যবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত শিবির গড়ে তুলেছে যা নিশ্ছিদ্র ও দুর্ভেদ্য। শিবিরটি উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনায় পুরোপুরি উদ্দীপ্ত। হিন্দু ভারতের গোটা শাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তার মুঠোর মধ্যে এসে গেছে। সামান্য যেটুকু বাকী তাও পূর্ণ হয়ে যায় যায় অবস্থা। এ অবস্থা দেখে তাদের বুঝেই আসে না যে, এখানে ইসলামী বিপ্লবটা আসবে কোন্ পথ দিয়ে। কিন্তু আমি বলি, যে দুর্ভেদ্য শিবিরটা আপনার নজরে আসছে এবং যাকে আপত দৃষ্টিতে বাস্তব বলে মনে হচ্ছে, তার কাঠামোটা আগে বুঝতে চেষ্টা করুন যে, ওটা কি কি উপাদান দিয়ে গঠিত এবং সেই উপাদানগুলোর পারস্পরিক বন্ধন কি ধরনের।

ভারতের কোটি কোটি অমুসলিমকে যে জিনিস ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করেছে, তা কোন পৃথক জীবনাদর্শ, কোন সুষ্ঠু জীবনদর্শন এবং কোন সচেতন লক্ষ্য বা অভিষ্ট নয় যে, তার নড়বড়ে হওয়া বা বদলে যাওয়া কঠিন হবে, বরং তা হচ্ছে নিছক একটা জাতীয়তাবাদী প্রেরণা বা ভাবাবেগ। একদিকে বিজাতীয় শাসনের বিরুদ্ধে এবং অপরদিকে মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এ ভাবাবেগকে উস্কে দেয়া হয়েছিল। জাতীয়তাবাদের এটা জন্মগত বৈশিষ্ট্য যে, কেবল কোন বিরোধী, প্রতিরোধকারী ও যুদ্ধংদেহী শত্রুর বিরুদ্ধেই তার জন্ম হয়, তার প্রবলতর প্রতিরোধের মুখেই তা প্রজ্বলিত হয় এবং যতক্ষণ সেই শক্তি তার বিরোধিতায় বহাল থাকে, কেবল ততক্ষণই তা টিকে থাকে। যখনই শত্রুর প্রতিরোধ খতম হয় এবং জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়, তৎক্ষণাত আপনা আপনি এ ভাবাবেগের অবলুপ্তি ঘটে, আভ্যন্তরীন জীবনের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য সমস্যাবলীর প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, আর যারা শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদী হুজুগের বশে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, তারা বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হতে আরম্ভ করে। বস্তুত হিন্দু জাতীয়তাবাদের ব্যাপারটাও অনেকাংশে এ রকমই। যে দুই পায়ের ওপর এটি দাঁড়িয়েছিল, তার মধ্যে একটা অর্থাৎ বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তি লাভের আকাংখা--অচিরেই অপসারিত হতে যাচ্ছে। এরপর শুধু দ্বিতীয় পা বাকী থাকে। সেটি হলো, মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রতিরোধের স্পৃহা। পাকিস্তান হওয়ার পর ওটারও টিকে থাকা কঠিন। অবশ্য এ কথাটা কেবল সেই অবস্থায়ই খাটবে--যদি হিন্দু এলাকার মুসলমান সংখ্যালঘু

নিজেদের সমস্যা সমাধানের এমন একটা পথ খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়। যাতে করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ও উত্তেজনার কারণ না ঘটে, আর ভারতের অভ্যন্তরে মুসলিম জাতীয়তাবাদের দাবী দাওয়া দমন করার জন্য হিন্দু জাতীয়তাবাদের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠারও অবকাশ না থাকে। আল্লাহ যদি এ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাটুকু মুসলমানদেরকে দান করেন, তা হলে আপনারা দেখতে পাবেন যে, জাতীয়তাবাদী নেতারা এবং সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রচারকারীরা কৃত্রিম ভীতি প্রদর্শন করে ও অবাস্তব জুজু দেখিয়ে বর্তমান জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে টিকিয়ে রাখতে ও উস্কে দিতে যত চেষ্টা চক্রান্তই করুক, তার মৃত্যু অবধারিত। আর যেসব পরস্পর বিরোধী ও বিচিত্র স্বভাবের লোকদের নিয়ে বর্তমান জাতীয়তাবাদী শিবির গঠিত হয়েছে, তাও ছিন্ন ভিন্ন না হয়ে পারবে না। কারণ এ শিবিরের অভ্যন্তরে এর সাংগঠনিক উপদানাগুলোর মধ্যেই যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎপীড়ন ও অবিচার, যে অর্থনৈতিক যুলুম, যে স্বার্থগত ও উদ্দেশ্যগত টানা পোড়েন ও দ্বন্দ্ব–সংঘাত এবং যে শ্রেণীগত ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বৈষম্য বিরাজমান, বহিরাগত বিপদ অপসৃত হওয়ার সাথে সাথেই তার অস্তিত্ব তীব্রভাবে অনুভূত হবে। উপরন্তু দেশের ভবিষ্যত শাসন কাঠামো, ক্ষমতা বন্টন, অধিকার চিহ্নিতকরণ এবং সামাজিক কাঠামোর বিন্যাস ও বিনির্মাণ প্রশ্নে তা অনিবার্যভাবে খন্ডবিখন্ড হয়ে যাবে। এ বিভক্তির জন্য এমন শক্তিশালী ও স্বাভাবিক কারণ বিদ্যমান রয়েছে যে, তা সংঘটিত হওয়াকে কোন শক্তিই ঠেকিয়ে রাখতে পারবেনা।

হিন্দু ভারতের বর্তমান সমাজ কাঠামো অসংখ্য শ্রেণী নিয়ে গঠিত। এসব শ্রেণীর কতক অন্যান্য শ্রেণীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে আর কতক উচ্চতর শ্রেণীগুলোর অধীন, নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত। এ সব শ্রেণীর মানুষের মনে এরূপ ধারণা অত্যন্ত গভীরভাবে বদ্ধমূল রয়েছে যে, কোন কোন শ্রেণীর মানুষ জন্মগতভাবে কুলীন এবং কোন কোন শ্রেণীর মানুষ জন্মগতভাবে নীচ ও হীন। এ ভেদাভেদ ও বৈষম্য চিরন্তন এবং কোনক্রমেই তা অপনোদনযোগ্য নয়। পুনর্জন্মবাদী দর্শন এ সংস্কারকে আরো মজবুত হতে সাহায্য করেছে। নিম্ন শ্রেণীগুলোর ব্যাপারে প্রবল বিশ্বাস জন্মানো হয়েছে যে, তারা নীচতা ও হীনতার জন্যই জন্মেছে এবং এটা তাদের পূর্বজন্মেরই কর্মফল, যা তাদেরকে ভোগ করতেই হবে। এ অবস্থা পরিবর্তনের যে কোন চেষ্টা বৃথা যেতে বাধ্য। এ সমাজ কাঠামোতে প্রত্যেক উচ্চতর শ্রেণী নিম্নতর

শ্রেণীর মাথার ওপর পা রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তাকে পদদলিত করছে। সমাজের প্রত্যেক অংশে কুলীন ও অকুলীনের বৈষম্য বিরাজমান। পদে পদে রয়েছে অবিচার ও বেইনসাফী কি খাওয়া–দাওয়ায় কি বসবাসে কি বিয়ে–শাদীতে সমাজের––রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে ভেদাভেদ ও বৈষম্যমূলক আরচণ। আর এ বৈষম্য শুধু যে সমাজে বিভক্তি ও ফাটল সৃষ্টি করেছে তাই নয়, বরং সেই সাথে ঘৃণা, অবজ্ঞা ও অবমাননারও প্রচলন ঘটাচ্ছে এমন কি কুলীন শ্রেণী নিম্নতর শ্রেণীর লোকদের একই ধরনের পোশাক ও অলংকারদি ব্যবহার করা পর্যন্ত বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। অল্প দিন আগের কথা যে, রাজপুতানার চামার প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা যুদ্ধের কল্যাণে সচ্ছল হওয়ায় এবং বিদেশের হাওয়া লাগার কারণে একটু রুচির উন্নতি ঘটায় কুলীনদের গৃহবধুদের মতো নিজেদের গৃহবধুদেরকে পোশাক ও অলংকারাদি ব্যবহার করাতে আরম্ভ করেছিল। আর যায় কোথায়। সেখানকার কুলীন গুজর ও জাটরা হুলস্থূল কান্ড ঘটিয়ে দিল। যদিও এ গুজর ও জাটরা স্বয়ং রাজপুতদের কাছ থেকেও একই ধরনের ব্যবহার পেয়ে আসছিল এবং সে জন্য তাদের মনেও প্রচন্ড ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছিল। কিন্তু তথাপি চামাররা হঠাৎ তাদের সমকক্ষ হয়ে যাবে, এটা তাদের কাছে খুবই অপমানজনক মনে হয়েছিল। এ জন্য তাদের গোত্রের লোকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে এ অধোপতিত লোকগুলোকে জোরপূর্বক আগের সেই হীনতার আবর্তে নিক্ষেপ করার তোড়জোড় শুরু করে দিল, যেখান থেকে তারা ওপরে উঠতে উদগ্রীব ছিল।

অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থাও এ সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। এর প্রাচীন নিপীড়নমূলক বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে আধুনিক পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্যের সংযোগ ঘটেছে। প্রাচীন সামাজিক ধ্যান–ধারণা ও আধ্যাত্মিক দর্শনের বদৌলতে যারা উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে জেঁকে বসেছে, তারা শুধু দেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে নিজেদের উচ্চতর অবস্থানকে পাকাপোক্ত করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, বরং সেই সাথে দেশের যাবতীয় সহায় সম্পদের ওপর নিজেদের একচেটিয়া দখলও প্রতিষ্ঠা করেছে। এরপর নীচতলার অধিবাসী সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের জন্য তাদের ভৃত্যগীরী ও দিনমুজুরী করা ছাড়া আর কোন উপায় তারা অবশিষ্ট রাখেনি। এ অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে বঞ্চিত ও খেটে খাওয়া মানুষের ওপর যে অবিচার ও নিপীড়ন চালু রয়েছে, তার সংখ্যা নিরূপণ করাই দুঃসাধ্য। শুধু তাই নয়, উচ্চতর শ্রেণীগুলো নিজেদের গন্ডীর মধ্যেও যুলুম ও অবিচারের রকমারি রীতিপ্রথা

চালু রেখেছে। এর পরিণতিতে সচ্ছল লোকের সংখ্যা কম এবং দীন দরিদ্রের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাদের সুদের কারবার, যৌথ পারিবারিক প্রথা, জৈষ্ঠ সন্তানের উত্তরাধিকার এবং এ ধরনের আরো বহু রীতিপ্রথা এমন রয়েছে, যা সম্পদ ও তার উৎসগুলোকে কতিপয় লোকের একচেটিয়া দখলভুক্ত এবং অনেককে বঞ্চিত ও পরমুখাপেক্ষী বানিয়ে ছাড়ে। এ প্রক্রিয়ায় যাদের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তারা এখন আধুনিক পুঁজিবাদী ধারার আশ্রয় নিয়ে দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থ ব্যবস্থার ওপর নিজেদের নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এখনো করে চলেছে।

বর্তমানে একটা নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। এ ব্যবস্থা রচনা করতে গিয়ে কাগজে তো গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার (Social Justice) সাম্য ও সুযোগ-সুবিধার সমতা (Equality of Opportunities) ইত্যাকার চমকপ্রদ আদর্শ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। কিন্তু এ শব্দগুলোর প্রকৃত মূল্য তার উচ্চারণ দ্বারা নয় বরং বাস্তাবায়ন দ্বারাই নির্ণিত হতে পারে। বাস্তবে আমরা যা দেখতে পাচ্ছ তা এই যে, এ রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবকাঠামো তৈরী ও তার বাস্তবায়নের যাবতীয় তৎপরতায় শুধুমাত্র সেই শ্রেণীটাই দোর্দন্ড প্রতাপে সক্রিয়, যা সামাজিক অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ওপর তলায় অবস্থান করে--শুধু অবস্থান করে বললেও সঠিক বলা হয়না, আসলে তাদের জন্মই হয়েছে ওপর তলায়।

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা জানতে পেরেছি যে, এই শ্রেণীকে আল্লাহ অন্য সব কিছু দিলেও উদার মন ও প্রশস্ত হৃদয় প্রদান করেননি। তাদের কূপমন্ডুকতা এ যাবত ভারতের অনেক ক্ষতি সাধন করেছে এবং তাদের ভাবগতিক দেখে এরূপ আশা করা খুবই কঠিন যে, ভবিষ্যতেও তারা আপন রাজনৈতিক শক্তিকে সত্যিই ইনসাফ প্রতিষ্ঠার কাজে প্রয়োগ করবে।

এ পরিস্থিতিতে দেশের সাধারণ মানুষের মনে অত্যন্ত তিক্ত অনুভূতি বিরাজমান। এ-যাবত জাতীয়তাবাদের নেশার ঘোরে এ অনুভূতি অনেকাংশে ধামাচাপা পড়েছিল। জনগণ এ আশায় বুক বেঁধে জীবন ধারণ করে আসছিল যে, দেশের প্রশাসনিক ক্ষমতা যখন আমাদের হাতে এসে যাবে তখন এ সব অবিচারের অবসান ঘটবে। সেই প্রশাসনিক ক্ষমতা যখন অচিরেই দেশবাসীর কাছে হস্তান্তরিত হবে, তখন আগামীতে এ ক্ষমতাকে কিভাবে প্রয়োগ করলে

দেশে সত্যিকার ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, এ প্রশ্ন বেশী দিন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। বর্তমানে যারা ভারতের ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসেছেন তারা হিন্দু সংস্কৃতির আদিম ঐতিহ্যের সাথে পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার জীবনধারা এবং কিছু কিছু সমাজতন্ত্রের জোড়াতালি লাগাতে ব্যস্ত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আমার এ অনুমান যদি সঠিক হয়, তা হলে এ পদ্ধতিতে তারা একটা লোক দেখানো গণতন্ত্র, একটা বাহ্যিক সাম্য ও একটা চোখ ধাধানো ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় যে সফল হবে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তার অভ্যন্তরে যথারীতি বর্তমানে প্রচলিত যাবতীয় নিপীড়ন, অসাম্য ও ভেদাভেদ বৈষম্য বহাল থেকে যাবে। কেননা বিভেদ ও বৈষম্য হিন্দু সংস্কৃতির মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য এবং এটা বহাল থাকতে কোন সত্যিকার গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর তার সাথে পাশ্চাত্য মতবাদের সংযোগ ঘটলে শুধুমাত্র এতটুকুই লাভ হবে যে, উচ্চতর শ্রেণীর কৌলিন্য ও পুঁজিবাদকে নির্বাচন ও ভোটের মাধ্যমে বৈধতার সনদ প্রদান করা হবে। এ জন্য তারা যে ভারতের সাধারণ জনগণকে অচিরেই হতাশাগ্রস্ত করে তুলবে, সেটা প্রায় সুনিশ্চিত। তাদের হাতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হবে না। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই ভারতের কৃষক শ্রমিক প্রভৃতি সাধারণ মানুষ এবং স্বয়ং উচ্চতর শ্রেণীর বঞ্চিত লোকেরা অন্য কোন ইনসাফপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠবে।

এ সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী প্রস্তুতি নিচ্ছে। বর্তমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আপন অভিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পর যেই অবসন্ন হয়ে পড়বে, অমনি তারা এ শ্রেণীভেদের চোরাগলি ও স্বার্থগত সংঘাতের ফাটলের মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে এবং জনসাধারণকে ইনসাফের আশ্বাস দিয়ে ক্ষমতা দখলের পায়তারা করবে। অথচ এ গোষ্ঠীর কাছে এ সব অবিচার ও বেইনসাফী উচ্ছেদ করার এমন কোন কর্মসূচী নেই, যা স্বয়ং যুলুম, অবিচার, হত্যা, রক্তপাত, নৈরাজ্য এবং স্বৈরাচার ও বল প্রয়োগ থেকে মুক্ত। প্রচলিত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব কলহের পরিবর্তে তারা ভারতকে উপহার দেবে শ্রেণী বিদ্বেষ ও শ্রেণী সংঘাত। এ যাবত যেখানে লোকেরা হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-কলহের ভিত্তিতে একে অপরের মাথা ফাটাতো ও বাড়ী পোড়াতো, সেখানে তাঁরা খাদ্য নিয়ে কোন্দল বাধাবে এবং সেই সমস্ত লোকেরাই রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় লিপ্ত হবে। আজ যেমন এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত ও

উত্তেজিত, ঠিক তেমনি আগামীতে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ ও অগ্নিশর্মা হবে। জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের স্থলে সৃষ্টি হবে শ্রেণী স্বার্থের অন্ধ আনুগত্য। ইসনাফ ও ন্যায়বিচারের যথার্থ চেতনার কোন স্থান যেমন আজকের জাতীয় সংগ্রামের আমলে মানুষের হৃদয়ে নেই, তেমনি আগামীতে শ্রেণী সংগ্রাম চালানোর সময়ও তার কোন অস্তিত্ব থাকবে না। ক্ষমতাসীন শ্রেণী বঞ্চিত সর্বহারা শ্রেণীকে বঞ্চিত রাখার জন্য আর সর্বহারা শ্রেণী ক্ষমতাসীন শ্রেণীকে পরাস্ত করে ক্ষমতা দখল করে তাদেরকে পাল্টা বঞ্চিত করা ও সর্বহারায় পরিণত করার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এভাবে দীর্ঘকালব্যাপী ভারতে বিরাজ করবে এক অশান্ত ও সংঘাত সংকুল পরিবেশ। আর শেষ পর্যন্ত যদি আল্লাহ না করুন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হয়ে যায়, তাহলে আরো দীর্ঘকাল জুড়ে এখানে রাশিয়ার মত ধনিক শ্রেণীকে জমী–জায়গা ও কল–কারখানা থেকে বেদখল করার জন্য চরম রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ও যুলুম–নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালানো হবে। অতপর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এখানে রাশিয়ার মতই স্বৈরচারী শাসন চালু হবে। সেই ভাবেই দেশের গোটা জনগোষ্ঠীকে এক পরাক্রান্ত ফ্যাসিবাদী শাসনের যাতাকলে নিষ্পেষিত করা হবে, মানুষ সেই ভাবেই বঞ্চিত হবে চিন্তার, কথা বলার ও লেখার স্বাধীনতা থেকে, এবং সেইভাবে গুটিকয় লোকের হাতে চলে যাবে সমগ্র দেশবাসীর জীবিকার নিয়ন্ত্রণ। রাশিয়ার মতই আল্লাহর বান্দাদের এতটুকু স্বাধীনতাও থাকবে না, যাতে করে সেই নিপীড়নমূলক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মনের ক্ষোভ ও জ্বালা প্রশমিত করার জন্য চিৎকার ও ফরিয়াদ করতে পারে কিংবা ঐ শাসনধারাকে পাল্টানোর জন্য রাজনৈতিক সংগঠন বানাতে ও সামষ্টিক চেষ্টা–তৎপরতা চালাতে পারে। সর্বোপরি সম্ভাব্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দ্বারা ভারতের সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি হবে, তা এই যে, বিগত শতাব্দীসমূহের ক্রমাগত আধোপতন সত্ত্বেও ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতায় কম বেশী যেটুকু নৈতিক ও আধ্যাতিক মূল্যবোধ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে তাও নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং এ দেশটি সম্পূর্ণরূপে একটি জড়বাদী ও বস্তুবাদী দেশে পরিণত হবে।

এ পরিণতি থেকে ভারতকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় এই যে, একটি দলকে চিন্তা ও কর্মের এমন একটি আদর্শ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, যাতে সর্বোচ্চমানের এবং সত্যিকার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ যেমন থাকবে, তেমনি সততা এবং নিরপেক্ষ সামাজিক সুবিচারও থাকবে, সত্যিকার

গণতন্ত্রও থাকবে--শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্র নয় বরং সামজিক ও সাংস্কৃতিক গণতন্ত্রও। সেই সাথে তাতে থাকবে শ্রেণী ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে উন্নতির সমান সুযোগ। সেই আদর্শ একটি বা কয়েকটি শ্রেণীর স্বার্থ নয়, বরং সকল মানুষের স্বার্থকে সমান সহানুভূতি ও ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখবে, সে কারোর মিত্র এবং কারো শত্রু হবে না। শ্রেণী ও গোষ্ঠীসমূহকে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা ও যুদ্ধে লিপ্ত করার পরিবর্তে একটি ন্যায়নিষ্ট জীবন পদ্ধতির ওপর তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবে, বঞ্চিত শ্রেণীগুলোকে যা তাদের স্বাভাবিকভাবে ন্যায্য প্রাপ্য তা অর্জনে সাহায্য করবে, আর উচ্চতর শ্রেণীগুলোর কাছে তাদের স্বাভাবিক প্রাপ্যের চেয়ে বেশী যেটুকু রয়েছে কেবলমাত্র সেটুকুই নিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সমর্পণ করবে। এ ধরনের একটা আদর্শ যদি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা হয় এবং যারা তুলে ধরবে তারা নির্ভরযোগ্য চরিত্র ও স্বভাবের অধিকারী হয়। তারা স্বয়ং কোন রকমের সাম্প্রদায়িক, শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থপরতায় লিপ্ত না হয়, তাদের নিজ জীবন এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, প্রকৃতপক্ষে ন্যায়বিচারের আশা তাদের কাছ থেকেই করা যেতে পারে অন্য কারো কাছ থেকে নয়। এবং তাদের ভিতরে সততা ও দুনিয়াবী ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের যোগ্যতা উভয়েরই সমাবেশ ঘটে। তা হলে ভারতবাসীর সেই আদর্শ বাদ দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথকে গ্রহণ করার কোন কারণই থাকতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তো হলো একটা অস্ত্রোপচার, যা রোগ আরোগ্য করার সাথে সাথে স্বাস্থ্যেরও সমূহ ক্ষতি সাধন করে। এ অস্ত্রোপচারকে মানুষ শুধু এমন অনন্যোপায় অবস্থাতেই মেনে নেয়, যখন ওষুধ দ্বারা রোগ সারানোর কোন আশাই থাকে না। পৃথিবীর যেখানেই কোন দেশের মানুষ এ অস্ত্রোপচারের প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছে, কেবল এ জন্যই অবলম্বন করেছে যে, তাদের সামনে পুঁজিবাদী শোষণ নিপীড়ন ও সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী তৃতীয় কোন পথ অবশিষ্টই ছিল না। যার সাহায্যে তারা এ উভয় ব্যবস্থার কুফল থেকে আত্মরক্ষা করে ইনসাফ লাভের আশা করতে পারে। যদি এ ধরনের তৃতীয় পথ যথোচিতভাবে তুলে ধরা হয়, তা হলে ভারত বা পৃথিবীর অন্য কোন দেশের মানুষ এতটা পাগল হয়নি যে, তারা একটা উপকারী ঔষুধ ব্যবহার না করে অনর্থক অস্ত্রোপচারের জন্যই জিদ ধরবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই তৃতীয় পথটা তুলে ধরার যোগ্যতা ও ক্ষমতা কি মুসলমানদের আছে? যদি থেকে থাকে—বস্তুত এ তৃতীয় পথটার নাম যে

ইসলাম, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই—তা হলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলতে চাই যে, ভবিষ্যতে ভারতে সমাজতন্ত্রের মোকাবিলায় ইসলামের সাফল্যের সম্ভাবনা অন্তত পক্ষে শতকরা ৬০ ভাগ। ইসলামের মত একটা পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ জীবন ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তার ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনা না করে সমগ্র ময়দানকে সমাজতন্ত্রের জন্য উন্মুক্ত ছেড়ে দেয়া যে মুসলমানদের পক্ষে চরম দুর্ভাগ্য ও নির্বুদ্ধিতার ব্যাপার হবে তাতে দ্বিরুক্তির কোনই অবকাশ নেই।

এবার ভারতে ইসলামী বিপ্লবের পথ সুগম করার জন্য আমাদের কি কি করা উচিত, সে বিষয়ে আমি সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

১. সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে, তা এই যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব–সংঘাত এখন পর্যন্ত লেগে রয়েছে, তা বন্ধ করতে হবে। আমার মতে, মুসলমানদের পক্ষে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার পরিবর্তে নিজেদের জাতীয় স্বার্থ ও দাবী- দাওয়ার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া আগেও ভ্রান্ত ছিল। কিন্তু এখন সে লড়াই চালিয়ে যাওয়া শুধু ভুলই নয়, এক ধ্বংসাত্মক ভুল এবং নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ আত্মহত্যাও। বস্তুত মুসলমানদের নিজস্ব কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দেয়া এখন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। আইন সভায় জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন তোলা, নির্বাচনের জন্য ছুটাছুটি ও ব্যস্ততা, চাকুরীর টানাহেঁচড়েন, সাম্প্রদায়িক অধিকার ও দাবী–দাওয়ার জন্য চিৎকার ফরিয়াদ--এ সব আগামীতে সম্পূর্ণ নিষ্ফলও হবে আবার ক্ষতিকরও হবে। নিষ্ফল এ জন্য যে, এখন যাদের হাতে ভারতের শাসন ক্ষমতা কুক্ষীগত হতে যাচ্ছে, তারা যুক্ত নির্বাচন ও চাকুরীতে শুধুমাত্র "যোগ্যতার" নীতি নির্ধারণ করে মুসলমানদের পৃথক জাতীয়সত্তা বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের এ সিদ্ধান্ত অপ্রতিরোধ্য। আর ক্ষতিকর এ জন্য যে এ সব অধিকার লাভের জন্য মুসলমানরা যত চেষ্টাই করবে, তাতে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আরো বেশী করে মাথাচাড়া দেবে আর যদি তারা নিজেদের অভিযোগের মীমাংসার জন্য পাকিস্তানের সাহায্য লাভ করতে চায়, তা হলে তা আন্তর্জাতিক জটীলতা ও বিরোধের উৎপত্তি ঘটাবে। আর এতে করে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আরো শাণিত ও শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ পাবে। সুতরাং আমাদেরকে এখন ব্যাপকভাবে মুসলমানদের মধ্যে এরূপ জনমত গড়ে তুলতে হবে, যাতে একটা জাতি হিসেবে সরকার ও তার শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ নিরাশক্তি ও

নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে এবং নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা হিন্দু জাতীয়তাবাদকে আশ্বস্ত করে যে, দেশে আর কোন রাজনৈতিক জাতীয়তা তার সাথে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হওয়ার মত নেই। বর্তমানে অমুসলিম সংখ্যাগুরুর মনে ইসলামের বিরুদ্ধে যে অস্বাভাবিক ধরনের বিদ্বেষ জন্ম নিয়েছে, তাকে প্রশমিত করার এটাই একমাত্র উপায়। ইসলামকে আরো প্রচার প্রসারে সুযোগ দিলে পুনরায় কোন এলাকার মুসলমানরা আর একটা পাকিস্তান গড়তে উদ্যত হতে পারে--অমুসলিমদের এ ধরনের আশংকাও এ পদ্ধতিতেই নিরসন করা সম্ভব।

২· আমাদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলামের জ্ঞান বিস্তার করা, ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপক প্রেরণা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করা, তাদের নৈতিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনকে এতটা সংশোধন করা--যাতে তাদের প্রতিবেশী অমুসলিমদের চোখে নিজেদের সমাজ অপেক্ষা মুসলমানদের সমাজ সুস্পষ্টভাবে ভাল লাগে। যদি কোন অমুসলিম এ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে আগ্রহী হয়, তা হলে সে যে শ্রেণী ও যে স্তরের লোকই হোক না কেন, তাকে যেন সম্পূর্ণ সমমর্যাদা দিয়ে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়। যুগ যুগ ব্যাপী অব্যাহত সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া এ কাজ সমাধা করা অসম্ভব। মুসলিম সমাজের একটি বড় অংশকে যতক্ষণ আমরা জ্ঞানে ও কর্মে, সংস্কৃতিতে ও সামাজিক আচরণে ইসলামের সত্যিকার প্রতিনিধিতে পরিণত করতে সক্ষম না হব, ততক্ষণ ভারতের সাধারণ অমুসলিম জনমতকে ইসলামের স্বপক্ষে দীক্ষিত করার আশা করা বাতুলতা মাত্র। অমুসলিমদের সামনে আপনি লেখনী কিংবা বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামকে যতই চিত্তাকর্ষকভাবে তুলে ধরুন না কেন, তা তাদেরকে কোনক্রমেই আকৃষ্ট করতে পারে না। কেননা ইসলামের প্রতিনিধিদের যে চরিত্র তারা দিনরাত প্রত্যক্ষ করছে, তা আপনার বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। তবুও যদি এ অমুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে এমন কোন সত্যনিষ্ঠ লোক বেরিয়েই পড়ে যিনি মুসলমানদের অবস্থা কিরূপ তা না দেখে ইসলাম কেমন তা দেখেন এবং ইসলামে দীক্ষিত হন, তাহলে বর্তমান মুসলিম সমাজে তার খাপ খাওয়ানোই কষ্টকর। কেননা এখানে এখন পর্যন্ত আদিম হিন্দু জাহেলিয়াতের পুরুষানুক্রমিক গোঁড়ামী ও কুসংস্কার আর জাত-গোষ্ঠীর তারতম্য ও বিভেদ-বৈষম্য ইসলামের আওতায় আসা সত্ত্বেও হুবহু বহাল রয়েছে। এ জন্য

একজন নওমুসলিমকে পুনরায় সে সব সামাজিক অনাচারের সম্মুখীন হতে হয়, যা ত্যাগ করে সে হিন্দু সমাজ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তাই মুসলমানদের সকলের না হলেও অন্তত উল্লেখযোগ্য অংশের চারিত্রিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন সংশোধন করা ছাড়া ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আমরা এক কদমও সামনে অগ্রসর হতে পারবো না। শুধুমাত্র নওমুসলিমদের আলাদা সমাজ গড়ে তুলবো--এটাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ সংশোধনের কাজে আমরা যদি খানিকটাও সফল হতে পারি, সেই সাথে মুসলমানদের মধ্যে মামুলী ধরনের ইসলামী জ্ঞানের বিস্তার ঘটাতেও পারি এবং নিত্যকার জীবনে যেসব অমুসলিমের সাথে দেখা হয় তাদের কাছে ক্রমাগত ইসলাম প্রচার করতে মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি, তা হলে এ দাওয়াতের গতি এতটা তীব্র হওয়া সম্ভব যে, ভারতে অন্যকোন আন্দোলন ইসলামের মোকাবিলা করতে পারবে না। বর্তমানে ভারতে মুসলমানের সংখ্যা চার পাঁচ কোটির কাছাকাছি। এ জনগোষ্ঠীর বিশ ভাগের এক ভাগও যদি ইসলাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ও সচেতন হয় এবং ইসলামের প্রচার শুরু করে দেয়, তা হলে ইসলাম প্রচারকের সংখ্যা প্রায় ২০/২৫ লাখে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। ভারতে আর কোন আন্দোলনের এত বিপুল সংখ্যক প্রচারক আছে কি? অপরদিকে মুসলমানরা ভারতে খিচুরীর আকারে অমুসলিমদের সাথে মিলে মিশে রয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক মুহূর্তে তারা অমুসলিমদের কাছে নিজেদের ধ্যান-ধারণা পৌছাতে পারে এবং নিজেদের আচার-ব্যবহার দ্বারা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়। অন্য কোন দল বা গোষ্ঠীর এ সুযোগ নেই। তা ছাড়া অন্য কোন দলের নিজস্ব কোন পৃথক সমাজ ও সাংস্কৃতিক অবকাঠামো নেই। অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের সমাজে আশ্রয় নিয়ে ভারতের অধিবাসী নিপীড়িত শ্রেণীগুলো হয়তোবা কোন রকমে নিজেদের পেটের দাবী মেটাতে পারে। কিন্তু নিজেদের সামাজিক জীবনের সমস্যাবলী ও অসুবিধাসমূহ দূর করতে পারে না। পক্ষান্তরে মুসলমানদের একটা আলাদা সমাজ রয়েছে। আমাদের আদর্শ অনুসারে তা যদি কিছুটাও সংশোধিত হয়ে যায়, তা হলে ভারতের অবহেলিত ও নিস্পেষিত জনগোষ্ঠীর সকলকেই এ সমাজে আশ্রয় দেয়া সম্ভব। জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার অন্যান্য অনাচার ও অবিচারের দরুন যাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে ইসলামী সমাজে তাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩· তৃতীয় জরুরী কাজ এই যে, এ দেশের মুসলমানদের মেধা শক্তির বৃহৎ অংশকে আমাদের এ দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে তা কাজে লাগাতে হবে। ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণী এ যাবত যে আশা আকাংখা ও উচ্চাভিলাস পোষণ করে আসছিল তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এ ব্যর্থতা উপলব্ধি করা মাত্রই তাদের মধ্যে নৈরাশ্য দেখা দেবে। এ পরিস্থিতিতে যদি তাদের সামনে একটা উজ্জ্বলতর লক্ষ্য ও আশা আকাংখা তুলে ধরা হয়, তা হলে তা তাদের একটা বিরাট অংশকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে। এভাবে আমাদের দাওয়াতী কার্যক্রম যতই শক্তিশালী ও তীব্র হবে, ততই তাকে ইসলামী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে পারে এমন সব ফলদায়ক কাজে নিয়োজিত করতে হবে। উদাহরণত আমরা মুসলমানদের সাংবাদিকতার বর্তমান পেশাগত প্রবণতাকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিতে চাই। আমরা কামনা করি যে, উঁচুদরের সাহিত্যিক সাংবাদিকগণ এখন ইংরেজী, উর্দু ও অন্যান্য ভাষায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করবেন এবং তার মাধ্যমে দাবী-দাওয়া ও অধিকার নিয়ে চিৎকার ফরিয়াদ, চাকুরীতে জনসংখ্যা অনুপাতে হিস্‌সা পাওয়া নিয়ে হৈ চৈ এবং বিভিন্ন কর্মস্থলে হিন্দুদের নিপীড়ন ও দৌরাত্ম্যে ক্ষোভ প্রকাশের পরিবর্তে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ওপর নীতিগত সমালোচনা করবেন, তার ত্রুটিবিচ্যুতি খুটিয়ে খুটিয়ে জনসমক্ষে তুলে ধরবেন এবং এর চেয়ে উত্তম একটা সমাজ ব্যবস্থা পেশ করে তার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তুলবেন। অনুরূপভাবে আমরা এটাও প্রত্যাশা করি যে, আমাদের তরুণ লেখক সাহিত্যিকরা বিনোদন সর্বস্ব সাহিত্য চর্চার পেশা ত্যাগ করে আপন সাহিত্য প্রতিভাকে একটা উচ্চতর মানের গঠনমূলক সাহিত্য রচনায় ব্যয় করবেন যে সাহিত্য মনুষ্যত্বের চেতনা জাগ্রত করে এবং মন-মগজে একটা ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থার চাহিদা ও ব্যাকুলতার সৃষ্টি করে। অতপর যাদেরকে আল্লাহ অধিকতর উঁচুমানের বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা দান করেছেন, তাদেরকে আমরা দুনিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দানের পথ দেখাতে চাই। সে পথ এই যে, তারা কুরআনের মশাল হাতে নিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সমস্যাবলী পর্যালোচনা করবেন এবং গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের মাধ্যমে ইসলামী জীবন পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র দুনিয়াবাসীর সামনে পেশ করবেন। সে চিত্র দেখে জনগণ সহজেই জানতে পারবে যে, এ পদ্ধতি অনুসারে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা চালু হলে তার বিস্তারিত রূপকাঠামোটা কি রকম দাঁড়াবে। এ ছাড়াও এ সব জ্ঞানীগুণী ও প্রতিভাধর লোকদের মধ্য

থেকেই নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন লোকও আবির্ভূত হতে পারে। ইসলামের দাওয়াতকে একটা গণআন্দোলনে পরিণত করার জন্য এ সব লোককে তার নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্য করে গড়ে তোলা খুবই জরুরী।

৪· চতুর্থ জরুরী কাজ এই যে, আমাদের সকল কর্মীকে এবং আমাদের আন্দোলন দ্বারা যারা ভবিষ্যতে প্রভাবিত হবেন তাদের সকলকে ভারতের সে সব আঞ্চলিক ভাষা শিখতে হবে এবং তাতে লেখা ও বক্তৃতা দেয়ার মত দক্ষতা অর্জন করতে হবে, যা আগামীতে শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যম হতে যাচ্ছে। সেই সাথে এ সব ভাষায় ইসলামের জরুরী বই পুস্তক ভাষান্তরিত করার কাজ যত শ্রীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করতে হবে। দক্ষিণ ভারতে তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালম ও মারাঠী, পশ্চিম ভারতে গুজরাটী, পূর্ব ভারতের বাংলা এবং ভারতের বাদবাকী অঞ্চলে হিন্দিভাষা এখন শিক্ষার মাধ্যম হবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে এগুলো সরকারী ভাষাও হবে এবং দেশের যাবতীয় বই পুস্তক এ সব ভাষাতেই প্রকাশিত হবে। মুসলমানরা যদি সংকীর্ণ জাতীয় আভিজাত্যবোধের ভিত্তিতে শুধুমাত্র উর্দূর মধ্যেই লেখা ও বলাকে সীমাবদ্ধ রাখে তা হলে দেশের সাধারণ মানুষ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং কোটি কোটি প্রতিবেশীকে স্বমতে দীক্ষিত করার কোন মাধ্যম তাদের হাতে থাকবে না। এ কথা সত্য যে, উর্দূ ভাষার স্থায়ীত্ব ও উন্নতি আমাদের কাম্য। কেননা আমাদের এ যাবতকালের জ্ঞান–বিজ্ঞান ও কৃষ্টির যা কিছু পুঁজি আছে, তা এ ভাষাতেই বিদ্যমান। কিন্তু তাই বলে আমরা ইসলামের ভবিষ্যতকে উর্দূর চার দেয়ালে আবদ্ধ করে রাখতে প্রস্তুত নই। উর্দূ যদি দেশের একটা সাধারণ ভাষা না হতে পারে, আর ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, সে মর্যাদা তার হবেও না, তা হলে যে যে ভাষা দেশে প্রচলিত হবে, আমরা তার সবকটিতে ইসলামী সাহিত্য সরবরাহ করবো এবং প্রতিটি ভাষাকে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ব্যবহার করবো। এ কাজ শুধু অমুসলিমদের জন্য নয়। ববং স্বয়ং মুসলমানদের তাবি বংশধরকে মুসলমান হিসেবে বাঁচিয়ে রাখার জন্যও জরুরী। কেননা আগামীতে মুসলমান শিশু–কিশোররা শিক্ষাংগনে যে ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হবে তা দ্বারা এবং শিক্ষাংগনের বাইরে যে ভাষা সরকারী ও জাতীয় ভাষা হবে তা দ্বারা এত বেশী প্রভাবিত হবে যে, উর্দূর সাথে তাদের সম্পর্ক নামমাত্র বহাল থাকবে। এ সব ভাষায় যদি ইসলামী সাহিত্য না থাকে তা হলে তারা ক্রমান্বয়ে একেবারেই সংখ্যাগুরুর চালচলন ও জীবনধারা রপ্ত করে ফেলবে।

উল্লিখিত চারটি কাজ এত গুরুত্বপূর্ণ যে, তার ওপর ভারতে ইসলামের এবং স্বয়ং আপনাদেরও ভবিষ্যত নির্ভরশীল। তাই আপনাদেরকে আপনাদের যাবতীয় উপায়-উপকরণ কর্মশক্তি ও চিন্তাশক্তিকে এ কাজে নিয়োজিত করতে হবে। কেননা এ প্রাথমিক কর্মসূচীকে অনেকাংশে বাস্তবায়িত না করে আপনাদের পক্ষে পরবর্তী কোন কর্মসূচী তৈরী করা সম্ভব হবে না। এখন এমন সময় সমাগত যে, এর একটি মুহূর্তও যদি আপনারা গড়িমসি করে নষ্ট করেন তবে তা হবে অপরাধ। বিগত দশ বছর ধরে আমি যে ঝড়ের সংকেত দিয়ে এসেছি, তা এখন ঘনিয়ে এসেছে। এখন আপনারা যদি এটা সামাল দেয়ার কথা না ভাবেন, তবে তা সকল মুসলমানদের সাথে সাথে আপনাদেরকেও ডুবিয়ে মারবে। এখন যে পরিস্থিতির উদ্ভব এখানে অত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে, তা আপনাদের ধৈর্য, সংকল্প, অবিচলতা, বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা এবং কর্মক্ষমতার কঠিন পরিক্ষা নিয়ে ছাড়বে। আপনাদের সামনে এক দিকে দাজ্জালের বেহেস্ত থাকবে। সে বেহেস্তে ঢুকতে হলে এবং উন্নততর মর্যাদায় আসীন হতে হলে মানুষকে ইসলামী চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও ইসলামী সভ্রমবোধ এমনভাবে বিসর্জন দিতে হবে যে, প্রখরতম ঘ্রাণ শক্তি সম্পন্ন একজন মানুষ যেন তার গন্ধও অনুভব করতে না পারে। আপনারা দেখতে পাবেন যে, আপনাদের আশ পাশের বহু মুসলমান পার্থিব মুক্তি লাভের খাতিরে এ শর্ত পূরণ করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। আপনাদের অপর দিকে হাতুড়ি ও কাস্তের ঝান্ডা ওড়ানো হবে এবং সেই ঝান্ডার নীচে অপর এক শাদ্দাদের বেহেশতের কল্পিত চিত্র তুলে ধরা হবে। এ বেহেস্তের প্রেমিকদের কাছ থেকে আল্লাহর আনুগত্য, ধার্মিকতা ও নৈতিকতার বালাই মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেলার শপথ আদায় করা হবে। ক্ষুধার্ত মুসলমান ও অমুসলিমদের এক বিরাট দল এর দিকে ছুটে আসছে, এটাও আপনারা দিব্য চোখে দেখতে পাবেন। এ দুই মিথ্যা বেহেস্তের মাঝখানে আপনি নিজেকে এমন এক জায়গায় দন্ডায়মান দেখতে পাবেন, যেখানে ইসলামের ওপর অটল থাকা এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত লোকদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি তো দূরের কথা, তাদের জীবন ধারণের উপকরণ অর্জন করাও দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। প্রতি পদে পদে তাদের মনোবল ভাঙ্গার মত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। তাদের ইসলামী সভ্রমবোধ ও আত্মমর্যাদা প্রতি মুহূর্তে বিপন্ন হবার উপক্রম হবে। ইসলামী কৃষ্টি, মূল্যবোধ ও রীতিনীতি তাদের চোখের সামনেই শুধু যে বিলুপ্ত হবে তাই নয় বরং প্রকাশ্যে তার অবমাননাও হবে। এমনকি এ

অবমাননা স্বয়ং মুসলমানাদের হাতে সংঘটিত হওয়াও বিচিত্র নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ইসলামী বিপ্লবের জন্য কাজ করা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব হবে, যারা অসাধারণ ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু, সর্বোচ্চমানের কারিৎকর্মা এবং দক্ষ কুশলী ও বিচক্ষণ প্রজ্ঞাবান হবে। এ তিনটে বৈশিষ্ট্য যদি আপনারা আয়ত্ব করতে পারেন তবে আমি আপনাদেরকে নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারি যে, ইনশাআল্লাহ আসন্ন ঝড়ের গতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে খুব বেশী বিলম্ব হবেনা।

(তরজুমানুল কুরআন, জুন, ১৯৪৭)

জামায়াতে ইসলামী এবং সীমান্ত প্রদেশের গণভোট

প্রশ্ন : আপনার জানা রয়েছে, সীমান্ত প্রদেশে এ প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যে, ভারত বিভাগের পর এ প্রদেশের লোকেরা নিজেদের প্রদেশকে ভারতের সংগে শামিল করতে চায় নাকি পাকিস্তানের সংগে? জামায়াতে ইসলামীর ওপর আস্থা রাখে এমন লোকেরা জানতে চায়, তারা এ গণভোটে অংশ নেবে কিনা এবং নিলে তাদের রায় তারা কোন্ দিকে দেবে? কিছু লোকের মত হচ্ছে, এ গণভোটেও আমাদের পলিসি সেরকমই নিরপেক্ষ হওয়া উচিত যে রকম নিরপেক্ষ ছিলো বিগত পার্লামেন্ট নির্বাচনে। এমনটি না করে আমরা যদি পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিই তবে আপনা-আপনি এ ভোট ঐ রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষেই গণ্য হবে, যে ব্যবস্থার ওপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হতেযাচ্ছে।

জবাব : গণভোটের বিষয়টা নীতিগতভাবেই পার্লামেন্ট নির্বাচন থেকে ভিন্ন ধরনের। গণভোটের মাধ্যমে তো কেবল এ বিষয়টিরই মতামত নেয়া হচ্ছে যে, তোমরা কোন্ দেশের সাথে সম্পর্কিত থাকতে চাও? ভারতের সাথে নাকি পাকিস্তানের সাথে? এ বিষয়ে মত প্রকাশ করা সম্পূর্ণ বৈধ। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এতে কোন আপত্তি নেই। সুতরাং যেসব অঞ্চলে গণভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেসব অঞ্চলের জামায়াত সদস্যদের নিজেদের মতামত প্রদানের অনুমতি রয়েছে।

বাকী থাকলো কোন্ দিকে মতামত দেয়া হবে এ প্রশ্ন। এ বিষয়ে জামায়াতের পক্ষ থেকে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যেতে পারে না। কারণ, জামায়াত তার রুকনদের ওপর কেবল ঐসব বিষয়েই বাধ্যবাধকতা আরোপ করে থাকে যেগুলো জামায়াতের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সংগে সম্পর্কিত। আর এ বিষয়টি আদর্শিকও নয় এবং উদ্দেশ্যের সাথেও সম্পর্কিত নয়। তাই এ বিষয়ে নিজেদের মন যেটাকে সঠিক বলে, সেদিকে মত প্রকাশ করার অধিকার জামায়াত সদস্যদের রয়েছে। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমি এটা বলতে পারি যে, আমি নিজে যদি সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী হতাম, তবে এই গণভোটে আমার রায় পাকিস্তানের পক্ষেই পড়তো। কারণ যেহেতু ভারতবর্ষ হিন্দু এবং মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে বিভক্ত হচ্ছে, তখন যেসব অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব অঞ্চলকে অবশ্যই মুসলিম জাতীয়তার অংশেই শামিল হওয়া উচিত।

ভবিষ্যতে এখানে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়া সে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে ভোট দেয়ার সমার্থক নয়। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেই ব্যবস্থা যদি সত্যিই ইসলামী হয়, তবে আমরা মনে প্রাণে তার শুভাকাংখী হবো, আর যদি অনৈসলামী ব্যবস্থা হয়, তবে তা পরিবর্তন করে ইসলামী আদর্শের ছাঁচে গড়ার জন্যে আমরা সে রকমই চেষ্টা–সংগ্রাম চালিয়ে যাবো, যেমনটি করছি বর্তমান ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্যে।

(অর্ধ সাপ্তাহিক কওসার, ৫ জুলাই, ১৯৪৭ ইং)

ভারত বিভক্তি জনিত পরিস্থিতির পর্যালোচনা

বিগত বছর আমরা যে ভয়াবহ বিপ্লব প্রত্যক্ষ করলাম, তা আমাদের দেশে[১] অথবা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সংঘটিত যে কোন বিপ্লবকে ম্লান করে দিয়েছে। হয়তো ইতিপূর্বে কোথাও আরো বিশাল এলাকা জুড়ে ব্যাপক গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। এর চেয়েও অনেক বড় জনগোষ্ঠীকে আপন পৈতৃক ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও থাকতে পারে। তবে মানুষের সাথে মানুষ কখনো কোথাও এত ব্যাপকভাবে এমন নিষ্ঠুর হিংস্রতা এবং এমন নির্লজ্জ পাশবিক আচরণ করেছে বলে মনে হয় না। জাতিতে জাতিতে অনেক শত্রুতা হয়েছে। দেশে দেশে অনেক গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু সম্ভবত দুনিয়ার কোথাও দুটো জাতির মধ্যে শত্রুতা কখনো এত প্রচন্ড, এত তিক্ত ও এত নৃশংস রূপ ধারণ করেনি। মানুষে মানুষে যুদ্ধ–বিগ্রহ বহুবার হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধে যে ইতরামী ও পৈশাচিকতার পরিচয় এখানে দেয়া হয়েছে তা এক কথায় নজিরবিহীন। মানুষরূপী পশুরা এখানে এমন সব অপকর্ম করেছে যে, কুকুর ও বাঘদের ওপর সে সব অপকর্মের দোষ চাপানো হলে তারাও তাতে অপমান বোধ করবে। এ সব অপকর্মের হোতা যে কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন দুর্বৃত্ত ছিল তা নয়, বরং পুরো এক একটা জাতি নিজেকে দুবৃত্ত ও গুন্ডা বলে প্রমাণিত করেছে। প্রতিষ্ঠিত সরকারসমূহ গুন্ডামীতে লিপ্ত হয়েছে। বড় বড় নেতা, সরদার ও মন্ত্রী পর্যন্ত গুন্ডামীর চক্রান্ত এঁটেছে এবং সরকারের গোটা প্রশাসন স্বীয় ম্যাজিস্ট্রেটবর্গ, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মাধ্যমে সেই চক্রান্ত বাস্তবায়িত করেছে। আমরা

১· অর্থাৎ বিভাগ পূর্বকালের যুক্ত ভারত।

যে দেশে বাস করি, তার অধিবাসীদের নৈতিক অধোপতন যে এমন নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌঁছেছে, সে কথা দু'বছর আগেও ছিল আমাদের কল্পনাতীত। ভদ্র বেশভূষা, উচ্চতর শিক্ষা ও বড় বড় খ্যাতির আড়ালে যে ব্যক্তিত্বগুলো লুকিয়েছিল আমরা তাদেরকে অভিজাত লোক মনে করতাম। সাধারণ অধিবাসীদের শান্তশিষ্ঠ চালচলন দেখে আমরা মনে করতাম এটা বড় ভাল মানুষের দেশ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বাস্তব ঘটনাবলী আমাদের সে সব উচ্চ ধারণাকে নস্যাত করে দিয়েছে। জানা গেল যে, আমরা যে সভ্যশান্ত পরিবেশটা দেখতে পাচ্ছিলাম, সেটা ছিল ইংরেজদের সঙ্গীনেরই কীর্তি। সেই সঙ্গীন অপসারিত হওয়া মাত্রই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ দেশ লক্ষ্য কোটি দস্যু, লুটেরা, খুনী, লম্পট ও নরপিশাচ জুলুমবাজদেরই দেশ।

শুধু কি একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা হিসেবেই এত সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে? বিগত ৩০ বছর যাবত যাঁরা এ দেশে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন এবং যাদের নেতৃত্বে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, তারা একে আকস্মিক দুর্ঘটনা বলেই চালিয়ে দিতে চাইছেন। তারা এ মহাবিপর্যয়ের কারণ পর্যালোচনাকে এ কথা সে কথা দিয়ে ধামাচাপা দিতে চান। তারা এর একটা কবিসুলভ ব্যাখ্যা আমাদের সামনে তুলে ধরে বলেন যে, এ হত্যাকান্ড ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর এই যুলুম-নির্যাতন কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় এবং এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করারও কোন কারণ নেই। বরং এটা হলো একটা স্বাধীন জাতির প্রসব বেদনা, যা এরূপ পরিস্থিতিতে সচরাচর হয়েই থাকে।[১] আসলে এটা যদি প্রসব বেদনাই হয়ে থাকে তবে বলতেই হবে যে, এর মাধ্যমে দুনিয়াবাসীকে একটি হিংস্র জন্তুর জন্মের সুসংবাদই দেয়া হচ্ছিল--কোন মানব শিশুর নয়। এভাবে দুনিয়ার মানুষকে যে খবরটি জানানো হলো, তা একটি মানবগোষ্ঠীর গোলামীর জিঞ্জির ভাঙ্গার খবর ছিল না, বরং তা ছিল একদল নরখাদক হায়েনার পিঞ্জর খুলে বেরিয়ে আসার বিজ্ঞপ্তি। এরপর অনিবার্যভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, ভারতের অধিবাসীরা কি জন্মগতভাবেই এবং আপন স্বভাবপ্রকৃতির দিক দিয়েই নীচ প্রবৃত্তি, দুষ্কৃতকারী ও খুনী, না তাদেরকে এ রকম বানিয়ে দেয়া হয়েছে? যদি ধরে নেই যে, তারা জন্মগত এবং স্বভাবগতভাবেই খারাপ, তা হলে সেটা সত্য সাব্যস্ত করার জন্য গত দু'বছরের ঘটনাবলীর চেয়ে অকাট্য প্রমাণ প্রয়োজন। কারণ ভারতের জনগণের বিগত শত শত

---

১. পন্ডিত নেহেরু একে Birth Pangs (প্রসব বেদনা) নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। (নতুন)

বছরের ইতিহাস রয়েছে। অতীতে তারা কখনো এমন জঘন্য চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন বলে জানা যায় না। সুতরাং তাদের জন্মগতভাবে খারাপ হওয়ার প্রমাণ যখন নেই, তখন দ্বিতীয় কথাটাই স্বতসিদ্ধভাবে সত্য প্রমাণিত। অর্থাৎ আমাদের দেশবাসীকে এ নৈতিক অধোপতনের আবর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আর এ অকাট্য সত্যকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য বিগত মর্মান্তিক ঘটনাবলীর কারণ অনুসন্ধানের ব্যাপারটা এ কথা সে কথা বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। কেননা এ তথ্যানুসন্ধান দ্বারা আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সমূহকে গত সিকি শতাব্দী ধরে যারা নেতৃত্ব দিয়েছে, তাদের মুখে কালিমা লেপন করা হয়।

ভারতে রাজনীতি সচেতনতার উন্মেষ ঘটে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির আওতাধীন। এ শিক্ষা ও সংস্কৃতি আমাদের চিন্তাশীল ও কর্মতৎপর লোকদেরকে দু'টো জিনিস উপহার দিয়েছে। একটি হলো জাতীয়তার অনুভূতি ও জাতীয়তাবাদী আবেগ, আর দ্বিতীয়টি হলো, বস্তুবাদী চরিত্র।

প্রথম জিনিসটি নিয়ে এখানকার রাজনৈতিক নেতারা "ভারতীয় জাতীয়তা" নামক একটা কৃত্রিম কল্পসূত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা চালালেন। কিন্তু যেহেতু এর কোন সত্যিকার ভিত্তি ছিল না। তাই জাতীয়তার অনুভূতি জাগানোর যতই চেষ্টা করা হতে লাগলো, তার ফল দাঁড়ালো এই যে, প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তার স্বাভাবিক উপাদান যে সম্প্রদায়গুলোর ছিল, তাদের মাধ্যে ক্রমেই জাতীয়তার চেতনার সঞ্চার হতে লাগলো। এভাবে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে জাতীয়তার প্রচার চলতে থাকায় এ দেশে একটার পরিবর্তে অনেকগুলি ছোট বড় জাতিসত্তার উদ্ভব হলো। তন্মধ্যে হিন্দু জাতি, মুসলিম জাতি ও শিখ জাতি তো পুরোপুরিভাবে সক্রিয় হয়ে নিজ নিজ খেলা দেখিয়েছে। এ ছাড়া আরো অনেক প্রাদেশিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা এখনো জন্মগ্রহণের পথে রয়েছে। সেই সাথে রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ব করার জন্য বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছিল। এ সংগ্রাম যত অগ্রগতি লাভ করতে লাগলো, ঐ সব ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ক্রমেই তীব্রতর ও তিক্ততর হতে লাগলো। এ দ্বন্দ্বের ফলে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা উজ্জীবিত হলো। একটির পক্ষ থেকে অপরটির জাতীয় আশা আকাংখ্যার প্রতিরোধ যতই বৃদ্ধি পেতে লাগলো,

ততই তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক রেষারেষী ও শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো।

অপর দিকে বস্তুতান্ত্রিক চরিত্রের যে সবক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে নেয়া হয়েছিল, তা পাগলা কুকুরের বিষের মত সারা দেশের ধমনীতে ধমনীতে ছড়িয়ে পড়লো। এর ফলে মানুষের মন থেকে আল্লাহভীতি ও সদাচার বিদায় নিল, মানবতা ও মহত্ত্বের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গেল এবং এ দেশের মানুষ সুপ্রাচীন কালের ধর্মমত থেকে যেসব নৈতিক মূল্যবোধ লাভ করেছিল, তা খতম হয়ে গেল। এরপর যে নতুন চরিত্র গড়ে উঠলো, তারই অবদান এই যে, বিগত ২৫ বছরে হিন্দু মুসলমান ও শিখদের সাম্প্রদায়িক বিরোধ দিন দিন পৈশাচিক নৃশংসতার রূপ ধারণ করেছে। বড় বড় নেতারা চরম নির্লজ্জতার সাথে বেঈমানী ও স্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। বড় বড় দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলো সত্য ও ন্যায়নীতির কোন তোয়াক্কা না করে পরস্পরের বিরুদ্ধে যোগসাজশে লিপ্ত হয়েছে। সমগ্র দেশের পত্র-পত্রিকা লজ্জার মাথা খেয়ে মিথ্যা প্রচারনা চালিয়েছে, গালিগালাজের সয়লাব বইয়ে দিয়েছে এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষের সুরা পান করিয়ে নিজ নিজ সম্প্রদায়কে মাতাল করে ছেড়েছে। সেই সাথে পরস্পর বিরোধী উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা সরকারী অফিস আদালতে, বাজারে ও জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রে একে অপরের বিরুদ্ধে নগ্ন অবিচার চালিয়েছে ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তারা বৈরী সম্প্রদায়ের যে কোন ব্যক্তির সাথে বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতাকে পুন্যের কাজ বলে বিবেচনা করেছে। ঘটনাবলীর এ গতিধারা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছিল এ দেশের নৈতিক অধোপতনের কিরূপ শোচনীয় ও মর্মান্তিক দশা হতে যাচ্ছে।

যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে, তা এ সব উপকরণের একত্র সমাবেশেরই ভয়ংকর পরিণতি। যারা এ সময়ে তখনকার বিভিন্ন জাতির নেতা ও পথিকৃত ছিলেন, তারা এর দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। তারা এক দিকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে পৃথক জাতীয় স্বার্থের চেতনা জাগিয়ে তুলেছেন, অপর দিকে, জাতীয় চরিত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেননি। বরং সত্য কথা এই যে, একে তাঁরা আরো নিকৃষ্টতর স্তরে নামিয়ে এনেছেন এবং এই নেমে যাওয়ার ব্যাপারে তারা আরো উৎসাহ যুগিয়েছেন। এ খেলার কি ফল দাঁড়াতে পারে তা যদি তারা না বুঝে থাকেন তা হলে বলতেই হয় যে, তাঁরা চরম নির্বোধ

ছিলেন। এমন নির্বোধ লোকদেরকে কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেয়া কিছুতেই সমিচীন হতে পারে না। আর যদি তারা জেনে শুনে এই ছিনিমিনি খেলায় লিপ্ত হয়ে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে, তারা প্রকৃতপক্ষে শুধু মানবতার দুশমনই নয়, বরং নিজ নিজ সম্প্রদায়েরও দুশমন ছিল। তাদের উপযুক্ত স্থান নেতৃত্বের গদি নয়, বরং আদালতের কাঠগড়া এবং সেখানে তাদের সমুচিত বিচার হওয়া উচিত।

এরূপ ধারণা করা চরম আহম্মকী ছাড়া কিছু নয় যে, যা ঘটে গেছে তা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব–সংঘাতের শেষ অধ্যায়। এখন দেশ ভাগাভাগির পর ইতিহাস সঠিক পথ ধরে এগুবে, কক্ষণো নয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের বিভক্তি থেকে এখানে যে দু'টো দেশের সৃষ্টি হয়েছে, তা বিভাগপূর্ব ভারতের ধমনীতে ধমনীতে সাম্প্রদায়িক স্বার্থপরতা ও নৈতিক অধোপতনের যে বিষ ছড়িয়ে পড়েছিল, সে বিষ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। আর যে মর্মান্তিক অবস্থার মধ্য দিয়ে এ দু'টি দেশের জন্ম হয়েছে, তা দেশ দু'টির ভবিষ্যত ইতিহাসকে প্রভাবিত না করে পারে না। নতুন রাজনৈতিক সীমারেখার এপারে ওপারে যে দু'টো জাতি বসবাস করছে, তাদের মন পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও জিঘাংসার তিক্ততম আবেগে ভারাক্রান্ত। বিশেষত শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে এমন বৈরীতার উদ্ভব হয়েছে, যা সম্ভবত বর্তমানে দুনিয়ার কোথাও দু' জাতির মধ্যে বিরাজমান নেই। হিন্দু–মুসলমান ও শিখরা একে অপরকে এমন আঘাত দিয়েছে, যার বেদনায় তারা দীর্ঘকাল ব্যাপী কাতরাতে থাকবে। আর এখনতো তারা কোন বিজাতীর শাসনাধীন অসহায় নয়। তারা এখন স্বাধীন দেশের অধিবাসী। এখনও যদি এ উভয় দেশের অধিবাসীদের সম্বিৎ ফিরে না আসে, এখনও যদি তাদের নেতৃত্বের রদবদল না হয় এবং এ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও যদি তাদের কার্যকলাপ আগেকার সেই গোঁড়া ও নোংরা জাতীয়তাবাদ এবং সেই বস্তুবাদী চরিত্র নিয়েই চলতে থাকে, তা হলে আগামীতে স্বাধীন জাতিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অধিকতর ব্যাপক আকারে বহুগুণ বেশী তিক্ত ফল ফলাবে। আগে যে গালিগালাজ পত্র পত্রিকায় সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তা স্থান পাবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে। আগে যে ছোট ছোট সংঘর্ষ বাজারে ও অফিস আদালতে সংঘটিত হতো, এখন তা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক দড়ি টানাটানি ও অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপ নেবে। আর আল্লাহ না করুন, যদি দু' জাতির মধ্যে কখনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে বসে, তা হলে তা নিশ্চিতভাবে

এমন প্রাতিহিংসাপূর্ণ যুদ্ধ হবে, যা নৃশংসতা ও বর্বরতায় মানব ইতিহাসের বিভৎসতম যুদ্ধগুলোকেও ম্লান করে দেবে।

সুতরাং এখন পাকিস্তান ও ভারতের উভয়ের ভবিষ্যতের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে উভয়ের অধিবাসীদের মধ্যে যদি ভদ্র, সুবোধ ও আল্লাহভীরু কেউ থেকে থাকে তবে তাদেরকে সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ হয়ে ময়দানে নামতে হবে, নিজ নিজ জাতির মানসিকতাকে বদলাবার চেষ্টা করতে হবে এবং বর্তমান নেতৃত্বে রদবদল ঘটিয়ে উভয় দেশকে এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যেন উভয়ের সম্পর্ক ভদ্রজনোচিত প্রতিবেশীত্ব ও ন্যায়সঙ্গত সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এবার গত বছর অভিনিত দেশ বিভাগের নাটকটির ওপর একটা নজর বুলিয়ে নিন, যাতে দক্ষ রাজনীতিবিদ হিসেবে খ্যাত নেতাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দৌড় কতদূর, তা বুঝতে পারেন।

এ নাটকের আসল নায়ক ছিল তিনজন--ইংরেজ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। এ তিন নায়কের ভূমিকা পর্যালোচনা করে আমাদের দেখতে হবে যে, তারা নিজেদেরকে কি সাব্যস্ত করেছে।

ইংরেজদের সামনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে উদ্ভুত সমস্যাবলী এবং ভারতের রাজনৈতিক জাগরণের দরুন যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল তা ছিল এই যে, এ দেশের ওপর কি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেদের স্বৈরাচারমূলক আধিপত্য বজায় রাখা হবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বল প্রয়োগে বিতাড়িত হওয়ার ভাগ্য বরণ করে নিতেও প্রস্তুত থাকা হবে, না তার আগেই পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে পাততাড়ি গুটানো হবে? প্রথমটা গ্রহণ করলে তারা আরো কয়েক বছর ভারতে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারতো। কিন্তু এ সাময়িক লাভের একটা স্থায়ী ক্ষতি অনিবার্য ছিল। সে ক্ষতি এই যে, ভারত থেকে তাদের যে স্বার্থ উদ্ধার করা সম্ভব ছিল, সেটা জবরদস্তি বহিষ্কৃত হলে চিরতরে হাত ছাড়া হয়ে যেত। দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বনে বাহ্যত বৃটিশ সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটা অবশ্যম্ভাবী হলেও পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারত থেকে নানা রকমের স্বার্থ উদ্ধারের সম্ভাবনা অটুট থাকতো। এ দু' পন্থার লাভ ও ক্ষতির তুলনামূলক বিচার- বিবেচনা করে ইংরেজ জাতি ঠাণ্ডা মাথায় দ্বিতীয় পন্থাটাই অবলম্বন করলো। তবে এই সাথে তারা ইতিহাসের ও মনস্তত্বের এ শিক্ষা সম্পর্কেও সচেতন ছিল যে, যে জাতি অন্য জাতির গোলামী থেকে মুক্তি পায়, সে জাতির মনে দীর্ঘকাল ব্যাপী অত্যাচার ও বল প্রয়োগে শাসনকারী জাতির

বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে থাকে। এ জন্য তারা আপন স্বার্থের তাগিদেই ভারতের সমস্যা এমনভাবে মিটিয়ে ফেলা জরুরী মনে করছিল, যাতে তাদের বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার আক্রোশ ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত না হয়ে খোদ্ ভারতীয়দের মধ্যেই পরস্পরের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং ইংরেজ জাতি এ সংঘাতমুখর উভয় ভারতীয় জাতির ঘনিষ্ট বন্ধু থেকে যায়। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বৃটিশ সরকার প্রথমে লর্ড ওয়েভেলকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু নিজের মাত্রাতিরিক্ত ভদ্র স্বভাবের কারণেই হোক অথবা অপেক্ষাকৃত কম চতুরতার কারণেই হোক, এ ব্যক্তিটি মানবেতিহাসের সেই জঘন্যতম রাজনৈতিক দুষ্কর্মটি করতে পারেননি, যা তার স্বজাতীয় সরকার তাকে দিয়ে করানোর পরিকল্পনা করেছিল। তাই অবশেষে তাদের নজর পড়লো লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের ওপর এবং তাকেই এ অপকর্ম করানোর জন্য মনোনীত করলো।[১] এ ব্যক্তি বড়লাট হয়ে ভারত বিভাগের নীলনকশাটা এমনভাবে তৈরী করলো, যাতে করে পরবর্তীকালে সংঘটিত ঘটনাবলী অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়।[২] কোলকাতা, নোয়াখালী, বিহার, গড়মিক্তোশোর, রাওয়ালপিণ্ডি ও অমৃতসরের দাঙ্গার পর দেশ বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের যে প্রক্রিয়া মাউন্ট ব্যাটেন অবলম্বন করলো, তা দেখে একজন মামুলী বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অধিকারী লোকও ধারণা

১· এ ব্যক্তিটি কি ধরনের চরিত্রের অধিকারী ছিল, তা নিম্নলিখিত ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যায়ঃ "লন্ডন, ১৮ই নভেম্বর বৃটিশ ভারতের শেষ বড়লাট এবং বৃটেনের রাণীর স্বামী প্রিন্স ফিলিপের চাচা লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে (পূর্ব বৃটেনের) কেন্টে অবস্থিত স্বীয় খামার থেকে পানি মিশ্রিত দুধ বিক্রির দায়ে আদালত আজ ২০ পাউন্ড জরিমানা করেছে। (পাকিস্তান টাইমস, ২০ নভেম্বর, ১৯৭২) (নুতন)

২· এখানে বিষয়টির নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্দি করার জন্য কিছু ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলীর কমন্স সভায় প্রদত্ত ভাষণে বৃটেনের পক্ষ থেকে ভারতবাসীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সর্বশেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল ১লা জুন ১৯৪৮। রক্ষণশীল দল এতে আপত্তি তোলে যে, এত বড় পরিবর্তনকে কার্যকর করার ব্যবস্থা নিতে ১৫ মাস সময় যথেষ্ট নয়। কিন্তু ২২শে মার্চ, ১৯৪৭ তারিখে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। তিনি মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ ভারত বিভাগের রূপরেখা প্রণয়ন সম্পন্ন করেন। (পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামকে দ্বিখন্ডিত করাসহ) অতপর বৃটিশ সরকারের মঞ্জুরী নিয়ে ৩রা জুন, ১৯৪৭ তারিখে ঘোষণা করে দেন যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট নাগাদ ভারতকে দ্বিখন্ডিত করে দু'টো স্বাধীন দেশ গঠনের ঘোষণা দেয়া হবে। এর অর্থ হলো, যে কাজের জন্য ১৫ মাস সময়কেও যথেষ্ট মনে করা হয়নি, সে কাজ কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই মাত্র ৭২ দিনে সম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো। স্পষ্টতই এটা ছিল একটা ইচ্ছাকৃত দুরভিসন্ধি এবং অরাজকতার মধ্য দিয়ে বিভক্তি সম্পন্ন করে গোটা দেশকে রক্ত রঞ্জিত করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। (নতুন)

করতে সক্ষম ছিল যে, এর ফলে দেশের একটি বিরাট অংশে, ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা সংঘটিত হওয়া অবধারিত। এখন এটা যদি মাউন্ট ব্যাটেনের নির্বুদ্ধিতা হয়ে থাকে এবং বৃটিশ জাতির সম্মতি প্রাপ্ত পরিকল্পিত দুরভিসন্ধি না হয়ে থাকে, তা হলে এর যে লোমহর্ষক ফলাফল দেখা দিয়েছিল, তা প্রত্যক্ষ করার পর তাকে অভিনন্দিত করার পরিবর্তে তার ওপর অভিসম্পাত নিন্দাবাদ বর্ষিত হওয়ার কথা ছিল এবং লাখ লাখ মানুষের হত্যাকাণ্ড ও কোটি কোটি মানুষের বাড়ীঘর ধ্বংসের অপরাধে তার ওপর প্রকাশ্য আদালতে বিচার অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। অথচ ইংল্যাণ্ডে তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা যেভাবে প্রশংসিত হয়েছে, তা থেকে আকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ সকল কার্যক্রমই ছিল পরিকল্পিত চক্রান্ত এবং এর পেছনে সমগ্র ইংরেজ জাতির সম্মতি ছিল। আজ এ চক্রান্তেরই ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, হিন্দু মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায় একে অপরের রক্ত পিপাসু শত্রুতে পরিণত হয়েছে। আর যে ইংরেজ কাল পর্যন্তও এ তিন জাতির ওপর সমভাবে নির্যাতন চালিয়েছে, সে আজ তিনটি জাতিরই অভিন্ন বন্ধু। যেখানে মুসলমানদের জন্য ভারতে এবং হিন্দু ও শিখদের জন্য পাকিস্তানে জীবন অতিষ্ঠ, সেখানে ইংরেজদের জন্য উভয় দেশেই পরম আনন্দে বসবাস করার অবারিত সুযোগ বিদ্যমান। অবশ্য মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে একে যত বড় অপরাধই গণ্য করা হোক না কেন, ইংরেজদের জাতীয় স্বার্থপরতার বিচারে নিসন্দেহে এটা একটা সফলতম কূটকৌশল রূপে গণ্য হবার যোগ্য। কিন্তু এ কাজটার জন্য লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনই বেশী কৃতিত্বের দাবীদার, না দেশ বিভাগের এই রূপরেখা প্রণয়নে বড় লাটের ঘনিষ্ট সহযোগিতা দানকারী হটকারী ভারতীয় রাজনীতিকরা, তা বুঝে ওঠা কঠিন।

এ নাটকের দ্বিতীয় নায়ক ছিল কংগ্রেস। এ নায়ক যে ভূমিকা পালন করেছে, নির্বোধদের কাছ থেকে ছাড়া তার জন্য কোন কৃতিত্ব সে দাবী করতে পারে না। দেশ বিভাগের দু' তিন বছর আগেই স্পষ্ট বুঝা গিয়েছিল যে, এখন ভারতকে দ্বিখন্ডিত করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এরপর দু'টো পথই কেবল খোলা ছিল। একটি এই যে, যে জিনিসটা অবধারিত হয়ে উঠেছে, সেটা তিক্ততা ও অবনিবনা আরো মারাত্মক আকার ধারণ করার আগেই মেনে নেয়া এবং সুসভ্য লোকদের মত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাটার এমন একটা সুরাহা করে নেয়া। যাতে পরবর্তী সময় আবার একত্রিত হওয়া অথবা নিদেন পক্ষে সৎপ্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করার

সুযোগ থাকে। দ্বিতীয় পথ ছিল এই যে, এক পক্ষের "না নিয়ে ছাড়বো না" এবং অপর পক্ষের "কিছুতেই দেব না" বলার মধ্য দিয়ে যে বিরোধ পাকিয়ে উঠেছে, তাকে চূড়ান্ত তিক্ততার পর্যায়ে উপনীত হতে দেয়া এবং অনিবার্য বিভক্তিকে এমন পর্যায়ে গিয়ে গ্রহণ করা, যেখানে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনকারী জাতিদ্বয়ের মধ্যে, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তো দূরের কথা, ভদ্র ও সুসভ্য মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখার সম্ভাবনাও তিরহিত হয়ে যায়। কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ এ দু' পথের মধ্যে দ্বিতীয় পথটাই অবলম্বন করলেন। এর কারণ যদি নির্বুদ্ধিতা হয়ে থাকে, তা হলে যে জাতি এমন নির্বোধ লোকদের হাতে নেতৃত্বের বাগডোর সমর্পণ করে, সে নিসন্দেহে এক হতভাগা জাতি। আর যদি এর কারণ এ হয়ে থাকে যে, এ নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ জাতির মধ্যে আপন জনপ্রিয়তা হারাতে চাননি, তা হলে ব্যাপারটা যে আরো দুঃখজনক তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাঁরা নিজেদের পদমর্যদার খাতিরে দেশকে এমন পথে চালিত করেছে, যে পথে কোটি কোটি স্বদেশবাসীকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা ছাড়া গত্যান্তর থাকে না।

এই সমগ্র নাটকটিতে আপন কার্যক্রম দ্বারা কংগ্রেস স্বীয় শত্রু ও প্রতিপক্ষীয়দের প্রতিটি কথা সত্য এবং নিজের প্রতিটি কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

ভারতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চার্চিল ও অন্যান্য ইংরেজ নেতৃবৃন্দের সবচেয়ে প্রবল যুক্তি ছিল এই যে, আমরা ভারত ত্যাগ করা মাত্রই এ দেশে চরম অরাজকতা ও দাঙ্গাহাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে। কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ এর জবাবে বলতেন যে, নিজেদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী করার মতলবে এটা তোমাদের সাজানো কথা মাত্র। ক্ষমতাকে দেশবাসীর হাতে অর্পণ করে দেখ, কত সুন্দর শান্তি–শৃংখলা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সংঘটিত ঘটনাবলী কোন্ পক্ষের বক্তব্যকে সত্য ও কোন্ পক্ষের বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তা আজ গোটা দুনিয়ার মানুষের কাছে সুস্পষ্ট।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জিন্নাহ সাহেবের সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল এই যে, ওটা আসলে একটা গোঁড়া হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের যে মুখোস সে পরেছে, সেটা নিতান্তই তার ভন্ডামী। কংগ্রেসীরা এ অভিযোগকে ভ্রান্ত বলতো। কিন্তু ক্যাবিনেট মিশনের আগমনের পর থেকে আজ পর্যন্ত কংগ্রেস ও তার নেতারা যে তৎপরতা চালিয়ে আসছে,

তা দ্বারা জিন্নাহ সাহেবের অভিযোগের সত্যতাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। জিন্নাহ সাহেবের কথিত ভন্ডামীর মুখোস কংগ্রেস নিজেই খুলে দূরে নিক্ষেপকরেছে।

কংগ্রেসের বিরোধীরা বলতো যে, কংগ্রেসের যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় তা আসলে হিন্দুরাজ ছাড়া কিছু নয় এবং সে রাজত্বে মুসলমানদের কোন স্বাধীনতাই থাকবে না। এ আশংকার ভিত্তিতেই দেশবিভাগের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল এবং এ আশংকার কারণেই মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কংগ্রেসের পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখতো। কংগ্রেসী নেতারা সব সময় মুসলমানদের এ আশংকাকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিত। কিন্তু সাত চল্লিশের ১৫ই আগষ্টের পর ভারতে যা ঘটেছে এবং এখনো ঘটে চলেছে, তা ঐ আশংকাকে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল সাব্যস্ত করেছে, যার জন্য মুসলমানদের কাছে কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলন তাদের জন্য সর্বনাসা আন্দোলন বলেই মনে হতো। বরঞ্চ, প্রকৃতপক্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মুসলমানদের সাথে যে আচরণ শুরু হয়েছে, তা কংগ্রেসের নিকৃষ্টতম শত্রুরা যা ভাবতে পেরেছিল, তার চেয়েও বহুগুণ বেশীখারাপ।

কংগ্রেস বলতো যে, তারা ভারতের ঐক্যে বিশ্বাসী। দেশ বিভাগকে তারা কেবল মুসলিম লীগ ও বৃটিশ শাসকদের পীড়াপীড়ির কারণেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিচ্ছে। কিন্তু বিভাগের আগে, বিভাগের সময় ও বিভাগের পরে তারা যে কার্যকলাপ চালিয়েছে, তার ফলে এ বিভক্তি চিরস্থায়ী হতে বাধ্য। যদি মানবিক সৌজন্যের মধ্য দিয়ে বিভক্তির ফায়সালা করা হতো, ভদ্রজনোচিতভাবে তা বাস্তবায়িত করা হতো এবং তারপরে ভারতীয় মুসলমানদের সাথে ন্যায়সঙ্গত ও সুবিচার মূলক আচরণ করা হতো, তা হলে হয়তোবা কিছুকাল পরে পাকিস্তান নিজেই ভারতের সাথে পুনরেকত্রিকরণের ইচ্ছা প্রকাশ করতো। কিন্তু এখন পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে এমন দুর্লংঘ্য প্রাচীর গড়ে উঠেছে, যা শত শত বছর পর্যন্ত তাদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করেইরাখবে।

এবার আসুন, এ নাটকের সবচেয়ে ব্যর্থ ও নিষ্ফল অভিনয়কারী তৃতীয় নায়কের ভূমিকা পর্যালোচনা করা যাক। দশ বছর যাবত মুসলমানদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তুরস্কের সুলতান আব্দুল হামিদের অনুরূপ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ

করে চলছিল। দীর্ঘ ৩৩ বছর যাবত তিনি কেবল ইউরোপীয় দেশসমূহের পারস্পরিক বিরোধ ও দ্বন্দ্বকে পুঁজি করে বেঁচে রইলেন। এ সময়ে তিনি নিজের দেশের জন্য এমন কোন শক্তি গড়ে তুললেন না, যার ওপর ভর করে দেশটি টিকে থাকতে পারতো। অনুরূপভাবে ভারতীয় মুসলমানদের নেতৃত্বেও কেবল কংগ্রেস ও ইংরেজদের বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করেই টিকে রয়েছে! পুরো দশ বছরের মধ্যে এ নেতৃত্ব মুসলমানদের নৈতিক, বৈষয়িক ও সাংগঠনিক শক্তি সঞ্চার ও তাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য চরিত্র সৃষ্টির কোন চেষ্টাই করেনি, যার সাহায্যে সে নিজের কোন দাবীকে নিজস্ব শক্তির বলে আদায় করতে সক্ষম হতে পারতো। এর ফলে ইংরেজ ও কংগ্রেসের পারস্পরিক বিরোধ যখনই মিটে গেল, এই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এমন দশা হলো যেন তার পায়ের তলায় মাটি নেই। তাই যে শর্তে যেটুকু দাবী আদায় হয়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে সে বাধ্য হয়ে গেল। বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভক্তি তাকে নির্বিবাদে মেনে নিতে হলো। সীমান্ত চিহ্নিত করার মত নাজুক ব্যাপারটা তাকে একটিমাত্র ব্যক্তির ওপর ছেড়ে দিতে হলো। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য যে সময় ও যে পদ্ধতি একতরফাভাবে নির্ধারণ করা হলো, তাও সে নির্দ্বিধায় মেনে নিল। অথচ উক্ত তিনটে ব্যাপারই মুসলমানদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ধ্বংসাত্মক ছিল। এ তিনটে সিদ্ধান্তের কারণেই এক কোটি মুসলমানের ওপর মহাবিপর্যয় নেমে এল এবং এর দরুনই পাকিস্তানের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই অত্যন্ত নড়বড়ে হয়ে পড়লো।

এই নেতৃত্ব অসংখ্য ভুল করেছে। কিন্তু তার মধ্যে কয়েকিট ভুল এত মারত্মক যে, প্রত্যেক সচেতন মানুষ তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে। উদাহরণ স্বরূপঃ

এক ঃ যে সব এলাকাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েই থাকতে হবে, সেখানকার মুসলমানদেরকেও পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত করা হয়েছে। আজকে যে ভারতের মাটি এই নিরীহ মানুষগুলোর জন্য জাহান্নামে পরিণত হয়েছে, সেটা এ ভুলেরই খেসারত। অথচ দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান ও ভারতের মুসলমানদের ভাগ্য যখন ভিন্ন রকমেরই হওয়ার কথা, তখন বিভাগের পূর্বে উভয়ের নীতি একরকম হওয়ার কোন যুক্তি ছিল না।

দুই ঃ দেশ বিভাগের সময় ভারতীয় মুসলমানদের ওপর যে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছিল সে সম্পর্কে তাদেরকে এক সপ্তাহ আগেও সাবধান করা

হয়নি। মুসলিম নেতৃত্ব যদি আসলেই তা ধারণা করতে না পেরে থাকে, তা হলে তার সে উদাসীনতা ও অজ্ঞতা চরম দুঃখজনক। আর যদি সে জেনে শুনেই মুসলমানদেরকে এ সম্পর্কে অজ্ঞ রেখে থাকে, তা হলে এটা তার অমার্জনীয় বিশ্বাসঘাতকতা।

তিন ঃ ভারতীয় মুসলমানরা যেসব নেতার ওপর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অন্ধ আস্থা স্থাপন করে রেখেছিল, তারা মোক্ষম সময়ে তাদেরকে ত্যাগ করে পাকিস্তানে এসে উঠলেন এবং তাদের চলে আসর পর ভারতীয় মুসলমানদের করণীয় কি, সে সম্পর্কে তাদেরকে কিছুই বললেন না।

চার ঃ ভারতীয় মুসলমানদেরকে এরূপ উদ্ভট উপদেশ দেয়া হলো যে, বিগত দশ বছর ধরে তারা যে আদর্শের ভিত্তিতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছে, তা যেন তারা এক রাতের মধ্যেই গিলে খেয়ে ফেলে। অর্থাৎ দ্বিজাতি তত্ত্বের কলেমা আওড়াতে আওড়াতে ১৪ই আগষ্টের সূর্য ডোবা চাই আর ১৫ই আগষ্টের সূর্য ওঠা মাত্রই প্রত্যেক ভারতীয় মুসলমানের ভারতীয় জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত হওয়া চাই।

পাঁচ ঃ বিগত দশ বছর ব্যাপী জাতীয় আন্দোলনের সময় যে পরিমাণে ইসলামের নাম উচ্চারিত হয়েছে, মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী চরিত্র গড়ার জন্য তার ৫০ ভাগের এক ভাগ কাজও করা হয়নি বরঞ্চ তাদের জাতীয় চরিত্রের মান আগের চেয়েও খানিকটা নামিয়ে ফেলা হয়েছে। এ জন্যই জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে কংগ্রেসীরা যেসব নৈতিক অপরাধ সংঘটিত করেছে, মুসলমানরাও তা সমানভাবে করেছে। যুলুমের পরিমাণে যত পার্থক্যই থাকুক, যুলুমের গুণগতমানের বিচারে উভয়ের অবদানে কোনই পার্থক্য ছিল না। আমাদের নেতৃত্ব যদি আমাদের জনগণের নৈতিক প্রশিক্ষণের জন্য কোন চেষ্টা করতো এবং সংখ্যাগুরু এলাকার মুসলমানরা যেসব তৎপরতা চালিয়েছে, তা যদি না চালাতো, তা হলে সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে এত নির্মমভাবে পিষ্ট করা হতো না এবং আজ পাকিস্তানের নৈতিক মর্যাদা ভারতের চেয়ে এত উঁচুতে থাকতো যে, ভারত তার চোখে চোখ রেখে কথাও বলতে সক্ষম হতো না।

(তরজুমানুল কুরআন, জুন, ১৯৪৮)

দেশ বিভাগের সময় মুসলমানদের অবস্থা মূল্যায়ণ

পূর্ববর্তী নিবন্ধে ভারতের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের যে পর্যালোচনা করা হয়েছে, সেটি ছিল তার মাত্র একটি দিক সংক্রান্ত। এতে আমি সামগ্রিকভাবে গোটা দেশের[১] সাম্প্রতিক রক্তঝরা ইতিহাসের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেছিলাম, এ দেশের সাবেক শাসকগণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরস্পরে যোগসাজশ করে, স্বার্থপরতা, গোঁড়ামী ও নির্বুদ্ধিতা দ্বারা দেশটাকে কি বিপজ্জনক পথে এনে দাঁড় করিয়েছে এবং তা থেকেই উদ্ধার পাওয়ার উপায় কি। আজ আমি এর দ্বিতীয় দিকটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এই পট পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে মুসলিম জাতি, তার বর্তমান অবস্থা কি, এ অবস্থার কারণ কি এবং কি উপায়ে তাকে এ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব?

দশ এগারো বছর আগের কথা। ভারতের সাতটি প্রদেশে আকস্মিকভাবে কংগ্রেসকে ক্ষমতাসীন হতে দেখে এবং পন্ডিত নেহরুর মুখ থেকে মুসলিম জনগণের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের (Muslim Mass Contact) কর্মসূচীর ঘোষণা শুনে মুসলমানরা সর্বপ্রথম বুঝতে পারলো যে, এ দেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদের আধিপত্য তাদের জন্য সত্যি সত্যি এক মহা আপদ এবং এ আপদ এখন একেবারে ঘাড়ের ওপর আপতিত। সে সময় মুসলমানদের মধ্যে দু'টো গোষ্ঠী বিরাজমান ছিল। এক গোষ্ঠী বলতো যে,

---

১. অর্থাৎ অবিভক্ত ভারতের। (নতুন)

আপদ টাপদ কিছু না। সবই তোমাদের কল্পনা এবং ইংরেজদের ভীতি প্রদর্শন থেকে উদ্ভূত। যে সয়লাব আসছে, আসুক। নির্দ্বিধায় ওতে ঝাপিয়ে পড় এবং যে দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, অকুণ্ঠচিত্তে ভেসে যাও। অপর গোষ্ঠী বলতো যে, এটা সত্যই মহাবিপদ। এ সয়লাব শুধু স্বাধীনতার সয়লাব নয়, বরং হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের সয়লাব। নিজেকে এ সয়লাবের কাছে সপে দেয়া জাতীয় আত্মহত্যার নামান্তর এবং এ থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্যই করা উচিত। প্রথম গোষ্ঠী বড় বড় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও ঝানু রাজনীতিবিদদের সমষ্টি ছিল। কিন্তু যেহেতু তাদের কথাবার্তা মুসলমানদের সাধারণ অনুভূতির পরিপন্থী ছিল এবং গোটা জাতি ভারতের প্রতিটি অঞ্চলে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছিল, তাই মুসলমানরা সামগ্রিকভাবে তাদের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং দলে দলে দ্বিতীয় গোষ্ঠীর ডাকে সাড়া দিতে লাগলো।

অতপর দ্বিতীয় গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে এ ব্যাপারে মতান্তর দেখা দিল যে, হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের এ ক্রমবর্ধমান হুমকির প্রতিরোধে মুসলমানদের কি কর্মপন্থা অবলম্বন করা উচিত।

একটি অভিমত এই ছিল যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ দ্বারা হিন্দু আধিপত্যবাদী আন্দোলন প্রতিরোধের চেষ্টা করা নীতিগতভাবেও ভ্রান্ত, বাস্তবেও নিষ্ফল। নীতিগতভাবে ভ্রান্ত এ জন্য যে, মুসলমান হিসেবে আমরা ইসলামের যে মূলনীতিগুলোতে বিশ্বাস রাখার দাবীদার এ নীতিগুলো তার সাথে সংঘর্ষশীল। আর বাস্তবে এ কর্মপন্থা শুধু নিষ্ফল নয়, অনিবার্যভাবে ধ্বংসাত্মকও--এ জন্য যে, ভারতের একটি ক্ষুদ্র এলাকা ছাড়া বাদবাকী সারা দেশেই মুসলমানরা সংখ্যালঘু। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম দ্বারা একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী নিজের ধ্বংস ছাড়া আর কিছু অর্জন করতে পারে না। এ অভিমত যারা পোষণ করতো, তারা মুসলিম জনগণকে বললো যে, তোমরা যদি অন্যান্য জাতির মতই নিছক একটি জাতি হতে তা হলে এখানে জাতীয়তাবাদী লড়াই চালিয়ে নিজেদের যেটুকু প্রাপ্য আদায় করা সম্ভব হয় তা আদায় করা এবং বাকীটুকুর আশা ছেড়ে দেয়া ছাড়া তোমাদের আর কোন গত্যান্তর ছিল না। কিন্তু আসলে তো তোমরা প্রচলিত অর্থে স্রেফ একটা জাতি নও, বরং একটা আদর্শবাদী দল। তোমাদের কাছে রয়েছে ইসলামী আদর্শের এমন জবরদস্ত হাতিয়ার, যা অতীতেও পৃথিবীকে জয়

করেছে, এবং আজও করতে সক্ষম। সুতরাং তোমাদের পক্ষে এ ধরনের হীনমন্যতাপূর্ণ সংগ্রামের পরিকল্পনা করা মোটেই শোভন নয়। তোমাদের জন্য একমাত্র সঠিক কর্মপন্থা এই যে, নিছক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য সংগ্রাম রত একটা সংখ্যালঘু জাতির অবস্থান গ্রহণ করে তোমারা যে ভুল করেছ, তা ত্যাগ করে নিজেদের জীবনের মূল লক্ষ্যে ফিরে এস। কেননা এটা জীবন সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান এবং প্রচলিত সকল জীবন ব্যবস্থার চাইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সুবিচারমূলক জীবন ব্যবস্থা নির্দেশকারী সুমহান দলের অবস্থান। তোমরা যদি এ জিনিসটা নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হও এবং চিন্তা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দিতে পার, আর সেই সাথে নিজেদেরকে চারিত্রিক দিক দিয়েও প্রতিবেশীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বলে প্রমাণ করে দেখাতে পার, তা হলে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখ যে, অচিরেই ভারতে শক্তির ভারসাম্য বদলে যাবে, ভারতের নেতৃত্ব তোমাদের ছাড়া আর কারো করায়ত্ব হবে না, আর তোমাদেরকে আত্মরক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হতে হবে না, বরঞ্চ তোমাদের বিরোধিরাই তোমাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করা যায়, সেই চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠবে।

এ কথাটাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় কুরাইশদেরকে বলতেন। তিনি বলতেন যে, আমি তোমাদের সামনে এমন এক আদর্শ নিয়ে এসেছি, যা তোমরা গ্রহণ করলে আরব অনারব--সকলেই তোমাদের করতলগত হবে। কিন্তু কুরাইশরা এ মহৎ পরামর্শটিতে যে আশংকা অনুভব করেছিল, ভারতের মুসলমানরাও সেই আশংকাই অনুভব করলো। আশংকাটি ছিল এই যে,

إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا

অর্থাৎ আমরা যদি এ পন্থা অবলম্বন করি, তা হলে এ দেশে আমাদের ঠাঁই থাকবে না। সারা ভারতের খুব কম সংখ্যক মুসলমানই এ কর্মপন্থার সম্ভাব্যতা উপলব্ধি করলো এবং তার চেয়েও স্বল্পসংখ্যক লোক এ পথ অবলম্বন করতে প্রস্তুত হলো। ফলে এ অভিমতটি জাতীয় আদর্শে পরিণত হতে পারলো না।

দ্বিতীয় অভিমতটি ছিল এই যে, সমগ্র ভারতের মুসলমানদের এক মঞ্চে সমবেত হয়ে সমস্বরে আওয়াজ তুলতে হবে যে, আমরা একটা আলাদা জাতি, আমাদের ধর্ম ভিন্ন, আমাদের সংস্কৃতি ভিন্ন। আমাদেরকে ও হিন্দুদেরকে একত্র করে সারা ভারতে একটা একক জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা চলবে না। দেশ ভাগ করে দিতে হবে। যেখানে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, সেখানে আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র হবে, আর যেখানে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে, সেখানে তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র হবে।

এ পথটা ছিল সহজ। এতে না ছিল কোন মাথা ঘামানোর প্রয়োজন আর না ছিল নৈতিক সংশোধন ও শৃংখলার কোন প্রশ্ন। আপাত দৃষ্টিতে এতে কোন অস্পষ্টতাও ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে যারা মেধাবী, তারা দীর্ঘ দিন যাবত এমন ধরনের শিক্ষা পেয়ে আসছিল যে, সে হিসাবে এ অভিমতটাই তাদের কাছে সহজবোধ্য ছিল। এ জন্য মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ, বরং বলতে গেলে মুষ্টিমেয় কিছু লোক বাদে গোটা জাতিই এ অভিমত মেনে নিল। এ কেন্দ্রীয় চিন্তাধারায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর থেকে বিগত কয়েক বছরে মুসলমানরা জাতি হিসেবে যা কিছু করেছে, এ চিন্তাধারা উপস্থাপনকারী আন্দোলন ও নেতৃত্বের অধিনেই করেছে। সুতরাং আমাদের নিকট অতীতের ইতিহাসের এবং আমাদের বর্তমান অবস্থার ভালো-মন্দ উভয়ের জন্য এ আন্দোলনইদায়ী।

এ আন্দোলন ছিল একটা জাতীয় আন্দোলন। নামে ও জন্মসূত্রে যারা মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত, তারা সকলেই এতে যোগদান করেছিল। এ আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী আল্লাহ, রসূল, আখেরাত, কিতাব, ওহি, দীন, শরীয়াত প্রভৃতিকে মানে কিনা, হালাল-হারাম বাছবিচার করার পক্ষপাতী কিনা এবং সে দীনদার না বেদীন বা সৎ না অসৎ ইত্যাকার প্রশ্ন এখানে সম্পূর্ণ আবান্তর ছিল। আসল সমস্যা ছিল জাতিকে উদ্ধার করা এবং সে জন্য সমগ্র মুসলিম জাতির সংঘবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য ছিল। যে কাজটি করণীয় ছিল, তাও ফতোয়া দেয়া বা ইমামতি করার কাজ ছিল না যে, ঈমান-আকীদা ও দীনদারীর খোঁজ খবর নিতে হবে। কাজটি ছিল কেবল জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং সে জন্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ তো দূরের কথা, তার নেতৃত্বের ব্যাপারেও এটা অনুসন্ধানের কোন দরকার ছিল না যে, যাদেরকে আমরা সম্মুখে এগিয়ে দিচ্ছি, ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্ক কতটুকু এবং কেমন।

এ আন্দোলন ছিল নিরেট রাজনৈতিক। এতে চরিত্র বা নৈতিকতারও কোন বালাই ছিল না। রাজনৈতিক গাঁটছড়া ও যোগসাজশে যে যত দক্ষতা দেখাতে পেরেছে, সে ততই উচ্চতর দায়িত্বশীল পদের যোগ্য বিবেচিত হয়েছে। এ যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণ দেয়ার পর, তার সততা, সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর অবস্থা কি এবং তার চরিত্র কতখানি নির্ভরযোগ্য, সেটা খোঁজ নেয়ার আদৌ কোন আবশ্যকতা ছিল না।

এ আন্দোলনে যদিও ধর্মের কোন ভূমিকা ছিল না। অবিকল এ ধরনের আন্দোলন এরূপ চরিত্র ও গুণাগুণের অধিকারী নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে দুনিয়ার যে কোন জাতিই চালাতে পারতো। কিন্তু ঘটনাক্রমে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে নিয়োজিত এ জাতিটির ধর্ম ছিল ইসলাম। তাই এ জন্য ইসলামকেও কাজে লাগানো হলো। এরূপ নীতি নির্ধারিত হলো যে, মানুষকে সৎ পথে চালিত করাটা তো আর ইসলামের আয়ত্বাধীন নয়, আর আমাদের কি করা উচিত কি করা উচিত নয়, সেটা বলে দেয়ারও তার কোন অধিকার নেই। তবে আমরা যা কিছুই করবো, তাকে সঠিক বলে সার্টিফিকেট দেয়া, আমাদের প্রত্যেক কাজকে পুন্যের ও সওয়াবের কাজ বলে আশান্বিত করা, আমাদের যে কোন উদ্যোগ বা তৎপরতাকে ইসলামী লেবেলযুক্ত করার জন্য তার কোন না কোন পরিভাষা ব্যবহার করার সুযোগ দেয়া এবং যারা তাতে আমাদের সহযোগিতা করবে না তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখানো ইসলামের অবশ্য কর্তব্য। কেননা আমরা যা কিছুই করবো, তার ওপর মুসলিম জাতির অস্তিত্ব নির্ভরশীল। মুসলিম জাতিই যদি না থাকলো, তবে এ ইসলাম সাহেব থাকবেন কোথায়? বখে যাওয়া জমীদার পুত্র পরিবারের পুরানো নিষ্ঠাবান ভৃত্যকে দিয়ে যেভাবে যথেচ্ছা কাজ আদায় করে থাকে, নামধারী মুসলমানদের এ আন্দোলনে ইসলামকে দিয়ে ঠিক সে ভাবে কাজ আদায় করা হলো। উপদেশ ও পরামর্শ দেয়ার বেলায় তার কোন অধিকার, থাকে না। কেবল বিপদের সময় বুড়ো ভৃত্যকে ডাকা হয় যে, সারা জীবন তো নুন খেলে, এস তার দাম দিয়ে যাও। আর যদি এ নিরীহ বৃদ্ধ বখাটে জমিদার পুত্রের সকল বিপর্যয়ের জন্য দায়ী অপকর্মগুলো সহ্য করতে না পারে এবং অস্থির হয়ে কখনো বলে বসে যে, বড় মিয়া, একটু সামলে চল, চালচলন ভালো কর, অমনি তাকে ধমক দিয়ে বলা হয় যে, ব্যাটা নিজের চর্কায় তেল দে। আমাদের ব্যাপারে নাক গলাস, এত দূর স্পর্ধা তোর কবে থেকে হলো!

আমাদের জাতীয় আন্দোলনের এই ছিল পটভূমি। এভাবেই তা চূড়ান্ত স্তর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে থাকে। মুমিন, মুনাফিক ও প্রকাশ্য নাস্তিক সবই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল । ধর্মীয় দিক দিয়ে যে যত শিথিল ছিল, সে তত উচ্চ মর্যাদা ও প্রতাপের অধিকারী হলো। এতে চরিত্রের কোন প্রশ্নই ছিল না। সাধারণ কর্মী থেকে শুরু করে বড় বড় দায়িত্বশীল নেতাদের মধ্যে পর্যন্ত চরম অনির্ভরযোগ্য চরিত্রের লোক বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে আন্দোলনের যত বিস্তার ঘটতে লাগলো, এ জাতীয় লোকদের আনুপাতিক হার আরো বেড়ে যেতে লাগলো। এতে ইসলামকে অনুসরণের জন্য নয় বরং জনগণের মধ্যে ধর্মীয় জজবা সৃষ্টির জন্য সহযোদ্ধার মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। কখনো একদিনের জন্য ইসলামকে এরূপ মর্যাদা দেয়া হয়নি যে, ইসলাম যা আদেশ দেবে, মুসলমানরা তা মেনে চলবে এবং যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের আগে ইসলামের মতামত নেবে।

আর যেহেতু মোকাবিলাটা ছিল হিন্দুদের সাথে, তাই প্রত্যেক চক্রান্তের জবাব অনুরূপ চক্রান্ত দিয়ে, প্রত্যেক আঘাতের জবাবে পাল্টা আঘাত হেনে এবং প্রত্যেক ফন্দির প্রতিশোধ অনুরূপ ফন্দি দিয়ে নেয়া অপরিহার্য ছিল। হিন্দুরা যত নীচে নামতো, মুসলমানরাও জিদ ও হঠকারিতার বলে ততই নীচে নামতো। হিন্দুরা তাদের জাতীয় স্বার্থের তাগিদে যা কিছু করতে লাগলো, তাদের অজুহাত দেখিয়ে মুসলমানরাও তাই করতে লাগলো। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে মুসলমানদের সাধারণ নৈতিকতার মান এত নীচে নেমে গেল যে, ইতিপূর্বে কখনো তাদের এমন নৈতিক অধোপতন বোধ হয় আর হয়নি।

এ ছিল আমাদের এ বিরাট জাতীয় আন্দোলনের নৈতিক ও ধর্মীয় পটভূমি। এবার আসুন, জাতিকে রক্ষা করার মানসে এ আন্দোলন যে মূল কাজটি করছিল, তার পর্যালোচনা করা যাক।

এ আন্দোলন মুসলমানদের যে জাতীয় দাবী–দাওয়া প্রণয়ন করে, তা ছিল এই যে, হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করা হোক। এ দাবীতে তিনটে বিষয় আপনা থেকেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথমত, ভারতের প্রায় অর্ধেক মুসলমানের হিন্দুদের জাতীয় গোলামে পরিণত হওয়া অবধারিত। দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের জাতীয় রাষ্ট্র দু'টো ছোট ছোট ভূখন্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে। প্রকান্ড হিন্দু রাষ্ট্রের পাশাপাশি এ দুটো ক্ষুদ্র মুসলিম ভূখন্ডের অবস্থা হবে অবিকল রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী পোল্যান্ড ও

চেকোশ্লোভাকিয়ার মত। তৃতীয়ত, এই দু'টো ভূখন্ডের মধ্যে আবার এক হাজার মাইলের হিন্দু এলাকা আড়াল হয়ে থাকবে। ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা যুদ্ধ কিংবা শান্তি---কোন অবস্থাতেই সম্ভব হবে না।[১]

প্রথম দিন থেকেই সবার জানা ছিল যে, হিন্দুরা এ দাবীর কঠোর বিরোধিতা করবে। হিন্দুরা সত্যিই তা করলো এবং এক দিক থেকে দাবী তোলা আর অপর দিক থেকে তার প্রতিরোধের ফলে কয়েক বছরের মধ্যে জাতীয় লড়াই এমন তিক্ত পর্যায়ে উপনীত হলো যে, আজ জার্মানী ও রাশিয়া, আমেরিকা ও জাপান এবং আরব ও ইহুদীদের মধ্যেও বোধকরি এর চেয়ে বেশী তিক্ততা বিরাজ করে না। এ জাতীয় লড়াইতে অনিবার্যভাবে মুসলমানরাই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত ছিল। কেননা তাদের অর্ধেক লোক আমাদের নিজেদের দাবী অনুসারেই হিন্দুদের প্রভুত্বের আওতায় চলে যাচ্ছিল। আর যেহেতু সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকেও এ যুদ্ধে অংশীদার করা হয়েছিল, বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষে তারাই অগ্রণী ছিল, তাই যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এবং দেশ বিভাগের পর তাদের নৃশংসতম যুলুমের শিকার হওয়া অবধারিত ছিল। উত্তর প্রদেশ, বিহার, এবং অন্যান্য ভারতভুক্ত অঞ্চলে কোন বাড়ীতে "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" ধ্বনি লিখিত হওয়ার অর্থই ছিল এই যে, এর দ্বারা মদমত্ত দুশমনদেরকে অগ্নিসংযোগ, হত্যা, লুন্ঠন এবং মা বোনের সতিত্ব হরণের আহবানজানানোহচ্ছে।

আরো মর্মান্তিক ব্যাপার এই যে, জাতীয় সংগ্রামের জন্য আমরা যে শক্তি সরবরাহ করেছিলাম, তা শ্লোগান, পতাকা, সভা, মিছিল, প্রস্তাবাবলী, সংবাদপত্রে ছাপানো বিবৃতি এবং রাজনৈতিক আলাপ আলোচনার অতিরিক্ত কিছু ছিল না। অথচ এ সব অস্ত্র কেবলমাত্র সেই অবস্থায় কার্যকরী হতে পারে যখন ভাগ্য নির্ধারণের দাঁড়িপাল্লা একটি তৃতীয় শক্তির হাতে থাকে এবং সেই

---

১. এ কথা প্রথম থেকেই বুঝা গিয়েছিল যে, হিন্দুরা যতক্ষণ ভারত বিভক্তির আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতি সম্মান দেখাবে, কেবল ততক্ষণই পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান একদেশ হিসেবে থাকতে পারবে। কিন্তু যখনই তারা ঐ চুক্তিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাবে এবং মুসলমানদের কোন গোষ্ঠীর সাথে যোগসাজশ করে পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ সংঘটিত করবে, অতপর নিজেই তার সাহায্যের জন্য সেখানে উপস্থিত হবে, তখন এ ঐক্য আর টিকে থাকতে সক্ষম হবে না। কেননা এমতাবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তান কোন ক্রমেই পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারবে না। ভারত ও পাকিস্তানের মানচিত্রের ওপর নজর দিলে যে কোন ব্যক্তি প্রথম দৃষ্টিতেই এ সত্যকে উপলব্ধি করতে পারতো। (নতুন)

তৃতীয় শক্তি নিজের স্বার্থের তাগিদেই ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে এক পক্ষের বিপরীতে আর এক পক্ষের চিৎকার ফরিয়াদের গুরুত্ব দিতে ইচ্ছুক হয়। তৃতীয় শক্তি ইংরেজের আওতাধীন দীর্ঘকাল থাকতে থাকতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সেই পরিবেশের এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে, তারা কেবল ঐ পরিস্থিতির গন্ডীর মধ্যেই চিন্তা করতে পারতেন। ঐ অবস্থা অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভিন্ন পরিস্থিতিতে কি কি দরকার হতে পারে, সে সম্পর্কে সম্ভবত তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তাই সহসা যখন ভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো, তখন তার মোকাবিলা করার কোন উপকরণই তাদের হাতে ছিল না।

গত বছরের (১৯৪৭) সূচনাকাল পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কি কি দুর্বলতা রয়েছে, তা কেউ অনুভবই করতে পারেনি। আমাদের রাজনীতির কি পরিণতি হতে পারে এবং জাতীয়তার সংগ্রাম কোন্ খাতে প্রবাহিত হতে যাচ্ছে, তা আমরা মোটেই বুঝতে পারিনি। হৈ হল্লা ও ভাবাবেগের রাজনীতি আমাদের দোর্দন্ড শক্তি সম্পর্কে এমন এক প্রতারণাময় ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছিল যে, আমরা আমাদের সংগঠনকে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগঠন এবং আমাদের রাজনীতিকে এক সুদক্ষ রাজনীতি বলে ধরে নিয়েছিলাম। সে সময় যে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্নিহিত দুর্বল দিকগুলো কিংবা আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সামান্যতম আভাস দিত, তাকে আমরা শত্রু ভেবে বসতাম। কিন্তু যেইমাত্র বিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো, অমনি আমাদের জাতীয় চরিত্রের, জাতীয় সংগঠনের এবং রাজনৈতিক পরিকল্পনার সকল দুর্বলতা ও গলদ আকস্মিকভাবে প্রকটিত হয়ে উঠলো।

পাঁচ কোটি মুসলমান অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় একটি পরাজিত ও বিজিত জাতির মত সে সব শিখ ও হিন্দুর হিংস্র থাবার করাল গ্রাসে পতিত হলো, যাদের সাথে মাত্র কয়েকদিন আগেও তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছিল। এভাবে যে আন্দোলন গোটা মুসলিম জাতিকে রক্ষা করার নিমিত্ত সক্রিয় হয়েছিল, তার প্রতিরক্ষা কৌশলের সারমর্ম দাঁড়ালো এই যে, জাতির অর্ধাংশকে বাঁচানোর জন্য বাকী অর্ধেককে এমন শোচনীয় ধ্বংসের আবর্তে নিক্ষেপ করা হলো, যার কথা ইতিপূর্বে কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল।

পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী ও তার আশে পাশের অন্যান্য অঞ্চলে যখন আকস্মিকভাবে মুসলমানদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন নেমে এল, তখন মুসলমানদের সেই পরম আস্থাভাজন জাতীয় সংগঠন তাদের কোন উপকারেই

এল না। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দের শতকরা ৯৫ ভাগ সর্বত্রই বিশ্বাসঘাতক বলে প্রমাণিত হলো। চরম ক্রান্তিকালে তারা স্বজাতীয় লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করলো এবং নিজ নিজ জানমাল বাঁচানোর চিন্তায় মগ্ন হলো। মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য যেসব অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল, মুসলিম জনগণের এই রক্ষকরা সেই সব অস্ত্র পর্যন্ত হিন্দু ও শিখদের কাছে বেশী দামে বিক্রি করতে কুণ্ঠাবোধ করলো না। বিপজ্জনক স্থানগুলো থেকে মুসলমানদেরকে নিরাপদে বের করে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তারা নিজেদের গৃহপালিত পশু ও বিলাসদ্রব্য বের করে আনাকে অধিকতর জরুরী মনে করলো। তারা পাকিস্তানের সরকারী ট্রাকে শরণার্থীদেরকে বহন করার বিনিময়েও ঘুষ আদায় করলো। সরকারী লোঙ্গরখানায় এক লোকমা খাবারের জন্য ব্যাকুল শরণার্থীদের কাছে তারা সরকারের পাঠানো খাদ্যও চড়া দামে বিক্রিকরলো।

তা ছাড়া মুসলমানদের জাতীয় চরিত্র গড়ার ব্যাপারে যে উদাসীনতা দেখানো হয়েছিল, তার জঘন্যতম কুফল পাকিস্তান সীমান্তের উভয় পারে দেখা দিল। পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানরা এক একটা হুমকিতেই বড় বড় এলাকা খালি করে দিল। একজন শিখের সামনে পঞ্চাশজন মুসলমানের প্রাণপাত করার মত কাপুরুষোচিত দৃশ্যও তাদেরকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। সেই সাথে, সেই প্রলয় কাণ্ড ঘটার মুহূর্তেও মুসলমানরা মুসলমানদের সম্পদ লুটপাট করতে এবং অতি নগণ্য জিনিসও আপন বিপন্ন সঙ্গীদের কাছে কালো বাজারের দামে বিক্রি করতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করেনি। অপর দিকে, পশ্চিম পাঞ্জাব, সীমান্ত ও সিন্ধুতে মুসলমানরা, মুসলিম নেতা ও কর্মীরা, তাদের নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা এবং সরকারী কর্মচারীরা--যারা এক সময়ে বড় বড় দেশদরদী সেজেছিল--হিন্দু ও শিখদের সম্পদ লুণ্ঠন করে যেভাবে নিজেদের ঘর বোঝাই করে, আপন শরণার্থী ভাইদের পুনর্বাসনে যেভাবে সমস্যার সৃষ্টি করে, বিপন্ন মুসলমানদের সাথে, যেরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করে এবং পাকিস্তান হওয়ার সাথে সাথেই বিশৃংখলা, কর্তব্যে অবহেলা, ঘুষখোরি, জাতীয় সম্পদ আত্মসাৎ, স্বজনপ্রীতি, যুলুম ও বেইনসাফীর যে সর্বব্যাপী অরাজকতার সৃষ্টি করে, তার নিরীখে এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, চরিত্র ও নৈতিকতা ছাড়া নিরেট পতাকা, শ্লোগান ও মিছিল দ্বারা কোন জাতির উত্থান ঘটানোর চেষ্টার কি ফলাফল দেখা দিতে পারে।

উল্লিখিত গোটা কার্যবিবরণীতে যদি কোন জিনিস লাভের খাতে উল্লেখের যোগ্য হয়ে থাকে, তবে সেটা শুধু এই যে, মুসলিম নেতৃত্ব অন্তত অর্ধেক মুসলমানকে রক্ষা করতে পেরেছে এবং তাদের একটা জাতীয় রাষ্ট্র তৈরী করে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই একমাত্র উজ্জ্বল কৃতিত্বকেও আমরা নিকৃষ্টতম ভুল–ভ্রান্তি দ্বারা কলংকিত দেখতে পাচ্ছি এবং তার মারাত্মক কুফল ভোগ করছি। ভারত বিভাগের কাজটা যে পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হলো, তা শুধু ভুলে পরিপূর্ণ ছিল না বরং বোকামীতেও ভারাক্রান্ত ছিল। সীমানা চিহ্নিত করার কাজটা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন না করে দুটো কমিশনের ওপর ছেড়ে দেয়া হলো। কমিশনের গঠন প্রক্রিয়া এমন গৃহীত হলো যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিরংকুশভাবে সভাপতির হাতে সমর্পিত হয়ে গিয়েছিল। আর সভাপতিও কোন নিরপেক্ষ জাতির লোককে বানানো হয়নি বরং ইংরেজ জাতির মধ্য থেকে একজনকে নেয়া হলো। অথচ এই ইংরেজ জাতি ভারতে নিঃস্বার্থও ছিল না, পক্ষপাতমুক্তও ছিল না। অতপর এ সিদ্ধান্ত ঘোষণার ক্ষমতাও সেই ব্যক্তির (লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন) হাতে অর্পন করা হলো, যার শুধু ভারতের বড় লাট থেকে যাওয়ার কথা ছিল। আমাদের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব আগাম কথা দিয়ে দিলেন যে, ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে যেভাবেই সীমানা চিহ্নিত করা হবে, তা তারা নির্বিবাদে মেনে নেবেন। এ মারাত্মক ভুলের ফল দাঁড়ালো এ যে, বাংলা ও পাঞ্জাব উভয় প্রদেশে মুসলিম সংখ্যাগুরু অধ্যুষিত বেশ কয়টি এলাকাকে ভারতের সাথে যুক্ত করে দেয়া হলো। ওদিকে পূর্ব পাঞ্জাবের পুরো ৯টি তহসিল সুস্পষ্টভাবে মুসলিম সংখ্যাগুরু অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু ও শিখদের অধিকারে চলে গেল। সর্বোপরি গুরুদাসপুর জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলো এবং এর ফলে কাশ্মীরের হিন্দু রাজা ভারতের সাথে সংযোগ স্থাপনের পথ পেয়ে গেল।

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের যে প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করলো, তা পাকিস্তানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ছিল। অথচ আমাদের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সে প্রক্রিয়াও হুবহু মেনে নিল। পাকিস্তান অংশের সৈন্যরা নানা জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিল, তার অংশের জিনিসপত্র ও সামরিক সাজ সরঞ্জামও ভারতের আওতাধীন ছিল, তার অংশের সম্পদের ওপরও ছিল ভারতের কর্তৃত্ব, তার অফিস ও কর্মচারীরাও তখনো পুরোপুরিভাবে বদলি হয়ে সারেনি। এমতাবস্থায় পাকিস্তান নামক স্বাধীন রাষ্ট্র সমগ্র প্রশাসনিক ও প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্ব সহকারে প্রতিষ্ঠা করা হলো। এ নির্বুদ্ধিতার ফল

হয়েছে এই যে, মুসলিম নেতৃত্ব আপন জাতির যে অর্ধাংশকে হিন্দু শাসনের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করেছে, তাও তার প্রভাব থেকে পুরোপুরি স্বাধীন হতে পারেনি। জুনাগড়কে তারা জোরপূর্বক দখল করলো। অথচ আমরা এমন অসহায় ছিলাম যে, টু শব্দটিও করতে পারলাম না। কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে আমাদের চোখের সামনে নাস্তানাবুদ করা হচ্ছে। অথচ তার মোকাবিলায় প্রকাশ্যে লড়াই করার সাহস আমাদের নেই। তারা আমাদের টুটি চেপে ধরে রেখেছে এবং আমরা প্রত্যেক ব্যাপারেই তাদের কাছে নতজানু হয়ে চলেছি।

আজ এক বছর পর বলা হচ্ছে যে, এ সবই মাউন্ট ব্যাটেন গায়ের জোরে করেছে। আমরা এ সব মেনে নেইনি। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই অন্যায় যখন করা হচ্ছিল এবং আপনারা চাক্ষুস দেখছিলেন যে, মাউন্ট ব্যাটেন আমাদের ধ্বংসের আয়োজন করছে, তখন আপনাদের বাকশক্তি কোথায় ছিল? মুসলমানদেরকে এবং সারা দুনিয়াকে আপনারা এ চক্রান্তের খবর জানালেন না কেন? মুসলমানদের পক্ষে যখন চরম ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপগুলো নেয়া হচ্ছিল, তখন আপনারা তা নীরবে বরদাশত করতে থাকলেন কেন? আপনারা তৎক্ষণাত ঘোষণা দিলেন না কেন যে, মাউন্ট ব্যাটেন সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে এ সব কাজ করছে এবং আমরা এগুলোর দায়দায়িত্বে স্বেচ্ছায় অংশীদার হইনি? আপনারা শুধু যে সেই সময় নীরব ছিলেন তা নয়, বরং পরবর্তী সময় যখন এ ত্রুটীপূর্ণ বিভাগ প্রক্রিয়ার ভয়াবহ পরিণাম দেখা দিল এবং লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে তার বিষময় কুফল ভোগ করতে হলো, তখনও আপনারা নিজেদের অবস্থান সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন অনুভব করেননি।

আমি প্রবন্ধের শুরুতেই বলেছি যে, দশ বছর আগে মুসলমানদের সামনে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, তা ছিল এই যে, হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য থেকে তারা কিভাবে মুক্ত হতে পারবে। সে প্রশ্নের একটি জবাব এই ছিল যে, ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী চরিত্রের শক্তি দ্বারা এ হুমকির মোকাবিলা করা হোক। কিন্তু মুসলিম জনতাকে এ সমাধান আকৃষ্ট করতে পারেনি এবং তারা সেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেও রাজী হয়নি। এখন এ কথা আলোচনা করে কোন লাভ নেই যে, ওটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে কি হতো। দ্বিতীয় যে সমাধানের প্রস্তাব করা হলো তা ছিল জাতীয়তা ভিত্তিক সংগ্রাম পরিচালনার প্রস্তাব। মুসলমানরা এ সমাধানকেই গ্রহণ করলো এবং নিজেদের সমগ্র জাতীয় শক্তি, নিজেদের সকল উপায়-উপকরণ ও সকল বিষয় সেই নেতৃত্বের

হাতে অর্পণ করা হোক, যা মুসলমানদের জাতীয় সমস্যার সমাধান এভাবে করতে চেয়েছিল। দশ বছর পর আজ তার সমগ্র কার্যক্রম আমাদের সামনে বিদ্যমান। আমরা দেখেছি, তারা কিভাবে আমাদের সমস্যার সমধান করেছে। যা হবার হয়েছে, এখন তাকে আর পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এটা না করা হলে কি হতো, সে আলোচনা এখন অর্থহীন বটে। তবে এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া জরুরী যে, আজ আমাদের সামনে যেসব সমস্যা বিরাজ করছে, তার সমাধানেরও কি সেই নেতৃত্বই মানানসই, যা আমাদের জাতীয় সমস্যার সমাধান এরূপ পদ্ধতিতে করেছে? এ নেতৃত্বের এ যাবত কালের কার্যক্রম থেকে কি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এখন যেসব বড় বড় ও নাজুক সমস্যা মাথার ওপর এসে পড়েছে এবং যা এ নেতৃত্বেরই কার্যকলাপের ফল, তার সমাধানের জন্য আমরা পুনরায় তার ওপর নির্ভর করতে পারি?

(তরজুমানুল কুরআন, জুলাই, ১৯৪৮)

বিভাগোত্তর কালে যেসব সমস্যা দেখা দেবে

মুসলমানরা বর্তমানে জাতি হিসেবে যেসব বড় বড় সমস্যার সম্মুখীন, এখনো পর্যন্ত তার যথাযথ পর্যালোচনা করা হয়নি। আমাদের সমাজের চিন্তাশীল শ্রেণী এ সমস্যাবলী কিছু কিছু উপলব্ধি করেন এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনাও করে থাকেন। কিন্তু সচরাচর যেসব আলোচনা পড়তে ও শুনতে পাওয়া যায়, তা থেকে এ ধারণাই জন্মে যে, এ সব সমস্যা সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন করা হয়নি এবং প্রতিটি সমস্যার ধরন, তার উদ্ভবের কারণ, তার গুরুত্ব এবং তা সমাধানের উপায় পর্যালোচনা করে দেখাও হয়নি। এ জন্যই সার্বিকভাবে জাতি এখনো পর্যন্ত তার আসল সমস্যাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেনি। তা ছাড়া আমাদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যাও প্রচুর যারা সব সময়ই জাতিকে এ সমস্যাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ রাখতে ইচ্ছুক ও সচেষ্ট। তারা জাতির মনোযোগ এ সব সমস্যা থেকে হটিয়ে সাময়িক বিষয়াদিতে নিবদ্ধ করার চেষ্টায় নিয়োজিত। স্বাধীনতার পূর্বে তারা জনগণকে যেসব উত্তেজনাকর বিষয়াদিতে মাতিয়ে রাখতো আজও সেগুলিতেই মাতিয়ে রাখতে সচেষ্ট রয়েছে। তারা তাদের পিঠ চাপড়িয়ে প্রবোধ দিয়ে চলেছে যে, এ সব সমস্যা আসলে সমস্যাই নয়, আর যদি হয়েও থাকে তবে তা নিয়ে খুব একটা ভাবান্বিত হওয়ার দরকার নেই। এ সব কথাবার্তা নির্বুদ্ধিতাবশতই বলা হোক অথবা চাতুর্যের সাথেই বলা হোক, আর এ সব বক্তব্য কোন দলবিশেষের স্বার্থে যতই কল্যাণকর হোক, এতে জাতির হীত্য কামনার কোন নামগন্ধও নেই। জাতির কল্যাণই যদি কারো কাম্য হয়, তা হলে তার একমাত্র উপায় এই যে, তাকে যেসব সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে, তা তার সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে এবং তাকে আবেদন জানাতে হবে

যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সে এ সমস্যাবলী মোকাবিলা করতে সক্ষম কিনা, সে কথা যেন ভেবে দেখে। যদি সক্ষম হয়ে থাকে, তা হলে তো আল্লাহর শোকর। আর তা না হলে তাকে অবশ্যই নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে এবং সেই পরিবর্তনটা কি ধরনের হওয়া চাই, তাও তাকে ভাবতে হব।

দেশ বিভাগের পর যেসব মুসলমান ভারতে রয়ে গেছে, বর্তমানে আমাদের সামনে তাদের সমস্যাই সবচেয়ে নাজুক ও সবচেয়ে হৃদয়বিদারক। বিভাগকালীণ সময়ে তাদের সংখ্যা ছিল পাঁচ কোটির মত। অর্থাৎ আমাদের জাতির পুরো অর্ধেক। দেশ বিভাগের পর তাদের কয়েক লাখকে হত্যা করা হয়েছে। বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে বল প্রয়োগে অমুসলিম বানানো হয়েছে। ষাট সত্তর লাখকে ঠেলে দেয়া হয়েছে পাকিস্তানে। আর দশ পনেরো লাখকে হায়দরাবাদে আশ্রয় নিতে হয়েছে।[১] এখন আনুমানিক চার কোটি মুসলমান ভারতে রয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নে এ চার কোটি মুসলমানের মর্যাদা রাশিয়ার অধীন পরাজিত জার্মানদের এবং আমেরিকার অধীন পরাজিত জাপানীদের মত। দশ বছর ব্যাপী তিক্ত ও তীব্র জাতীয় সংগ্রামের পর এখন তারা একেবারেই অসহায়ভাবে তাদের সাবেক প্রতিদ্বন্দ্বীদের করতলগত। তাদেরকে "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" বলার এমন মূল্য দিতে হচ্ছে যে, তা তাদের শুধু নাগরিক অধিকারই নয়, মানবিক অধিকারকেও গ্রাস করে নিয়েছে। তাদের সকলকে এখন "বিশ্বাসঘাতক" এবং "গোয়েন্দা" বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। প্রত্যেকেরই আনুগত্য সন্দেহজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রেফতারী ও খানাতল্লাশী প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। কেবল কারো কারো পালা আসতে এখনো বাকী। পুরো জাতি ভারতের হিন্দুদের হাতে জিম্মী হয়ে পড়েছে। সম্মানজনক জীবন যাপনের পথ তাদের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে। এ জন্য কেবল তিনটে পথ খোলা রয়েছে। হয় স্বেচ্ছায় ইসলাম পরিত্যাগ করে অমুসলিম হয়ে যেতে হবে, অথবা শুদ্রদের চেয়েও খারাপ অবস্থায় থাকতে হবে, নচেত তাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে হিন্দু জাতীয়তায় বিলীন করে দেয়ার যেসব কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে, তা নীরবে বরদাশত করতে থাকতে হবে। এ অবস্থা যদি এভাবেই চলতে থাকে তা হলে সে দিন বেশী দূরে নয়, যখন সিসিলি ও স্পেন থেকে যেভাবে মুসলমান উধাও হয়ে গেছে, ভারত থেকেও তেমনি উধাও হয়ে যাবে। আল্লাহ এমন দুর্দিন যেন কখনোনা দেন।

---

১. তখনো পর্যন্ত হায়দরাবাদ রাজ্য ভারতের দখলে যায়নি। আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েক লাখ মুসলমান তখন এ ডুবন্ত নৌকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। (নতুন)

চার কোটি মুসলমানের এ বিরাট জাতি বর্তমানে সম্পূর্ণ অসহায়। যে রাজনীতি এত দিন তাদের উপজীব্য ছিল। বিপ্লবের এক আঘাতেই তা উল্টে গেছে। যে জাতীয় সংগঠনটি তাদের সকল আশা ভরসার কেন্দ্রস্থল ছিল, ঝড়ের প্রথম দমকাতেই তা ধরাশয়ী হয়ে গেছে। যে নেতৃবৃন্দের ওপর তারা নিজেদের যাবতীয় সমস্যার ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিল, তারা তাদের কোন কাজেই এল না। তাদের কোন কোন প্রথম সারির নেতা তো চুপিসারে পাকিস্তানে চলে এল। আর বাদবাকী সকল ছোট বড় নেতা শত্রুর সামনে ক্ষমা প্রার্থনা করতে ও নাকে খত্ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। চরিত্র ও নৈতিকতা বাদ দিয়ে নিছক শ্লোগানকে পুঁজি করে যারা নেতা হয়ে বসেছিলেন, যুগের ধারা পাল্টে যাওয়ার পর তারা এক দিনের জন্য আপন নীতির ওপর বহাল থাকতে পারলো না। যে নীতি ও আদর্শের জন্য দীর্ঘ দশ বছর ধরে তারা আপন জাতিকে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, পট পরিবর্তনের প্রথম রাতেই তারা সেই আদর্শকে জলাঞ্জলী দিয়ে বসলো। দ্বিজাতিতত্ত্বটা রাতারাতি তাদের কাছে অচল বলে গণ্য হলো। একজাতিতত্ত্বই সঠিক ও সত্য এটা তারা যেন সহসাই উপলব্ধি করলো। ত্রিবর্ণা পতাকার শ্রদ্ধা হঠাৎ তাদের মনে গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মুসলিম জাতির এই বীর নেতৃবৃন্দ জাতীয়তাবাদের এমন দীক্ষা নিল যে, তাদের এলাকায় হিন্দু মুসলমান পারস্পরিক বিয়েশাদীর প্রস্তাব পর্যন্ত আসা শুরু হলো, যাতে উভয় জাতির মন থেকে স্বাতন্ত্রবোধের বালাই কোন রকমে মুছে যায়। এ গোটা গোষ্ঠীর মধ্য থেকে এমন একজনও বের হলো না, যে পরাজিত হওয়ার পর আদর্শের বদলে প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে। সমগ্র দলটি স্বার্থপর লোক দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল এবং তারা অদ্ভুত রকমের ডিগবাজি খেয়ে সারা দুনিয়ার মানুষের সামনে নিজেদের টলমলে ব্যক্তিত্ব ও ঘুণে খাওয়া চরিত্রের ভোজবাজি দেখালো এবং যে জাতির তারা প্রতিনিধিত্ব করছিল, তারা অবশিষ্ট সন্মানটুকুও ধুলায় লুটিয়ে দিল।

হতাশাগ্রস্ত হয়ে ডুবন্ত মুসলিম জাতি কংগ্রেসের দরিয়ায় ভাসমান খড়কুটোগুলো ধরে বাঁচতে চাইল। কিন্তু তখন তাতেও আর কাজ হলো না। এদের মধ্যে একটি দল এখনও মনে করে যে, মুসলমানদের জাতিগত স্বাতন্ত্রের কথা ভুলে যাওয়া উচিত এবং ভারতীয় জাতীয়তায় একাকার হয়ে যাওয়া উচিত। সবার জানা যে, এটা আত্মরক্ষার কৌশল নয় বরং "আত্মহত্যার সহজ উপায়", যা মুসলমানদের মেজাজের সাথে আগেও কখনো

খাপ খায়নি, এখনো খাপ খেতে পারে না। অপর গোষ্ঠী মুসলমানদের "স্বতন্ত্র সত্তা" ও তার "অধিকার" সম্পর্কে কিছু ধারণা রাখে বটে। তবে এ নাম মুখে আনা মাত্রই প্রাচীনতম কংগ্রেসী মুসলমানকেও হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা মুখোসপরা মুসলিম লীগার ছাড়া আর কিছু মনে করে না।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের এ সব মুসলমানের সমস্যা বর্তমানে আমাদের সবচেয়ে বড় জাতীয় সমস্যা। দেশবিভাগের ফলে তারা আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বটে। কিন্তু তারা মূলত আমাদের জাতিরই একটা অংশ, আর তাও কোন নগণ্য অংশ নয় বরং দুই-পঞ্চমাংশ। তারা এভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক এটা আমরা হতে দিতে পারি না। আমরা তাদের কাছে সবচেয়ে বেশী ঋণী। কেননা আজ যে পাকিস্তানকে আমরা উপভোগ করছি, তার আসল মূল্য তারাই পরিশোধ করেছে। আমরা যে তাদেরকে উপেক্ষা করতে পারি না তার আরো একটা কারণ এই যে, আমাদের শ্রেষ্ঠতম মানব সম্পদ ঐ অংশেই উৎপন্ন হয়েছে। তাদের ব্যাপারে আমরা এ জন্যও উদাসীন থাকতে পারি না যে, আমাদের হাজার বছরের সভ্যতার সমস্ত উৎকৃষ্টতম ফসল এবং আমাদের সকল বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের রক্ষক তারাই। সর্বোপরি, আমাদের পূর্বপুরুষগণ বিগত এক হাজার বছর ধরে ভারতের কোণে কোণে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য যে পরিশ্রম ও প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করেছেন, তা নষ্ট হয়ে যাক এবং তাওহীদের দাওয়াত সংকুচিত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের মাত্র দু'টো ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ হয়ে যাক, এটা আমরা কিভাবে নীরবে বরদাশত করতে পারি? সুতরাং কোন ব্যক্তির পক্ষে বেপরোয়াভাবে এ কথা বলার উপায় নেই যে, ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যা তাদের নিজস্ব সমস্যা। না, ওটা যেমন ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যা, তেমনি পাকিস্তানেরও সমস্যা। সত্যি বলতে কি, যে মুসলিম জাতি এ কৃত্রিম দ্বিধাবিভক্তি সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তান জুড়ে একই জাতি হিসেবে বহাল রয়েছে, এটা সেই গোটা মুসলিম জাতিরই সমস্যা।

এখন প্রশ্ন এই যে, উক্ত চার কোটি মুসলমানকে বাঁচিয়ে রাখা এবং ভারতে ইসলামের দাওয়াতকে সজীব ও সতেজ রাখার জন্য আমরা কি করতে পারি? যেহেতু এ যাবত জাতীয় পর্যায়ে আমরা পুরোপুরিভাবে মুসলিম লীগ ও তার নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল ছিলাম, তাই অনিবার্যভাবে এ প্রশ্ন তার ওপরই বর্তায়। দেশ বিভাগের পূর্বে কি মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এ প্রশ্নের কোন সমাধান উদ্ভাবন করেছিল? দেশ বিভাগের পরে কি ভারতে

মুসলিম লীগের রাজনীতি ও নেতৃত্বের কাজ করার কোন সুযোগ অবশিষ্ট আছে? পাকিস্তানী মুসলিম লীগের কাছে কি এ ব্যাপারে কোন কর্মসূচী রয়েছে? ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্য উন্নয়নে কোন প্রভাব বিস্তার করা কিংবা ভারতে ইসলামের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করা সম্ভব না হোক, অন্ততপক্ষে তার সংরক্ষণের ব্যাপারে কিছু করার কোন যোগ্যতা কি পাকিস্তান সরকারের আছে? এ সব প্রশ্নের কোন উত্তর যদি থেকে থাকে, তবে তা জানতে পারলে আমি খুবই আনন্দিত হব। আর যদি না থেকে থাকে তবে তার পরিষ্কার অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে, আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব যতক্ষণ বর্তমান নীতি নির্ধারক ও কর্ণধারদের হাতে থাকবে, ততক্ষণ মুসলিম জাতির এই বৃহত্তম সমস্যাটির কোন সমাধান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আর এ রাজনীতি ও এ নেতৃত্ব যদি আমাদের কর্তৃত্বের ক্ষমতায় বহাল থেকেই যায়, তবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের দেখতে হবে যে, ওয়াগা থেকে রাসকুমারী পর্যন্ত এবং পূর্ব বাংলার সীমান্ত থেকে কাটিয়াড় উপকূল পর্যন্ত সমগ্র এলাকা থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

অন্যান্য সমস্যা পাকিস্তান সংক্রান্ত। সাধারণত এ সমস্ত সমস্যা এড়িয়ে আমাদের সামনে কেবলমাত্র একটা বড় সমস্যা তুলে ধরা হয়ে থাকে, যার শীরোনাম হচ্ছে, "পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও স্থিতিশীলতা।" আর এ সমস্যার এরূপ সমাধান পেশ করা হয় যে, সকল পাকিস্তানীকে ঐক্যবদ্ধ এবং সামরিক দিক দিয়ে মজবুত হওয়া চাই। কিন্তু সামান্য একটু পর্যালোচনা করলেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও স্থীতিশীলতা একটিমাত্র সহজ সরল সমস্যা নয়, বরং অনেকগুলো সমস্যার সমষ্টি। আর এর সমাধানও যতটা সহজ মনে করা হয়েছে ততটা নয়। যে দেশের চরিত্রে ঘুণে ধরেছে, তা কি কেবল অস্ত্র ও সামরিক প্রশিক্ষণের ওপর ভর করে দাঁড়াতে ও টিকে থাকতে পারে? যে দেশের মৌলিক উপাদানগুলোর পরস্পরকে ছিন্নভিন্ন করার ও পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার অনেকগুলো শক্তিশালী কারণ বিদ্যমান, তা কি কেবল "ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাও" এ তছবিহ জপলেই বাস্তবিকপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে? সুতরাং আমাদের নিজেদের যেমন মাত্রাতিরিক্ত সরলতা এড়িয়ে চলা উচিত তেমনি অন্যদেরকেও সরল ভেবে আসল সমস্যাবলী থেকে তাদের মনোযোগ হটানো এবং কাল্পনিক সমস্যাবলীর প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করার চেষ্টা পরিহার করা উচিত। তার বদলে আমাদের তন্ন তন্ন করে খতিয়ে দেখতে হবে যে,

প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের স্থায়ীত্ব, প্রতিরক্ষা ও স্থীতিশীলতা কোন্ কোন্ বিষয়ের সাথে জড়িত এবং কিভাবে তা অর্জন করা সম্ভব।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দেশের নৈতিকতা ও চরিত্রের সমস্যা। বর্তমানে এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনকভাবে অধোপতিত। আমাদের যাবতীয় সমস্যার গোড়ায় এ চরিত্রের অসততাই সক্রিয় রয়েছে। এ বিকৃতির বিষাক্ত প্রভাব এত ব্যাপক আকারে আমাদের সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এত গভীরে প্রবেশ করেছে যে, আমরা যদি একে আমাদের এক নম্বর জাতীয় শত্রু রূপে গণ্য করি তবে তা মোটেই অত্যুক্তি হবে না। এ আভ্যন্তরীন আপদ আমাদের জন্য যতখানি মারাত্মক, কোন বহিরাগত আপদ ততটা নয়। এটি আমাদের জাতির প্রাণশক্তিকে বিনষ্ট করে দিয়েছে এবং ক্রমাগত বিনষ্ট করে চলেছে।

গত বছরের দাঙ্গায় দুশ্চরিত্রপনার যে ছয়লাব বয়ে গিয়েছিল, তা আমাদের জনগণের একটি বৃহৎ অংশকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। হত্যা, জ্বালাও পোড়াও ও নারী অপহরণের প্রশিক্ষণ যারা পেয়েছিল, তাদের সংখ্যা হয়তো কয়েক হাজার হবে। কিন্তু লুঠতরাজের অপরাধ লক্ষ লক্ষ মানুষকে কলংকিত করে ছেড়েছে। এ চারিত্রিক অধোপতনের ব্যাপকতা কিরূপ ছিল, তা এ ঘটনা থেকে আন্দাজ করা যায় যে, একটি গ্রামের আড়াই হাজার অধিবাসীর মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তি লুঠতরাজে অংশ গ্রহণে বিরত ছিল। আর অন্য একটি ক্ষুদ্র শহরের সাতশো বাড়ীর মধ্যে মাত্র ৩৫টি বাড়ি এরূপ পাওয়া গিয়েছিল, যেখানে লুণ্ঠিত জিনিসপত্র ঢোকেনি। আর এ লুটেরাদের মধ্যে শুধু যে নিরেট মূর্খ ও টাউটরাই ছিল তা নয়, বরং বড় বড় কুলীন ও সভ্রান্ত ভদ্রলোক, সম্মানিত উচ্চ শিক্ষিত, সমাজের অভিজাত লোকজন ও উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা পর্যন্ত এই বহমান গঙ্গায় প্রাণভরে স্নান করেছিল। পুলিশের ছোট বড় কর্মচারী, প্রশাসন ও আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট, উচ্চপদস্থ আমলা , বড় বড় নামজাদা সমাজকর্মী, আইন পরিষদের সদস্য, এমনকি কোন কোন মন্ত্রী পর্যন্ত এই পঁচা নর্দমায় ডুব দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। এ সব ঘটনা কারো অজানা নয়। সমাজের বিপুল সংখ্যক লোক এদেরকে চেনে এবং এদের উট পাখির মত বালুতে মুখ লুকিয়ে কোন লাভ নেই। এটা এখন দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, আমাদের নৈতিক বন্ধন অস্বাভাবিক রকমের ঢিলে হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে হাজারো মানুষ এমন রয়েছে যারা নরহত্যায় সিদ্ধহস্ত। সুযোগ পেলেই জঘন্যতম অপরাধ করে বসতে পারে এমন লোকও হাজারে হাজারে বিদ্যমান। নীচ থেকে উচ্চতর

শ্রেণী পর্যন্ত শতকরা ৯৫ ভাগ লোকই এমন যে, হারাম মাল উপার্জনে তারা বিন্দুমাত্রও ইতস্তত করে না কেবল আইনের ধরপাকড় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা পেলেই হয়।

এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের এ কথা বলে সান্ত্বনা পাওয়ার অবকাশ নেই যে, ভারতে শিখ ও হিন্দুরা আমাদের চেয়ে বহুগুণ বেশী জঘন্য চরিত্রের পরিচয় দিয়েছে। যে বিষ তারা খেয়েছে তার জন্য তাদের কোন চিন্তা–ভাবনার উদ্রেক হোক বা না হোক, তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। আমাদের মেরুমজ্জায় যে বিষ ঢুকে গেছে, তার চিন্তাভাবনা আমাদের করতেই হবে। প্রশ্ন এই যে, এত বিপুল সংখ্যক ঝানু অপরাধী ও দুর্ধর্ষ বিশ্বাসঘাতককে সাথে নিয়ে আমাদের পক্ষে আপন জাতীয় জীবনকে স্থীতিশীল ও নিরুপদ্রব বানানো কি সম্ভব? যে দুষ্কর্ম ও চরিত্রহীনতা সেদিন অন্যদের জানমাল ও সতিত্ব হরণে ব্যবহৃত হয়েছিল, তা কি সেখানেই খতম হয়ে গেছে? আমাদের চরিত্রে ও কর্মে কি তার কোন স্থায়ী প্রভাব পড়েনি? এ বিকৃত চরিত্র কি এখন নিজেদের লোকদের ওপরও হাত সাফাই করতে উদ্যত না হয়ে পারবে?

এক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে পারছি যে, বিগত দাঙ্গার সময় আমরা যে নৈতিক অধোপতনের খবর পেয়েছি তা সাময়িক ছিল না , বিশেষ গন্ডীতে সীমাবদ্ধও ছিল না। আসলে তা এক ভয়াবহ রোগের আকারে আমাদের মধ্যে তখনো বিদ্যমান এবং তা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি অংশকে খারাপ করে দিচ্ছে। পাকিস্তান হওয়ার পর যেসব জটীলতা ও বিপাকে পড়া একটি নতুন দেশের জন্য স্বাভাবিক, তাতো আমাদের এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায়ই ছিল না। আর যেসব বিপদ মুসিবত ইংরেজ, হিন্দু ও শিখদের পারস্পরিক যোগসাজস ও ষড়যন্ত্রের দরুন আমাদের ওপর নেমে এসেছিল, তাও আমাদের জন্য অনিবার্য ছিল। কিন্তু এ সব অতি সহজেই মানিয়ে নেয়া যেত যদি আমাদের জনসাধারণ, বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গ ও নেতৃবর্গ চরিত্রের দিক থেকে এত অধোপতিত না হতো। এটা একটা অকাট্য সত্য ঘটনা যে, আমাদের সমস্যা ও সংকট যতই থেকে থাকুক, আমাদের চারিত্রিক অসততার কারণে তা আসলে যতটুকু ছিল তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী বেড়ে গেছে।

উদাহরণস্বরূপ "মোহাজের"দের কথাই ধরুন, যা পাকিস্তান হওয়ার সাথে সাথেই একটা পর্বত প্রমাণ সমস্যার আকারে আমাদের পর নেমে এসেছিল। বস্তুত একটি দেশের ওপর যদি ষাট সত্তর লাখ সহায় সম্বলহীন মানুষকে আকস্মিকভাবে চাপিয়ে দেয়া হয় তা হলে ঐ দেশের জন্য এর চেয়ে বড় বিপদ আর কিছু হতে পারে না। তবে একটু গভীরভাবে তলিয়ে ভেবে দেখুন যে, এভাবে বাস্তবিক পক্ষে যে সমস্যাবলীর উদ্ভব হয়েছিল, আমাদের চারিত্রিক দোষের দরুন তা আরো কত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১] বাস্তুত্যাগী হিন্দু ও শিখরা যেসব ঘরবাড়ী, জমী-জায়গা, কল-কারখানা, দোকানপাট, আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিস রেখে গিয়েছিল, তা যদি পাকিস্তানের অধিবাসীরা, সরকারী কর্মচারীরা এবং রাজনৈতিক কর্মীরা দখল করে না বসতো তা হলে মোহাজেরদের পুনর্বাসনের আমাদেরকে যেসব সমস্যার সম্মুখিন হতে হচ্ছে, তা কি হতে হতো? পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধু সরকারকে জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে যে, বাস্তুত্যাগীরা কি কি সম্পদ রেখে গিয়েছিল, আর তার কত অংশ মোহাজেরদেরকে দেয়া হয়েছিল এবং কত অংশইবা অন্যান্যদের অবৈধ দখলে গিয়েছিল। এ পরিসংখ্যান প্রকাশিত হলে বিশ্ববাসী দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাবে যে, মোহাজের সমস্যার যে ক্ষত আমাদের দেহে বিধর্মীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল, তাকে কারা ক্যানসারের ফোঁড়ায় রূপান্তরিত করেছিল। অনুসন্ধান করলে এ জঘন্য কাজে কত কীর্তিমান ব্যক্তিকে যে নগ্ন হয়ে লিপ্ত হতে দখা যাবে, তার ইয়ত্তা নেই। এ ছাড়া যেসব লোক কাল পর্যন্তও "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" শ্লোগান দিয়ে বেড়াতো, যাদের চেয়ে বড় দেশদরদী আর কাউকে মনে হতো না এবং যারা আজও মুখে নিজেদেরকে বিরাট "সংগ্রামী পুরুষ" "বলে জাহির করে থাকে, তাদের একটি বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এমন যে, পাকিস্তান হওয়ার পর সর্ব দিক থেকে তার নৌকায় ছিদ্র করে চলেছে। ঘুষ, দুর্নীতি, জাতীয় সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, স্বজনপ্রীতি, কর্তব্যে অবহেলা, শৃংখলাভঙ্গ, দরিদ্র জাতির সম্পদ দ্বারা বিলাসিতা প্রভৃতি এত ব্যাপক হয়ে পড়েছে যে, প্রশাসনের প্রতিটি বিভাগে তা এক সর্বব্যাপী প্লাবনের সৃষ্টি করেছে এবং ছোট থেকে বড়--সর্বস্তরের কর্মচারী ও কর্মকর্তা মায় মন্ত্রী পর্যন্ত এর দ্বারা কলুষিত। এ সব কি পাকিস্তানকে মজবুত করার উপকরণ? দোকানপাঠ ও কলকারখানার

---

১. সর্বশেষ পরিসংখ্যানের আলোকে পাকিস্তানে আশ্রয়গ্রহণকারীদের মোট ৯০ লাখ ছিল। কিন্তু তাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে কিরূপ কৃতিত্ব দেখানো হয়েছিল তা এ তথ্য থেকে বুঝে নিন যে, ১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুসারে সিন্ধু থেকে বাস্তত্যাগ করে চলে যাওয়া অমুসলিমদের সংখ্যা ছিল ৯ লাখ, কিন্তু

অবৈধ বিলিবন্টনের দরুন দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের একটি বড় অংশ যেভাবে অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ লোকদের হাতে চলে গেছে, তা কি পাকিস্তানের শক্তিকে সংহত ও স্থীতিশীল করতে সক্ষম? সরকারী কর আদায়ে জনগণের ফাকি দেয়ার ব্যাপক প্রবণতা, তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং অন্যান্য অবৈধ সুবিধা বাগানোর জন্য ঘুষের আশ্রয় নেয়া এবং যেখানেই আইনের ধরপাকড় থেকে রেহাই পাওয়ার আশা করা যায় সেখানে জাতীয় সম্পদের বিরাট রকমের ক্ষতি সাধনেও ইতস্তত না করা--এ সবই কি পাকিস্তানকে মজবুত করার উপায়? দেশের মানুষের চরিত্রের এত অধোপতন হয়েছে যে, ভারত থেকে আগত মোহাজেরদের লাশ যখন ওয়াগা ও লাহোরের মাঝখানে পড়ে পঁচার উপক্রম হচ্ছিল এবং শিবিরগুলোতেও অনেকেই মারা যাচ্ছিল তখন ১২-১৩ লাখ মুসলমান অধ্যুষিত শহরে কয়েক হাজার দূরে থাক, কয়েক শো লোকও নিজের ভাইদের সৎকার করার ঝামেলা পোহাতে প্রস্তুত ছিল না। একজন মোহাজের মারা গেছে এবং তার আপন-জনেরা জানাজার নামাজ পড়াতে পারিশ্রমিক দিয়ে লোক যোগাড় করেছে, এমন ঘটনাও একাধিকবার ঘটেছে। এমনকি একবার সীমান্তবর্তী এক গ্রামে মোহাজেরদেরকে জমী দেয়া হলে স্থানীয় মুসলমানরা সীমান্তের অপর পার থেকে শিখদের ডেকে এনে তাদের ওপর হামলা করিয়ে দিয়েছে, যাতে তারা পালিয়ে যায় এবং জমী তাদের দখলে থাকে। শুধু তাই নয়, যেসব মেয়ে ভারতের নির্যাতন থেকে কোন রকমে আত্মরক্ষা করে পালিয়ে এসেছিল। তাদের সতিত্ব এখানে নিজের মুসলমান ভাইদের কবল থেকে রক্ষা পায়নি-এ ধরনের ঘটনাও একাধিকবার সংঘটিত হওয়ার খবর আমাদের গোচরে এসেছে। আর এহেন জঘন্য অপরাধ সংঘটনকারীরা শুধু যে সাধারণ গুন্ডা-বদমাশ ছিল তাও নয়। এমন মারাত্মক চারিত্রিক অধোপতন হওয়া সত্ত্বেও আমরা কিভাবে আশা করতে পারি যে, কোন বড় ধরনের আভ্যন্তরীন কিংবা

ভারত থেকে আসা ৫ লাখ ৪০ হাজার মুসলমানকে সেখানে পুনর্বাসিত করা হয়। সীমান্ত প্রদেশ থেকে চলে যাওয়া ২ লক্ষ ১৬ হাজার মুসলমানের জায়গায় ভারত থেকে আগত মাত্র ৫১ হাজার মুসলমানকে পুনর্বাসিত করা হয়। মোহাজেরদের পুনর্বাসনের সমস্যা বছরের পর বছর ধরে পাকিস্তানের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে রয়েছে। এখনো পর্যন্ত তার সমাধান পুরোপুরিভাবে করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে আমরা দেখতে পাই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পশ্চিম জার্মানীতে পূর্ব জার্মান বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা ১৯৬১ সালের জুন পর্যন্ত ২ কোটি ২৫ লাখে গিয়ে দাঁড়ায়। অথচ পশ্চিম জার্মানী থেকে কেউ বাস্তুভিটে ত্যাগ করে যায়নি। তা সত্যেও জার্মানরা শরণার্থীদেরকে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসিত করে এবং কর্ম সংস্থানও করে। বস্তুত শরণার্থীদের এত বড় সয়লাব পশ্চিম জার্মানীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের একটা প্রধান উপায় হয়ে দেখাদিয়েছিল।।(নজুন)

বহিরাগত দুর্যোগের মোকাবিলায় আমরা দৃঢ়তার সাথে রুখে দাঁড়াতে পারবো! আর এরূপ কদর্য চরিত্র আমাদের দেশের পুনর্গঠনের কোন পরিকল্পনাকে সাফল্যমন্ডিত হতে সাহায্য করবে, এও কি সম্ভব!

আমাদের নেতৃত্ব রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সাথে জনগণের নৈতিক শক্তিকে সংহত করার চিন্তাভাবনা এ যাবত কেন করলো না, সে প্রশ্ন না হয় আপাতত বাদ দিলাম। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, এ নেতৃত্ব এখন এ ব্যাপারে কি করছে? চরিত্র গড়া ও তার উৎকর্ষ দানের জন্য তার কাছে কি উপায় উপকরণ আছে? কি কি কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচী সে তৈরী করেছে? এ একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং এর সুস্পষ্ট জবাব আমাদের পাওয়া চাই। এক সময় রেডিও, সরকারী তথ্য বিবরণী ও বিবৃতিমালা দ্বারা জনগণকে ও নিম্ন পর্যায়ের সরকারী কর্মচারীদেরকে যেসব নৈতিক উপদেশ দেয়া হতো, সেগুলোকে দেখিয়ে যদি উক্ত প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হয়, তা হলে আমরা আগেভাগেই বলে রাখছি যে, এ ধরণের ছেলেভুলানো কথাবার্তায় আমরা সন্তুষ্ট নই। কেননা চরিত্র ভ্রষ্টতার আসল উৎস তো নেতৃত্বের প্রাসাদ ভবনের স্তম্ভগুলোতেই বিদ্যমান। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি বর্তমানে এমন লোকদের হাতে রয়েছে, যাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আকার আস্কারা পেয়েই চরিত্রহীনতার বাজার এত রমরমা। যারা পরস্ব অপহরণের কাজে অভ্যস্ত তাদের মুখে আমানতদারীর শিক্ষা, স্বার্থপর লোকদের মুখে নিস্বার্থতার নছিহত এবং পাপাসক্ত মুখে পুন্যের ওয়াজ মানুষের প্রকৃতির কাছে কবেইবা গ্রহণযোগ্য হয়েছে যে, আজ তা গৃহীত হবার আশা করা হচ্ছে?

দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা পাকিস্তানের স্থীতি, স্থায়ীত্ব ও সংহতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই যে, পাকিস্তানের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করে একটা ইস্পাতকঠিন প্রাচীরে পরিণত করার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। এ সব জনগোষ্ঠী বর্তমানে তীব্র বিভেদ প্রবণতায় ভুগছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীই হলো পাকিস্তানের মৌলিক উপাদান। আর কোন জিনিসের মৌলিক উপাদান যদি পরস্পরে যুক্ত ও সংহত না হয়, তা হলে তার অস্তিত্ব টিকে থাকা দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। তার সত্তার অংশগুলোতে বিচ্ছেদ প্রবণতা দেখা দেয়ার অর্থই হলো তার গঠন প্রক্রিয়াতেই কোন ত্রুটী লুকিয়ে রয়েছে। সুতরাং পাকিস্তানের মৌলিক উপাদানগুলোতে যে ঐক্য ও সংহতির পরিবর্তে বিভেদ ও

বিচ্ছিন্নতার কিছু কিছু প্রবণতা বিদ্যমান এবং কিছু কিছু শক্তি যে এ প্রবণতাকে আরো তীব্র করার চেষ্টায় নিয়োজিত সে কথা কে অস্বীকার করতে পারে? আর এ কথা যখন সত্য, তখন আমাদের বুঝতে হবে যে, আমাদের সংহতির বন্ধনে, বরং আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে আমাদের জাতিসত্তার মূল গাথুনীতেই একটা মারাত্মক ফাটল রয়ে গেছে। এ ফাটল দূর না করে আমারা নিজেদেরকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হবো না।

পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীরূপী উপাদানগুলোতে বর্তমানে তিন ধরনের বিভেদাত্মক লক্ষণ সুস্পষ্ট।

প্রথম বিভেদ মোহাজের ও স্থানীয়দের মধ্যে বিরাজ করছে। আমাদের জনগণের মধ্যে মোহাজেরদের সংখ্যা ৭০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে এবং তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কেননা ভারতের প্রত্যেক এলাকা থেকে মুসলমানরা বাস্তুচ্যুত হয়ে দলে দলে পাকিস্তানের দিকে চলে আসছে। পূর্বভারতীয় অঞ্চলের মুসলমানরা আসছে পূর্ব পাকিস্তানে আর ভারতের অন্যান্য এলাকার লোকেরা ছুটছে পশ্চিম পাকিস্তান অভিমুখে।[১] এই নতুন জনগোষ্ঠী এখন আমাদের দেশের চিরস্থায়ী অধিবাসী এবং সংখ্যার দিক দিয়েও তারা নগণ্য নয়। কিন্তু একাধিক কারণে এই নবাগত জনগোষ্ঠী ও আদি অধিবাসীরা মিলে একক জাতিতে পরিণত হতে পারছে না। এর মধ্যে কিছু রয়েছে ভাষা, সংস্কৃতি, লোকাচার, আদত-অভ্যাস ও রীতিপ্রথার স্বাভাবিক পার্থক্য, যা কিছুকাল পর্যন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করতে বাধ্য কিন্তু একটি জিনিস এ ব্যবধানকে অস্বাভাবিক রকমে বাড়িয়ে তুলেছে। সে জিনিসটি হলো মোহাজের ও আদি অধিবাসী--উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে জাহেলিয়াত সুলভ বিদ্বেষ, রেষারেষী এবং বৈষয়িক স্বার্থপরতা। এ জিনিসটির দরুন প্রতিটি ক্ষেত্রে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে এবং উভয় গোষ্ঠী পরস্পরের শত্রুদল হিসেবে সংগঠিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে এবং উভয় তরফের কূপমন্ডুক ও মতলববাজ কুচক্রীরা তাদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধাচ্ছে।[২]

---

১. ১৯৫০ সালে খোখরাপারের পথ ধরে আগত মুসলমানদের সংখ্যা প্রথমে ছিল ২,৬৮,৮৯৯ এবং পরে ক্রমান্বয়ে এই সংখ্যা ৬ লাখে উপনীত হয়। ১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণকারী বিহার থেকে আগত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৭ লাখ। (নতুন)

২. অবশেষে পূর্ব পাকিস্তানে মোহাজেরসহ সকল অবাঙ্গালী মুসলমানদের সাথে বাঙালী মুসলমানরা যে আচরণ করে তা হিংস্রতা ও নৃশংসতায় ভারতের মুসলমানদের ওপর শিখ ও হিন্দুদের পরিচালিত যুলুমকেও হার মানিয়ে দেয়। (নতুন)

দ্বিতীয় বিভেদটি হলো ভৌগলিক, প্রজন্মগত ও ভাষাগত। পাকিস্তান প্রথমত এমন দুটো ভূখন্ড নিয়ে গঠিত, যার মাঝখানে এক হাজার মাইলের ব্যবধান বিদ্যমান। অধিকন্তু এ ভূখন্ডগুলোও আভ্যন্তরীনভাবে ঐক্যবদ্ধ নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন অংশের সমষ্টি এবং প্রতিটি অংশ অপর অংশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে। বর্তমানে আমরা প্রকৃতপক্ষে এক জাতি নই। আমরা পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি--যাকে কৃত্রিমভাবে একটি রাজনৈতিক ঐক্যসূত্রে গ্রোথিত করা হয়েছে অর্থাৎ সিন্ধী, বেলুচী, পাঠান, পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী। এদের প্রত্যেকের মধ্যে তীব্র বিচ্ছেদ প্রবণতা রয়েছে আর কতিপয় নির্বোধ গোষ্ঠী এ বিচ্ছেদ প্রবণতাকে আরো জোরদার করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।[১]

তৃতীয় বিভেদটা অর্থনৈতিক। ধনী ও গরীব, ভূস্বামী ও ক্ষেতমজুর উচ্চ বেতনভূক কর্মকর্তা ও নিম্নপদস্থ কর্মচারী এ সব বিবিধ শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক অবিচারের দরুন বিভেদ জন্ম নিয়েছে। তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির সম্পর্ক নেই। রয়েছে হিংসা ও বিদ্বেষের সম্পর্ক। এরা একে অপরের সহায়ক ও রক্ষক নয় বরং প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ। তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমাদের মধ্যে এমন একটি গোষ্ঠীও বিদ্যমান যাদের চিরাচরিত দর্শনই এই যে, এ দু' শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার ধারণা অচল ও ভ্রান্ত। তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেয়াই সঠিক কাজ।[২]

---

১. পাকিস্তান আন্দোলনের সময় মুসলিম জাতীয়তা ও মুসলমানদের জাতীয় ঐক্যের পক্ষে যেভাবে ধ্বনি তোলা হয়েছিল তাতে এরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, এ সব ভিন্ন ভিন্ন ভৌগলিক, ভাষাগত ও বংশগত জনগোষ্ঠীগুলো একক ইসলামী জাতীয়তায় বিলীন হয়ে গেছে এবং ঐসব অনৈসলামিক বিভেদ আর তাদের মধ্যে অবিশিষ্ট নেই। কিন্তু পাকিস্তান হওয়া মাত্রই এ সব বিভেদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এ সব অনৈসলামিক রেষারেষী উস্কে দেয়ার কাজটাও সেই সাথেই আরম্ভ করে দেয়। অথচ দীর্ঘ ২৫বছর ধরে যারা পাকিস্তানের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল, তারা এ সব জনগোষ্ঠীকে একিভূত করার জন্য কিছুই করেনি। বরঞ্চ বিচ্ছিন্নতাকামীদের নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছে। এর পরিণামেই আজ পূর্ব পাকিস্তান আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন তো হয়েছেই। অধিকন্তু অবশিষ্ট পাকিস্তানে ও চারটি জাতির আলাদা আলাদা সত্তার স্বপক্ষে শ্লোগান উঠছে প্রকাশ্যভাবে। (নতুন)

২. এ আপদটিও দীর্ঘ ২৫ বছরে লালিত হয়ে বেশ শক্তিশালী হয়েছে। ফলে এখন এই ইসলামী দেশে প্রকাশ্যভাবে সমাজতন্ত্রের আহবান জানানো হচ্ছে। মুসলিম সমাজকে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে শ্রেণীযুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। (নতুন)

আমাদের রাষ্ট্র ও জাতিকে টুকরো টুকরো করতে উদ্যত এ সব বিভেদ ও বৈষম্যকে বিকশিত ও পরিপুষ্ট করার আভ্যন্তরীন উপরকণ যেমন রয়েছে, তেমনি তাকে উস্কে দেয়ার বাহ্যিক উপকরণও বিদ্যমান। এমতাবস্থায় স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এ বিভেদ ও বৈষম্যকে নির্মূল করার উপায় কি? নিরেট শক্তির বলে এ বিভেদকে দমন করে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ঐক্য ও তার নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখা কিছুটা সম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন উন্নয়ন ও বহিরাগত হুমকির মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য যে হৃদয়ের ঐক্য প্রয়োজন, তা কখনো এভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। বিভেদক্লিষ্ট মন ও মুষ্টিবদ্ধ হাত নিয়ে কোন জাতি যেমন দেশগড়ার কাজে সহযোগিতা করতে পারে না, তেমনি প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার বেলায়ও শীষাঢালা প্রাচীরের মত রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হয় না। জাতীয়তাবাদী প্রচারণা দ্বারাও এ ক্ষেত্রে কোন লাভ হয় না। ভারতে আমরা এর পরিণতি দেখেছি। পাশ্চাত্য ধ্যান–ধারণা মোতাবেক জাতীয়তার প্রচারাভিযান ভারতে যতই তীব্রতর করা হয়েছে, তার ফলে জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টির পরিবর্তে জাতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজ নিজ স্বতন্ত্র জাতিসত্তারঅনুভূতি ততই জাগ্রত ও শাণিত হয়েছে। তা ছাড়া অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত তো এমন এক বস্তু, যার বিষাক্ত প্রভাব নির্মূল করতে জাতীয়তাবাদ সর্বত্রই ব্যর্থ হয়েছে ও হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমরা জানতে চাই যে, আমাদের বর্তমান নেতৃত্বের কাছে এ সমস্যার কি সমাধান রয়েছে এবং এর সমধানে এর যোগ্যতাইবা কতটুকু আছে।

কারো এরূপ ধারণা হওয়া চাই না যে, সদ্যপ্রসূত রাষ্ট্র পাকিস্তান অন্যান্য যেসব সমস্যার সম্মুখীন তার ব্যাপারে আমরা উদাসীন। পাকিস্তান হওয়ার পর উদ্ভুত সেই সব আর্থিক, শিল্প সংক্রান্ত, প্রশাসনিক, বৈদেশিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাবলীও মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেগুলোর দিকে মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করে না। আর এ সব ক্ষেত্রে বর্তমান নেতৃত্ব যেটুকু বাস্তব অবদান রেখেছে, তাকে অবজ্ঞা করাও ন্যায়সঙ্গত নয়। কিন্তু আমি মনে করি, মুসলমানদের জাতীয় জীবনের পক্ষে বর্তমানে উল্লিখিত তিনটে সমস্যাই সর্বাধিক গুরুত্ববহ। এগুলোর সুষ্ঠু সমাধান করার নৈতিক ও আদর্শিক যোগ্যতা কতটুকু আছে, সেটাই নেতৃত্বের মান যাচাইএর আসলকষ্টিপাথর।

(তরজুমানুল কুরআন, আগস্ট, ১৯৪৮)

পাকিস্তানের কি ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া উচিত?

(পাকিস্তান গঠিত হওয়ার সাথে সাথেই দেশটিকে ইসলামী রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলাতে কি কি সমস্যা ও অসুবিধা আছে তা নিয়ে বাকবিতন্ডা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কোন কোন মহল থেকে এ মর্মে যুক্তি প্রদর্শন করা শুরু হয়ে গিয়েছিল যে, দেশটির একটি ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়াই সঙ্গত। ১৯৪৮ সালের মে মাসে রেডিও পাকিস্তানের লাহোর কেন্দ্র থেকে যে প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক আলোচনা প্রচারিত হয়, তা থেকেই এ বিতর্কের আভাস পাওয়া যায়। এতে প্রশ্নকর্তা ছিলেন জনাব ওয়াজিহুদ্দীন এবং উত্তরদাতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী)

প্রশ্নঃ এ আলোচনার সূত্রপাত করার আগে সম্ভবত জেনে নেয়া বাঞ্ছনীয় যে, আপনি ধর্মীয় রাষ্ট্র বলতে কি বুঝেন?

মাওলানা মওদূদীঃ এ কথা বলাই বাহুল্য যে, একজন মুসলমান যখন ধর্ম শব্দটি উচ্চারণ করে, তখন সে তার দ্বারা ইসলামই বুঝে, অন্য কিছু নয়। আমি যখন বলি যে, পাকিস্তানের একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র হওয়া উচিত, তখন আমার কাছে তার অর্থ এ হয়ে থাকে যে, এর ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ এমন একটি রাষ্ট্র যা নৈতিকতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, রাজনীতি ও অর্থনীতির যে মূলনীতিগুলো ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে, তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্নঃ আপনি ধর্মীয় রাষ্ট্রের যে তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, তা থেকে মনে হয় যে, এ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা একটি ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ মহলের অধিকারে থাকবে। এ মহলটির কাজ হবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে তত্ত্বানুসন্ধান করা, রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করা এবং শরীয়াতের বিধিমতে প্রত্যেক রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা। এখন প্রশ্ন জাগে যে, এ মহলটির পৃষ্ঠপোষক কারা হবে? এ কথা তো আপনার জানাই আছে যে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমাদের সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রতিটি শ্রেণী নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ধর্মীয় বৈধতা অনুসন্ধান ও ধর্মীয় শ্লোগান কাজে লাগানোর চেষ্টায় নিয়োজিত। ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ শ্রেণীটি এ শ্রেণী দ্বন্দ্বের স্বপ্রবমুক্ত এবং তার ব্যাপারে নির্লিপ্ত ও বেপরোয়া থাকতে পারে না। তাকে হয় জনসধারণের পক্ষে থাকতে হবে, নচেৎ পুঁজিপতি ও যোতদারদের সমর্থক হতে হবে। এ ক্ষেত্রে কুরআনের মূলনীতিসমূহের যে ব্যাখ্যাই করা হবে, তাতে ঐ শ্রেণীটির রাজনৈতিক আশা আকাংখারই প্রতিফলন ঘটবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাধারার অধিকারী মুফাস্সিরদের (কুরআন ব্যাখ্যাতা) মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর ব্যাপারে গুরুতর মতভেদের সৃষ্টি হবে। অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব এক সীমাহীন শাস্ত্রীয় বিতর্কের রূপ ধারণ করবে। যেসব সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করা আশু প্রয়োজন, কোন কালেও তার সমাধানহবেনা।

মওদূদী ঃ যে শ্রেণী দ্বন্দ্বের কথা আপনি বলছেন, আসলে তা সৃষ্টিই হয়েছে এ জন্য যে, দীর্ঘকাল ব্যাপী অনৈসলামী ব্যবস্থার প্রভাবাধীন থাকার দরুন আমাদের সমাজ ইসলাম প্রদত্ত নৈতিক চেতনা ও ইনসাফ নিশ্চিতকারী মূলনীতিসমূহ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। যে বস্তুবাদ ও ভোগবাদ দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে এবং তাদের সমাজে স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি করেছে, দুর্ভাগ্যবশত সেই একই বস্তুবাদ ও ভোগবাদ আমাদের সমাজকেও বহুধা বিভক্ত করার ও পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত করার হুমকি দিচ্ছে। আমরা সবেমাত্র সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ভয়াবহ কুফল ভোগ করলাম এবং সেই সাম্প্রদায়িক সংঘাতজনিত ক্ষতে এখানো আমাদের সমাজদেহ জর্জরিত। যে সমাজ দর্শন আমাদের মধ্যে নতুন করে শ্রেণীযুদ্ধ বাঁধাবে এবং এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে সম্পূর্ণ নিশ্চহ্ন করে না দেয়া পর্যন্ত আমাদেরকে শান্তির মুখ দেখতে দেবে না। তা আমরা এখন আর গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। অন্যান্য জাতি এ সব দর্শনকে হয়তো এ জন্যই গ্রহণ করেছে যে,

শ্রেণীগত স্বার্থপরতার উদ্ভব রোধ করতে এবং সমাজের বিভিন্ন অংশকে একটি ইনসাফপূর্ণ ভ্রাতৃত্বে সমবেত করতে পারে, এমন নৈতিক ও ন্যায়ভিত্তিক আদর্শ তাদের কাছে ছিলনা। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমরা এমন একটা ব্যবস্থার ধারক ও বাহক, যা আমাদেরকে এ ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। শুধুমাত্র যে কাজটি আমাদের করা প্রয়োজন তা এই যে আমাদের মধ্যে যারা ইসলামের প্রাণশক্তিকে যথাযথভাবে উপলব্দি করে এবং শ্রেণীবিদ্বেষের উর্ধে উঠে ইসলামী আইনের নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা দিতে পারে, তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। অতপর এ সকল ব্যক্তি সর্বসম্মতভাবে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে যে ব্যাখ্যা আমাদের সামনে তুলে ধরবে, তা আমাদের সকলকে মেনে নিতে হবে এবং আমাদের মধ্যকার কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর নিজস্ব স্বার্থপ্রণোদিত ব্যাখ্যা আদায়ের জন্য জিদ ধরা চলবে না। সমগ্র জাতির কর্তব্য এ ধরনের লোকদের সংঘবদ্ধভাবে ও সর্বাত্মকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা। শুধু কতিপয় শ্রেণী বা গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা যথেষ্ট নয়। তাদেরকে নির্বাচনের সময় আমাদের শুধু এতটুকু লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মানের দিক থেকে তারা যেন নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী ও ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা করার যোগ্য হয়।

প্রশ্নঃ আমার বিনীত অভিমত এই যে, রাজনৈতিক অবকাঠামো ও বিধি–ব্যবস্থা প্রণয়নে শুধুমাত্র আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততায় কাজ চলতে পারে না। আমরা বর্তমানে বহু সংখ্যক জটীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন। এ সব সমস্যা নিয়ে আমাদের ঠান্ডা মাথায় চিন্তা–ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে। উৎপাদনের উপকরণকে জাতীয় মালিকানাভুক্ত করা উচিত না ব্যক্তিমালিকানায় রাখা উচিত? রাষ্ট্রে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকা উচিত না গণতন্ত্রের স্থায়িত্বের জন্য একাধিক রাজনৈতিক দল থাকা জরুরী? শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার থাকা উচিত কিনা? ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব জটীল প্রশ্নকে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের বিবেচনার জন্য পেশ করে দেখুন। তারা কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতেই পারবে না। এর প্রধান কারণ এই যে, রাষ্ট্র বিনির্মাণে ফেকাহশাস্ত্রীয় চিন্তা–গবেষণা এবং ধর্মীয় কেতাবপত্র ঘাটাঘাটির পরিবর্তে রাজনৈতিক পর্যালোচনা ও ঐতিহাসিক চেতনার প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের চাইতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা আমাদের ভালো নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।

মওদূদী : আপনি যখন "ধর্মীয় ব্যাপার" শব্দটা উল্লেখ করেন, তখন মনে হয়, "দুনিয়াবী ও বৈষয়িক ব্যাপারকে" তার বাইরে রেখে দেন। এ জন্য স্বাভাবিকভাবেই আপনার এ আশংকা জন্মেছে যে, বৈষয়িক বিষয়ে অজ্ঞ ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের কাছে আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর ভার অর্পণ করলে আমাদের কোন সমস্যারই সমাধান হবে না। তবে আপনি এ দিকটাও একটু বিবেচনা করে দেখুন যে, আমরা যদি আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীকে সেই সব বিশেষজ্ঞদের কাছে সমর্পন করি। যারা শুধুমাত্র পাশ্চাত্য মতবাদ ও কর্মপ্রক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে নিরেট মূর্খ, তা হলে আমাদের পরিণতিটা কি দাঁড়াবে? আপনি বলেন, এরা ধর্ম তাত্ত্বিকদের তুলনায় আমাদের উত্তম নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। কিন্তু আমার আশংকা এই যে, আজকের দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির যে পরিণতি হয়েছে, এ নেতৃত্ব আমাদেরও সেই পরিণতি ঘটিয়ে ছাড়বে। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শ্রেণী স্বার্থেরই সংঘাত এবং বাহ্যিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্বার্থপরতার টানাপোড়েন। তার চেয়ে আমাদের সমাজের সেইসব লোককে খুঁজে বের করাই কি সমিচীন নয় যারা ধর্ম ও দুনিয়াদারী দুটোই ভালো জানে, যারা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা এবং রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে সমান পারদর্শী আর যারা আমদের জটিল সমস্যাবলী নিয়ে সম্মিলিত চিন্তা-ভাবনা ও সলাপরামর্শের মাধ্যমে এমন সমাধান পেশ করবে যা আমাদের জীবনকে সমগ্র বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত করতে পারে?

প্রশ্নঃ পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ইসলামী শরীয়াত মোতাবেক সংগঠিত করা এবং শরীয়াতের বিধি- ব্যবস্থাকে বর্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বাস্তবায়িত করার বেলায় আমাদেরকে আরো একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আমরা অনেক সময় ধর্মীয় নির্দেশের মূল ভাবাদর্শকে ভুলে যাই এবং তার শাব্দিক রূপটাই শুধু আমাদের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে। এতে উদ্দেশ্য ও উপায়-উপকরণ মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। সূদের ব্যাপারটাই ধরুন। অর্থনৈতিক শোষণ রোধ করার লক্ষ্যেই সূদকে অবৈধ করা হয়েছিল। একই উদ্দেশ্যে ইজারাদারী, গোলাজাতকরণ ও চোরাকারবার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেবলমাত্র বৈধ বাণিজ্যকেই অনুমোদন করা হয়েছে। কেননা তৎকালে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সবেমাত্র শৈশব স্তরে অবস্থান করছিল এবং শিল্প পুঁজির মত তা যুলুম ও শোষণের হাতিয়ার ছিল না। এ যুগে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে।

আজকের যুগে বহির্বাণিজ্যের অর্থই হলো সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে শক্তি যোগানো এবং অপরাপর জাতিকে রাজনৈতিকভাবে দাবিয়ে রাখা। বৈধ ও অবৈধ বাণিজ্যের ব্যবধান ঘুচে গেছে। কিন্তু আমাদের আলেম সমাজ যখন অর্থনৈতিক ব্যাপারে ফতোয়া দেন তখন বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মহাজনী সুদের যে কোনই গুরুত্ব নেই সে কথা ভুলে যান। শিল্প পুঁজি ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে তারা বৈধ বলে ফতোয়া দেন। অথচ এ দুটোই দারিদ্র ও অনটনের উৎস।

মওদূদী : যে সমস্যাটার আপনি উল্লেখ করেছেন, তা যেখানেই আইনের উদ্দেশ্য ও ভাবদার্শকে উপেক্ষা করে কেবল তার শাব্দিক রূপকে গ্রহণ করা হয় সেখানেই দেখা দেয়। কোথাও এ সমস্যার উদ্ভব হয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অভাবে, আবার কোথাও তা দেখা দেয় এ জন্য যে, স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে আইনের মৌল ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে জনগণ বিদ্রোহ করে। অথচ নিজেদের বাহ্যিক ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্ত আইনের বাহ্যরূপ পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকে। এ সমস্যা থেকে আমাদের নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায় এই যে, সাধারণ মুসলমানদের ইসলামের চেতনা ও উপলব্ধি এবং তার সত্যিকার অনুসরণের ইচ্ছা থাকতে হবে। এ জিনিসটা যদি বহাল থাকে তা হলে তারা ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা দানের জন্য নিজেদের মধ্য থেকে এমন লোকদেরকেই নির্বাচন করবে, যারা কুরআন ও সুন্নাহর শুধু শব্দ নয় তার মূল ভাবাদর্শও উপলব্ধি করে।

প্রশ্ন : শরীয়াতের ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছাড়াও নিরেট ধর্মীয় মতভেদ যেটুকু রয়েছে, সে সম্পর্কে আপনার মত কি? আপনার দৃষ্টিতে কি এ সব মতভেদ ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যথার্থ ধারণা দেয়ার পথে প্রতিবন্ধক হবে না।

মওদূদী : এ সব মতভেদ আমাদের অন্যান্য মতভেদের মতই এবং আমরা অন্যান্য মতভেদ যেভাবে মীমাংসা করে থাকি, এগুলোর মীমাংসাও সেভাবেই করতে পারি। মানুষের দ্বারা গঠিত কোন সমাজেই জীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন মতামত না থেকে পারে না। কিন্তু মতের এ বিভিন্নতাকে কোথাও এত বড় প্রতিবন্ধক হতে দেয়া হয় না যে, সামগ্রিক জীবন যাত্রাই অচল হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। মতবিরোধ মীমাংসার গণতান্ত্রিক রীতি এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হবে এবং

সংখ্যালঘুর দৃষ্টিভঙ্গীকে মূলনীতির আলোকে যতটুকু আমল দেয়ার অবকাশ থাকে কেবল ততটুকুই দিতে হবে। তা ছাড়া সংখ্যালঘু হিসাবে তাদের বিধিসম্মত অধিকার সমূহ ন্যায়সঙ্গতভাবে নিশ্চিত ও সংরক্ষিত করতে হবে। ইসলামের যে উদারতম মূলনীতিসমূহের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক ঐকমত্য বিদ্যমান, পাকিস্তানের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সেই সব মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা চেষ্টা করবো। এতদসত্ত্বেও এ সব ব্যাপক ভিত্তিক মূলনীতির ওপর নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে একমত হতে পারবে না এমন কিছু গোষ্ঠী থাকতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে আমি এই মাত্র যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কথা বললাম সেটাই অবলম্বন করতে হবে। নচেৎ ইসলামের পক্ষে একমত হতে না পারার কারণে আমরা যদি ইসলামের বিরুদ্ধে একমত হই, তবে সেটা হবে একটা রীতিমত উদ্ভট ব্যাপার।

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ মতভেদ ছাড়াও পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের সমস্যাও ভেবে দেখার মত। মুসলমানদের ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে মেনে নিতে এবং তার অনুগত থাকতে তাদেরকে আপনি কিভাবে রাজী করবেন?

মওদূদী ঃ মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ সমস্যার সমধান যা, এ সমস্যার সমাধানও তাই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে যে নীতি সঠিক, সেই নীতি অনুসারেই দেশের শাসন ব্যবস্থা গঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ তার মতামতকে বিবেচনা করা এবং তার নাগরিক অধিকার, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত বিধিকে সংরক্ষণের দাবী জানাতে পারে। কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে সে এরূপ দাবী জানাতে পারে না যে, তার খাতিরে সংখ্যাগুরু স্বীয় মতামত পাল্টে ফেলুক। এ দেশের সংখ্যাগুরু জনগণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ মত পোষণ করে যে, ইসলামের আদর্শ ও মূলনীতিসমূহ অনুসরণ করার মধ্যেই পাকিস্তানের জনগণের কল্যাণ নিহিত। তাদের মতানুসারেই দেশের যাবতীয় কর্মকান্ড চলবে, এ অধিকার তাদের থাকা উচিত। সংখ্যালঘু তাদের কাছ থেকে নিজের অধিকারের নিশ্চয়তা চাওয়ার অধিকারী। কিন্তু সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী ইসলাম বাদ দিয়ে অন্যান্য নীতি ও আদর্শের মধ্যে নিজের কল্যাণ অনুসন্ধান করুক--এমন কথা বলার তার অধিকার নেই। আর আনুগত্যের প্রশ্ন? কোন রাষ্ট্র ধর্মীয় হবে না ধর্মহীন হবে, তার সাথে আনুগত্যের কোন সম্পর্ক নেই। সংখ্যগুরু জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘুদের সাথে কিরূপ ইনসাফ, ভদ্রতা ও উদারতার আচরণ করতে

পারে, তার ওপরই তাদের আনুগত্য নির্ভর করে। সংখ্যালঘুকে শুধু এরূপ লোক দেখানো কথা বলে আশ্বস্ত করা যাবে না যে, এই দেখ, তোমাদের খাতিরে আমরা ধর্মত্যাগী হলাম এবং একটা ধর্মহীন রাষ্ট্র বানালাম। সংখ্যালঘু দেখবে যে, আমরা তাদের সাথে ইনসাফ করি কিনা। আমাদের আচরণ, বিদ্বেষ ও সংকীর্ণ মানসিকতাসুলভ, না উদারতা ও মহানুভবতায় পরিপূর্ণ। আসলে এ অভিজ্ঞতা দ্বারাই স্থিরীকৃত হবে যে, সংখ্যালঘুরা ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত হয়ে থাকবে কিনা।

প্রশ্ন ঃ আমার মতে, প্রত্যেক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবকাঠামো তার অধিবাসীদের লোকাচার, চরিত্র, রীতিপ্রথা, বিশ্বাস ও ধ্যান–ধারণার প্রতিক হয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্বয়ং কোন দর্শন বা ধর্মের বাহক হয় না। তাকে যদি এরূপ করার চেষ্টা করা হয় তা হলে সেটা হবে একটা কৃত্রিম ও নিষ্ফল চেষ্টা। প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্র প্লেটোর চিন্তার ফসল ছিল না বরং গ্রীসবাসীর প্রচলিত সাধারণ জীবন দর্শন ও চিন্তাধারার ফসল ছিল। অনুরূপভাবে আমরা যদি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে চাই, তা হলে আমাদের পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বিশুদ্ধ ইসলামী চেতনা সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদেরকে ইসলামের সত্যিকার মূল্যবোধের সাথে পরিচিত করতে হবে। এ মূল্যবোধ যখন বদ্ধমূল হবে এবং আমাদের জাতীয় চরিত্রে ইসলামী ধারণা–বিশ্বাসের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটবে, তখন আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা আপনা থেকেই ইসলামী রূপ ধারণ করবে। যতক্ষণ আমাদের আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন ইসলামী ঐতিহ্যের পরিপূর্ণ দীপ্তি সহকারে উদ্ভাসিত না হবে, ততক্ষণ আমরা ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি পত্তন করতে সমর্থ হবনা। আমার মনে হয়, আমাদের পরিপূর্ণরূপে ইসলামী আদর্শে দীক্ষিত হওয়ার দিনটি এখনো বেশ দূরে রয়েছে। তাই এক্ষুণি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার সময় আসেনি। আমাদের ভিত্তি এখনো এতটা পোক্তা হয়নি যে, তার ওপর একটা দালান গড়তে পারি।

মওদূদী ঃ একটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার অধিবাসীদের নৈতিক ও মানসিক অবস্থার প্রতিক হয়ে থাকে–এ কথাটা আপনি সঠিক বলেছেন। এখন পাকিস্তানের অধিবাসীদের যদি ইসলামের প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ থেকে থাকে এবং তাদের মনে ইসলামের পথে অগ্রসর হবার অদম্য আকাংখা বিরাজমান থেকে থাকে, তা হলে তাদের যে, জাতীয় রাষ্ট্রটি গঠিত হয়েছে, তা তাদের এই আকর্ষণ ও আকাংখার প্রতিক কেন হবে না? আপনার এ উক্তি সম্পূর্ণ নির্ভুল ও যথার্থ যে আমরা যদি পাকিস্তানকে একটি ইসলামী

রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাই, তা হলে পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে আমাদের সত্যিকার ইসলামী চেতনা, ইসলামী মানসিকতা এবং ইসলামী চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা চালাতে হবে। কিন্তু আপনি স্বয়ং রাষ্ট্রকে এ চেষ্টায় অংশ গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে চান কেন, তা আমি বুঝতে পারলাম না। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব পর্যন্ত তো আমাদের ওপর একটা অমুসলিম সরকার চেপে বসেছিল। সে জন্য আমরা ইসলামী প্রক্রিয়ায় আমাদের জাতীয় জীবনকে গড়ে তোলার ব্যাপারে রাষ্ট্র, তার বিবিধ কার্যকর ক্ষমতা ও উপায়-উপকরণ থেকে কোন সাহায্য পাচ্ছিলাম না। বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষে সে সময় গোটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তার সমগ্র শক্তি দিয়ে আমাদেরকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে ইসলামী জীবন গড়ার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এখন ১৫ই আগষ্টে যে রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হলো, তার পরে আমাদের সামনে এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, এখন কি আমাদের এই মুসলিম রাষ্ট্রটি ইসলামী জীবন গড়ার জন্য নির্মাতার ভূমিকা পালন করবে? না সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও উদাসীন থাকবে? অথবা আমাদেরকে কি এখনো আগের মতই রাষ্ট্রীয় সাহায্য ছাড়াই শুধু নয়, বরং রাষ্ট্রের বাধা ও প্রতিরোধ উপেক্ষা করেই ইসলামী সমাজ গড়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে? যেহেতু এ মুহূর্তে পাকিস্তানের ভাবি রাষ্ট্র ব্যবস্থা কি রকম হবে, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে, তাই আমরা আশা করবো যে, ইসলামী জীবন গড়ে দিতে পারে এমন রাষ্ট্র হিসেবেই পাকিস্তানের উত্তরণ ঘটুক। আমাদের এ আশা যদি সফল হয়, তা হলে রাষ্ট্রের বিপুল ও ব্যাপক ক্ষমতা ও উপকরণাদি কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে মানসিক ও নৈতিক বিপ্লব সংঘটিত করা খুবই সহজ হয়ে যাবে। অতপর যে পরিমাণে আমাদের সমাজ বদলাতে থাকবে, সেই অনুপাতেই আমাদের রাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হতে থাকবে।

(তরজুমানুল কুরআন, জুন, ১৯৪৮, রেডিও পাকিস্তানের সৌজন্যে)

ইসলামী আইন[১]

আজকাল শুধু অমুসলিম দেশেই নয়, অনেক মুসলিম দেশেও যখন ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তখন প্রত্যেকেই বহুতর অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়। শতাব্দির পুরানো আইন কি বর্তমান যুগের সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট? একটি বিশেষ সময়ের আইনকে সবকালের জন্য গ্রহণযোগ্য মনে করা কি বোকামী নয়? এ উন্নত দিনেও কি হাতকাটা ও বেত্রাঘাতের মতো হিংস্র শাস্তি দেয়া হবে? আমাদের বাজারে কি তবে আবার গোলামের বেচাকেনা চলবে? তদুপরি মুসলমানদের কোন্ দলের আইন (ফেকাহ্) এখানে জারি হবে? অতপর অমুসলিম যারা এ সমাজে বাস করছে তারা কিভাবে এটা মেনে নেবে যে, তাদের ওপর মুসলমানদের ধর্মীয় আইন চালু করা হবে? এ ধরনের জন্য অনেক প্রশ্ন আছে, যা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কথা উঠলেই আপনার সম্মুখে এনে উপস্থিত করা হবে। এ সব কথা যে শুধু অমুসলিমদের মুখেই শোনা যায় তা নয়--মুসলমানদের মধ্যেও বহু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের মুখেও আজকাল এ সব শোনা যায়।[২]

---

১. এটি ১৯৪৮ সালের ৬ জানুয়ারী ল' কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতা

২. মনে রাখা দরকার, পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে এ শ্রেণীটি এ সব প্রশ্নে মুখ খোলেনি। বরঞ্চ তারা মুসলমানদের নিশ্চয়তা দিচ্ছিল যে, আমাদেরকে আমাদের জীবনদর্শন অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য একটি পৃথক দেশ প্রয়োজন। কিন্তু দেশটি হস্তগত হবার পর তারা সে সব প্রশ্ন উত্থাপন শুরু করে।.

এর কারণ এ নয় যে, এদের সাথে ইসলামের কোন শত্রুতা আছে, সত্যিকার অর্থে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এদের মনে এ সব প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। মানুষের চরিত্রই হচ্ছে, যে বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞান নেই, তার নাম শুনলেই তার মনে নানা রকম ধোঁকা ও প্রশ্ন সৃষ্টি হয় এবং দূরের সে জিনিসের প্রতি তার মনে ভালোবাসার পরিবর্তে ভীতির সঞ্চারই হয় বেশী। আমাদের দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ ইতিহাসের এও একটি দুঃখজনক অধ্যায় যে, আজ শুধু বাইরের লোকেরাই নয়, আমাদের স্বজাতির লোকদের অধিকাংশও তাদের দীন-ধর্ম থেকে এবং তাদের পূর্ব পুরুষদের বিশ্বাস ও উত্তরাধিকার থেকে রীতিমত অজ্ঞ ভীত-সন্ত্রস্ত। এ অবস্থায় কিন্তু আমরা রাতারাতি এসে পড়েনি। দীর্ঘদিনের অধোপতনের ফলেই আমরা এ অবস্থায় এসে পৌঁছেছি, সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমাদের মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির উত্থান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বলতে গেলে বন্ধই ছিল। এ স্থবিরতার ফলেই আমাদের ওপর রাজনৈতিক অধোপতন এলো। দুনিয়ার মুসলমান জাতিসমূহ হয়তো কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের অধীন হয়ে গেল, নতুবা তাদের মধ্যে দু'এক জাতির এতোটুকু স্বাধীনতা অর্জিত হলো, যা কোন অবস্থায় গোলামীর চেয়ে উন্নততর ছিল না, কেননা পরাজিত মানসিকতার প্রভাব তাদের মন-মগজের অভ্যন্তরে তখনো বিদ্যমান ছিল। পরিশেষে একদিন যখন আমরা অধপতন থেকে দাঁড়াতে চাইলাম, তখন সব মুসলমান--চাই সে সরাসরি অন্যের গোলাম হোক কিংবা নামে মাত্র স্বাধীন, তার দাঁড়াবার একই পদ্ধতি সর্বত্র দেখা গেলো এবং তা হলো, নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্য নেয়া। আমাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অনুবর্তনকারীরাও সেই সার্বিক অধোপতনের শিকার ছিল, যাতে গোটা জাতিই আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। ধর্মের ভিত্তিতে কোন সৃষ্টিধর্মী বিপ্লবাত্মক তৎপরতা দেখানো ছিল তাদের সাধ্যের অতীত। তাদের পথপ্রদর্শন থেকে নিরাশ হয়ে জাতির অবশিষ্টাংশ ঐ জীবন বিধানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেল, সুস্পষ্টভাবে যাকে তখন খুব কামিয়াব দেখা যাচ্ছিল, তা থেকেই তারা জীবনের মূল নীতি গ্রহণ করলো, তারই জ্ঞান শিখলো, তাদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুকরণ করলো এবং সর্বস্তরে তাদেরই পথকে অনুকরণ করলো। আস্তে আস্তে ধর্মীয় দলের লোকেরা চার দেয়ালের মধ্যেই নিক্ষিপ্ত হলো, সারা দুনিয়ার মুসলমানদের

নেতৃত্বের বাগডোর ও সক্রিয় শক্তিসমূহ এদেরই হাতে এসে গেল। আর এরা ছিল আমাদের দীন ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও আধুনিক সভ্যতার মানসপুত্র। পরিণাম এই হলো, দু'একটি ব্যতীত সব স্বাধীন মুসলিম দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষতার অনুকরণে পরিচালিত হলো। এগুলোর কোথায়ও হয়তো পুরো ইসলামী শরীয়াতই তুলে দেয়া হলো, কোথাও মুসলমানদের জন্য তাদের ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত ইসলামী শরীয়াতের অনুমোদন দেয়া হলো অর্থাৎ মুসলমানদের তাদের নিজ দেশে শুধু ততটুকু ধর্মীয় অধিকার দেয়া হলো, বা একদিন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা জিম্মীদের প্রদান করতো[১] এভাবে যেসব দেশ পরাধীন, সে সব দেশেও যাবতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক

---

১. ইসলামী শরীয়াতকে তুলে দেবার কাজ সর্বপ্রথম হিন্দুস্থানে শুরু হয়েছে। এখানে ইংরেজদের কৃর্তত্ব লাভের পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত শরীয়াতকেই আইনের ভিত্তি গণ্য করা হতো, এ কারণেই ১৮৯১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এ দেশে চোরের হাত কাটা হতো, কিন্তু এর পরবর্তি সময়ে ইংরেজরা আস্তে আস্তে ইসলামী আইনের স্থলে অন্য আইন প্রতিষ্ঠা করতে লাগলো, উনবিংশ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে পুরো শরীয়াতই তুলে দেয়া হলো এবং শরীয়াতের শুধু সে অংশই মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন হিসেবে রাখা হল যা বিয়ে, তালাক ইত্যাদির সাথে জড়িত। অতপর এ পথ ধরে তারাও চলতে লাগলো, যেসব মুসলিম দেশে মুসলমানদেরই শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিলো। হিন্দুস্থানের সব মুসলিম রাজাগুলো আস্তে আস্তে নিজেদের আইন-কানুনগুলোকে বৃটিশ ভারতের পুনর্গঠিত করে নিলো এবং শরীয়াতকে শুধু ব্যক্তিগত আইনের সীমাবদ্ধ করে দেয়া হলো। ১৮৮৪ সালে মিশর তার পুরো আইন ব্যবস্থাকেই ফরাসী আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিলো। শুধু বিয়েশাদী তালাক ও মীরাসী আইনের ক্ষেত্রেই কাজীদের স্বীকার করা হলো। তারপর বিংশ শতকে আলবেনিয়া ও তুরস্ক আরেকটু অগ্রসর হলো। তারা পরিষ্কার করেই এই কথা ঘোষণা করলো যে, তাদের দেশ ধর্ম বিবর্জিত। তারা নিজেদের আইন-কানুনকে ইটালী, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর অনুকরণে ঢেলে সাজিয়েই ক্ষান্ত হয়নি--মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনেও এমন সব সুস্পষ্ট পরিবর্তন, পরিবর্ধন শুরু করতে শুরু করলো, যার সাহস ইতিপূর্বে কোন অমুসলিম দেশও করেনি। আলবেনিয়ার একাধিক বিয়েকে আইনের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো, তুরস্কে তো বিয়ে, তালাক ও উত্তরাধিকার আইনে কুরআনের সুস্পষ্ট আদেশ নিষেধকেই লংঘন করা হয়েছে। এরপর শুধু সৌদি আরব ও আফগানিস্তান দু'টি রাষ্ট্রই এমন থেকে গেল, যেখানে শরীয়াতের আইনকে রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হলো, যদিও শরীয়াতের মূল স্পিরিট সেখান থেকেও অনুপস্থিত ছিল। (স্মরণীয় যে, প্রবন্ধনটি ১৯৪৮ সালে লিখা-অনুবাদক)

আন্দোলনের নেতৃত্ব একই ধরনের লোকদের হাতেই এসে গেল এবং স্বাধীনতার দিকে তাদের যাত্রা যতোই এগুলো ততোই তা এমন স্থানেই নিয়ে উপনীত হলো, যেখানে অন্য স্বাধীন দেশসমূহ পূর্বেই পৌঁছেছে। এখন যদি তাদের কাছে ইসলামী আইন ও ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবী করা হয়, তা হলে এরা তা দমন করতে অনেকটা বাধ্য হয়ে পড়ে, কারণ এদের ইসলামী আইন ও শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কোনই জ্ঞান নেই। যা কিছু তাদের কাছে দাবী করা হলো তার সম্পর্কেও তারা কিছু জানে না। যে শিক্ষা ও মানসিক প্রশিক্ষণ তারা পেয়েছে তা তাদেরকে ইসলামী আইনের উৎস ও জীবনী শক্তি থেকে এতো বেশী দূরে নিয়ে গেছে যেখানে থেকে ইসলামী শরীয়াতকে বুঝা তাদের জন্য খুব সহজ ছিল না। অপরদিকে তখন ধর্মীয় নেতাদের নেতৃত্বে দীন শিক্ষার যে ব্যবস্থা এখানে প্রচলিত ছিল তা সেদিন পর্যন্ত বিংশ শতকের জন্য দ্বাদশ শতকের লোক তৈরীতেই ব্যস্ত ছিল। তাছাড়া এমন কোন দলও সমাজে তখন বর্তমান ছিল না যারা পশ্চাত্যের অনুসারীদের সরিয়ে একটি আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়তে কিংবা চালাতে পারে।

এ ছিল সত্যিই এমন এক জটিলতা, যা সারা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইন ও শাসনতন্ত্রের বাস্তবায়ন করাকে অনেকাংশে একটি কঠিন কাজে পরিণত করে রেখেছে। কিন্তু আমাদের ব্যাপার অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের তুলনায় ভিন্নতর। আমরা এই ভারতীয় উপমহাদেশে বিগত বছরগুলো ধরে এ জন্যই সংগ্রাম করছি যে, আমাদের একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা, একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ এবং জীবনের একটি বিশেষ লক্ষ্য রয়েছে। আমাদের জন্য মুসলমান ও অমুসলমানদের একই জাতীয়তা কোন অবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তাদের জীবন ব্যবস্থা অবশ্যই আমাদের জীবন লক্ষ্যের সাথে খাপ খাবে না। এ জন্য আমাদের একটি স্বতন্ত্র ভূখন্ড দরকার ছিল, যেখানে আমরা আমাদের স্বকীয় আদর্শ মোতাবেক দেশ গড়তে ও চালাতে পারবো। একটি দীর্ঘ ও কষ্টকর দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের পর অবশেষে আমরা সে ভূ-খন্ডটি লাভ করেছি, যার জন্য এতোদিন ধরে আমরা দাবী জানিয়ে আসছিলাম এবং এরই মূল্য পরিশোধ করতে গিয়ে আমাদের লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের জানমাল ও ইজ্জত দিতে হয়েছে। এ সব কিছুর পরও যদি এখানে আমরা সেই জীবন লক্ষ্য বাস্তবায়িত না করি, সত্যিকার অর্থে যার জন্য এতো

বিরাট মূল্য পরিশোধ করে এ ভূ–খন্ড অর্জিত শাসনতন্ত্রের স্থলে ধর্মহীন গণতান্ত্রিক শাসন- ব্যবস্থা ও ইসলামী আইনের পরিবর্তে যদি ভারতীয় দন্ডবিধি ও ফৌজদারী বিধি–বিধানই জারি করতে হয় তাহলে হিন্দুস্থান কি ক্ষতি করেছিল যে, তার পরিবর্তে এতো ঝগড়া ফাসাদ করে পাকিস্তান লওয়া দরকার হয়ে পড়লো। যদি আমাদের কর্মসূচী সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠাই হয়, তাহলে এই 'মহান কাজ' তো হিন্দুস্থানের সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট পার্টির সাথে মিলেমিশেই আঞ্জাম দেয়া যেতো। এর জন্যও এমন কোন দরকার ছিল না যে, অযথা এতো প্রাণান্তকর সংগ্রামও এতো বেশী মূল্য দিয়ে পাকিস্তান অর্জনের বোকামী করার? সত্যিকার কথা হচ্ছে, আমরা একটি জাতি হিসেবে নিজেদেরকে আল্লাহর, আল্লাহর বান্দাহ ও ইতিহাসের কাছে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার জন্য বাধ্য করে নিয়েছি, আমাদের জন্য নিজেদের প্রতিশ্রুতি থেকে ফিরে আসা সম্ভব নয়। তাই অন্যান্য মুসলিম জাতিসমূহ যাই করুক না কেন, আমাদের অবশ্য এ সব জটিলতার সমাধান করে নিতে হবে না যা এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

ইসলামী আইনের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে তার সব ক'টি সম্পর্কেই বলা যায় যে, এগুলো সবই দূরীভূত করার চেষ্টা করা সম্ভব। এগুলোর মধ্যে কোনটাই আসল নয়। আসল সমস্যা হচ্ছে যেসব মন–মস্তিষ্কের চিন্তা–সাধনা দ্বারা এ কাজ আঞ্জাম দেবে তারা নিজেরাই এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নয়। অবশ্য এর কারণও ইসলামী আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা। এ জন্য আজ সর্বাগ্রে করণীয় কাজ হচ্ছে, তাদের পরিষ্কার করে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, ইসলামী কানুন কাকে বলে, তার প্রকৃতি কেমন, তার লক্ষ্য ও নীতি, তার আভ্যন্তরীণ চরিত্র ও ধরন কেমন, তার মধ্যে কি কি বিষয় স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় এবং এ স্থায়ী হওয়ার মধ্যে কি কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাছাড়া তার কোন কোন বিষয় চির প্রগতিশীল এবং তা কিভাবে যুগে যুগে আমাদের ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে পারে, তার বিধিসমূহের ভিত্তি কি কি সুবিধের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে সব ভুল ধারণাগুলোরই বা প্রকৃত অবস্থা কি, যা এ সম্পর্কে সর্বত্র অজ্ঞ লোকদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছে। যদি এভাবে সঠিক অর্থে সংশ্লিষ্ট

সবাইকে এ কথাগুলো অনুধাবন করানো যায় তবে আমার বিশ্বাস, আমাদের সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট ও ক্রিয়াশীল মস্তিষ্কগুলো এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে, তাদের এ মানসিক নিশ্চিন্ততাই সে সব চেষ্টার নতুন দিগন্ত খুলে দেবে, যা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠাকে বাস্তবে সম্ভব করে তুলবে। এ পরিচিতির জন্যই আমার আজকের এ বক্তৃতা।

আইন ও জীবন বিধানের পারস্পরিক সম্পর্ক

আইন শব্দটি দিয়ে আমরা যা বুঝাই তা মূলত এ প্রশ্নেরই উত্তর যে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে মানুষের কর্মধারা কি হওয়া উচিত? এ প্রশ্নের পরিধি সেই পরিধির চেয়ে অনেক ব্যাপক, যাতে আইন এর জবাব দেয়। আমাদের বিস্তৃত পরিসরে এ 'হওয়া উচিত' প্রশ্নটিরই সম্মুখীন হতে হয়। এর বিভিন্ন জবাব আছে যা বিভিন্ন অধ্যায় ও শিরোনামে গ্রথিত হয়, তার একাংশ আমাদের নৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত এবং এই মোতাবেক আমরা আমাদের ব্যক্তি চরিত্র ও কর্মধারাকে ঢেলে সাজাতে চাই। এরই আরেকটি অংশ আমাদের সামাজিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত, এরই আলোকে আমরা আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানবীয় সম্পর্কের ভিত্তি নির্ণয় করি, এরই তৃতীয় অংশ আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের সাথে জড়িত, এরই আলোকে আমরা সম্পদ- সম্পদের আহরণ, উৎপাদন, বিতরণ ও বিনিময় করি এবং এ পর্যায়ের সব কয়জনের অধিকারের নীতি ঠিক করি। মোদ্দা কথা হচ্ছে, এই উত্তরের বেশ কয়টি অংশই এমন তৈরী হয়ে যাবে, যা আমাদের জীবনের বিভিন্ন বিভাগের ধরন ও কর্মসূচী নির্দিষ্ট করে। 'আইন' এ সব কিছুর মধ্যে শুধু ওসব অংশেরই নাম যাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ব্যবহার করতে হয়। এখন যদি কোন ব্যক্তি আইনকে বুঝতে চায় তাহলে তার চিন্তা ওই সীমাবদ্ধ পরিসরে আটকে রাখা উচিত হবে না, যেখানে আইন 'কি হওয়া উচিত' শুধু এ কথারই জবাব দিয়েছে বরং তাকে সমাজের সেই কর্মসূচী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে, যেখানে জীবনের সব কয়টি দিক সম্পর্কেই এ মূল প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। কারণ আইন হচ্ছে সেই সামগ্রিক স্কীমেরই একটা অংশ মাত্র। সামগ্রিকভাবে বিষয়টি অনুধাবন করা ছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে শুধু এর ধ্যান-ধরণ বুঝা কিংবা তার সম্পর্কে কোন ধারণা পোষণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

জীবন বিধানের চৈন্তিক ও নৈতিক ভিত্তি

অতপর জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে আমাদের 'কি হওয়া উচিত' এ প্রশ্নের যে জবাব দেয়া হয় তাও মূলত আরেকটি প্রশ্ন অর্থাৎ 'কেন হওয়া উচিত' এর জবাবেরই অংশ মাত্র। অপর কথায় 'কি হওয়া উচিত' সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় উত্তরের ভিত্তি বস্তুত সে আদর্শের ওপরই, যা আমরা মানবীয় জিন্দেগী, তার ভালো-মন্দ, তার হক ও বাতিল, ঠিক বেঠিক সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা করে রেখেছি এবং সে আদর্শের ধরন ঠিক করার কাজে সেই মূল সূত্রের বিরাট একটা প্রভাব রয়েছে, শুধু প্রভাবই নয় সত্যিকার অর্থে তাই সিদ্ধান্তকারী শক্তি হয়ে দাঁড়ায় যেখান থেকে আমরা মূল আদর্শকে গ্রহণ করছি। পৃথিবীতে বিভিন্ন মানবীয় গোষ্ঠীর আইন কানুনে মতবিরোধ এ জন্য দেখা যায় যে, মানবীয় জীবন সম্পর্কে গৃহীত আদর্শসমূহ তারা একই সূত্র থেকে গ্রহণ করেনি, তাদের সূত্র ছিলো ভিন্নতর। এ মতবিরোধের কারণে তাদের আদর্শও ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। আদর্শের বিভিন্নতা তাদের জীবনের স্কীমকেও বিভিন্নমুখী করে দিয়েছে, অতপর এ স্কীমের যে অংশ আইনের সাথে সম্পৃক্ত তাও নানামুখী হয়ে পড়েছে, এ অবস্থায় এটা কি করে সম্ভব যে, আমরা জীবনের কোন একটি স্কীমের মৌল আদর্শ, তার উৎস ও তার থেকে নেয়া সামগ্রিক জীবন বিধানকে অনুধাবন করা ছাড়া শুধু তার আইনগত দিকগুলো সম্পর্কেই কোন ধারণা পোষণ করলো, তাও আবার তার আইনের অংশের বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করে নয়--তার দু'একটি বিষয় সম্পর্কে কতিপয় উড়া কথার ওপর নির্ভর করে।

আমি এখানে তুলনামূলক পর্যালোচনা (Comparative Study) পেশ করার কোন ইচ্ছা পোষণ করি না, যদিও এ ব্যাপারটি তখনই সঠিকভাবে বুঝা যাবে, যখন পাশ্চাত্যের জীবন ব্যবস্থাকে--যার আইন- কানুন আপনারা পড়েন এবং নিজের দেশে যা জারি করেছেন--ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পাশপাশি রেখে তুলনামূলকভাবে দেখানো হবে যে, এ উভয়ের মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে এবং এ পার্থক্য কিভাবে উভয় আইনকে বিভিন্নমুখী করে দিয়েছে। কিন্তু তা বলতে গেলে প্রসংগ অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে। এ জন্য আমি এখানে শুধু ইসলামী আইনের ব্যাখ্যার ওপরই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

ইসলামী জীবন বিধানের উৎস

ইসলাম যে জীবন বিধানের নাম, তার উৎস একটি গ্রন্থ। যার বিভিন্ন সংস্করণ অতীত যুগে তাওরাত, ইঞ্জিল, জবুর ইত্যাদি বহু নামে দুনিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। এ কিতাবেরই সর্বশেষ সংস্করণ 'আল-কুরআন' নামে মানবতার সামনে পেশ করা হয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় এ গ্রন্থের নাম আল-কিতাব। এ ছাড়া অন্যান্য নামগুলো (যেমন তাওরাত, জবুর ও ইঞ্জিল) এ গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের নাম। ইসলামী জীবন বিধানের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে, সে সব মানুষ যাঁরা যুগে যুগে এ গ্রন্থ নিয়ে মানুষের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। যাঁরা নিজেদের কথা ও কাজ দিয়ে এ গ্রন্থেরই উদ্দেশ্য সাধন করেছেন, এঁরা যদিও বিভিন্ন মানুষ হওয়ার কারণে নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (সঃ) নামে আখ্যায়িত। কিন্তু তাঁরা সবাই ছিলেন একই মিশনের জন্য কর্মতৎপর। তাই তাঁদের 'আর-রসূল' বলে অভিহিত করাটাই হচ্ছে যুক্তিযুক্ত।

ইসলামের জীবন আদর্শ

এই 'আল-কিতাব ও 'আর-রসূল' জীবনের যে আদর্শ পেশ করেছেন তা হচ্ছে, এই বিশাল সৃষ্টিরাজি, যাকে তোমরা একটি সুস্পষ্ট বিধানের অধীন ও একটি নির্দিষ্ট বিধি মোতাবেক চলতে দেখছো, তা মূলত এক আল্লাহ্‌রই রাজত্ব। আল্লাহ্‌ই তার স্রষ্টা, আল্লাহ্‌ই তার মালিক। তিনিই তার শাসক। এই ভূ-খন্ড, যার ওপর তোমরা বসবাস করছো তা তার অনন্ত রাজত্বের অসংখ্য বিভাগেরই একটি ক্ষুদ্র বিভাগ মাত্র এবং এ বিভাগও কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সেই বন্ধের পুরোপুরি অধীন, যার বন্ধনে গোটা বিশ্বলোকের প্রতিটি অনু-পরমাণু জড়িত। তোমরা এ ভূখন্ডে আল্লাহর জন্মগত দাস (Born Subjects)। তোমরা নিজেরা নিজেদের স্রষ্টা নও--তোমরা সৃষ্টি, নিজেদের প্রতিপালকও তোমরা নিজেরা নও--তোমরা পালিত জীব। তোমরা নিজের শক্তিতে নিজেরা বেঁচে নেই--তিনিই তোমাদের জীবিত রেখেছেন। এ জন্য তোমাদের অন্তরে স্বীয় স্বাধীন সত্বার যদি কোন ধারণা থাকে তবে তা নিসন্দেহে একটি ভুল ধারণা মাত্র, একে বড় জোর দৃষ্টিভ্রমই বলা যেতে পারে। জীবনের এক বিশাল অংগে তোমরা স্পষ্টত প্রজা এবং তোমরা

তোমাদের এ অবস্থার কথা যে জানো না এমনও নয়। তোমাদের মায়েদের গর্ভে গর্ভ সঞ্চারের দিন থেকে মৃত্যুর শেষ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ্‌র প্রাকৃতিক আইনে এমনভাবে বন্দী হয়ে আছো যে, একটি নিঃশ্বাসও তোমরা তার বিরুদ্ধে চালাতে পারো না এবং তোমাদের ওপর প্রাকৃতিক শক্তি ও বিধানসমূহ এমনভাবেই প্রতিষ্ঠিত যে, তোমাদের কিছু বলতে হলে তার নিয়ন্ত্রণে থেকেই করতে হবে, এক মুহূর্তের জন্য তার থেকে মুক্তি লাভ করা তোমাদের জন্য সম্ভব নয়। এখন অবশিষ্ট রইলো তোমাদের জীবনের সে অংশ যে অংশে তোমাদের ইচ্ছার প্রাধান্য চলে, এতে তোমরা তোমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা অনুভব করো এবং নিজের ইচ্ছা মতো ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনের কর্মপন্থা বাছাই করণের ক্ষমতা রাখো। হাঁ, অবশ্যই তোমাদের এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু এ স্বাধীনতা তোমাদের বিশ্ব চরাচরের আসল মালিকের রাজত্ব বহির্ভূত করে দেয় না। বরং শুধু এটুকু স্বাধীনতা দেয় যে, তোমরা চাইলে আনুগত্যের পথ অবলম্বন করতে পারো যা তোমাদের জন্মগত প্রজা হিসেবেই করা উচিত এবং চাইলে তোমরা এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও বিদ্রোহের পথও অবলম্বন করতে পারো--যা তোমাদের প্রাকৃতিক সত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তোমাদের করা উচিত নয়।

সত্যের মৌল ধারণা

এখান থেকেই সত্য সম্পর্কিত প্রশ্নটির উদয় হয় এবং এটি এমন এক মৌলিক প্রশ্ন, যা জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত সত্য মিথ্যা ফায়সালা করার কাজে প্রভাব বিস্তার করে। জীবনের সত্য সম্পর্কে যে ধারণা আল-কিতাব ও আর-রসূল দিয়েছেন, তাকে একটি শাশ্বত সত্য হিসেবে মেনে নেয়ার পর এ ব্যাপারটিও একটি সুস্পষ্ট সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে হয় যে, জীবনের যে অংশে মানুষের ইচ্ছা শক্তি কার্যকর, তাতেও আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে মেনে নেবে। কারণ তার জীবনের অপর বিরাট অংশ—যেখানে তার ইচ্ছা শক্তির কোন প্রভাব নেই এবং সৃষ্টিলোকের অন্য সর্বত্র তারই সার্বভৌমত্ব কার্যকরী। তিনি নিজেই সে সার্বভৌমত্বের মালিক। এ ব্যাপারটি কয়েক কারণে সত্য। এটা এ জন্যও সত্য যে, মানুষ যে শক্তি ও প্রকরণ দিয়ে তার ইচ্ছা শক্তিকে বাস্তবায়িত করে তা সর্বাংগে আল্লাহ্‌র দান। এ জন্যও সত্য যে, এ সব

ইচ্ছাও মানুষের অর্জিত কিছু নয়। এ জন্যও সত্য যে, সব কিছুর ওপর এ ইচ্ছাকে মানুষ কার্যকর করে তা সবই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। এ জন্যও সত্য যে, যে দেশে এই ইচ্ছা শক্তি চলে তাও আল্লাহ্‌র দেশ। এ কারণে সত্য যে, বিশ্বলোক ও মানবীয় জীবনের মধ্যে ঐক্য ও সাম্যের দাবীও এই যে, আমাদের জীবনের দুটি অংশ--যেখানে আমাদের নিজ ইচ্ছা চলে এবং যেখানে নিজ ইচ্ছা চলে না--উভয়টাই একই মালিকের অধীন ও উভয়টার জন্য একই হেদায়াত ও পদ্ধতি কায়েম থাকবে। এ দু'টি বিভাগের দু'টি স্বতন্ত্র ও পরস্পর বিরোধী লক্ষ্য যদি নির্ধারণ করে নেয়া হয় তাহলে উভয়ের মধ্যে এমন একটি বৈপরিত্ব দেখা দিবে যা শুধু বিশৃংখলারই কারণে হবে। এক ব্যক্তির জীবনে এ বিশৃংখলা হয়তো সীমিত পর্যায়েই প্রকাশিত হবে, কিন্তু বড় বড় জাতিসমূহের জীবনে এ বৈপরিত্বের ফলাফল এতো ব্যাপকভাবে দেখা দেয় যে, মারাত্মক বিপর্যয়ই অবধারিত হয়ে পড়ে।

"ইসলাম" ও "মুসলিম"—এর ব্যাখ্যা

আল-কিতাব ও তার উপস্থাপক রসূল (সঃ) মানুষের সামনে এ সত্যকেই পেশ করেন, তাদের প্রতি আহ্‌বান জানান, তারা যেন কোন রকম চাপ প্রয়োগ ছাড়াই তা গ্রহণ করে নেয়। কেননা এটা মানবীয় জীবনের ঐ অংশের ব্যাপার, যাতে আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। এ জন্যই এই অংশেও কোন রকম চাপ প্রয়োগ ছাড়াই তাকে স্বীয় সন্তুষ্টির দ্বারাই এই সত্য মেনে নেয়া উচিত। এ সত্য ঘটনার ব্যাপারে যার মন নিশ্চিত হয় যে, আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রসূল বিশ্ব রহস্য সম্পর্কে যা বলেছেন তাই ঠিক, যার মন একবার সাক্ষ্য দেয় যে, এই সত্য ঘটনা বর্তমান থাকায় প্রকৃত সত্য তাই, যা ঘটনা পরম্পরা দাবী করে, সে তার ইচ্ছা, আযাদী ও স্বকীয়তাকে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের সামনে সমর্পণ দেয়। এ সমর্পণ করার নামই "ইসলাম"। যারা এভাবে নিজেকে সমর্পণ করে দেয় তাদের বলা হয় "মুসলিম"। অর্থাৎ এমন লোক যারা আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে তার সামনে নিজের ইচ্ছা, শক্তি ও স্বাধীনতাকে সমর্পণ করেছে। সর্বোপরি নিজের জীবনকে আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবিক চালানোর জন্য নিজেকে বাধ্য করেছে, সত্যিকার অর্থে এ ধরনের ব্যক্তিই হচ্ছে মুসলিম।

মুসলিম সমাজ কাকে বলে?

এভাবে যারা আল্লাহর কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছে তাদের একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ তৈরী হয়। তাদের একত্রিত হবার মাধ্যমেই সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই সমাজ সে সব সমাজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর, যেসব সমাজ বিচ্ছিন্ন ঘটনার ফলে সংঘটিত হয়েছে। এ সমাজের সংগঠন একটি ইচ্ছাকৃত ব্যাপার, তার সংগঠনও এমন একটি চুক্তির (Contract) ভিত্তির ওপর গঠিত হয়, যা আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাহদের মধ্যে জেনে শুনেই সম্পাদন করা হয়। এ চুক্তিতে বান্দা এ কথা মেনে নেবে যে, আল্লাহই তার শাসক, তার হুকুম আহকামই হচ্ছে তাঁর জন্য শাসনতন্ত্র। তাঁর বিধনাই তার জন্য আইন। তাকেই সে ভালো মনে করবে যাকে আল্লাহ্ ভালো বলবেন। ঠিক তাকেই সে খারাপ মনে করবে যাকে আল্লাহ্ খারাপ বলে নির্ধারণ করে দেবেন। সত্য মিথ্যা, জায়েজ না-জায়েজের মাপকাঠি সে আল্লাহর কাছ থেকেই গ্রহণ করবে। স্বীয় স্বাধীনতার গন্ডি ঐ পরিসীমা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখবে যার সীমানা স্বয়ং আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সংক্ষেপে এই চুক্তির ভিত্তিতে যে সমাজ গঠিত হয় তা সুস্পষ্টভাবে এ কথা স্বীকার করে নেয় যে, সে তার জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে 'কি হওয়া উচিত' এর উত্তর সে নিজে নিজে তৈরী করবে না, তার যে উত্তর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঠিক করে দিয়েছেন তাকেই সে গ্রহণ করবে।

এ সুস্পষ্ট ঘোষণার ভিত্তিতে যখন একটি সমাজ তৈরী হয় তখন আল-কুরআন ও তার বাহক সে সমাজের জন্য একটি নিয়ম-কানুন প্রদান করেন যাকে শরীয়াত বলা হয়। তখন সে সমাজের নিজস্ব ঘোষণা মোতাবেক তার ওপর এটা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে যে, সে তার দৈনন্দিন কার্যাবলীকে সে স্কীম অনুযায়ী চালাবে যা শরীয়াত নির্ধারণ করে দেবে। যতোক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির জ্ঞান ও বিবেকবোধ লোপ পাবে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত সে কিছুতেই এটাকে সম্ভব মনে করতে পারে না যে, কোন মুসলিম সমাজ তার মৌলিক চুক্তিকে ভংগ করা ব্যতিরেকে শরীয়াত ছাড়া অন্য কোন জীবন ধারণের পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করার সাথে সাথেই তার মুল চুক্তি আপনা আপনিই বাতিল হয়ে যায়। আর চুক্তি বাতিল হবার সাথেই সে সমাজে 'মুসলিম' থেকে অমুসলিম সমাজে পরিণত হয়ে যায়। বিচ্ছিন্নভাবে কোন ব্যক্তির জীবনে কোন একটি ঘটনায় শরীয়াতের

খেলাফ চলা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস, এতে চুক্তি ভংগ হয় না। অবশ্য একটি মারাত্মক অপরাধেই সে অপরাধী হয়ে পড়ে, কিন্তু একটি পুরো সমাজ যখন জেনে শুনে এ সিদ্ধান্ত করে যে, শরীয়াত এখন তার জীবন প্রণালী নয়, এখন তার নিয়মনীতি সে নিজেই নির্ধারণ করবে। অথবা অন্য কোন সূত্র থেকেই সে তা গ্রহণ করবে, তবে তা হবে নিসন্দেহে চুক্তি ভংগের কাজ, এ অবস্থায় সে সমাজের জন্য 'মুসলিম' শব্দটিকে অপরিহার্যভাবে জুড়ে রাখার কোন কারণ নেই।

শরীয়তের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা

এ মূল কথাগুলোর ব্যাখ্যা করার পর এবার আমাদের সেই স্কীমগুলোও বুঝার চেষ্টা করা উচিত, যা শরীয়াত মানব জীবনের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছে। এ জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সর্বাগ্রে উদ্দেশ্য ও তার কতিপয় বৃহৎ নীতিমালার পর্যালোচনা করা।

শরীয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জীবনকে মারূফের (ভালকাজ) ওপর প্রতিষ্ঠিত করা ও মুনকার থেকে পবিত্র করা। মারূফ বলতে যে সমস্ত নেকী, গুণাবলী ও ভালো কাজকে বুঝায় যাকে মানবীয় প্রকৃতি সর্বদাই ভালো জেনে এসেছে এবং মুনকার দ্বারা খারাপ কাজই বুঝানো হয় যাকে মানবীয় মন সব সময়ই খারাপ মনে করে এসেছে, অন্য কথায় 'মারূফ' মানবীয় প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং 'মুনকার' তার সুস্পষ্ট বিরোধী।

শরীয়াত আমাদের জন্য সে সব জিনিসকে ভালো বলে গ্রহণ করতে বলে যা আল্লাহর বানানো প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সংঘর্ষশীল নয়, অপরদিকে সে সব জিনিসকে মন্দ বলে, যা তার সাথে সংঘর্ষশীল। শরীয়াত এ সব ভালো কাজের একটি সূচী তৈরী করে আমাদের হাতে অর্পণ করেই স্বীয় দায়িত্ব শেষ করে দেয়নি--সে জীবনের পুরো স্কীমকেই এমন নকসার ভিত্তিতে তৈরী করতে চায় যার ভিত্তি হবে 'মারূফ' কিংবা অন্য ভালো কাজের ওপর। জীবনের পুনর্গঠনের ব্যাপারে মুনকারের সেখানে কোনো স্থান নেই, বরং মানব জীবনের কোনো অংশেই মুনকারকে তার বিষক্রিয়া বিস্তারের-সুযোগ দেয়া হবে না।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শরীয়াত মারূফ কাজের সাথে সেসব উপকরণকেও তার স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়, যার দ্বারা মূল

জিনিসটির কায়েম ও বিকাশ ঘটতে পারে এবং এ পথে আরোপিত যাবতীয় বিধি- নিষেধকেও সে নির্মূল করতে চায়। এভাবে মূল 'মারুফ' কাজের সাথে তার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে এমন সব কার্যাবলীও মারুফের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। একই ব্যাপারে সে মুনকারের বেলায়ও গ্রহণ করে, আসল মুনকারের সাথে ওসব জিনিসও তখন মুনকার বলে বিবেচিত হয়, যা কোনো মুনকার কাজের সংগঠন, প্রকাশ ও বিস্তার লাভের ব্যাপারে সাহায্য করে। সমাজের পুরো ব্যবস্থাপনাকে শরীয়াত এমনভাবে ঢেলে সাজাতে চায় যে, এক একটি 'মারুফ' কাজ পূর্ণাঙ্গরূপে কায়েম হবে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার বিকাশ ঘটবে, সব দিক থেকেই তাকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে সহযোগিতা পাওয়া যাবে। এমন প্রতিটি বাধাই দূরীভূত করা হবে যা এর পথ রোধ করে দাঁড়াবে। এ ভাবে এক এক করে প্রতিটি মুনকারকে সমাজ থেকে খুঁজে খুঁজে উচ্ছেদ করা হবে, তার জন্ম ও বিকাশের উপকরণকে বন্ধ করা হবে, যতোদিক থেকে এটা জীবনে ঢুকে পড়তে পারে ততোগুলো রাস্তাই বন্ধ করা হবে। যদি কোনো কারণে তা মাথা তোলে তাকে কঠোর হাতে দমন করা হবে।

'মারুফ' কাজকে শরীয়াত তিন ভাগে বিভক্ত করে। এক, ফরজ-ওয়াজেব, দ্বিতীয় মানদুব অর্থাৎ আকাংখিত, তৃতীয় মুবাহ্ বা জায়েজ।

১. ফরজ ওয়াজেব ঐসব মারুফকে বলা হয়, যাকে মুসলিম সামজের ওপর আবশ্যকীয় বিষয় করে দেয়া হয়েছে। এ সব ব্যাপারে শরীয়াত পরিষ্কার ও অপরিবর্তনীয় আদেশ দিয়েছে।

২. 'মানদুব' ওইসব মারুফ কাজকে বলা হয়, যেগুলো শরীয়াত পসন্দ করে, অপর কথায় শরীয়াত যার সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন হওয়া প্রত্যাশা করে। এর কিছু কিছু ব্যাপার শরীয়াত পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে। অবশিষ্ট কিছু ব্যাপারে শরীয়াতের পক্ষ থেকে ইংগীত প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে এমন কিছু আছে যার বিকাশের সরাসরি ব্যবস্থা করা হয়েছে আবার কয়েকটির ক্ষেত্রে শুধু সুপারিশ করা হয়েছে, যেন সমাজ সামগ্রিক ভাবে কিংবা তার ভালো মানুষগুলো এর দিকে আকৃষ্ট হয়।

৩. তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে মুবাহ্ কিংবা বৈধ 'মারুফ'। শরীয়াতের দৃষ্টিতে এমন প্রত্যেকটি জিনিসই জায়েজ, যার ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। এ ব্যাখ্যার আলোকে মুবাহ্ কাজ শুধু তাই নয় যার অনুমতির স্পষ্ট বিধান আছে অথবা যার ব্যাপারে আমাদের পরিষ্কার করে কিছু বলে দেয়া হয়েছে। এ আলোকে এর পরিধি অনেক ব্যাপক। এমনকি কয়েকটি বর্ণিত বিধি-নিষেধ ছাড়া পৃথিবীর সব কিছুই জায়েজ হয়ে পড়ে, মুবাহর এ ব্যাপক পরিসীমায় শরীয়াত আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে। ওই সীমানা আমরা আমাদের প্রয়োজন মুতাবেক আইন-কানুন, কারিগরি ও কর্মসূচী নিজেরাই তৈরী করতে পারি।

মুনকার কাজকেও শরীয়াত দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। এক, হারাম অর্থাৎ স্থায়ী নিষেধ, দ্বিতীয়, মাকরূহ্ কিংবা অপসন্দনীয়।

হারাম হচ্ছে সেই মুনকার যা থেকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে বিরত রাখা মুসলমানদের ওপর অবশ্য করণীয় এবং শরীয়াতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান জারী করা হয়েছে। এরপর আসে মাকরূহ্ কাজের প্রসংগ। এ ব্যাপারে শরীয়াতের পক্ষ থেকে কোনো না কোনোভাবে--কোথাও সুস্পষ্ট ভাবে, কোথাও ইশারা ইংগীতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে, যাকে সহজেই এ কথা বুঝা যায় যে, তা কোন পর্যায়ে অপসন্দনীয়। কিছু মাকরূহ্ কাজ আছে যা হারামের কাছাকাছি, কিছু এমন আছে যাকে জায়েজের কাছাকাছিও বলা যায়, আবার কিছু আছে যার অবস্থান হচ্ছে এর মাঝামাঝি, কিছু আছে যাকে রুখে দাঁড়ানো ও নির্মূল করার ব্যাপারে শরীয়াতের নির্দেশ আছে, আবার কয়েক প্রকারের এমন আছে যাকে অপসন্দনীয় বলে রেখে দেয়া হয়েছে যাতে করে সমাজের ভালো মানুষেরা মিলে মিশে তার গতিরোধ করতে পারে।

শরীয়াতের ব্যাপকতা

মারূফ আর মুনকারের ব্যাপারে এ সব বিধি আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সর্বস্তরেই বিরাজিত। ধর্মীয় ইবাদাত, ব্যক্তির কর্মকান্ড, নৈতিক চরিত্র ও অভ্যাস সমূহ, খানা-পিনা, কাপড়-চোপড় পরিধান করা, মানুষের উঠা বসা, কথাবার্তা, পারিবারিক জীবন, সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক ব্যাপার, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, নাগরিকদের

অধিকার ও কর্তব্য, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার নিয়মাবলী, রাজকার্য চালাবার ধরন, যুদ্ধ ও সন্ধির নিয়ম, অন্যান্য জাতির সাথে সম্পর্ক মোট কথা জীবনের কোনো বিভাগ ও ক্ষেত্র এমন নেই যার সম্পর্কে শরীয়াত আমাদের নেকী-বদীর বিধি, ভালো মন্দের পথ, পবিত্র-অপবিত্রতার পার্থক্যবোধ পরিষ্কার করে দেয়নি। শরীয়াত এর সর্বস্তরে আমাদের একটি সুস্থ জীবন যাপনের পূর্ণ নকসা প্রদান করে, এতে পুরোপুরি ভাবে এ কথা বলে দেয়া হয়েছে যে, সে সব ভালো জিনিস কি যাকে আমাদের প্রতিষ্ঠা করা, তরান্বিত করা ও বিকশিত করা দরকার। আবার কি কি খারাপ জিনিস আছে যাকে আমাদের নির্মূল ও দমন করা দরকার। কোন্ পরিসীমা পর্যন্ত আমাদের কর্মের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করা উচিত এবং বাস্তবে আমাদের কোন্ পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন যাতে আমাদের জীবনে বাঞ্ছিত ভালো কাজের প্রসার ঘটে ও মন্দ কাজের সমাপ্তি হয়।

শরীয়াতের বিধান অবিভক্ত

জীবনের এ পুরো নকশাটি একটি একক নকশা। তার সামষ্টিক দাবী হচ্ছে, তার বিচ্ছিন্ন হয়ে কায়েম থাকতে পারে না। তার পারস্পরিক ঐক্য মানুষের শারীরিক অস্তিত্বের ঐক্যের মতো, আপনি যাকে মানুষ বলেন তা মানুষের একটি পূর্ণাংগ অস্তিত্বের নাম--মানবীয় দেহের কতিপয় বিচ্ছিন্ন ও কর্তিত অংশের নাম নয়। একটি কাটা পা-কে আপনি মানুষের $\frac{১}{৮}$ কিংবা $\frac{১}{৬}$ অংশ বলতে পারেন না। ঠিক একটা কাটা পা সে সব দায়িত্বের কোনো একটিও পালন করতে পারে না বা মানব দেহের একটি জীবন্ত অংশ হিসেবে মানুষের পা আঞ্জাম দিতে পারতো। না সে কাটা পাকে আপনি অন্য কোনো জন্তুর শরীরে লাগিয়ে তার কাছ থেকে মানবীয় পায়ের আচরণ আশা করতে পারেন। এভাবেই মানব দেহের হাত, পা, চোখ, নাক ইত্যাদি অংশকে আলাদা আলাদা করে আপনি তার সৌন্দর্য ও উপকারিতা সম্পর্কে কোনো মতামত দিতে পারেন না, যতোক্ষণ পর্যন্ত জীবন্ত শরীরের একটি অংশ হিসেবে তাকে তার কাজ করার সুযোগ না দেবেন ততোক্ষণ পর্যন্ত কিছুই আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন না। শরীয়াতের পরিপূর্ণ জীবনের নকশাটির অবস্থাও একই রকম। ইসলাম তার সমস্ত অংশের একক ও সামষ্টিক

নাম--বিচ্ছিন্ন অংশের নাম নয়। তার অংশগুলোকে ভাগ করে তার সম্পর্কে কোনো ধারণা পেশ করা ঠিক নয়, না সমষ্টি থেকে আলাদা করে তার কোনো এক দু'টি অংশকে কায়েম করে আপনি বলতে পারেন যে, আমি ইসলামের অর্ধাংশ কিংবা এক-চতুর্থাংশ ইসলাম কায়েম করেছি। অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থার সাথে তার দু'একটি অংশ জুড়ে দিয়েও তার থেকে কোনো কল্যাণকর কিছু হাসিল করা যাবে না। শরীয়াতের বিধান প্রণয়নকারী এ নকশাটি বানিয়েছেন, যেন পুরোটাই একত্রে কায়েম হতে পারে। কারো ইচ্ছা মোতাবেক তার কোনো একটি বিচ্ছিন্ন অংশকে যখন কায়েম করে দেয়া তার উদ্দেশ্য নয়। এর প্রতিটি অংশ একটার সাথে কায়েম করে দেয়া তার উদ্দেশ্য নয়। এর প্রতিটি অংশ একটার সাথে অপরটি এমনভাবে জড়িত যে, এগুলো একত্রে থেকেই কাজ করতে পারে। আপনি এর সৌন্দর্য সম্পর্কে তখনি কোনো অভিমত প্রকাশ করতে পারবেন যখন এর সর্বাংশ একত্রে ও পর্যায়ক্রমে তাদের দায়িত্ব পালন করতে থাকবে।

আজ শরীয়াতের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে যে ভুল ধারণা লোক সমাজে প্রচলিত আছে তার অধিকাংশের পেছনেই এ কারণটি বিদ্যমান যে, পুরো ইসলাম সম্পর্কে কোনো সামষ্টিক দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে কোনো একটি অংশকে তার থেকে বের করে আনা হয় অথবা তাকে বর্তমান অনৈসলামী জীবন বিধানের আওতায় রেখেই একে কায়েম করার চেষ্টা করা হয়। অথবা সেই বিচ্ছিন্ন অংশকেই একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বিষয় মনে করে তার ভালো-মন্দ সম্পর্কে ফয়সালা করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ ইসলামের ফৌজদারী আইনের কতিপয় ধারা সম্পর্কে আজকের দুনিয়ার বহু লোক নাক ছিটকায়। কিন্তু তাদের এ কথা জানা নেই যে, যে জীবন বিধানে এ সব ফৌজদারী আইনের ধারা সন্নিবেশিত হয়েছে, তাতে তার সাথে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, একটি সমাজ ব্যবস্থা, একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও একটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও আছে। তার সব কয়টি অংশকে কাজ করতে না দিয়ে শুধু সে আইনের কতিপয় ধারাকে আইনের বই থেকে বের করে এনে বিচারকক্ষে জারী করে দেয়া স্বয়ং সে জীবন বিধানেরও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

অবশ্যই ইসলামী আইন চোরের হাত কাটার শাস্তি দেয়। কিন্তু এ বিধান যে কোনো সমাজে জারী করার জন্যে দেয়া হয়নি। বরং তাকে

ইসলামের ওই সমাজেই জারী করার কথা বলা হয়েছে, যেখানে অর্থশালীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করা হবে, যার রাষ্ট্রীয় বায়তুল মাল বিপদগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য সদা উন্মুক্ত থাকবে, যার প্রতিটি জনপদে মুসাফিরদের জন্যে তিন দিনের মেহমানদারী আবশ্যকীয় করে দেয়া হবে। যে শরীয়াতের ব্যবস্থায় সবার জন্যে একই ধরনের অধিকার ও সুবিধে নিশ্চিত করা হয়েছে, যার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোনো শ্রেণীর অতিরিক্ত সুবিধে-অর্থনৈতিক ইজারাদারীর জন্যে কোনো স্থান রাখা হয়নি, বৈধ রোজগারের যাবতীয় পথই সবার জন্যে খোলা আছে। যার নৈতিক ও শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতি ও তার সন্তুষ্টির চেতনা সৃষ্টি করবে, যার নৈতিক পরিবেশে দানশীলতা, গরীবদের ব্যাপারে দাক্ষিণ্য, বিপদগ্রস্তদের সাহায্য ও পতন্মুখ ব্যক্তিদের আশ্রয় দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে এবং যার প্রতিটি বালককে পর্যন্ত এ শিক্ষা দেয়া হবে--তুমি মুমীন হতে পারবে না, যদি তোমার কোনো প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে। এ আদেশ আপনাদের বর্তমান সমাজের জন্যে দেয়া হয়নি, যে সমাজে একজন আরেকজনকে সুদ ছাড়া ঋণ পর্যন্ত দেয় না। যে সমাজে বায়তুল মালের পরিবর্তে ব্যাংক ইনসিউরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, যেখানে বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করার হাতগুলো একে একে পেছনমুখী থাকে। যার নৈতিক দৃষ্টিকোণ হচ্ছে, একজনের রোজগারে অপর কারো অধিকার নেই, বরং প্রত্যেকেরই নারী পুরুষ নির্বিশেষে রুটী রুজীর দায়িত্ব তার স্বীয় স্কন্ধের ওপর অর্পিত। যার সমাজ ব্যবস্থা শ্রেণী বিশেষকে বিশেষ পার্থক্যসূচক অধিকার দিয়েছে, যার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিছু ভাগ্যবান ও ধূর্ত লোককে চারদিক থেকে সম্পদ জমা করার সুযোগ দেয়, সর্বোপরি যে সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা আইনের মাধ্যমে এ সব সুযোগ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্বার্থই সংরক্ষণ করে চলে এমন সমাজে চোরের হাত কাটার প্রশ্ন তো আলাদা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভবত তাদের শাস্তি দেয়াই জায়েজ হবে না। কেননা এ ধরনের একটি সমাজে চুরিকে অপরাধ বলার অর্থ দাঁড়াবে স্বার্থবাদী ও অবৈধ অর্থ উপার্জনকারীদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা। অথচ এর পরিবর্তে ইসলাম সেই সমাজ ব্যবস্থা তৈরী করতে চায় যাতে 'চুরি করতে বাধ্য' এমন কোনো পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হবে না। প্রত্যেক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার বৈধ প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে মানুষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত

ভাবেই এগিয়ে আসবে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও তার প্রয়োজন পূরণের যাবতীয় ব্যবস্থা থাকবে। এরপরও যদি কোনো ব্যক্তি চুরি করে তখন তার জন্যে ইসলাম হাত কাটার শিক্ষামূলক ও চরম শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। কেননা এমন ব্যক্তি একটি ভদ্র, ইনসাফপূর্ণ ও দয়া-দাক্ষিণ্যে ভরা সমাজে বসবাসের যোগ্য নয়।

এভাবেই ইসলামী শাস্তির বিধানে ব্যভিচারের জন্যে একশ' বেত্রাঘাত ও বিবাহিত ব্যভিচারির বেলায় প্রস্তারাঘাতে হত্যার বিধান প্রদান করে, কিন্তু তা কোন্ সমাজে? ঐ সমাজে, যেখানে পুরো সমাজ ব্যবস্থাকেই যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারক উপকরণসমূহ থেকে পাক করে দেয়া হয়েছে, যে সমাজে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকবে না, যাতে অশ্লীল অংগ ভংগিতে মেয়েদের রাস্তায় নামা বন্ধ হবে, যাতে বিয়ের ব্যাপারটাকে খুব সহজ করে দেয়া হবে, সর্বোপরি যে সমাজে নেকী, আল্লাহভীতি ও পবিত্র জীবন যাপনের ব্যাপক সুযোগ থাকবে এবং যার পারিপার্শিকতায় আল্লাহর স্মরণ প্রতি মুহূর্তেই সবার হৃদয়ে জাগরুক থাকবে। এ বিধান সে নোংরা সমাজের জন্যে নয়, যার চারদিক থেকে মানুষের যৌন অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা আছে, অলি গলি ও ঘরে ঘরে অশ্লীল গান বাদ্য চলছে, স্থানে স্থানে চিত্রাভিনেত্রীদের নগ্ন চিত্র লটকানো থাকে, শহর ও পল্লীর সর্বত্র সিনেমা শুধু প্রেমের নিত্য নতুন অনুশীলনই প্রদান করে বেড়ায়, অশ্লীল ও নোংরা বই পুস্তক দিব্বি প্রকাশ ও প্রসার লাভ করেছে, কতিপয় নারী তাদের উগ্র যৌন কামনায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, জীবনের প্রতিটি স্তরে যৌন মিলনের সুযোগ বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং সমাজ ব্যবস্থা তার অযথা রসম-রেওয়াজের কারণে বিয়েকে কঠিন কাজে পরিণত করে রেখেছে। জানা কথা, এমন সমাজে ব্যভিচারের শরীয়াত সম্মত শাস্তির বিধান করা হয়নি। এমন সমাজে ব্যভিচারকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে ব্যভিচার থেকে বিরত থাকার মানুষটিকে বরং কোনো মূল্যবান পুরস্কার অথবা অন্তত বিরোচিত উপাধি দেয়া উচিত।

শরীয়তের আইনগত দিক

এ আলোচনা, দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, বর্তমান পারিভাষিক অর্থে শরীয়াতে রসে অংশকে আমরা আইন নামে আখ্যায়িত

করি, তা জীবনের একটা পরিপূর্ণ কর্মসূচীরই অংশ। এটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কোনো বিষয় নয় যে, সমষ্টি থেকে আলাদা করে তাকে বুঝানো যেতে পারে কিংবা তাকে জারী করা যেতে পারে। যদি তা করাও হয় তবে তা ইসলামী কানুনের প্রতিষ্ঠা হবে না, তার সে ফলও পাওয়া যাবেনা যা ইসলাম তার থেকে পেতে চায়। সর্বোপরি শরীয়াত প্রদানকারীরও তা ইচ্ছা মোতাবেক হবে না। শরীয়াতের পুরো স্কীমকে সামষ্টিক জীবনে জারী করা এবং এ স্কীমের পূর্ণাংগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামী আইনকে যথার্থভাবে জারী করা সম্ভব।

শরীয়াতের এ স্কীম বাস্তবে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। এর কিছু অংশ আছে, যাকে প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির দায়িত্ব। কোনো বাইরের শক্তি তাকে প্রতিষ্ঠা করাতে পারে না, কিছু এমন আছে, যাকে ইসলাম তার আত্মশুদ্ধি এবং ব্যক্তি চরিত্রের পরিশুদ্ধির কর্মসূচী দিয়ে প্রতিষ্ঠা করাতে চায়। অন্য বিষয়গুলোকে জারী করার ব্যাপারে জনমতের শক্তিকে কাজে লাগায়। সর্বশেষ অংশগুলোকে সে মুসলিম সমাজের মার্জিত সংস্কার হিসেবেই প্রচলন করাতে চায়। এ সব কিছুর সাথে একটি বড় রকমের অংশ হচ্ছে এমন, যার প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলাম দাবী করে মুসলিম সামজে নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করুক। কেননা তা রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ রাজনৈতিক ক্ষমতা শরীয়াতের বর্ণিত জীবন বিধানেরই সংরক্ষণ করবে, তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে, তার চাহিদা মুতাবেক ভালো কাজের বিকাশ ও মন্দের নির্মূল করণের ব্যবস্থা করবে এবং তার সে সব বিধান প্রতিষ্ঠা করবে, যার জন্য একটি বিচার ব্যবস্থাও দরকার।

এই সর্বশেষ বর্ণিত বিষয়টিই হচ্ছে তা, যাকে আমরা ইসলামী আইন নামে অভিহিত করি, যদিও এক হিসেবে পুরো শরীয়াতটাই হচ্ছে একটা আইন, কেননা তা প্রজাদের ওপর সার্বভৌম রাজার আদেশেরই সমষ্টি। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে আইন বলা হয় এমন সব বিধিকে যার প্রতিষ্ঠার জন্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অপরিহার্য। এ জন্যে আমরা শরীয়াতের সে অংশকেই "ইসলামী আইন" বলি, যাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সে নিজস্ব নীতি ও মেজাজ মোতাবেক একটি রাজনৈতিক ক্ষমতাও সংগঠিত করে।

ইসলামী আইনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ

১. রাজনৈতিক ক্ষমতা সংগঠনের জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি শাসনতান্ত্রিক আইনের। শরীয়াত এর সব কয়টি জরুরী মূলনীতিই ঠিক করে দিয়েছে। রাষ্ট্রের মূল আদর্শ কি, তার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য কি, কারা কারা তার নাগরিক হতে পারে, তাদের অধিকার ও কর্তব্যের সীমারেখা কতটুকু, কিসের ভিত্তিতে একজনকে নাগরিকত্ব অধিকার দেয়া হবে, আবার কি কি কারণে তা রহিত করা হবে, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য কতোটুকুন, রাষ্ট্রের যাবতীয় আইন ও ক্ষমতার উৎস কি, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কোন মূলনীতির ভিত্তিতে চলবে, প্রশাসনের ক্ষমতা কার হাতে অর্পণ করা হবে, তার নিয়োগ কে প্রদান করবে, কার সামনে তাকে জবাবদিহি করতে হবে, কোন সীমায় থেকে সে কাজ করবে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কাকে কতটুকু দেয়া হবে, বিচারালয়ের অধিকার ও দায়িত্ব কি হবে, শাসনতান্ত্রিক আইনে এ সব মূল প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব শরীয়াত আমাদের প্রদান করেছে। অতপর এ সব মূলনীতিগুলো পরিষ্কার করে বলে দেয়ার পর শরীয়াত আমাদের এটুকু স্বাধীনতা দিয়েছে যে, শাসনতন্ত্রের বিস্তারিত স্বরূপ আমরা নিজেরা নিজেদের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক করে নিতে পারি। আমরা অবশ্য এ জন্যে বাধ্য যে, আমরা আমাদের রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে ইসলামী শরীয়াত মোতাবেক তৈরী করবো কিন্তু কোনো বিস্তারিত শাসনতন্ত্র সর্বকালের জন্যে আমাদেরকে দেয়া হয়নি যে, তাতে শাখা প্রশাখায় কোনো রকম সংস্কার করা চলবে না।

২. রাজনৈতিক ক্ষমতা সংগঠনের পর ইসলামী রাষ্ট্রে তার ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করার জন্যে একটি প্রশাসনিক আইনের প্রয়োজন এরও সব মৌলিক নীতিগুলো শরীয়াত স্পষ্টভাবে ঠিক করে দিয়েছে। তাছাড়া এ ব্যাপারে আমাদের পথ দেখাবার জন্যে মহানবী (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের (রা) আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদাহরণ আছে। একটি ইসলামী রাষ্ট্র তার আয়ের জন্যে কি ধরনের পন্থা অবলম্বন করতে পারে এবং কোন্ ধরনের পন্থা অবলম্বন করতে পারে না, রাষ্ট্রীয় খরচের খাতে কোন্ ধরনের খরচ বৈধ, কোন্ ধরনের খরচ অবৈধ, সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিচারালয়, আইন শৃংখলার বিভিন্ন দিকে রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ কি

হবে, নাগরিকদের নৈতিক ও বৈষয়িক কল্যাণের জন্যে রাষ্ট্রের ওপর কি কি দায়িত্ব অর্পিত হয়, কোন্ কোন্ ভালো কাজ আছে যাকে নির্মূল ও রুখে দাঁড়ানো রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নাগরিকদের জীবন যাপনের বেলায় রাষ্ট্র কতটুকু হস্তক্ষেপ করতে পারে? এ সব ব্যাপারে শরীয়াত আমাদের শুধু নীতিগত হেদায়েতই প্রদান করে না বরং বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে স্থায়ী ও স্পষ্ট বিধানও দিয়েছে। কিন্তু পুরো শাসন ও প্রশাসনের এমন বিস্তারিত কর্মসূচী তৈরী করে আমাদের প্রদান করা হয়নি যে প্রতি যুগে আমরা তাই মানতে ও কায়েম করতে বাধ্য থাকবো, যার কোনো সামান্য পরিমাণও পরিবর্তন করার আমরা অধিকার রাখি না। শাসনতান্ত্রিক আইনের মতো প্রশাসনিক আইনেও বিস্তারিত বিধি-নিষেধ তৈরী করার পূর্ব স্বাধীনতা আমাদের রয়েছে। অবশ্য এ স্বাধীনতা আমাদের অবশ্যই সেই নীতিমালার পরিসীমার মধ্য থেকে প্রয়োগ করতে হবে, যা শরীয়াত আমাদের জন্যে ঠিক করে দিয়েছে।

৩. এরপর রাষ্ট্রীয় আভ্যন্তরীণ আইন-কানুন ও ব্যক্তিগত আইনের সে সব অধ্যায়ের প্রসংগ আসে, যা সমাজে আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্যে একান্ত জরুরী। এ ব্যাপারে শরীয়াত আমাদের এতো ব্যাপক পরিমাণে বিস্তারিত বিধি-নিষেধ ও মৌলিক নির্দেশাবলী প্রদান করেছে যে, কোনো যুগেই জীবন যাপনের কোনো পর্যায়েই আমাদের আইনের প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে শরীয়াতের সীমা-পরিসীমার বাইরে যাবার দরকার হবে না। যে বিস্তারিত বিধি শরীয়ত দিয়েছে, তা এখনো প্রতিটি দেশে ও প্রতি যুগে একই ভাবে নিখুঁতভাবে জারী হতে পারে (অবশ্য জীবনের সামগ্রিক বিধানও—যাতে আপনি এ সব জারী করবেন তাকেও ইসলাম মতো চলতে হবে।) এবং শরীয়াত এ পর্যায়ে যেসব মৌলিক পথনির্দেশ দিয়েছে, তা এতো বিশাল ও ব্যাপক যে, প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবন যাপনের কাজে জরুরী আইন কানুন এরই আলোকে প্রণয়ন করা যায়। অতপর যেসব ব্যাপারে শরীয়াতের কোনো বিধি পাওয়া যায় না তাতে স্বয়ং শরীয়াতেরই নিয়ম অনুসারে ইসলামী রাষ্ট্রের 'মাজলিসে শূরা' ও নির্বাচিত ব্যক্তিরা পারস্পরিক পরামর্শে আইন-কানুন তৈরী করার অধিকার রাখে। এভাবে যেসব আইন তৈরী হবে, তাও ইসলামী কানুনেরই একটা অংশ হবে। কেননা তা শরীয়াতেরই প্রদত্ত অনুমতির

ভিত্তিতে প্রণীত। এ কারণেই ইসলামের প্রথম শতকগুলোতে ফেকাহ শাস্ত্রবিদরা 'এসতেহসান' ও 'মাসালেহে মুরসালাহ' ইত্যাদি শিরোনামে যেসব বিধি প্রণয়ন করেছেন তা পরবর্তীকালে ইসলামী আইনেরই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৪. সর্বশেষে আইনের একটি বিশেষ বিভাগ হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইন, একটি রাষ্ট্রকে তার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে এর দরকার। এ ব্যাপারে শরীয়াত যুদ্ধ, সন্ধি ও নিরপেক্ষতার বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মসূচী নির্ধারণ করার জন্যে নেহায়াত বিস্তারিত পথনির্দেশ প্রদান করেছে। যেখানে বিস্তারিত বিবরণ নেই, সেখানে মূলনীতি দেয়া হয়েছে যার আলোকে বিস্তারিত বিধি প্রণীত হতে পারে।

ইসলামী আইনের গতিশীলতা

এ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আইন শাস্ত্রের যতো দিক ও বিভাগে আজ পর্যন্ত মানুষের ধারণা বিস্তার লাভ করেছে, তার কোনো একটি দিকও এমন নেই যার ব্যাপারে শরীয়াত আমাদের পথপ্রদর্শন করেনি। এ পথপ্রদর্শন কোন্ভাবে করা হয়েছে, তার যদি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে এ কথা খুব পরিষ্কার করে বুঝা যায় যে, ইসলামী আইনে কোন্ কোন্ বিষয় স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় এবং তার এ অপরিবর্তনীয় হওয়ার উপকারই বা কি আর কোন্ বিষয় চির প্রগতিশীল এবং এগুলো কিভাবে যুগে যুগে আমাদের ক্রমবর্ধমান সভ্যতা ও সামাজিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

এ আইনে যা স্থায়ী কিংবাপরিবর্তনীয় তা তিন ভাগে বিভক্ত ঃ

১. স্থায়ী ও সুস্পষ্ট আদেশ যা কুরআন অথবা প্রমাণিত হাদীসে প্রদান করা হয়েছে, যেমন মদ, সুদ ও জুয়ার হারাম হওয়া, চুরি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপরাধের শাস্তি এবং মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীদের অংশ।

২. মৌলিক বিধি যা কুরআন কিংবা প্রমাণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, প্রত্যেক নেশা করা হারাম বস্তু হারাম অথবা লেন-দেন যেসব পন্থার মুনাফার বিনিময়ে পারস্পরিক সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পন্ন হবে তা বাতিল কিংবা 'পুরুষ স্ত্রীদের ওপর ক্ষমতাবান' এ বিধিটি।

৩. এমন কতিপয় সীমারেখা যা কুরআন ও রসূলের হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, যেন আমরা আমাদের স্বাধীনতার সীমা এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি। এবং কোনো অবস্থায়ই যেনো এই সীমা অতিক্রম না করি, যেমন একাধিক বিয়ের ব্যাপার, একই সময়ে চার স্ত্রী রাখার সীমা, তালাকের জন্যে সংখ্যা তিন এর পরিসীমা অথবা ওসিয়তের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের সীমা নির্ধারণ করা। ইসলামী আইনের এ স্থায়ী অপরিবর্তনীয় ও অবশ্য পালনীয় অংশই সত্যিকার অর্থে তা--যা ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির চতুঃসীমা ও তার বিশিষ্ট চরিত্র নির্ধারণ করে। আপনি এমন কোনো সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রমাণ পেশ করতে পারেন না যা তার মধ্যে কিছু অপরিবর্তনীয় বিষয় না রেখে নিজের স্বকীয়তা ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে, যদি কোনো সভ্যতার কাছে এমন কোনো কিছু না থাকে বরং সবই যদি থাকে সংশোধনযোগ্য তা হলে সে সভ্যতা মূলত কোনো সভ্যতাই নয়। বরং তাহলো একটি গলিত ধাতু, যাকে প্রতিটি ছাচে ঢেলে সাজানো যায় এবং যে সবসময়ই নিজের রূপ পরিবর্তন করতে পারে। তদুপরি এ সব বিধিবিধান, মূলনীতি ও সীমারেখা সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করার পর প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, শরীয়াত এমন আদেশ সেখানেই দিয়েছে, যেখানে মানুষের সিদ্ধান্তকারী শক্তি ভুল করে 'মারূফ' থেকে সরে যেতে পারে, এমন আশংকা বিদ্যমান থাকে, এমন সব ব্যাপারে শরীয়াত স্পষ্ট আদেশ দিয়ে অথবা খোলাখুলি নিষেধ করে কিংবা মূলনীতি বর্ণনা করে অথবা সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে, এ যেনো পথের পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়া একটি চিহ্ন স্তম্ভ। এর উদ্দেশ্য আমরা যেন বুঝতে পারি সঠিক পথ কোন্‌টি? এ চিহ্নগুলো আমাদের প্রগতির ও উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক নয় বরং আমাদের সহজ সরল পথে পরিচালিত করে। আমাদের চলার পথকে পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ সব স্থায়ী বিধি-বিধানের একটি নির্ভরযোগ্য অংশ এমন আছে যার ব্যাপারে গতকাল পর্যন্ত এ পৃথিবীর মানুষেরা আপত্তি উত্থাপন করে আসছে। কিন্তু আজ আমাদের দেখাদেখি ও দীর্ঘ দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে গতকালকের সেসব বিরোধীদেরও এখন এ সব কিছুর সমর্থক বানিয়ে দিয়েছে এবং এ সব আইনের সত্যতা সম্পর্কে তারাও এখন অনেকটা একমত।

উদাহরণ স্বরূপ আমি শুধু এখানে ইসলামের বৈবাহিক আইন ও উত্তরাধিকার আইনের দিকে ইংগিত প্রদানই যথেষ্ট মনে করছি।

এই স্থায়ী ও অটল বিষয়ের সাথে দ্বিতীয় আরেকটি উপাদান এমন আছে যা ইসলামী আইনে অপরিসীম ব্যাপকতা সৃষ্টি করে এবং তাকে যুগের যাবতীয় পরিবর্তনশীল অবস্থায় প্রগতিশীল করে দেয়া। এগুলো আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত।

১. বিধিসমূহের ব্যাখ্যা অর্থাৎ কোনো আদেশ যে ভাষায় দেয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য অনুধাবন ও তার লক্ষ্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করা। এটা ফেকাহ্ শাস্ত্রের বিশাল এক অধ্যায়। আইনের প্রজ্ঞা ও এ ব্যাপারে বুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা যখন কুরআন হাদীসের ব্যাপারে গবেষণা করেন তখন তারা শরীয়াতের স্পষ্ট আদেশগুলোতেও একাধিক ব্যাখ্যা দেখতে পান এবং তাদের সবাই নিজ নিজ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কোনো একটি ব্যাখ্যাকে দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে আরেকটি ব্যাখ্যার ওপর স্থান দেন। এই ব্যাখ্যার মতদ্বৈত্যতা আগের দিনেও উম্মতের জ্ঞানী লোকদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো আজো হতে পারে, ভবিষ্যতেও এ পথ উন্মুক্ত থাকবে।

২. কেয়াস অর্থাৎ যে ব্যাপারে কোনো পরিষ্কার আদেশ পাওয়া যায় না, সে ব্যাপারে এমন আদেশ প্রদান করা, যা তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো ব্যাপারে আগেই দেখা হয়েছে।

৩. ইজতেহাদ অর্থাৎ শরীয়াতের মৌলিক বিধি-নিষেধ ও সামগ্রিক হেদায়াতকে অনুধাবন করে তাকে এমন সব ব্যাপারে প্রয়োগ করা যাতে পূর্বের কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ উদাহরণ পাওয়া যায় না।

৪. ইসতেহসান অর্থাৎ জায়েজ কার্যক্রমের অসীম পরিসরে প্রয়োজন মতো এমন আইন ও বিধি তৈরী করা, যা ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার ও মূলসত্তার সাথে বেশী পরিমাণ সামঞ্জস্যশীল হবে।

এই চারটি বিষয় এমন, যার বিপুল সম্ভাবনা সম্পর্কে যদি কেউ চিন্তা ভাবনা করেন তাহলে তিনি এই সন্দেহে পড়তে পারেন না যে, ইসলামী আইন কখনো মানবীয় সভ্যতার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন ও পরিবর্তনশীল অবস্থার জন্যে অপর্যাপ্ত হতে পারে। কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, এ ইজতেহাদ, ইসতেহসান, তাবীর ও কিয়াস

কোনোটাই ইচ্ছে করলেই যে কোনো ব্যক্তি শুরু করে দিতে পারে না। আপনি প্রতিটি চলমান ব্যক্তিরই এ অধিকার স্বীকার করতে পারেন না যে, সে দেশের বর্তমান আইনের কোনো একটি ধারা উপধারা সম্পর্কে স্বীয় সিদ্ধান্ত জারী করে দেবে। এ জন্যে আইনের শিক্ষা ও মস্তিষ্কের গঠনের একটি বিশেষ পরিমাপকে আপনিও আবশ্যকীয় বলে স্বীকার করবেন, যার ওপর পুরোপুরি দখল না থাকলে বাইরের কাউকে আইন সম্পর্কে কথা বলার যোগ্য মনে করা হয় না। এভাবে ইসলামী আইনের ব্যাপারেও মতামত দেয়ার অধিকার একমাত্র তাদের আছে যারা এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হাসিল করেছে। ইসলামী বিধি-বিধানের ব্যাখ্যার জন্যে প্রয়োজন সেই ভাষার মাধুর্য সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা, যে ভাষায় তা প্রদান করা হয়েছে, ওই অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়া যে অবস্থায় প্রথম এ আদেশটি নাযিল করা হয়েছে। কুরআনের বাচনভংগী ও হাদীসের বিশাল সংগ্রহ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া দরকার। কেয়াসের জন্যে কেয়াস করনেওয়ালা ব্যক্তিকে সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পর্কে এতোটুকু সজাগ হতে হবে, যেন এক ব্যাপারকে অন্য কিছুর ওপর কেয়াস করার সময় উভয়ের পারস্পরিক সামঞ্জস্যের বিভিন্ন দিকগুলোকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে, নতুবা এক আদেশকে দ্বিতীয় আদেশের ওপর সংস্থাপন করতে গিয়ে সে ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। ইজতেহাদের জন্যে শরীয়াতের হুকুম আহকামে গভীর পর্যবেক্ষণ ও দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর উৎকৃষ্ট জ্ঞান শুধু সাধারণ জ্ঞানই নয় বরং ইসলামী দৃষ্টিভংগীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ইসতেহসানের জন্যেও অপরিহার্য হচ্ছে, ইসলামের মেজাজ ও তার সামগ্রিক বিধি সম্পর্কে ভালোভাবে জানা, যেন বৈধ কার্যক্রমের বিশাল ক্ষেত্রে যে বিধি সে প্রণয়ন করবে তাকে ওই জীবন বিধানের মধ্যেই খাপ খাওয়ানো যায়। এ জ্ঞানগত মানসিক যোগ্যতার পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ও দরকার, যার অবর্তমানে ইসলামী আইনের সঠিক ক্রমন্নোতি কখনো সঠিক পথে চলতে পারে না। তা হচ্ছে যারা এ কাজ করবেন তাদের মধ্যে ইসলামকে অনুসরণ করার আকাংখা আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতি বিদ্যমান থাকবে। এ কাজ তাদের জন্যে নয় যাদের দৃষ্টি আল্লাহ ও আখেরাত থেকে বেপরোয়া হয়ে শুধু দুনিয়াবী সুবিধা ও সুযোগের প্রতি নিবন্ধ থাকে এবং ইসলামী

মূল্যবোধের পরিবর্তে ভিন্ন কোনো সভ্যতার মূল্যবোধের প্রতি অধিক পরিমাণ আকৃষ্ট হয় এবং তাকে বেশী পসন্দ করে, এ ধরনের লোকদের হাতে ইসলামী আইনের উন্নতি হতে পারে না—শুধু তার অপব্যাখ্যাই হতে পারে।

২৮

কতিপয় অভিযোগ ও তার জবাব

এদেশে ইসলামী আইন জারী করার কথা বললে সাধারণত যেসব অভিযোগ উথাপিত হয় এবার আমি সে সব অভিযোগ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো। এ সব অভিযোগের সংখ্যা অনেক। কারণ এগুলোর বলার সময় সবাই প্রাণ খুলে ভাষা প্রয়োগ করে। কিন্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আসল অভিযোগ শুধু চারটি।

১. ইসলামী আইনের 'পুরানো' হওয়ার অভিযোগ

প্রথম অভিযোগ হলো, শতাব্দীর পুরানো আইন যুগের একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যে কিভাবে উপযোগী হতে পারে?

যাদের পক্ষ থেকে এ অভিযোগ পেশ করা হয়, আমার সন্দেহ হচ্ছে, তাদের ইসলামী আইন সম্পর্কে প্রাথমিক ও মোটামুটি ধারণাও নেই। সম্ভবত তারা কোথায়ও এই উড়া খবরটি শুনেছেন যে, এ আইনের মৌলিক নীতিগুলো সাড়ে তেরশ বছর আগে বিবৃত হয়েছে। এরপর তারা এ কথাই ধরে নিয়েছেন যে, সে সময় থেকে এ আইন সেই একই অবস্থায় রাখা হয়েছে। সেই ভিত্তিতেই তাদের মনে এ আশংকা জন্মেছে যে, আজ যদি কোনো আধুনিক রাষ্ট্র তাকেই দেশের আইন হিসেবে মেনে নেয়, তাহলে তা কিভাবে তার উপযোগী হতে পারে। তাদের এ কথা জানা নেই যে, সাড়ে তেরশ' বছর আগে যে মূলনীতি দেয়া হয়েছিলো তার ওপর ভিত্তি করে তখন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থাও কায়েম হয়েছিলো। অতপর দৈনন্দিন জীবনে যেসব প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সে সব ব্যাপারে আইন ব্যবস্থা কেয়াস ইজতেবাদ ও ইসতেহ্সানের (এগুলোর আগে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে) মাধ্যমে এ আইনের গতিশীলতা সে দিন থেকেই শুরু হয়েছে। অতপর ইসলামী মূলবোধ ব্যাপক হয়ে পৃথিবীর অর্ধেকের চেয়ে বেশী সভ্য দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। এরপর যতো রাষ্ট্রই পরবর্তি বারশ' বছর মুসলমানরা কায়েম করেছে তার সব কয়টির প্রশাসনসহ যাবতীয় ব্যবস্থা এ আইনের

ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়েছে। যুগে যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এ আইনেও ক্রমান্বয়ে ব্যাপকতা এসেছে। উনবিংশ শতক পর্যন্ত এ আইনের গতিশীলতা এক দিনের জন্যও বন্ধ হয়নি। অন্যদের কথা আলাদা, আপনাদের এ দেশই উনবিংশ শতকের প্রথমাংশ পর্যন্ত এই বিধানে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন চালু ছিলো। এখন বড়ো জোর এক দেড়শ বছর সম্পর্কে আপনি বলতে পারেন যে, এ সময়টাতে ইসলামী আইনের বাস্তব প্রয়োগ বন্ধ ছিলো এবং এ সময়েই এ আইনের গতি বন্ধ হয়ে আছে। কিন্তু প্রথম কথা হলো, এ সময়টা কোনো বিরাট সময় নয়। সামান্য পরিশ্রম করেই এ সমস্যা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি। তাছাড়া আমাদের কাছে এ পর্যায়ে প্রত্যেক শতাব্দীর ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদদের যাবতীয় পদক্ষেপের রেকর্ড বর্তমান আছে, যা দেখে আমরা জানতে পারি, আমাদের পূর্ববর্তি ব্যক্তিরা এ ক্ষেত্রে এ যাবত কি কি কাজ করেছেন এবং একে এ যুগের সাথে মিলানোর জন্যে আর কি কি কাজ আমাদের করতে হবে। অতপর যেসব নীতিমালা অনুসরণ করে আইনে বার বার গতিশীলতা আনায়ন করা হয়েছে, তা দেখে যে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিই এ ব্যাপারে সন্দেহই পোষণ করতে পারবেন না। যেভাবে গত বারশ' বছরে এ আইন যুগ ও অবস্থার প্রয়োজনে ব্যাপকতা লাভ করেছে, সেভাবে আজও করতে পারে, আগামী দিনগুলোতেও এভাবে তার প্রসার হতে থাকবে। মূর্খ লোকেরা না জেনে হাজার প্রকার ধোঁকার শিকার হতে পারে কিন্তু যারা এ আইন সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা রাখে, যারা সম্ভাবনা বুঝে, যারা ইতিহাসের ধারণা সম্পর্কেও ওয়াকেফহাল, তারা এক মুহূর্তের জন্যেও এ সংকীর্ণতার শিকার হতে পারে না।

২. বর্বরতার অভিযোগ

দ্বিতীয় অভিযোগ যা জনসাধারণের কাছে নরম সূরে এবং আলাপ আলোচনার বৈঠকে খুব ধৃষ্ঠতা সহকারে বলা হয় তাহলো, ইসলামী আইনের বহ কিছু মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন চিন্তাধারারই ফসল, একে কিভাবে বর্তমান যুগের উন্নত চিন্তাধারা বরদাস্ত করতে পারে? উদাহরণ স্বরূপ হাতকাটা, বেত্রাঘাত ও পাথর মেরে হত্যা করার মতো নির্মম শাস্তিসমূহের কথা উথাপন করা হয়।

এ অভিযোগ শুনে এ সব ব্যক্তিদের বলতে ইচ্ছে হয়--সাহেব! আজ নিজেদের পবিত্রতার কাহিনী বলতে হবেনা, এক বারের জন্যে নিজের চেহারার দিকেও দেখুন। নিজের অভ্যন্তরে কুৎসিত ছবিখানিও দেখুন। যে যুগে আপনাদের দ্বারা এটম বোম আবিষ্কৃত হয়েছে, যে যুগের নৈতিক চিন্তাধারাকে উন্নত বলতে আপনাদের মনে লজ্জার অনুভূতি জাগা দরকার। আজকের (নামকা ওয়াস্তে) সুসভ্য মানুষেরা অন্য মানুষের সাথে যে আচরণ করছে তার নজীর পুরনো যুগের কোনো অন্ধকার দিনেও পাওয়া যাবে না। এরা পাথর মেরে মানুষ হত্যা করে না--এরা বোমার দ্বারা মানুষের গোটা জাতিকেই ধ্বংস করে। শুধু হাতই কাটেনা তার শরীরের সর্বাংশ বিনষ্ট করে দেয়। বেত্রাঘাতে তার মন ভরে না--তারা জীবন্ত আগুনে তাকে জ্বালিয়ে দেয়, মৃত লাশ থেকে চর্বি বের করে তা দিয়ে সাবান বানায়--যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায়ই নয়--সুস্থ পরিবেশেও যাকে তারা রাজনৈতিক অপরাধী, জাতীয় স্বার্থের দুশমন অথবা অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে তাদের নির্মমভাবে শাস্তি দেয়ার তারা কোন্ কাজটুকু বাকী রেখেছে? অপরাধ প্রমাণিত হবার আগে শুধু অনুসন্ধানের জন্যেও অপরাধ স্বীকার করানোর জন্য আজকের সুসভ্য মানুষরা যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাও কারো অজানা নয়। এ সব কিছুর সাথে এ উন্নত চিন্তাধারা মানুষের হাতে মানুষের অত্যাচারিত হওয়ার ব্যাপারটা সহ্যই করতে পারে না। অথচ ব্যাপারটা তা নয়। আজ শুধু অত্যাচারই সহ্য করছে না, জঘন্যতম ও নিষ্ঠুরতম অত্যাচারও তাদের সামনে অহরহ ঘটছে। অবশ্য পার্থক্য এসেছে শুধু নৈতিক মূল্যবোধে তারা যাকে মারাত্মক অপরাধ মনে করেন তার জন্যে যথেষ্ট শাস্তির বিধান করে না। যেমন, তাদের রাজনৈতিক শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা, তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থে প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া। আবার যে অপরাধকে তারা সত্যিকার অর্থে অপরাধই মনে করে না তার ওপর শাস্তি দূরে থাক সামান্য কোনো তিরস্কারও তারা বরদাস্ত করে না। আর যেহেতু এটা তাদের কাছে অপরাধই নয়--তাই এ জন্যে শাস্তি বিধানও তাদের কাছে অসহনীয়। যেমন মদ খেয়ে কিছু তৃপ্তি (?) লাভ করা অথবা এমনি রিক্রিয়েশনের জন্য ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

এখন আমি সে সব অভিযোগ উত্থাপনকারীদের জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনারা কোন্ নৈতিক মূল্যবোধ স্বীকার করবেন, ইসলামের

নৈতিক মূল্যবোধ না বর্তমান সভ্যতা প্রদত্ত এই মারাত্মক ও তথাকথিত মূল্যবোধকে? যদি আপনাদের মূল্যবোধ বদলে গিয়ে থাকে, যদি ইসলাম প্রদত্ত হালাল হারাম, সত্য মিথ্যা ও নেকী বদীর মাপকাঠি পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে থাকে অথবা আপনারা তা যদি ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে ইসলামের পরিমন্ডলে আপনাদের স্থানই বা কোথায় যে আপনি সে ব্যাপারে কথা বলবেন, আপনার স্থান তখন মিল্লাতের ভেতরে নয়--বাইরেই হবে। আপনি আপনার মিল্লাত আলাদা তৈরী করে দিন, নিজের জন্যও অন্য কোনো নাম ঠিক করুন এবং পরিষ্কার করে বলে নিন যে, ইসলামকে একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে আমরা পরিত্যাগ করেছি। যে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তির বিধানসমূহকে আপনি বর্বর ও নিষ্ঠুর বলছেন, তার ওপর ঈমান আনার জন্য আপনাকে কোন্ নির্বোধ পরামর্শ দিচ্ছে? কোন নির্বোধ ব্যক্তিই এটা চাইবে যে আল্লাহকে মূর্খ বলার পরও আপনি তার ওপর ঈমান আনবেন।

৩. ফেকাহ্ শাস্ত্রের মতবিরোধের অভিযোগ

তৃতীয় এই অভিযোগ করা হয় যে, ইসলামে তো অনেক ফের্কা আছে এবং সব ফেকারই স্বতন্ত্র 'ফেকাহ' আছে। যদি এখানে ইসলামী আইন জারি করার সিদ্ধান্ত করা হয় তাহলে কোন ফেকার কার্যকার হবে?

অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে এ অভিযোগটি সম্পর্কেই ইসলাম বিরোধীরা বেশী আশাবাদী। তারা মনে করে যে, শেষ পর্যন্ত এ অভিযোগই মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে ইসলামের বিদপকে(?) এড়ানো যাবে। এমনকি মুসলমানদের মধ্যে যেসব লোক প্রকৃত সত্য সম্পর্কে সচেতন না তারাও এ প্রশ্নে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন যে, এ জটিলতা শেষতক কিভাবে সমাধান হবে? অথচ তাদের অনেকেই জানেনা যে, এটা কোনো জটিলতাই নয়। বিগত বারশ' বছরে কখনো কোথাও ইসলামী আইনের প্রতিষ্ঠাকে এ জটিলতা রুখতে পারেনি।

সর্বাগ্রে এটা বুঝে নিন যে, ইসলামী আইনের মৌল কাঠামো যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ) কর্তৃক নির্ধারিত তা স্থায়ী বিধান, কতিপয় মূলনীতি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা--এগুলো প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত একই ধরনের স্বীকৃত ছিলো, এ সব কিছুতে কোনো মত বিরোধ না

অতীতে ছিলো, না বর্তমানে আছে। ফেকাহর মতেবিরোধ যা আছে তা সবই বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা, কেয়াস ও ইজতেহাদী সমস্যার ব্যাপারে। সর্বোপরি তারও এক বিরাট অংশ হচ্ছে জায়েজের পরিসীমার ভেতর। তাছাড়া এ সব মতবিরোধের ধরনও জানা দরকার। কোনো আলেম যদি শরীয়াতের বিধানের ব্যাখ্যা পেশ করেন, কোনো ইমাম স্বীয় ইজতেহাদ ও কেয়াসের বলে কোনো সমস্যার সমাধান করেন কিংবা কোনো মুজতাহিদ যদি ইসতেহসানের ভিত্তিতে কোনো বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করেন, তা সাথে সাথেই ইসলামী রাষ্ট্রের আইনে পরিণত হয় না। মূলত তার ধরন হচ্ছে একটি প্রস্তাবের মতোই, আইনে পরিণত হয় তখন, যখন তার ওপর যুগের ফকীহদের ঐকম্যত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা তাদের অধিকাংশ তাকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেন এবং তার ওপরই ফতোয়া প্রদত্ত হয়। আমাদের ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদরা যখন ফেকাহর কেতাবে কোনো মাসযালা বর্ণনা করে লিখেছেন যে 'এর ওপর ঐকমত্য স্থাপিত হয়েছে কিংবা এর ওপর অধিকাংশের মত পাওয়া গেছে' তখন তার অর্থ হলো, এ মতামত এখন আর শুধু প্রস্তাব আকারেই নেই, এটি এখন সর্বসম্মত কিংবা অধিকাংশের সম্মতিতে আইনে পরিণত হয়েছে।

এ সব সম্মত অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত ফায়সালাও আবার দু'প্রকার। এক হচ্ছে, ওসব বিষয় যাতে সর্বকালের সকল ফকীহদের ঐকমত্য ছিলো অথবা মুসলিম দুনিয়ার অধিকাংশই তাকে সর্বদাই গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় হচ্ছে, সে বিষয়ে কোনো যুগের বিশেষ কোনো দেশের মুসলমানদের ঐকমত্য স্থাপিত হওয়া কিংবা তাদের অধিকাংশের মতের ভিত্তিতেই ঐকমত্য স্থাপিত হওয়া।

প্রথম ধরনের ফায়সালা, যদি তা সর্বসম্মত হয় তবে তাতে দ্বিতীয় বার পর্যালোচনা করা যাবে না তাকে সকল মুসলমানদের আইন হিসেবেই গ্রহণ করতে হয়। যদি তা অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে স্থিরীকৃত হয়, তবে দেখতে হবে আমরা যে দেশে ইসলামী আইন জারি করতে চাই তার অধিকাংশ লোক একে গ্রহণ করে কিনা, যদি গ্রহণ করে তবে তাই দেশের আইনে পরিণত করা হবে। কেউ বলতে পারেন এতো বিগত দিনের ফেকাহর মাসয়ালার ব্যাপারেই প্রযোজ্য, ভবিষ্যতে কি হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, সে-ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা আসবে তাতে--তাবীর, কেয়াস, ইজতেহাদ ও ইসতেহসান যাই হোক,

আমাদের দেশে দায়িত্বশীল, যাদের হাতে সমস্যাসমূহের সমাধানের ভার ন্যস্ত থাকবে তাদের সার্বিক মতামতের ভিত্তিতেই কিংবা তাদের অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে ফায়সালা হবে এবং সে ফায়সালাই দেশের আইনে পরিণত হবে। আগেও সব মুসলিম দেশের ফতোয়া দেশের সব কিংবা অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে তৈরী হতো। আজও এ পথটি কার্যকরভাবে চলতে পারে। আমি বুঝি না গণতান্ত্রিক মূলনীতির ভিত্তিতে এছাড়া আর কি বিষয়ের প্রস্তাব করা যেতে পারে? এখন প্রশ্ন হলো, মুসলমানদের মধ্যে যারা অধিকাংশের সাথে ঐকমত্য পোষণ করবে না। তাদের অবস্থা কি হবে? এর জবাব হচ্ছে, এ ধরনের স্বল্প সংখ্যক লোকের দল নিজেদের ব্যক্তিগত আইনের সীমা পর্যন্ত নিজেদের মতামতের ফেকাহ্ প্রচলন করার দাবী জানাতে পারে এবং তাদের এ দাবী অবশ্যই মানা উচিত। কিন্তু রাষ্ট্রের আইন তাই হবে যার ওপর অধিকাংশ লোকের ঐকমত্য থাকবে। আমি বিশ্বাস করি, আজ মুসলমানদের কোনো ফের্কাই এ মূর্খতাজনিত কথা বলবে না যে, যেহেতু রাষ্ট্রের ইসলামী আইনের সাথে আমরা একমত হলাম না তাই এখানে কুফরী আইন চালু করা হোক। ইসলামের কতিপয় শাখা-প্রশাখার মতবিরোধ করে মুসলমান কুফরী আইনে ঐকমত্য পোষণ করা এমন একটি বাহুল্য কথা যা কয়েকজন কুফরঘেষা ব্যক্তির কাছে যতোই প্রিয় হোক না কেন, তাকে মুসলমানদের কোনো ফের্কাই মানার জন্য এগিয়ে আসবে না।

৪. অমুসলমান সংখ্যালঘুদের সমস্যা

সর্বশেষ অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, সেই দেশে শুধু মুসলমানই বাস করে না অমুসলিমও যারা এদেশে বাস করে তারা কিভাবে সেটা মেনে নেবে যে, তাদের ওপর মুসলমানদের ধর্মীয় আইন জারি করা হবে।

এ অভিযোগ যারা পেশ করেন, তারা মূলত এ সমস্যাটিকে ওপর থেকেই পর্যবেক্ষণ করেছেন, তারা পুরোপুরি তা অনুসন্ধান করে দেখেননি, এ জন্য তাদের কাছে বিষয়টিকে খুব জটিল মনে হয়, অথচ সামান্য চেষ্টা করলে সমস্ত গিট এমনিই খুলে যায়। জানা কথা, আমরা যে আইন সম্পর্কে কথা বলছি তা রাষ্ট্রের আইন কোনো ব্যক্তির

ব্যক্তিগত আইন নয়। মানুষের ব্যক্তিগত আইনের ব্যাপারে এ কথা বলা যায় এবং তা স্বীকৃত সত্যও যে, সেখানে তাদের আইনই চলবে। এ অধিকার সবার আগে ও সবচাইতে সুন্দুরভাবে ইসলামই তার অমুসলিম অধিবাসীদের প্রদান করেছে বরং সত্য কথা হচ্ছে ইসলামই দুনিয়ায় সর্বপ্রথম মানুষকে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত আইনের পার্থক্য শিখিয়েছে। আধুনিক দুনিয়ায় আইনবেত্তারাও এ মূলনীতি ইসলামের কাছে থেকেই শিখেছেন। তারা এ মূলনীতিও শিখেছেন যে, যে দেশের অধিবাসীরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, তাদের সব লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপার ব্যক্তিগত আইনের ভিত্তিতেই চলবে। অতএব অমুসলিম নাগরিকদের তো এ আশংকাই হওয়া উচিত নয় যে, আমরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমাদের ধর্মীয় আইন জারি করে দেবো এবং এ ক্ষেত্রে আমরা আমাদেরই প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিরোধিতা করবো যার ব্যাপারে ইসলাম আমাদের সুস্পষ্ট বিধান দিয়ে দিয়েছে।

এখন শুধু প্রশ্ন এই থেকে যায়, এ দেশের রাষ্ট্রীয় আইন কোন্টি হবে, ইনসাফের দৃষ্টিতে এ প্রশ্নের জবাব এ ছাড়া আর কি হতে পারে, রাষ্ট্রীয় আইন তাই হবে যা দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য। সংখ্যালঘুরা তাদের বৈধ অধিকার অবশ্যই আমাদের কাছে চাইতে পারে, আর আমরা তাদের চাইবার আগেই তা দিতে চাই। কিন্তু তারা কিভাবে এটা দাবী করেন যে, আমরা তাদের খুশী করার জন্য আমাদের আকীদা-বিশ্বাসকে অস্বীকার করবো এবং এমন কোনো আইনকে আমাদের হাত দিয়েই জারী করবো, যাকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি না। যতো দিন পর্যন্ত আমরা আমাদের দেশে স্বাধীন ছিলাম না ততোদিন পর্যন্ত আমাদের বাধ্যতামূলকভাবে বাতিল আইনকে সইতে হয়েছে, তার দায়িত্ব থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি। কিন্তু এখন যখন দেশের শাসন ব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরই হাতে, এখন যদি আমরা জেনে বুঝে ইসলামী আইনের স্থলে অন্য কোন আইন জারি করি, তখন তার অর্থ হবে, আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাচ্ছি। সত্যই কি কোনো অমুসলিম দলের এ অধিকার আছে যে, তাদের খুশীর জন্য আমরা আমাদের দীন ধর্ম সব পরিবর্তন করে নেবো। কোনো সংখ্যালঘুর কি ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো সংখ্যাগুরুর কাছে এ বাণী পেশ করা সংগত যে, তারা তাদের মতামতের ভিত্তিতে যা সত্য

মনে করবে তাকে বর্জন করবে এবং তাই গ্রহণ করবে যাকে সংখ্যালঘু লোকেরা সত্য বলে বিশ্বাস করবে অথবা এটা কি কোনো যুক্তি সংগত নিয়ম, যে দেশে বিভিন্ন ধর্মের লোক বসবাস করবে তাদের সবাইকে ধর্মহীন হয়েই থাকতে হবে। যদি এ সব প্রশ্নের জবাব হাঁ-বোধক হয় তবে আমি বুঝি না যে, একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের রাষ্ট্রীয় আইন ইসলামী আইন হবে না কেন?

(তরজমানুল কুরআন, জুলাই, ১৯৪৮)

ইসলামী আইন কোন্ পন্থায় কার্যকর হতে পারে[১]

ইসলামী আইন কাকে বলে, তার আভ্যন্তরীণ পরিচয় কি, তার উদ্দেশ্য ও মূলনীতিসমূহ কি, মুসলমান হওয়ার কারণে তার সাথে আমাদের সম্পর্ক কি, আমরা কেন আমাদের দেশে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য, তাছাড়া ওসব সন্দেহ ও অভিযোগের মূল্যই বা কি যা এ ব্যাপারে সাধারণত পেশ করা হয়। এ সব বিষয়ের আলোচনা ইতিপূর্বে আমি আপনাদের সামনে পেশ করেছি। সেটা ছিলো অনেকটা পরিচিতি মূলক বক্তব্য। এবার আমি একটু বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই যে, আমরা যদি সত্যই এ দেশে ইসলামী আইনকে নতুনভাবে চালু করতে চাই তাহলে আমাদের কি কি কাজ করতে হবে?

ত্বরিত বিপ্লব সম্ভব নয়—বাঞ্ছিতও নয়

এ পর্যায়ে সর্বাগ্রে আমি সে ভুল ধারণাটি দূরীভূত করতে চাই যা ইসলামী আইন প্রচলনের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষের মনেই বাসা বেঁধে আছে। মানুষ যখন শুনে যে, আমরা এখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চাই এবং সে রাষ্ট্রে আইন হবে ইসলামী আইন, তখন তারা ধারণা করে যে, সম্ভবত রাষ্ট্রের পরিবর্তনের ঘোষণার সাথে সাথে অতীতের সমস্ত আইন রহিত হয়ে যাবে এবং ইসলামী আইন একই দিনে জারী করে দেয়া হবে। এ ভুল ধারণা শুধু সাধারণ লোকদের মধ্যে নয়—বহু ধর্মীয়

১. ১৯৪৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী লাহোর ল' কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতা

জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরাও এ রোগে ভুগছেন। তাদের কাছে ব্যাপারটি এমন হওয়া উচিত যে, এদিকে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হবে ওদিকে সাথে সাথেই অনৈসলামী আইন সমূহের প্রচলন বন্ধ করা হবে এবং রাতারাতি ইসলামী আইন জারী করে দেয়া হবে। সত্যিকার কথা হচ্ছে, এরা কথাটি বুঝতে পারে না যে, কোনো দেশের আইনের সাথে সে সমাজের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গভীর সংযোগ থাকে। তাদের এটাও জানা নেই যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো দেশের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত সেই দেশের আইন ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব। তাদের এ ধারণাও নেই অতীতের দেড় দু'শ' বছর আমাদের ওপর যে ফিরেঙ্গী শাসন কায়েম ছিলো তা কিভাবে আমাদের পুরো জীবন ব্যবস্থাকে ইসলামী মূলনীতি থেকে দূরে সরিয়ে অনৈসলামী ব্যবস্থার ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এখন আবার তাকে পরিবর্তন করে অন্য মূলনীতির ওপর চালানোর জন্য কতো পরিশ্রম, কতো প্রচেষ্টা ও কতো সময়ের প্রয়োজন? এরা বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নয়। এ জন্য সামগ্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তনকে একটি ছেলেখেলা মনে করে—এ যেন হাতে সরিসা ভাঙ্গানোর স্বপ্ন। অতপর এদের এ সব কথাবার্তা মূল ধারণাকে হাস্যস্পদ করে ও তার অনুসারীদের ছোট করার সুযোগই এনে দেয়। এ সুযোগ তারাই লাভ করে যারা ইসলামী জীবন বিধান থেকে পালিয়ে বেড়াবার পথ খোঁজে।

ধীরে চলার নীতি

যদি সত্যিই আমরা আমাদের এ কল্পনাকে সফল দেখতে চাই, তাহলে আমাদের প্রকৃতির সে স্থায়ী নিয়ম থেকে গাফেল হলে চলবে না যা সামগ্রিক জীবনে যতো পরিবর্তনই আসুক তা আস্তে আস্তেই আসে। বিপ্লব যতো দ্রুত ও একমুখী হবে, তা ততো অস্থায়ী ও নড়বড়ে হবে। একটি স্থীর ও স্থায়ী বিপ্লবের জন্য এটা অবশ্য জরুরী যে, জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে পুরোপুরি ভারসাম্য বজায় থাকবে, তার একটি বিভাগ আরেকটি বিভাগের পরিপূরক হয়ে কাজ করবে।

নবী যুগের আদর্শ

এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে মহানবীর (সাঃ) সে বিপ্লব, যা তিনি আরবে কায়েম করেছিলেন। যে ব্যক্তি মহানবীর (সাঃ) কীর্তি সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও রাখে, সে জানে যে, তিনি পুরো ইসলামী আইন তার সমস্ত বিভাগসহ একদিনে জাঁরী করেননি বরং তিনি সমাজকে সে জন্য আস্তে আস্তে তৈরী করেছিলেন। এ প্রস্তুতির সাথে সাথে পুরনো জাহেলী নিয়ামাবলীকে পরিবর্তন করে তার জায়গায় নতুন নতুন ইসলামী বিধান স্থাপন করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও নৈতিক বিধানসমূহ মানুষের কাছে পেশ করেছেন। অতপর যারা তা গ্রহণ করেছে, তাদের তিনি প্রশিক্ষণ দিয়ে এমন একটি সুস্থ দল গঠন করেছেন, যাদের মন-মানসিকতা, দৃষ্টিভংগী ও কার্যপ্রণালী ছিলো পূর্ণ ইসলাম মোতাবেক। এ কাজটি যখন একটি বিশেষ সীমায় এসে পূর্ণতা লাভ করেছে তখন তিনি যে দ্বিতীয় পদক্ষেপ নিলেন তা হচ্ছে মদীনায় এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, যার ভিত্তি ছিলো খালেস ইসলামী আদর্শের ওপর এবং যার উদ্দেশ্যই ছিলো দেশের মানুষের জীবনকে ইসলামী ধাঁচে গড়ে তোলা। এভাবে রাজনৈতিক শক্তি ও দেশীয় সম্পদকে হাতে নিয়ে মহানবী (সাঃ) ব্যাপক পরিসরে সংশোধন ও পুনর্গঠনের সে কাজ শুরু করলেন, যার জন্য তিনি এতোদিন পর্যন্ত শুধু দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমেই প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি একটি সুসংহত ও সুসংগঠিত উপায়ে মানুষদের চরিত্র, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি পরিবর্তনের চেষ্টা করলেন, শিক্ষার এক নতুন ব্যবস্থা কায়েম করলেন যা সে সময়ের পরিস্থিতি মোতাবেক বেশীর ভাগ মৌখিক শিক্ষার মাধ্যমেই চলতো। জাহেলী চিন্তাধারার পরিবর্তে ইসলামী চিন্তাধারা তার ওপর উপস্থাপন করলেন, পুরাতন রসম-রেওয়াজের জায়গায় সংস্কারমূলক নতুন রসম ও শিষ্টাচার চালু করলেন এবং এ ব্যাপক সংস্কারের ফলে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে একদিকে আস্তে আস্তে পরিবর্তন সূচিত হতে লাগলো। তিনি তার পাশাপাশি অত্যন্ত ভারসাম্যমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামী আইনের বিধিসমূহ জারি করতে থাকলেন। এভাবেই ৯ বছরের মধ্যে একদিকে জাহেলী যুগের পরিবর্তে ইসলামী জীবন গঠন পূর্ণতা পেলো, অন্যদিকে ইসলামী আইনও দেশে জারী হয়ে গেলো।

কুরআন ও হাদীসের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের দ্বারা আমাদের কাছে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিনি এ কাজটি কি ধীর পদ্ধতিতে করেছেন। উত্তরাধিকার আইন তৃতীয় হিজরীতে জারি করা হয়েছে, বিয়ে তালাকের আইন ৭ম হিজরীতে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে, ফৌজদারী আইন কয়েক বছর পর্যন্ত এক এক ধারা করে জারী করা হয়েছে, ৮ম হিজরীতে গিয়ে তা পূর্ণ হলো। মদ্যপান নিষিদ্ধ করার পরিবেশ আস্তে আস্তে তৈরী করা হলো, ৫ম হিজরীতে তার ওপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলো, সুদের ক্ষতি সম্পর্কে যদিও মক্কার জীবনেই পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবার সাথে সাথেই তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি বরং দেশের পুরো অর্থ ব্যবস্থাকে যখন পরিবর্তন করে একটি নতুন পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে তখন ৯ম হিজরীতে গিয়ে তার ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। এ কাজটি ছিলো ঠিক একজন নির্মাতার কাজের মতো, নির্মাতা তার সামনে তার প্লান মতো প্রাসাদ বানানোর কারিগর ও মজদুর জমা করলেন, উপায়-উপকরণ একত্রিত করলেন, মাটিকে সমান করলেন, ভিত্তি স্থাপন করলেন, অতপর তার ওপর এক একটি ইট রেখে প্রাসাদকে বাড়াতে থাকলেন। এভাবেই কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শেষ পর্যন্ত সেই প্রাসাদ পূর্ণাংগভাবে নির্মিত হলো--যে প্রাসাদের কাঠামো একদিন তার চিন্তার রাজ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিলো।

ইংরেজ যুগের উদাহরণ

মাত্র কিছুদিন আগের কথা, আমাদের দেশে যখন ইংরেজদের রাজত্ব কায়েম হলো, তখন কি তারা এক মুহূর্তেই এখানকার সমস্ত আইন-কানুন পরিবর্তন করে দিয়েছে? তাদের রাজত্বের পূর্বে ছয় সাত শ' বছর পর্যন্ত এখানকার পুরো জীবন বিধান ইসলামী ফেকাহর ভিত্তিতেই পরিচালিত হতো। এ শতাব্দীর জমানো প্রাসাদকে ভেঙ্গে দেয়া ও পাশ্চাত্যের নীতি ও আদর্শ মোতাবেক একটি দ্বিতীয় ধরনের প্রাসাদ তৈরী করা এক দিনের কাজ ছিলো না। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত এখানে ইসলামী ফেকাহ চালু ছিলো। বিচারালয় সমূহে কাজীরাই বসে বিচার

করতেন, ইসলামের আইন তখনো শুধু ব্যক্তিগত আইনের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিলো না, তা রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে কায়েম ছিলো। ইংরেজদের এখানকার আইন–কানুনকে পরিবর্তন করতে এক শত বছর সময় লেগেছিলো। তারা আস্তে আস্তে এখানকার ব্যবস্থা পরিবর্তন করে নিজের উদ্দেশ্য মোতাবেক মানুষ তৈরী করেছে। নিজ চিন্তাধারার ব্যাপক প্রচারের ফলে মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন এসেছে, শাসন ক্ষমতার প্রভাব দ্বারা মানুষের চরিত্র বদলে দিয়েছে। নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্বারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করেছে। এভাবে তারা এক এক করে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রভাবের দ্বারা এখানকার সামগ্রিক জীবনকে একদিকে পরিবর্তিত করতে থাকলো এবং পুরনো আইন রহিত করে নতুন আইন প্রতিষ্ঠা করতে লাগলো।

ধীরে না চলে উপায় নেই

এখন যদি আমরা এখানে ইসলামী আইন জারী করতে চাই, তাহলে আমাদের জন্যও ইংরেজদের শত বছরের তৎপরতাকে মুছে দেয়া এবং তার ওপর নতুন নকশা স্থাপন করা একটি কলমের খোচায়ই সম্ভব নয়।

আমাদের পুরনো শিক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘ দিন যাবৎ জীবন ও তার সমস্যা থেকে সম্পর্কবিহীন থাকার কারণে এমন প্রাণহীন হয়ে পড়েছে যে, তার থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে হাজারেও এমন একজন পাওয়া যাবে না, যিনি একটি আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্রের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট হতে পারেন। অপরদিকে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা যে মানুষ তৈরী করছে, তারা ইসলাম ও তার আইন–কানুন সম্পর্কে বিলকুল অজ্ঞ এবং তাদের মধ্যেও এমন লোকের সংখ্যা নেহায়াত কম, যাদের মানসিকতা কমপক্ষে এ শিক্ষা ব্যবস্থার বিষ প্রভাব থেকে মুক্ত আছে। অতপর এক দেড়শ বছর স্থবির থাকার ফলে আমাদের আইনের সম্পদ সমূহও যুগের গতি থেকে বেশ কিছু পেছনে পড়ে গেছে এবং তাকে বর্তমান যুগের বিচার ব্যবস্থার উপযোগী বানানোর জন্যে যথেষ্ট পরিশ্রম দরকার। সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, দীর্ঘ দিন যাবৎ ইসলামী প্রভাব মুক্ত ও ইংরেজ প্রভাবে প্রভাবাধীন থাকতে থাকতে আমাদের চরিত্র, সমাজ, সভ্যতা, মানসিকতা, অর্থনীতি ও রাজনীতির চেহারাই মূল ইসলামী

নকশা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এ অবস্থায় দেশের আইন ব্যবস্থাকে এক মুহূর্তে বদলে দেয়া—যদি এটা সম্ভবও হয়—সুফলদায়ক হতে পারে না। কেননা এ অবস্থায় জীবনের অন্যান্য দিকের সাথে আইনের অপরিচিতি ক্ষেত্র বিশেষে সংঘর্ষই চলবে এবং এ ধরনের আইনকে পরিবর্তন করে দেয়ার ওই পরিণাম হবে যা এমন একটি বীজের হতে পারে, যাকে বিপরীতমুখী আবহাওয়ায় এমন জমিনে লাগানো হয়েছে যার ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। অতএব, যে পরিবর্তন আজ আমরা চাই, তার পরিবর্তন নৈতিকতা, সমাজ ব্যবস্থা, সভ্যতা, সংস্কৃতি অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে ভারসাম্য বজায় রেখেই করতে হবে।

একটি মিথ্যে অজুহাত

আস্তে আস্তে অগ্রসর হবার এ যুক্তিসংগত ও নির্ভুল নীতিকে অজুহাত বানিয়ে যারা এ কথার সপক্ষে যুক্তি-প্রমান পেশ করেন যে, এখানে আসলে বিধর্মী বরং সঠিক অর্থে ধর্ম বিবর্জিত রাষ্ট্রই কায়েম হওয়া দরকার। অতপর যখন ইসলামী পরিবেশ তৈরী হবে তখন ইসলামী রাষ্ট্র এমনিই কায়েম হয়ে যাবে, এরা পরবর্তি সময় ইসলামী কানুনও জারী করে দেবে। তারা সত্যিই একটি অযৌক্তিক কথা বলেন। আমি তাদের জিজ্ঞেস করবো এ পরিবেশ কে তৈরী করবে? একটি ধর্মহীন রাষ্ট্র? যার নেতৃত্ব ফিরিঙ্গী মানসিকতাসম্পন্ন লোকদের হাতে। যে নির্মাতা একটি পানশালা ও মদ্যশালা বানাতে জানেন এবং তাতে আগ্রহও পোষণ করেন—তাকে দিয়ে মসজিদ তৈরী করা হবে? যদি তারা এই বুঝাতে চান, তাহলে এটা মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতা হবে যে, ধর্মহীনতাই ধর্মের উৎকর্ষ সাধন করে, তার জন্যেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। যদি তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন কিছু হয়, তবে তারা খোলাখুলি এ কথার ব্যাখ্যা পেশ করুন যে, ইসলামী পরিবেশ তৈরীর এ কাজ কোন্ শক্তি, কোন্ উপায়ে করবে এবং এ সময়ে বেদীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার উপায় উপকরণ ও ক্ষমতাকে কোন কাজে ব্যয় করবে?

একটু আগে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার নীতি প্রমাণ করার জন্যে যেসব উদাহরণ আমি পেশ করেছি, তাকে আপনারা আরেকবার মনে মনে স্মরণ করুন, তাহলে দেখতে পাবেন ইসলামী কিংবা অনৈসলামী

জীবন বিধানের প্রতিষ্ঠা ধীরে ধীরে না করে উপায় নেই। কিন্তু আস্তে আস্তে এর গঠন শুধু এভাবেই হতে পারে যে, যখন একটি নির্মাতা শক্তি তার সামনে একটি কাঠামো ও একটি উদ্দেশ্য নিয়ে একাধারে এ জন্যে কাজ করতে থাকবে। প্রথম দিকে যে ইসলামী বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে তা এভাবেই হয়েছে। নবী (সাঃ) কয়েক বছর ধরে তার উপযোগী লোক তৈরী করেছেন, শিক্ষা ও প্রচার দ্বারা মানুষের চিন্তাধারা পাল্টে দিয়েছেন। রাষ্ট্রের সমস্ত প্রশাসন ও ব্যবস্থাকে সমাজের সংস্কার ও একটি নতুন সমাজ সৃষ্টির জন্যে কাজে লাগিয়েছেন এবং এভাবেই সে পরিবেশ তৈরী হলো, যাতে ইসলামী আইন জারী করা সম্ভব হয়েছে। নিকট অতীতের হিন্দুস্থানে ইংরেজরা জীবন পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন সাধন করেছে তাও এভাবেই হয়েছে। রাষ্ট্রের চাবিকাঠি এমন লোকদের হাতে ছিলো যারা এ পবির্তনের প্রত্যাশী ছিলো এবং তার জন্যে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে শেষ পর্যন্ত এখানকার পুরো জীবন ব্যবস্থাকে সেই ধাঁচে ঢেলেই সাজালো, যা তাদের নীতি ও আইনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো। এখন আমাদের ইপ্সীত পরিবর্তন কি এমন শক্তিশালী নির্মাতা ব্যতিত সম্ভব অথবা এমন নির্মাতাদের হাতে হবে যারা নিজেরা এই নতুন কাঠামো মতো প্রাসাদ তৈরী করতে জানে না, তেমন আগ্রহীও নয়।

সঠিক কর্মপন্থা

আমি বুঝি, আশাকরি, প্রত্যেক বিবেকবান মানুষই আমার সাথে ঐকমত্য পোষণ করবেন যে, যখন পাকিস্তান ইসলামের নামে ও ইসলামের জন্যে হাসিল করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতেই আমাদের ঐ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছে, তখন আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই সেই নির্মাতার শক্তি হওয়া উচিত, যে শক্তি ধীরে ধীরে ইসলামী জিন্দেগী গঠন করবে, আর যখন এটা আমাদেরই দেশ, যাবতীয় জাতীয় উপায়-উপকরণ যদি আমরা এরই জন্যে উৎসর্গ করি, তখন কোনো কারণ নেই যে, এ দেশ গঠনের জন্যে কারিগর অন্য কোনো সূত্র থেকে আমাদের তালাশ করতে হবে।

এ কথাকে সঠিক ধরা হলে এ গঠনের পথে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে, আমরা আমাদের রাষ্ট্রকে সর্বপ্রথম মুসলমান বানানো--যা এখনো ফিরিঙ্গীদের ছেড়ে যাওয়া কুফরী ভিত্তিসমূহের ওপর চলছে এবং

তাকে মুসলমান বানাবার আইনগত পদ্ধতি হলো, আমাদের গণপরিষদ রীতিমতো এ ঘোষণা প্রদান করবেঃ

১. এ দেশের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। রাষ্ট্র তার প্রতিনিধি হিসেবে দেশের শাসন ব্যবস্থা চালাবে।

২. রাষ্ট্রের মৌলিক আইন হবে আল্লাহর সেই শরীয়াত, যা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)–এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

৩. অতীতের সমস্ত আইন যা শরীয়াতের সাথে সংঘর্ষশীল, তাকে আস্তে আস্তে বদলাতে হবে এবং ভবিষ্যতে শরীয়াত বিরোধী কোনো আইন বানানো হবে না।

৪. রাষ্ট্র তার ক্ষমতার ব্যবহার ও প্রয়োগ শরীয়াতের পরিসীমা অতিক্রম করার অধিকারী হবে না।

এ হচ্ছে সেই 'কালেমায়ে শাহাদাত' যাকে আইনগত কণ্ঠ অর্থাৎ গণপরিষদের মাধ্যমে আদায় করে আমাদের রাষ্ট্র মুসলমান হতে পারে।

এ ঘোষণার পরই সত্যিকার অর্থে আমাদের ভোটাররা এটা জানতে পারবেন যে, এখন তাদের কোন উদ্দেশ্যে ও কি কাজের জন্যে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে হবে। জনগণ যতো অজ্ঞই হোক না কেন, তাদের এতটুকু বুঝ অবশ্যই আছে যে, তাদের কোন্ কাজে কোন্দিকে ধাবিত হতে হবে এবং তাদের মধ্যে কোন্ লোক কোন্ উদ্দেশ্যের জন্যে যোগ্য। তারা এমন বোকা তো নয় যে, চিকিৎসার জন্যে উকীল ও মামলা পরিচালনার জন্যে ডাক্তার অনুসন্ধান করবে। তারা এমন লোকদেরও কোনো না কোনোভাবে জানে যে, তাদের মধ্যে ঈমানদার ও আল্লাহকে ভয় করার লোক কে কে আছে। ধূর্ত ও দুনিয়ার পূজারীই বা কে, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী বদ লোক কে, তাও তারা জানে। যে ধরনের উদ্দেশ্য তাদের সামনে থাকে তেমন মানুষই তারা নিজদের মধ্য থেকে বের করে নেবে। এখন পর্যন্ত তাদের সামনে এ উদ্দেশ্যই উপস্থাপন করা হয়নি যে একটি দীনী ব্যবস্থা চালানোর লোক এখন তাদের প্রয়োজন। কেনই বা তারা তেমন লোক তালাশ করবে? যেমন ধর্মহীন ও নীতি বিবর্জিত দেশে প্রচলিত ছিলো। তার চাহিদা মোতাবেক লোকদের ওপরই তার নির্বাচনী দৃষ্টি নিপতিত হয়েছে, তাদেরই ভোটাররা জনগণের মধ্য থেকে বাছাই করে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন যদি আমাদের

একটি ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বানাতে হয়, মানুষের সামনে এর প্রশ্ন রাখা হয় যে, এ কাজের জন্যে তোমাদের উপযুক্ত লোক পাঠাতে হবে, তাহলে তাদের বাছাই যদিও পূর্ণাংগ নির্ভুল হবে না, তবুও এ কথা বলা যায় যে, এ কাজের জন্যে তাদের দৃষ্টি ফাসেক, ফাজের ও পাশ্চাত্যের মানসিক গোলামদের ওপর নিবিষ্ট হবে না। তারা এ কাজে সেসব মানুষই অনুসন্ধান করবে যারা নৈতিক মানসিক ও জ্ঞানমূলক কাজের জন্যে যোগ্য।

রাষ্ট্রকে মুসলমান বানানোর পর ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ হলো, গণতান্ত্রিক নির্বাচন দ্বারা এ রাষ্ট্রের নেতৃত্ব এমন সব লোকদের হাতে অর্পন করা--যারা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং সে জীবন পদ্ধতিকেও ইসলাম অনুযায়ী গঠন করতে আগ্রহশীল হবে।

তারপর তৃতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে, সামগ্রিক জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের সংশোধনের জন্যে একটি পরিকল্পনা 'প্রণয়ন' করবে এবং তাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে রাষ্ট্রের সব উপায়-উপকরণকে নিয়োজিত করবে। শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে হবে, রেডিও-প্রেস-সিনেমার সমস্ত শক্তিকে মানুষের চিন্তাধারার পরিশুদ্ধি এবং একটি নতুন ইসলামী মানসিকতা সৃষ্টির কাজে লাগাতে হবে। সমাজ সভ্যতাকে নতুন ধাঁচে ঢেলে সাজাবার জন্যে বিরামহীন প্রচেষ্টা চালাতে হবে, সিভিল সার্ভিস, পুলিশ, জেলখানা, আদালত ও সেনাবাহিনী থেকে আস্তে আস্তে এমন লোকদের বের করে দিতে হবে, যারা ফাসেকী ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং এমন নতুনদের কাজের সুযোগ দিতে হবে যারা সার্বিক সংশোধনের কাজে সাহায্যকারী হতে পারে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে, তার যে কাঠামো এতোদিন পুরনো হিন্দুয়ানী ও ফিরিঙ্গী পদ্ধতির ওপর চালু আছে, তাকে উৎখাত করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, যদি একটি সুস্থ ও জ্ঞান সম্পন্ন দল ক্ষমতাসীন হয় এবং দেশের সমস্ত উপায় উপকরণের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এভাবে সুচিন্তিত পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করতে শুরু করে, তাহলে দশ বছরের মধ্যে এ দেশের সামগ্রিক জীবনের রূপ বদলে যতে পারে। একদিকে ধীরে ধীরে এ পরিবর্তন হবে, অপর দিকে পূর্ণ ভারসাম্যের সাথে পুরনো আইনের সংশোধন ও রহিত করণের পাশাপাশি ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কাজও চলবে। এতে করে জাহেলিয়াতের কোনো আইনই আমাদের দেশে

অবশিষ্ট থাকবে না এবং ইসলামের কোনো একটি আইনও অপ্রতিষ্ঠিত থাকবেনা।

ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার জন্যে গঠনমূলক কাজ

এবার আমি বিশেষভাবে ওসব গঠনমূলক কাজের কিছু বিবরণ পেশ করবো, যা দেশের প্রচলিত আইন ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা ও তার স্থলে ইসলামের আইন সমূহ জারী করার জন্যে আমাদের এই মুহূর্তেই করতে হবে। যে সংশোধনমূলক কর্মসূচীর দিকে আমি ইতিপূর্বে ইংগীত প্রদান করেছি সে ব্যাপারে জীবনের প্রায় দিকেই আমাদের বেশ কিছু গঠন মূলক কাজ করতে হবে। কেননা দীর্ঘদিনের স্থবিরতা, গোলামী ও পতনের কারণে আমাদের সমাজ দেহের প্রতিটি দিকই বিনষ্ট হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখানে আমার বিষয়বস্তু একটি বিশেষ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ বলে আমি অন্যান্য দিকের গঠন মূলক কাজ কর্মের কথা বাদ দিয়ে শুধু আইন ও বিচার ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক যুক্ত বিষয়ই আলোচনা করবো।

একঃ একটি আইন একাডেমী প্রতিষ্ঠা

এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে আমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে, একটি আইন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা। এ একাডেমীই আমাদের পূর্ব পুরুষদের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করবে এবং ইসলামী ফেকাহর সেসব মূল্যবান কিতাব সমূহের শুধু বংগানুবাদই করবে না—এ সব মূল্যবান বিষয়গুলোকে যা ইসলামী ফেকাহ জানার জন্যে অপরিহার্য বর্তমান যুগের পদ্ধতি অনুযায়ী নতুনভাবে ঢেলে সাজাবে, এ উপায়েই এ থেকে পূর্ণ উপকার পাওয়া যেতে পারে। আপনারা জানেন, আমাদের ফেকাহর আসল সম্পদ সব আরবী ভাষায়। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণত এ ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ। এ অজ্ঞতার কারণে কিছু শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায়ই মূল্যবান সেসব সম্পদ সম্পর্কে নানা ধরনের ভুল ধারণা পোষণ করেন। এমন কি তাদের অনেক লোক তো এমন মন্তব্যও করে বসেন যে,এসব অপ্রয়োজনীয় ও বিতর্কমূলক বিষয়াবলীকে ফেলে দেয়া দরকার। সব

বিষয়ে নতুন ইজতেহাদ করে কাজ করতে হবে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, যারা এ ধরনের অর্থহীন চিন্তাধারা প্রকাশ করেন, তারা শুধু নিজেদের চিন্তা ও বিবেকের দৈন্যের রহস্যই প্রকাশ করেন, যদি তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের ফেকাহ্ শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলো সম্পর্কে গবেষণা করতেন, তাহলে তাঁরা দেখতে পেতেন যে, গত বারো তেরোশ বছরে আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্ব পুরুষরা শুধু অর্থহীন বিতর্কেই সময় নষ্ট করেননি বরং তারা পরবর্তী বংশধরদের জন্যে রেখে গেছেন এক মহান উত্তরাধিকার। তারা অনেক প্রাথমিক মনযিল আমাদের জন্যে নির্মাণ করেছেন। আমাদের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি কেউ হবে না, যদি আমরা এই বিশাল প্রাসাদকে শুধু অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে মিছেমিছি ধ্বংস করে নতুন করে তা বানাবার অনুযোগ করি। আমাদের জন্যে জ্ঞানের কাজ হবে, যাকে পূর্ববর্তী লোকেরা তৈরী করেছেন তাকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো, ভবিষ্যতে যেসব প্রয়োজন দেখা দেবে তার জন্যে গঠনের কাজ অব্যাহত রাখা। নতুবা যদি আমরা প্রত্যেকে আমাদের পূর্ববর্তীদের কার্যকলাপকে অর্থহীন ভেবে ফেলে দিয়ে নতুন করে কিছু বানাবার চেষ্টা করি, তাহলে কোনো দিনই আমরা উন্নতির পথে পা বাড়াতে পারবো না। এ ব্যাপারে আমার প্রথম দিককার আলোচনায় আমি বলেছিলাম, বিগত শতাব্দীতে দুনিয়ার এক বৃহৎ অংশে মুসলমানরা যেসব রাজ্য কায়েম করেছিলো তার সব কয়টির আইনই ছিলো এই ইসলামী ফেকাহ্। সে সময়ের মুসলমানরা শুধু ঘাস উপড়ায়নি—তারা একটি বলিষ্ঠ তমুদ্দুনেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাদের এ বিশাল তমুদ্দুনের সব প্রয়োজনেই ফেকাহশাস্ত্রবিদরা এ ইসলামী আইনকেই ব্যবহার করেছেন। এরাই এ রাষ্ট্রের জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও চীপ জাষ্টিস নিযুক্ত হতেন। তাদের ফায়সালার দ্বারা বিচার বিবরণীর ব্যাপক সম্পদ তৈরী হতো, তারা আইনের প্রায় সব ক'টি বিভাগ নিয়েই আলোচনা করেছেন। শুধু দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনই নয়; শাসনতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়েও তাদের কলম থেকে এমন মূল্যবান তথ্য বেরিয়েছে, যা দেখে একজন আইন বিশারদের দৃষ্টির বাপকতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। প্রয়োজন হচ্ছে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একটি দলকে এ কাজে নিয়োজিত করা যারা বর্তমান যুগের আইনের গ্রন্থরাজীর পাশাপাশি সেসব মূল্যবান বিষয়কেও সাজিয়ে দেবে।

বিশেষ করে বেশ কয়টি গ্রন্থ এমন আছে, যার অবশ্যই বংগানুবাদ হওয়া দরকার।

১. কুরআনের আইনের পর্যায়ে তিনটি কিতাবঃ 'জেস্সাছ', 'ইবনুল আরাবী' ও 'কুরতবী'।

এ সব কিতাবের অনুশীলন আমাদের আইনের ছাত্রদের কুরআন থেকে সমাধান বের করার পদ্ধতি শিক্ষা দেবে, এতে কুরআনের সমস্ত বিধি-নিষেধ সম্বলিত আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। হাদীস ও সাহাবাদের আসারে এর যেসব ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এতে তা উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আয়িম্মায়ে মোজতাহেদীন-এর থেকে যে বিধি-বিধান বের করেছেন সেগুলো যুক্তিসহ এতে পেশ করা হয়েছে।

২. দ্বিতীয় মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে, হাদীসের গ্রন্থরাজীর ব্যাখ্যা সমূহ। যাতে বিধি-বিধান ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের উদাহরণ ও তার ব্যাখ্যামূলক বিবরণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে বিশেষভাবে এ সব কিতাবের বাংলা অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

বোখারী শরীফের ব্যাপারে 'ফতহুলবারী' ও 'আইনী'। মুসলিম শরীফের 'নবভী' ও মাওলানা শিববীর আহমদ ওসমানীর 'ফতহুল মুলহাম'। আবু দাউদে 'আওনুল মাবুদ' এবং 'বজলুল মাজহুদ', মুয়াত্তার ক্ষেত্রে শাহ ওয়ালী উল্লাহর 'মূসাওয়া মুসাফ্‌ফা' এবং বর্তমান যুগের একজন হিন্দুস্থানী আলেমের লিখা 'আওজাযুল মাছালেক'। মুনতাকিয়াল আখবারের ব্যাপারে শাওকানীর 'নাইনুল আওতার।' মেশকাতে মওলানা ইদ্রীস কান্দালবীর 'আততা'লীকুস্ সাব্বীহ'. এলমুল আসারে ইমাম তাহাবীর 'মায়ানীয়াল আ' সার'।

৩. এরপর আমাদের ফেকাহ্ শাস্ত্রের সেসব বড় বড় গ্রন্থসমূহের দিকে তাকানো দরকার, যেগুলোকে এ পর্যায়ে মৌলিক গ্রন্থ বলা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এ গ্রন্থগুলোর অবশ্যই অনুবাদ হওয়া দরকার।

হানাফী ফেকাহায় ইমাম সারাখসীর 'আল মাবসুত' এবং 'শরহে আস্সিয়ারুল কাবীর'। কাসানীর 'বাদায়েউস্ সানায়ে', ইবনুল হুমামের 'ফাতহুল কাদীর', 'হেদায়া' ও 'ফতোয়ায়ে আলমগীরি'।

শাফেয়ী ফেকাহায় 'কিতাবুল উম্', 'শারহুল মুহাজ্জাব', 'মুগনিয়াল মুহ্তাজুল মূদাওয়ানাহ' এবং অন্য যেকোনো বই জ্ঞানবানরা বিবেচনা করবেন। হাম্বলী ফেকাহায় ইবনে কুদামার 'আল মুগনি' জাহেরী ফেকাহ্র ওপর ইবনে হাজামের 'আল মুহাল্লা' চার মাজহাবের ওপর ইবনে রুশদের 'বেদায়াতুল মুজতাহিদ' মিশরীয় আলেমদের প্রণীত 'আল ফেকহ্ ফি মাজাহেবে আরবায়া।' ইবনে কাইয়েমের 'জাদুল মায়াদের' ওই অংশ, যা আইনের সাথে সম্পৃক্ত।

বিশেষ বিশেষ সমস্যার ওপর ইমাম আবু ইউসুফের 'কিতাবুল খারাজ', ইয়াহিয়া বিন আদামের 'আল খারাজ' আল কাসেমের 'আল আম্ওয়াল' হেলাল বিন ইয়াহিয়ার 'আহ্কামল ওয়াক্ফ' ও ত্বিময়াতীর 'আহ্কামুল মাওয়ারীস'।

৪. অতপর আমাদের আইনের মূলনীতি ও শরীয়াতের টেকনিকের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কিতাবেরও বংগানুবাদ করা দরকার। এর সাহায্যে আমাদের আইনবিদরা ইসলামী ফেকাহ্র সঠিক জ্ঞান ও তার তত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন আমার মনে হয় এ ক্ষেত্রে এ সব কেতাব নির্বাচিত হওয়ার অধিকার রাখে।

ইবনে হাজামের 'উসুলুল আহ্কাম', আল্লামা আমেদীর 'আল আহ্কামু লি উসুলিল আহ্কাম', খাজরীর 'উসুলুল ফেকাহ', শাতেবীর 'আল মুয়াফেকাত', ইবনে কাইয়েমের 'আ'লামুল মুকেয়ীন এবং শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্র 'হুজ্জতুল্লাহিল বালেগাহ'।

এ গ্রন্থ সমূহের ব্যাপারে আমাদের শুধু বাংলা অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হলে চলবে না বরং তার বিষয়াবলীকে বর্তমান যুগের আইনের গ্রন্থ সমূহের মতো করে নতুনভাবে সাজাতে হবে, নতুন বিষয়সূচী ঠিক করে নিতে হবে, বিক্ষিপ্ত বিষয়াবলীকে একই শিরোনামের অধীনে একত্রিত করতে হবে, সূচীপত্র বানাতে হবে, ইনডেকস্ তৈরী করতে হবে। এ পরিশ্রম ছাড়া এ সব বই আজকের দিনের উপযোগী হবে না। অতীত দিনের সংকলনের ধরন ছিলো ভিন্ন রকম, সে সময়ে আইনের বিষয়াবলীর জন্যে এতো শিরোনামাও দরকার ছিলো না, যা আজকের দিনে দরকার। উদাহরণ স্বরূপ, তারা 'শাসনতান্ত্রিক আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের জন্যে কোনো স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ তৈরী করেননি, বরং

তারা এ সব সমস্যাকে বিয়ে শাদী-রাজস্ব, (আদায় ও বন্টন) জেহাদ ও উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি ভাগেই বর্ণনা করেছেন। ফৌজদারী আইন নামে তাদের কাছে আলাদা কোনো পরিচ্ছেদ ছিলো না, তারা এ সব সমস্যাকে 'অপরাধের শাস্তি' পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন। দেওয়ানী আইনও তারা স্বতন্ত্রভাবে সংকলিত করেননি, তারা একই আইনের গ্রন্থে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে এগুলো বলে গেছেন। অর্থনীতি নামক স্বতন্ত্র কোনো বিষয়ও তাদের কাছে ছিলো না। এ ধরনের বিষয়গুলোকে তারা বেচা-কেনা, অংশীদারীত্বের ব্যবসায়, জায়গা-জমির ফসলাদির সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে ভাগ করেছেন। এভাবেই সাক্ষ্য আইন, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধি, বিচার বিধি ইত্যাদি নতুন পরিভাষা তাদের গ্রন্থে ছিলো না। এ আইনের বিষয়াবলীকে তার কাজীর বৈশিষ্ট্য দাবী-দাওয়ার পদ্ধতি, স্বীকৃতি ও সাক্ষ্যের পদ্ধতি ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এখন যদি এ সব বই হুবহু বাংলায় তরজমা করা হয় তাহলে এর থেকে পূর্ণ উপকার লাভ করা যাবে না। প্রয়োজন হচ্ছে কিছু আইনবিশারদদের এর ওপর কাজ করা। এর সম্পাদনা, সংকলন, পরিবর্তন করে তার বিষয়াবলীকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। যদিও চিন্তার রাজ্যে এটা খুব পরিশ্রমের কাজ বলে মনে হয়; কিন্তু কমপক্ষে এটুকু কাজতো হতেই হবে যে, নেহায়েত সুসমভাবে এর পূর্ণ ফিরিস্তি ও বিভিন্ন ইনডেক্স বানাতে হবে, যার ফলে অন্তত প্রয়োজন বশত তাকে খুঁজে পাওয়া যায়।

দুই ঃ বিধি—নিষেধ সমূহের সংকলন

দ্বিতীয় জরুরী কাজ হচ্ছে, দায়িত্বশীল আলেম ও আইনজ্ঞদের নিয়ে এমন একটি কমিটি বানাতে হবে, যারা ইসলামের আইনগত হুকুম-আহকামগুলোকে আইন গ্রন্থসমূহের মতো করে ধারা উপধারা আকারে সাজাবে। আমি আমার প্রথম আলোচনায় এ কথা পরিষ্কার করে বলেছি যে, ইসলামী দৃষ্টিভংগীতে এমন সব জিনিসকেই আইন বলে না, যা কোনো ফকীহ মুজতাহিদের মুখ থেকে বের হয়েছে কিংবা তা ফেকাহর কোনো কেতাবে লিখা আছে। আইন শুধু চারটি বিষয়ের নামঃ

১. এরই এমন বিধান যা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বর্ণনা করেছেন।

২. কোনো কুরআনী হুকুমের ব্যাখ্যা ও বিবরণী অথবা কোনো স্বতন্ত্র বিধান যা আল্লাহর নবী (স) থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

৩. কোনো বের করা মাসয়ালা, কেয়াস, ইজতেহাদ, ইসতেহসান যার ওপর গোটা উম্মত কিংবা তার অধিকাংশের ঐকমত্য পাওয়া গেছে। অধিকাংশের এমন কোনো ফতোয়া যা আমাদের দেশীয় মুসলমানদের অধিকাংশ লোকেরা তাকে গ্রহণ করে।

৪. এরই কাছাকাছি এমন কোন বিষয় যার ওপর সমকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নির্বাচিত পরিষদের ঐকমত্য কিংবা তার ওপর অধিকাংশ লোকের ঐকমত্য পাওয়া যাবে।

আমার পরামর্শ হচ্ছে, প্রথম তিন ধরনের বিধি-নিষেধগুলোকে বিশেষজ্ঞদের একটি দল কোড (CODE)-এর মতো সংকলিত করবে। অতপর যতো আইনের ফায়সালা ভবিষ্যতে সার্বিক ঐক্য ও অধিকাংশের মতে স্বীকৃত হবে, আমাদের আইন বইগুলোতে তাও সংযোযিত হতে থাকবে। যদি এ ধরনের একটি কোড তৈরী হয়ে যায়, তাহলে তাই হবে আসল আইন। অন্যান্য ফেকাহর কিতাব তার ব্যাখ্যা হিসেবে পরিগণিত হবে। সাথে সাথে আদালতেও ইসলামী আইনের প্রতিষ্ঠা ও আইন কলেজ সমূহেও এ আইনের শিক্ষা সহজ হবে।

তিন ঃ আইন শিক্ষার সংস্কার

চতুর্থ জরুরী কাজ হবে, আমাদের এখানে আইন শিক্ষার পুরনো পদ্ধতি পরিবর্তন করা। আমাদের আইন কলেজ সমূহের পাঠসূচী, পাঠ্য কার্যক্রমে এমন সংশোধন করা, যাতে ছাত্ররা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার জন্যে চিন্তা ও চরিত্র উভয় দিক দিয়েই প্রস্তুত হতে পারে।

এখন পর্যন্ত আমাদের আইন প্রতিষ্ঠান সমূহে যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, তা আমাদের দৃষ্টিভংগীর একেবারে অযোগ্য। এর থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা শুধু ইসলামী আইন সম্পর্কেই অজ্ঞ থাকে না, তাদের মন-মানসিকতাও অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে এমন চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টি হতে থাকে, যা পাশ্চাত্য আইনের প্রতিষ্ঠার জন্যেই উপযোগী; ইসলামী আইনের জন্যে বলতে গেলে সর্বোতভাবে অনুপোযোগী। এ অবস্থাকে যতোক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন না

করা হবে, এ সব প্রতিষ্ঠানে যতোদিন পর্যন্ত ইসলামী মাপকাঠি মোতাবেক ফেকাহশাস্ত্রবিদ তৈরী করার ব্যবস্থা না হবে, আমাদের এখানে কোনোদিনই এমন লোক তৈরী হবে না, যারা আদালতের বিচারক ও ফতোয়াদাতার দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার যোগ্য হতে পারবে। এ ব্যাপারে আমার মনে যেসব প্রস্তাব ছিলো তা আমি আপনাদের কাছে পেশ করছি অন্যরাও এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। এভাবে এ চিন্তার সংস্কার ও পরিবর্ধন সম্ভব হবে-যাতে করে সবার জন্যে গ্রহণযোগ্য একটি স্কীমও তৈরী হতে পারে।

১. সর্বাগ্রে সংশোধন এই হওয়া দরকার যে, ভবিষ্যতে আমাদের আইন কলেজসমূহে ভর্তির জন্যে আরবী ভাষার জ্ঞান-এতটুকু জ্ঞান যা কুরআন-হাদীস ও ফেকাহর কিতাব পড়ার জন্যে দরকার-অপরিহার্য করা হবে। যদিও আমরা ইসলামী আইনের পুরো শিক্ষাই বাংলায় দিতে চাই এবং এ বিষয়ের ওপর লিখা যাবতীয় কিতাবকেই বাংলায় ভাষান্তরিত করতে চাই, তবু আরবী ভাষার জ্ঞানের প্রয়োজন থেকে যাবে। কারণ ইসলামী ফেকাহর বুৎপত্তি সে ভাষার জ্ঞানার্জন ছাড়া সম্ভব নয়, যে ভাষায় মহানবী (সাঃ) কথা বলতেন। প্রথম প্রথম আমাদের আইন কলেজসমূহে আরবী জানা প্রার্থী পাবার ব্যাপারে কিছু অসুবিধা হবে। সম্ভবত এ উদ্দেশ্যে কয়েক বছর পর্যন্ত প্রত্যেক আইন কলেজে স্বতন্ত্র আরবী ক্লাশ চালু রাখতে হবে, এ জন্যে আইন শিক্ষার জন্যে এক বছর অতিরিক্ত ব্যয়ও করতে হবে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমাদের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় যখন আরবী ভাষা বাধ্যতামূলক হবে তখন আইন কলেজে ভর্তির জন্যে এমন সব গ্র্যাজুয়েট আসবে যারা প্রথমেই আরবী ভাষার জ্ঞান সম্পন্ন হবে।

২. আরবী ভাষার সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, আইনের শিক্ষা শুরু করার আগে ছাত্রদেরকে কুরআন হাদীসের প্রত্যক্ষ পড়ালেখার মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মেজাজ ও তার পুরো পদ্ধতি অনুধাবনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দীর্ঘদিন থেকে এ ভ্রান্ত পদ্ধতি চালু আছে যে, শিক্ষার শুরুই করানো হয় ফেকাহর কেতাব থেকে। অতপর প্রত্যেক মাজহাবের লোক নিজেদের বিশেষ দৃষ্টিভংগী নিয়েই হাদীস পড়ে এবং কুরআনের দু' একটি সূরা তাবারক হিসেবে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। তাতেও আল্লাহর কালামের সাহিত্যিক

বৈশিষ্ট্য ছাড়া অন্য দিকে দৃষ্টিই প্রদান করা হয় না। এর ফলে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে, যারা এ সব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে বের হন। তারা নিজেদের পড়ে আসা শরীয়াতের কতিপয় বিধান সম্পর্কে অবশ্যই ওয়াকেফ হন; কিন্তু যে দীন কায়েমের জন্যে এ সব আইন বানানো হয়েছে, তার সামগ্রিক ব্যবস্থা, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা অনেকাংশেই অজ্ঞ থেকে যান। তারা তখন এটুকুও জানতে পারেন না যে, দীনের সাথে শরীয়াতের, শরীয়াতের সাথে ফেকাহ্‌র মাজহাবগুলোর কি সম্পর্ক। তারা আইনের কতিপয় শাখা-প্রশাখা ও স্বীয় মাজহাবের কিছু মাসয়ালাকেই আসল দীন মনে করে নিয়েছেন। এ জিনিসটাই আমাদের দেশে নানা রকম ফের্কাবন্দী ও পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে। এরই পরিণামে জীবন ব্যবস্থায় ফেকাহ্‌র মাসয়ালাকে প্রয়োগ করার কাজে বহুবার শরীয়াতের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যকেও পর্যন্ত অবজ্ঞা করা হয়। আমরা চাই, এখন এ ভুলের সংশোধন হোক। কোনো ছাত্রকেই কুরআন-হাদীস থেকে সঠিক দীন শিক্ষার আগে আইন পড়ানো হবে না।

এ ক্ষেত্রেও প্রথম দিকে কয়েক বছর পর্যন্ত আমাদের কিছু সমস্যার মুকাবেলা করতে হবে। কেননা কুরআন- হাদীস জানা গ্র্যাজুয়েট প্রথম দিকে বেশী পাওয়া যাবে না, এ জন্যে আইন কলেজসমূহেই আমাদের প্রথম এ ব্যবস্থা করতে হবে। যখন আমাদের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের অধীনে এসে যাবে, তখন সহজভাবেই এ নিয়ম বানানো যাবে যে, আইন কলেজে শুধু তারাই ভর্তি হবে যারা তাফসীর ও হাদীসকে বিশেষ বিষয় হিসেবে পড়ে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে, নতুবা অন্য বিষয়ের ছাত্রদেরকে এক বছর অতিরিক্ত এ বিষয়ের জন্য ব্যয় করতে হবে।

৩. আইনের পাঠ্য তালিকায় তিনটি বিষয়কে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একটি হচ্ছে, বর্তমান যুগের আইনের মূলনীতির (Juris Prudence) সাথে সাথে ফেকাহ্‌র মূলনীতিসমূহ। দ্বিতীয়, ইসলামী ফেকাহ্‌র ইতিহাস পর্যালোচনা। তৃতীয়, ফেকাহ্‌র সব বড় বড় মাজহাবের নিরপেক্ষ পর্যালোচনা। এ তিনটি বিষয় ছাড়া ছাত্রদের মধ্যে ফেকাহ্‌র পূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদার অধিকারী কাজী-মুফতী হওয়ার জন্যে ইজতেহাদের যে যোগ্যতা প্রয়োজন তা অর্জন করাও অসম্ভব। তাছাড়া এ না হলে আধুনিক রাষ্ট্রের

ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তা'বীর, কেয়াস, ইজতেহাদ ও ইসতেহসানের সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে আইন-কানুন বানাবার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন লোকও তাদের মধ্যে তৈরী হওয়া সম্ভব নয়। নিজেদের আইনের মূলনীতি সমূহ বুঝা ছাড়া কিভাবে নিত্য নতুন সমস্যার সমাধান করবে? নিজেদের ফেকাহর ইতিহাস না জানা থাকলে তারা কিভাবে জানতে পারবে যে, ফেকাহর বিবর্তন কিভাবে হয়েছে ও ভবিষ্যতে কিভাবে হবে? ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদদের জমা করা বিশাল সম্পদ সম্পর্কে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ ছাড়া তারা কিভাবে এ যোগ্যতা অর্জন করবে যে, কোন সমস্যার যদি এক মাজহাবে সমাধান না পাওয়া যায় তাহলে তার সমাধানের জন্যে নতুন একটি মাজহাব তৈরী না করেও অন্য কোন মাজহাবে তা অনুসন্ধান করা যাবে, এ সব কারণেই আমি এটা জরুরী মনে করি যে, এ তিনটি বিষয় অবশ্যই আমাদের আইন শিক্ষার পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত।

৪. শিক্ষার এ সংস্কারের সাথে সাথে আমাদেরকে আইন কলেজের ছাত্রদের নৈতিক প্রশিক্ষণেরও বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে আইন কলেজ সমূহ ধূর্ত উকীল, স্বার্থান্বেষী ম্যাজিষ্ট্রেট ও অসাদাচারণকারী জজ তৈরী করার কারখানা নয় বরং তার কাজ হবে এমন ধরনের বিচারক ও মুফতী তৈরী করা, যারা স্বজাতির মধ্যে নিজেদের চরিত্র ও কাজ-কর্মের দিক থেকে উন্নত ধরনের মানুষ হবে। যাদের সত্যবাদিতা, সততা ও ইনসাফের ওপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করা যাবে, যাদের নৈতিক চরিত্র সমস্ত সন্দেহের উর্ধে থাকবে। এটা সেই জায়গা, যেখানে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীতি, সততা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়া উচিত। এখান থেকে বের হয়ে ছাত্রদের সে আসনের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে, যেখানে একদিন কাজী শুরায়হ্, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও কাজী ইউসুফের মতো লোকেরা বসেছিলেন। এখানে এমন মজবুত চরিত্রের লোক তৈরী হওয়া দরকার, যারা কোনো শরীয়াতের মাসয়ালায় মতামত প্রকাশের সময় অথবা কোন ব্যাপারে ফায়সালা করার সময় আল্লাহ ছাড়া কারো দিকেই লক্ষ্য দেবে না, কোন লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি, কোন স্নেহ-ভালোবাসা, কোন ঘৃণা-বিদ্বেষ তাদের সে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে

পারবে না, যাকে তারা তাদের জ্ঞান ও বিবেক দিয়ে সত্য ও ইনসাফ মনে করে।

চার ঃ বিচার ব্যবস্থা সংস্কার

ইসলামী আইন জারী করার লক্ষ্যে পরিবেশ অনুকূল করার কাজে আমাদের বিচারালয়ের ব্যবস্থাপনায়ও বহুবিধ পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এ ব্যাপারে ছোট ছোট বিষয় পরিহার করে আমি বিশেষভাবে দু'টি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই, এগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পাঁচ ঃ ওকালতী পেশার নির্মূল করণ

সর্বাগ্রে সংশোধনযোগ্য বিষয় হচ্ছে, বর্তমান ওকালতী পেশা সম্পর্কিত। আধুনিক বিচার ব্যবস্থার অনাচার সমূহের মধ্যে সম্ভবত এটাই হচ্ছে নিকৃষ্টতম। নৈতিক দিক থেকে এর বৈধতার পক্ষে একটি অক্ষরও পেশ করা যায় না। বাস্তবেও বিচার ব্যবস্থার এমন কোনো প্রয়োজন নেই, যার জন্যে অন্য কোনো বিকল্প উদ্ভাবন করা যায় না। ইসলামের মেজাজ অনুয়ায়ী এ পেশার সাথে ইসলামের দূরত্ব এতো বেশী যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত এ পেশা জারী থাকবে আমাদের আদালত সমূহে ইসলামী আইন সঠিক স্পিরিটে চালুই হতে পারে না। বরং আজ মানবীয় আইনের সাথে যে কাজ করা হচ্ছে, তা যদি কোথায়ও ইসলামী আইনের সাথে করা হয়, তাহলে আমরা যদি ইনসাফের সাথে ঈমানও হারিয়ে ফেলি তাতেও অশ্চর্যান্বিত হবার কিছু থাকবে না। তাই এটা খুবই জরুরী যে, আস্তে আস্তে এ পেশাকে নির্মূল করে দিতে হবে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে উকীলের কাজ হচ্ছে, আদালতের আইন বুঝা, বিচারাধীন মামলার ওপর তাকে যথাযথ প্রয়োগ করার কাজে সাহায্য করা। নীতিগতভাবে এ প্রয়োজন স্বীকৃত। এটাও ঠিক যে, একই মামলায় দু'জন আইন বিশেষজ্ঞের মতামত ভিন্নতর হবে। হতে পারে একজনের রায়ে এক পক্ষের মোকদ্দমা মজবুত হবে, দ্বিতীয় জনের মতে সে মোকদ্দমা হবে দুর্বল এবং আদালতকেও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যে দু' পক্ষের যুক্তি-প্রমাণ সম্পর্কে জেনে নেয়া অবশ্যই দরকারী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ বিষয়টাকে বাস্তবায়িত করার যে পদ্ধতি ওকালতের আকারে এখানে প্রচলিত আছে তার থেকে কি এই

দ্বাবিধ উপকার পাওয়া যাচ্ছে? একজন উকীল এখানে আইনের যোগ্যতা নিয়ে ব্যবসার জন্যে বসে থাকে এবং সদা এ জন্যে প্রস্তুত থাকে যে কোন মামলার যে কোন পক্ষ তার মস্তিষ্কের ভাড়া আদায় করে তাকে কাজে লাগাতে পারে এবং সেও তার মক্কেলের পক্ষে আইনের ধারা বের করতে শুরু করবে, তার এটা জানা দরকার নেই যে, আমার মক্কেল সত্যের ওপর আছে, না মিথ্যের ওপর, অপরাধী না নিরপরাধ, সে নিজের অধিকার পেতে চায়, না অন্যের অধিকার ছিনিয়ে আনতে চায়, এ ব্যাপারেও তার কোন মাথাব্যথা নেই। এ পর্যায়ে সত্যিই আইনের পন্থা কি হবে এবং সে আলোকে তার মক্কেলের মোকদ্দমা সত্য না মিথ্যে? সে শুধু এটুকু দেখে যে, মক্কেল তাকে তার মস্তিষ্কের 'ফি' দিয়েছে কিনা! তাই তার কাজ তার পক্ষ সমর্থন করা। এ জন্যে সে মামলাকে নতুনভাবে আইনের আলোকে সাজিয়ে নেয়, দুর্বল বিষয়গুলোকে গোপন করে অনুকূল বিষয়গুলোকে সামনে নিয়ে আসে। মামলার বিবরণী ও সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে বেছে বেছে শুধু ওসব বিষয়ই বের করে, যা তার মক্কেলের এ মামলায় কাজে আসতে পারে, সাক্ষ্যকে ভেংগে দেয়ার চেষ্টা করে, যেনো মামলায় সঠিক ঘটনাবলী-যদি তা তার মক্কেলের বিপক্ষে যায়-একেবারে মিথ্যে প্রমাণ করতে না পারলে কমপক্ষে সন্দিগ্ধ করে তোলা যায়। আইনের উদ্দেশ্য মূলক ব্যাখ্যা করে এবং সে অনুযায়ী যুক্তি খাড়া করে বিচারককে ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে, যেনো তার কলম দিয়ে ইনসাফ মোতাবেক রায় নয়-তার মক্কেলের পক্ষেই রায় বেরোয়। এখন চাই কোন সঠিক অপরাধী ছাড়া পেয়ে গেলো, কিংবা কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি ফেঁসে গেলো, কোন ব্যক্তি তার অধিকার হারিয়ে ফেললো, আবার কোন ব্যক্তি অন্যের অধিকার কেড়ে নিলো, উকীলের তাতে কিছু আসে যায় না। সে তো সত্যের পক্ষে ও ইনসাফ করাবার জন্যে ওকালত খানায় বসেনি, তার উদ্দেশ্য হলো পয়সা। যে তাকে টাকা দেবে সেই সত্যের ওপর আছে, চাই সে মামলার প্রথম পক্ষ হোক কিংবা দ্বিতীয় পক্ষ। আমি জিজ্ঞেস করি, কোন নৈতিক বিবেচনায় কি এ আইনবাজীকে জায়েয মনে করা যেতে পারে? কোন বিবেকবান, আল্লাহভীতি সম্পন্ন ও ঈমানদার ব্যক্তি শুধু 'ফি'র বিনিময়ে এতো বড় দায়িত্ব নিজের মাথায় নিতে পারে যে, মজলুমকে বিচার থেকে মাহরুম করা ও যালেমের যুলুম অব্যাহত রাখার ব্যাপারে

সে চেষ্টা করে যাবে, এ আইনজ্ঞদের কোন পরামর্শ কি কোন বিচারককে ইনসাফের কাজে সাহায্য করতে পারে? যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে এ উদ্দেশ্যে 'ফি' নিয়েছে যে, আইনের ব্যাখ্যা সে তার মক্কেলের পক্ষেই করবে। কোন আইনের বিষয়ে একই মোকাদ্দমায় দু' প্রতিপক্ষের মতবিরোধ শুধু কি কখনো ঈমানদারীর ভিত্তিতে সাধিত হয়েছে? অথচ দু'জন উকীলই অত্যন্ত জোরের সাথে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মতামত পেশ করে, যা সত্য হলে উভয়ের মক্কেলই বদলে যেতো।

সত্যি কথা হচ্ছে, এ ওকালতী পেশা আমাদের বিচার ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্তই করেনি–শুধু এটুকুই করেনি যে, আমাদের সমাজে আইনের আনুগত্যের পরিবর্তে আইনের বিরুদ্ধতা করার শক্তিকেই বৃদ্ধি করেছে–বরং তার ক্ষতি আমাদের সমগ্র জীবনেও ব্যাপ্তি লাভ করেছে। আমাদের রাজনীতিও এ কারণে নোংরামীতে ভরে উঠেছে। মুখের কথা ও বিবেকের একটাকে আরেকটা থেকে বিচ্ছিন্ন করার ট্রেনিং আপনাদের কলেজের বিতর্ক সভাগুলো থেকেই শুরু হয়েছে। এখানে একজন কথকের আসল গুণ হচ্ছে, সে একই বিষয়ের ভালো মন্দ উভয় দিকের সপক্ষে একই রকম জোরের সাথে কথা বলতে পারে, যেদিকেই দাঁড় করিয়ে দেয়া হোক না কেন সে যুক্তির পাহাড় সৃষ্টি করে দিতে পারে–তার ব্যক্তিগত মতামত তার যতো বিপক্ষেই হোক তাতে কিছুই আসে যায় না। এ প্রাথমিক ট্রেনিংই পরবর্তী পর্যায়ে ওকালতী পেশায় ঢুকে তাকে মারাত্মকভাব কলুষিত করে। অতপর যখন একজন উকীল বহু বছর পর্যন্ত মনের বিরুদ্ধে মস্তিষ্ক চালনা করে ও বিবেকের বিরুদ্ধে কথা বলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন সে তার এ চরিত্র নিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রবেশ করে এবং সে তার এ চরিত্রগত বিষ প্রভাবকে আমাদের শিক্ষা, সমাজ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়।

ইসলাম এ পেশাকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে রাজী নয়। তার পুরো ব্যবস্থায় এ পেশার কোন স্থান নেই। এটা তার মেজাজ, তার প্রকৃতি ও তার ঐতিহ্যের বিরোধী। বিগত দশ বারো শতক পর্যন্ত দুনিয়ার অর্ধাংশের (ক্ষেত্র বিশেষে বেশী) ওপর মুসলমানরা রাজত্ব করেছে, কোথায়ও বিচার ব্যবস্থায় এর লেশমাত্র ছিল না। তার পরিবর্তে আমাদের এখানে মুফতীর পদ মর্যাদা ছিলো–এখন আমাদের তাই পুনরুজ্জীবিত

করা দরকার। আগের দিনে মুফতীরা বেশীর ভাগ নিজেদের জীবিকার জন্যে কোন স্বাধীন কারবার করতেন, আর ফতোয়া দিতেন বিনা পারিশ্রমিকে। আজকের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কিছু পরিমাণ আইন বিশারদ-যাতে আইনের বিশেষ বিশেষ বিভাগের বিশেষজ্ঞরা শামিল থাকবেন-সরকারীভাবে নিয়োগ করা যেতে পারে এবং তাদের সরকারী কোষাগার থেকে যথোপযুক্ত বেতন দেয়া হবে। তাদের কাছে মামলার উভয় পক্ষের যাওয়া এবং তাদের কিছু 'খেদমত' করা আইনত নিষিদ্ধ হবে। এভাবে রাষ্ট্রেরও তাদের মতামতে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার থাকবে না, যেভাবে আদালতের বিচারকদের ওপর চাপ প্রয়োগের কোন অধিকার রাষ্ট্রের নেই। বিচারালয় স্বয়ং নিজেদের প্রয়োজনে এ সব মুফতীদের কাছে আদালতের বিবরণী পাঠাবে এবং তাদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করবে, যদি তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয় তবে তারা আদালতে এসে তাদের মতামত পেশ করতে পারেন, মোকদ্দমার ঘটনাবলীর অনুসন্ধানের জন্যে আদালত নিজেও সাক্ষ্যকে জেরা করবে, মুফতীদেরও সুযোগ দিতে হবে। তারা ওসব ঘটনা জানার চেষ্টা করবে যার প্রভাব এ মামলায় পড়তে পারে, এভাবে আদালতের আইন অনুধাবনে ও মোকদ্দমাসমূহের ওপর একে প্রয়োগ করার ব্যাপারে সত্যিকার সাহায্য পাওয়া যাবে। মুফতীদের সত্যিকার মতবিরোধের ফলে অনেক আইনগত সমস্যাই পরিষ্কার করে দেবে, আদলতের অনেক মূল্যবান সময় যা এখন বানানো মাকদ্দমা ও কৃত্রিম সাক্ষ্য-প্রমাণের কারণে নষ্ট হচ্ছে তা বেঁচে যাবে। এ ওকালতী পেশার কারণে মোকদ্দমার যে ছড়াছড়ি ও মামলাবাজী আমাদের সমাজে চালু আছে তাও চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন হলো, যদি মামলাকে নিয়মানুযায়ী তৈরী করে আদালতে পেশ করার বিশেষ লোক সমাজে না থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বহু অসুবিধায় পড়তে হবে, তারা বিভিন্ন অনিয়মতান্ত্রিকভাবে মামলা দায়ের করে আদালতকেও অসুবিধায় ফেলবে। এ সমস্যার সমাধান হচ্ছে, এ জন্যে আমাদেরকে মোখতারীর সেই পুরনো পদ্ধতিকে জীবিত করতে হবে, যা আমাদের আদালতে দীর্ঘ দিন ধরে চালু ছিলো, আমাদের আইন কলেজের সাথে সাথে এ সব পরিপূরক ক্লাশও হওয়া দরকার যেখানে

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকেরা শুধু আইনের পদ্ধতি পড়বে এবং আদালতের বাস্তব কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হবে। এদের কাজ হবে কোন মোকদ্দমাকে আইনগত পদ্ধতির মাধ্যমে আদালতে পেশ করার যোগ্য বানিয়ে দেয়া এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে পদ্ধতিসমূহ বলে দেয়া। এরা যদি 'ফি' নিয়েও প্র্যাকটিস করে, তাহলেও সেই অনাচার সৃষ্টির আশংকা নেই যা ওকালতী পেশার দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে।

ছয়ঃ কোর্ট ফি রহিতকরণ

দেশের বিচার ব্যবস্থাকে ইসলামের নির্দেশিত পথে আনায়নের জন্যে আরেকটি জরুরী সংস্কার হচ্ছে, আমাদেরকে এখানে কোর্ট ফি তুলে দিতে হবে। এ এক নিকৃষ্টমানের বেদয়াত। পাশ্চাত্যের গোলামীর আগে আমরা এর সাথে পরিচিত ছিলাম না। ইসলামের প্রকৃতিতে এ ধারণাই নেই যে, আদালত বিচার প্রদানের পরিবর্তে ইনসাফের দোকান খুলে বসবে-যেখান থেকে পয়সা না দিয়ে কেউই বিচার পেতে পারবে না, যেখানে গরীব লোকের ভাগ্যই এই যে, সে যুলুম সইবে-বিচার পাবে না। আমরা চাই, ইংরেজ রাজত্বের সাথে সাথে তার এ স্মৃতিও বিদায় নিক এবং আমাদের আদালতসমূহ পুনরায় ইসলামী নির্দেশিত পথের ওপর কায়েম হোক-এ ব্যবস্থায় মানুষকে বিচার পৌঁছানো একটি ব্যবসায়িক কাজ নয় বরং একটি ইবাদাত এবং বিনা পারিশ্রমিকের খেদমতও বটে।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যদি কোর্ট ফি উঠিয়ে দেয়া হয় তাহলে আদালতের খরচপত্র কোথেকে সরবরাহ করা হবে, এ কথার জবাবে আমি দু'টি কথা পেশ করবো। এক, ইসলামী ব্যবস্থায় এতো লম্বা চওড়া আদালত ও এতো বিপুল কর্মচারীর দরকার নেই, যাকে বর্তমান বিচার ব্যবস্থা অপরিহার্য করে রেখেছে। ওকালতী পেশার রহিতকরণে মোকদ্দমাবাজী অনেক হ্রাস পাবে। বিচারের ও মোকদ্দমার দীর্ঘসূত্রীতাও আজকালের তুলনায় অনেক কমে আসবে। অতপর সমাজের নৈতিক চরিত্র, সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতির সংস্কারও মোকাদ্দমাবাজীকে কমিয়ে আনার ব্যাপারে অনেকাংশে সাহায্য করবে, পুলিশ ও জেল

কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মপদ্ধতি থেকে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পাবে।[১]

এভাবে আমাদের বিচার ব্যবস্থার জন্যে এতো বেশী জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কেরানীর দরকার হবে না, যতো সংখ্যক আজকের দিনে প্রয়োজন হয়েছে। এভাবেই আদালতের অন্যান্য খরচপাতিও কমে যাবে। তাছাড়া বড় বড় আমলাদেরও ইসলামী রাষ্ট্রে এতো বেতন হবে না--যতো আজ আছে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এ সুবিধে হাসিলের পর বিচার ব্যবস্থার খরচের যে সামান্য বোঝা আমাদের কোষাগারের ওপর পড়বে, তাকে আমরা বিচার প্রার্থীর ওপর না বর্তায়ে ওসব লোকের ওপর ফেলবো যারা বিচারালয়ে অযাচিত ফায়দা লুটতে আসে, অথবা যারা আদালতের খেদমতের ফলে অসাধারণভাবে উপকৃত হয়েছে। যেমন, মিথ্যে মামলা দায়েরকারী, মিথ্যে সাক্ষ্য প্রদানকারী ও আদালতের সমন বাস্তবায়নের অবহেলা প্রদর্শনকারীর ওপর জরিমানা ধার্য করা যাবে। অপরাধীদের কাছ থেকে যে অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায় হবে তাও এর সাতে যোগ করা হবে এবং একটি বিশেষ অংকের ডিক্রী যাদের পক্ষে দেয়া হবে, তাদের ওপর একটি বিশেষ ট্যাক্স বসাতে হবে। এ সব কিছু করার পরও যদি বিচার বিভাগের বাজেটে কোন ঘাটতি আসে তবে তা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পূরণ করা হবে। কারণ মানুষের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করাতো ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্বেরই অন্তর্ভুক্ত।

---

১. এখানে সম্ভবত এ ঘটনার উল্লেখ অপ্রয়োজনীয় হবে না যে, হযরত ওমর (রা)–এর যুগে একবার কুফার প্রধান বিচারপতি হযরত সালমান বিন রাবিয়া বাহেলী তার বিচারালয়ে একাধারে চল্লিশ দিন শুধু হাতের ওপর হাত রেখে বসেছিলেন, শুধু এ জন্যে যে, তার কাছে আদৌ কোনো মামলাই আসেনি (আল ইস্তিয়াব, খন্ড ২, পৃষ্ঠা–৫৮)। এর থেকেও আশ্চার্যজনক ঘটনা হচ্ছে, হযরত আবু বকর (রা)–এর খেলাফতের যুগে যখন হযরত ওমর (রা) মদীনার কাজী ছিলেন, পুরা একটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে তার কাছে একটি মোকদ্দমাও বিচারের জন্যে হাজির করা হয়নি (আস্‌সিদ্দিক আবুবকর, সম্পাদনা মোঃ হোসাইন হায়কল পাশা, পৃষ্ঠা–২১০)

এ থেকে বুঝা যায় যদি সঠিকভাবে ইসলামের সংস্কারমূলক স্কীমগুলোকে সমাজে জারী করা হয় তাহলে মোকদ্দমাবাজী কতো হ্রাস পায়।

শেষ কথা

এ কয়েকটি প্রস্তাবই আমার কাছে ছিলো। এ দেশে ইসলামী আইনকে জারী ও প্রতিষ্ঠার জন্যে এগুলো বাস্তবায়িত হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। আমি চাই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষ করে ওসব লোক যারা আদালতের বাস্তব অভিজ্ঞতা রাখেন তারা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করুন এবং এ বিষয়টিকে পূর্ণাংগ রূপ দেয়ার চেষ্টা করুন। আমি মনে করি যারা এতোদিন পর্যন্ত ইসলামী আইনকে আদৌ সম্ভবই নয় বলে মনে করতেন তারা আমার নিবেদনের পর কিয়দংশে অন্তত নিশ্চিত হতে পেরেছেন। তারা এটাও জানতে পেরেছেন যে, ইসলামী আইন কিভাবে জারী হতে পারে এবং এর বাস্তব উপায়গুলো কি। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, পৃথিবীতে কোনো কিছুরই প্রতিষ্ঠা অসম্ভব নয়-যদি তার জ্ঞানসম্পন্ন ও আগ্রহশীল নির্মাতা পাওয়া যায় এবং তার প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণও তার কাছে মজুত থাকে। এ দু'টি বস্তু যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে সব কিছুই তৈরী হতে পারে, চাই তা মসজিদ হোক কিংবা শিবমন্দির।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার দাবী[১]

জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (যিনি বর্তমানে পাকিস্তান সরকারের হাতে কারাবন্দী) ১৯৪৮ সালের এপ্রিল ও মে মাসে লাহোর, মুলতান, করাচী, রাওয়ালপিন্ডি, শিয়ালকোট ও পেশোয়ারে জামায়াতের সাধারণ সম্মেলন সমূহে যেসব ভাষণ প্রদান করেন, নিম্নে তার সম্মিলিত বক্তৃ সংক্ষেপ পেশ করা হলো। হাজার হাজার মুসলমান এ ভাষণ সমূহ শ্রবণ করে প্রথমবারের মত বুঝতে পারে যে, পাকিস্তান অর্জনে তাদের কাজ শেষ হয়নি বরং আসল লক্ষ্য অর্জনের দিকে যাত্রার সূচনা হয়েছে মাত্র। সেই লক্ষ্য অর্জন সম্পন্ন করতে এখনো আরো অনেক ত্যাগ স্বীকার ও প্ররিশ্রম করতে হবে।

এ ভাষণগুলোকে সম্পাদনা করার জন্য মাওলানা প্রয়োজনীয় সময় বের করার আগেই ১৯৪৮ সালের ৪ঠা অক্টোবর জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হন। কিন্তু একদিকে এ ভাষণ প্রকাশ করার আশু প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় এবং অপর দিকে মাওলানার মুক্তির এখনো অনেক দেরী থাকায় বাধ্য হয়ে আমরা নিজেরাই পত্র-পত্রিকার সাহায্যে তা লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করছি।

–জামায়াতে ইসলামীর প্রকাশনা বিভাগের ব্যবস্থাপক

---

১. এ ভাষণটি ১৯৪৯ সালের শুরুতেই পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। মাসিক তরজুমানুল কুরআনে প্রকাশের অবকাশ পাওয়া যায়নি।

আমরা এক যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত

উপস্থিত ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ! আজ আমরা আমাদের ইতিহাসের এক নাজুকতম সময় অতিক্রম করছি। বর্তমানে আমরা একটা যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত। আমাদের সামনে দুটো পথ উন্মুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে কোন্ পথটি আমরা অবলম্বন করবো। সেটাই আজ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জাতি হিসেবে আজ আমরা যে সিদ্ধান্ত নেব, তা শুধু আমাদের ভবিষ্যত নয় বরং কতকাল পর্যন্ত আমাদের ভাবি বংশধরদের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে তা বলা যায় না। আমাদের সামনে একটা পথ হলো ইসলাম প্রদত্ত নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলার পথ। আমাদের সমগ্র জীবন-সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন-এক কথায় জীবনের সকল দিক, বিভাগ ও কার্যক্রমকে এ আদর্শের আলোকে তৈরী করা চাই। অপর পথটি হলো পাশ্চাত্য জীবন পদ্ধতিকে গ্রহণ করা-চাই তা সমাজতন্ত্র হোক, ধর্মহীন গণতন্ত্র হোক অথবা অন্য কোন জীবন পদ্ধতি হোক।

আল্লাহ্ না করুন, আমরা যদি দ্বিতীয় পথটা অবলম্বন করি তা হলে সেটা হবে জাতিগতভাবে আমাদের ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার শামিল। সেটা হবে দীর্ঘকাল ধরে আমরা আল্লাহ্র সামনে ও মানবজাতির সামনে যেসব প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার ঘোষণা করে এসেছি, তা লংঘন করার পর্যায়ভুক্ত। আর এভাবে আমরা যে ওয়াদা খেলাপী ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দায়ে দোষী হবো, তার দরুন আমাদেরকে আল্লাহ্র ও দেশবাসীর সামনে সমান অপদস্ত হতে হবে। এ পথ অবলম্বনের আরো একটা অবশ্যম্ভাবী কুফল দেখা দেবে এই যে, ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাসের চূড়ান্ত উচ্ছেদ ঘটবে। পক্ষান্তরে আমরা যদি প্রথম পথটা অবলম্বন করি এবং খাটি ইসলামী মূলনীতির আলোকে নিজেদের জাতীয় জীবনকে গড়ে তুলি, তা হলে আমরা দুনিয়াতেও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো এবং আখেরাতেও সফলকাম হতে পারবো। এতে আমাদের আল্লাহ্র কাছেও গৌরবময় মর্যাদার অধিকারী হওয়া সম্ভব হবে আর বিশ্ববাসীর সামনেও আমাদের সম্মানজনক আসন লাভ নিশ্চিত হবে। হাজার হাজার বছর আগে একটি জাতি ইসলামী বিধান কায়েমের শপথ ঘোষণা করলে আল্লাহ্ তাকে সম্বোধন করে اِنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ 'আমি

তোমাদেরকে বিশ্বের সকল জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম” বলে যে দুর্লভ সম্মানে অলংকৃত করেছিলেন এবং তারপর আরো একটি জাতি যখন এ সুমহান দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, তখন তাকে كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ এবং وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا অর্থাৎ তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি এবং তোমরা কেন্দ্রীয় জাত বলে তাকে আল্লাহ্ যে গৌরবময় উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, আমরাও, ইসলামী জীবন বিধানের পতাকা বহন করে সেই মহিমান্বিত আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবো।

আমাদের মুসলমান হওয়ার উদ্দেশ্য

আমাদের সামনে উন্মুক্ত এ দুটি সুযোগের যেটিই আমরা গ্রহণ করবো, তা আমাদের ও আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের ভাগ্য নির্ধারণে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে। আমরা যদি ইসলামী আদর্শকেই নিজেদের জন্য মনোনীত করি এবং আমাদের শাসন ব্যবস্থাকে ইসলামী রূপরেখা অনুসারে গড়ে তুলি তবে একাধিক কারণে তা সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত হবে। প্রথম কারণ এই যে, এটাই আমাদের মুসলমান হওয়ার অনিবার্য দাবী। মুসলমান হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহর অনুগত হওয়া। এর তাৎপর্য হলো, নিজের স্বধীনতা ও স্বাধিকারকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা ও এ মর্মে অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা করা যে, এখন থেকে আল্লাহর নির্ধারিত বিধি-নিষেধের অধীনই জীবন যাপন করবো। তার পক্ষ থেকে যেদিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেয়া হবে, সেদিকে অগ্রসর হব, আর যেদিকে অগ্রসর হতে নিষেধ করা হবে, সেদিকে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকবো। কোন ব্যক্তি যেমন আল্লাহর সাথে এ অঙ্গীকার করে নিজের জীবনকে তার ইচ্ছা ও মর্জির অধীন করে দিলেই মুসলমান হতে পারে। ঠিক তেমনি সামষ্টিকভাবে একটি জাতির মুসলমান হওয়ার পদ্ধতি এই যে, সে নিজের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারকে আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়ে নিজেকে তার আইন বিধির অধীন করে নেবে। কোন জাতির লোকেরা যদি ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান হয়, কিন্তু তারা সংগঠিত ও সম্মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করার পর রাষ্ট্রটি অমুসলিম তথা আল্লাহর অবাধ্য হয়, তা হলে সেটা হবে এক অদ্ভূত ও উদ্ভট ঘটনা। সমষ্টি অমুসলিম হলে তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি কেমন করে মুসলিম হতে পারে। আর যদি ব্যক্তিবর্গ মুসলিম হয়, তা হলে সেই ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে

গঠিত সমষ্টি কোন্ কারণে অমুসলিম হবে? ব্যক্তিবর্গ যদি মুসলমান হয় এবং মুসলমান হিসেবে বহাল থাকতে চায়, তাহলে তারা মিলিত হয়ে যখন একটি জাতি ও রাষ্ট্র গঠন করবে তখন তাদেরকে জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবেও মুসলমান হতে হবে।

ইসলামের জন্যই পাকিস্তানের সৃষ্টি

এ ছাড়া আমাদের পাকিস্তান দাবীরও উদ্দেশ্য এই যে, আমরা এখানে ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবো। বিগত দশ বছর ধরে জাতি হিসেবে আমাদের দাবী ছিল এই যে, আমাদের এমন একটা ভূ-খন্ড চাই, যেখানে আমাদের সভ্যতা ও তামাদ্দুনকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে এবং আমাদের দীনের মূলনীতি অনুসারে আমাদের জীবনের লালন ও বিকাশ ঘটাতে পারবো। কেননা একটা অমুসলিম সংখ্যাগুরুর অধীন আমাদের পক্ষে এ ধরনের জীবন যাপন সম্ভব নয়। আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, এখন থেকে দেড় বছর আগে ভারত বিভক্ত হবে এমন কোন লক্ষণ পরিস্ফুট ছিল না এবং এখানে মুসলমানদের একটা আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে, তা ধারণা করা যায়নি। এমনকি যারা সামনের কাতারে ছিলেন এবং এ দাবী আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, স্বয়ং তাদেরও সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল না যে, পাকিস্তান সত্যিই কায়েম হবে। এরপর পরিস্থিতির যেরূপ নাটকীয় পরিবর্তন ঘটলো এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার পক্ষে যেভাবে পরিবেশ অনুকূল হলো এবং দেখতে দেখতে দেশ দ্বিখন্ডিত হলো, এর যে ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিই প্রদর্শন করা হোক না কেন, আমি এ বিপ্লবে আল্লাহর ইচ্ছাকে অসাধারণভাবে সক্রিয় দেখতে পাই। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, শত শত বছর পরে ইতিহাসে সর্বপ্রথম এরূপ ঘটনা ঘটেছে যে, একটি জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে ঘোষণা করলো, "আমরা ইসলামী জীবন যাপন করতে চাই এবং যেহেতু অমুসলিম সংখ্যাগুরুর অধীন আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়, সুতরাং আমাদের একটা স্বাধীন ভূ-খন্ড চাই। এরূপ একটা স্বাধীন ভূ-খন্ড পেলে সেখানে আমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে বিজয়ী করবো।" আল্লাহর কাছে এ কথা গৃহীত হলো যে, এ জাতিটি যখন ইসলামী জীবন যাপন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে, তখন একটিবার তাকে এ সুযোগ দেয়া উচিত। সুদীর্ঘকাল ধরে মুসলমানদেরকে পদদলিত করা

হচ্ছিল। কিন্তু তারা যখন সংকল্প ব্যক্ত করলো যে, তারা স্বতন্ত্র জাতিসত্তা নিয়ে বাঁচতে চায়, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে সে সুযোগ এনে দিলেন।

একটি কঠিন পরীক্ষা

এ সুবর্ণ সুযোগ হস্তগত হওয়া আপনাদের জন্য যেমন অনুগ্রহ বিশেষ, তেমনি তা এক পরীক্ষাও বটে। পাকিস্তান লাভের পর আপনারা সকলে পরীক্ষাস্থলে অবস্থিত। বিগত দশ বছর ধরে আপনারা মুখ দিয়ে যা বলছিলেন, আপনাদের মনেও সত্যিই তা ছিল কিনা; যেসব সংকল্প আপনারা ঘোষণা করছিলেন, আপনাদের নিয়তও কি সেই মোতাবেক আছে কিনা। আল্লাহ্ ও বিশ্ববাসীর সামনে আপনারা যেসব প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার দিয়েছিলেন, তা সত্য অঙ্গীকার ছিল না মিথ্যা অঙ্গীকার, সেই পরীক্ষা আপনাদেরকে এখন দিতে হবে। আল্লাহ্ দেখতে চান যে, ইসলামী শাসন কায়েমের যে আওয়াজ আপনারা তুলেছিলেন, তা কি জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য তুলেছিলেন, না সত্য সত্য অন্তর দিয়েই তা চেয়েছিলেন এবং এখন সেই আওয়াজকে কার্যে পরিণত করে দেখাবেন। আপনারা বলতেন, "পাকিস্তানের অর্থ কি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহা", আপনারা বলতেন যে, ইসলামকে পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত করার জন্যই আমরা পাকিস্তান চাই। এখন আল্লাহ্ পাকিস্তান দিয়ে আপনাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, আপনারা সত্য বলেছিলেন না মিথ্যা বলেছিলেন?

ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থায়ীত্বের একমাত্র উপায়

এ সিদ্ধান্ত নেয়া যে এত গুরুত্ববহ তার তৃতীয় কারণটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। সেটি এই যে, গত বছর সংঘটিত এ বিপ্লব আমাদেরকে একটা নাজুক পরিস্থিতিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। ভারতের একটা বিরাট অংশে এখন ইসলাম ও ইসলাম ভক্তদের আর কোন অস্তিত্ব নেই। যে ভূ-খন্ড একদিন শাহ্ ওলিউলাহ্ ও মোজাদ্দেদে আলফেসানী (র)-এর মত ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছিল, আজ সেখানে আজানের শব্দ উচ্চারিত হয় না। সেখানে আজান দেয়ার লোকও নেই, শোনার লোকও নেই। তা ছাড়া ভারতের অন্যান্য অংশ থেকেও ইসলামকে নির্মমভাবে উৎখাত করা হচ্ছে। এখন সেখানে এরূপ অবস্থা হয়েছে যে, রেলগাড়ীতে ভ্রমণের

সময় যাত্রীদের মধ্যে কে মুসলমান, তা চেনাও কষ্টকর। কাল পর্যন্ত ইসলামের কথায় সোচ্চার ছিল, এমন বহু লোক এখন ইসলাম থেকে তওবা করছে। এখন সেখানে কোন মুসলমানের বাস করতে হলে এমনভাবে বাস করতে হবে যেন ইসলামের গন্ধও তার মধ্যে অবশিষ্ট না থাকে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরে ভারতে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা শত শত বছর ব্যাপী অবিরাম চেষ্টা-সাধনা দ্বারা সারা ভারতে যে ইসলাম প্রচার ও বিস্তার করেছিলেন, তা এখন আটশো বছর পর পাকিস্তানের দু' অংশে সংকুচিত হয়ে টিকে আছে। এখন যদি আমরা একটি কদমও ভ্রান্তভাবে উঠাই, তাহলে ভারতে ইসলামের হাজার বছরের ইতিহাস বৃথা হয়ে যাবে। ভারতীয় উপমহাদেশের তিন-চতুর্থাংশে তো ইসলাম অন্যদের হাতে নির্মূল হচ্ছে। আর পাকিস্তানে আমাদের নিজেদের হাতেই তা উৎখাত হবে। তাই আমাদেরকে পরবর্তী পদক্ষেপ খুবই সতর্কতার সাথে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের ও ইসলামের মূলোৎপাটনের মধ্যে এখন আর একটি মাত্র ধাক্কার ব্যবধান রয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের যদি পদস্খলন ঘটে, তা হলে আমাদের পূর্বপুরুষদের ইসলামী কৃতিত্ব ও অবদানের গোটা ইতিহাস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এ সব কারণে আজ আমাদের এ সিদ্ধান্ত নেয়া অপরীহার্য হয়ে ওঠেছে যে, এ দেশের শাসন ব্যবস্থাকে আমাদের যে কোন মূল্যে ইসলামী আদর্শের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এখানে আমাদের হাতে রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার যে কাঠামো তৈরী হবে তা ইসলামের অনুকরণেই তৈরী হবে।

বর্তমান শাসন ব্যবস্থার ইসলামীকরণের উপায়

আমাদের দেশে এ যাবত যে শাসন ব্যবস্থা চলে আসছে তার ইসলামীকরণ কিভাবে সম্ভব। সে বিষয়ে এখন আমার বক্তব্য পেশ করতে চাই। একজন মানুষের মুসলমান হওয়ার জন্য যে নিয়ম নির্ধারিত রয়েছে, একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের ইসলামীকরণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াও তাই। একজন অমুসলিমকে মুসলমান বানানোর জন্য আমরা কি পন্থা অবলম্বন করে থাকি? আমরা কি তার শুধু বাহ্যিক বেশভূষা, চেহারা ও আদত-অভ্যাসে কিছু পরিবর্তন এনে এবং খানাপিনার তালিকা থেকে কিছু জিনিস বাদ দিতে বলেই ক্ষান্ত হই? অতপর তাকে কি এই বলে

ছেড়ে দেই যে, যাও, এবার তুমি ক্রমান্বয়ে মুসলমান হয়ে যাবে? তারপর কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর যখন সেই অমুসলিম ব্যক্তি নিজের ভেতরে বেশ কিছু পরিবর্তন সূচিত করে, তখন কি তাকে কালেমা পড়াই? না, আমরা কখনো এ রকম করি না। বরঞ্চ যখন কেউ মুসলমান হতে চায়, তখন সর্বপ্রথম তাকে কলেমা পড়ানো হয়। সে যখন কালেমা পড়ে অঙ্গিকার করে যে, এখন থেকে সে আল্লাহর দাসত্ব ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের মাধ্যমে জীবন যাপন করবে, তখন আমরা তাকে এক এক করে ইসলামী বিধিসমূহ শেখাই এবং তার কর্ম ও চরিত্র, আদত ও অভ্যাসে পরিবর্তন সাধন করি। অবিকল এই একই পন্থা অনুসরণ করতে হয় রাষ্ট্র ও সরকারকে মুসলমান বানানোর ক্ষেত্রে। প্রথমে তার কাছ থেকে কতিপয় মৌলিক নীতিমালার স্বীকৃতি আদায় করা হয়। এ সব নীতি ও আদর্শকে সে যখন মেনে নেয়। তখন তার সামনে পর্যায়ক্রমে ইসলামের বাস্তব দাবীসমূহ পেশ করা হয় এবং ইসলাম যেসব পরিবর্তন ও সংস্কার প্রত্যাশা করে, তা কার্যকরী করা হয়।

আমাদের দেশে বর্তমানে যে শাসন ব্যবস্থা চালু রয়েছে, তা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন থেকে গৃহীত। ইংরেজরা নিজেদের নীতি ও অভিপ্রায় অনুসারে এ আইন প্রণয়ন করেছিল। ইংরেজদের শাসন ইসলামী শাসন ছিল না। কুফরী শাসন ছিল। পাকিস্তানেও সেই শাসন ব্যবস্থা এখনো চলছে। যদিও এটা এখন মুসলমানরা পরিচালনা করছে। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে তা কুফরী শাসন। এখন এ শাসন ব্যবস্থাকে মুসলমান বানানোর জন্য সর্বপ্রথম যে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন তা এই যে, কোন ব্যক্তিকে মুসলমান বানাতে প্রথমে যেমন কালেমা পড়াতে হয়। তেমনি এ রাষ্ট্রকেও কালেমা পড়াতে হবে। একটি রাষ্ট্র বা সরকারকে কালেমা পড়ানোর জন্য যে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া প্রয়োজন, তা আমরা একটা দাবীনামার আকারে প্রণয়ন করেছি। প্রথমে আমি সেই দাবীনামা পেশ করছি। অতপর আমি তার ব্যাখ্যা দেব। এ ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা যাবে যে, এ রাষ্ট্রকে মুসলমান বানানোর জন্য প্রথম পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত এবং তদনুসারে কি কি তৎপরতা চালানো উচিত।

সাংবিধানিক "দাবী"

উল্লিখিত যে দাবীনামাটি এ সময় পড়ে শোনানো হয়, তার বিবরণ নিম্নরূপঃ "যেহেতু পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাগুরু অধিবাসী ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী এবং যেহেতু পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্যই মুসলমানদের সমস্ত তৎপরতা ও ত্যাগ তিতিক্ষা নিবেদিত, যাতে করে তারা যেসব নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী, সে অনুসারে যেন জীবন যাপন করতে পারে।

অতএব, পাকিস্তান হওয়ার পর পাকিস্তানের গণপরিষদের কাছে প্রত্যেক পাকিস্তানী মুসলমানের দাবী এই যে, তাকে নিম্নরূপ ঘোষণা দিতে হবেঃ

১. পাকিস্তানের রাজত্ব তথা শাসন ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত এবং পাকিস্তানের সরকারের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো তার বাদশাহ্ তথা সার্বভৌম শাসকের ইচ্ছাকে তার রাজ্যে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করা।

২. ইসলামী শরীয়াতই পাকিস্তানের মৌলিক আইন।

৩. ইসলামী শরীয়াতের পরিপন্থী যত আইন-কানুন এ যাবত চালু আছে, তা বাতিল করা হবে এবং আগামীতে শরীয়াতবিরোধী কোন আইন চালু করা হবে না।

৪. পাকিস্তান সরকার একমাত্র শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে আপন ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

এ দাবীনামার তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য জানা দরকার যে, যখন কোন দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়, তখন কোন্ কোন্ মূলনীতি অনুসারে দেশের প্রশাসনিক কাঠামো তৈরী করতে হবে, সেটাই সর্বপ্রথম রচনা করতে হয়। সম্প্রতি আপনাদের সামনে ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণীত হলো। সেখানে আপনারা দেখেছেন যে, সর্বপ্রথম সে দেশের গণপরিষদ শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাশ করে সেখানকার সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। অনুরূপভাবে পাকিস্তানেও শাসনতন্ত্র রচনার প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা। এ সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকেই আমরা

সাংবিধানিক ভাষায় উপরোক্ত ৪টি দফায় রচনা করেছি। এখন আমি এর প্রতিটি দফার ব্যাখ্যা করছিঃ

প্রথম দফার ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

রাজনীতি ও সংবিধানে (Constitution) মৌলিক প্রশ্ন এ হয়ে থাকে যে, সার্বভৌমত্ব (Sovreignty) কার? সার্বভৌমত্ব যদি কোন ব্যক্তি বা পরিবারের জন্য নির্ধারিত হয়, তাহলে সরকারের গোটা প্রশাসনযন্ত্র সেই ব্যক্তি বা পরিবারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে থাকে। সার্বভৌমত্ব যদি জনসাধারণের জন্য নির্ধারিত হয়, এবং দেশের অধিবাসীরাই যদি দেশের সার্বভৌম মালিক হয়, তাহলে সমগ্র প্রশাসনিক কাঠামো দেশবাসীর ইচ্ছা ও মর্জিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে দেশের একচ্ছত্র মালিক এ জনসাধারণের আশা-আকাংখা পূরণের নিমিত্বই সরকারের যাবতীয় উপায় উপকরণ ও ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়। এটা একটা মৌলিক প্রশ্ন। তাই আমরা সর্বপ্রথম এ প্রশ্নেরই মীমাংসা করতে চেয়েছি। পাকিস্তানের অধিবাসীরা যেহেতু মুসলমান, তাই তারা দেশের সার্বভৌম মালিক হতে পারে না। তাদের মুসলমান হওয়ার অর্থই এই যে, তারা নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে এর দাবী চিরতরে বিসর্জন দিয়েছে। এখন তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য দাড়িয়েছে এই যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নিরংকুশ কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তার ইচ্ছাকেই তাদের পূর্ণ করতে হবে। অতএব মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র বা সরকার কেবল তখনই মুসলমান হতে পারে, যখন তা আল্লাহ্ তায়ালাকে দেশের একচ্ছত্র অধিপতি মেনে নিয়ে তার ইচ্ছাকে কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত নেয়।

কেউ কেউ এ দাবীটিকে এভাবে রূপ দিয়েছে যে, সরকার ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা করলেই হলো। কিন্তু আমাদের মতে, এটা যথেষ্ট নয়। কেননা শাসনতন্ত্রে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা করেছে-এমন দেশ বহু রয়েছে। কিন্তু সেখানে সার্বভৌমত্ব কোন ব্যক্তি, পরিবার কিংবা সর্বসাধারণ দেশবাসীর জন্য নির্ধারিত। আমি কোন

দেশের নাম উল্লেখ করতে চাই না। কেননা আমরা একটা স্বাধীন জাতি। কোন প্রতিবেশী দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হোক সেটা আমরা চাই না। যা হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সরকার দেশের সার্বভৌমত্ব তথা একচ্ছত্র আধিপত্য এবং নিরংকুশ মালিকানা ও কর্তৃত্বকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট না করবে, ততক্ষণ তা সাংবিধানিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্র হতে পারবে না। এ জন্যই, আমাদের গণপরিষদের কাছে আমাদের পয়লা নম্বর দাবী এই যে, তা আল্লাহর সাবভৌমত্বে বিশ্বাস স্থাপনের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করুক।

দ্বিতীয় দফার ব্যাখ্যা ঃ

পাকিস্তানের মৌলিক আইন

দ্বিতীয় দফা প্রথম দফার যৌক্তিক পরিণতি। যেহেতু দেশের মালিক তথা সার্বভৌম মনিব আল্লাহ্। তাই তাঁর মর্জিই মৌলিক আইন হওয়া উচিত। এ দফাটা মেনে নেয়ার পর এখানকার আইন সভার আইন রচনার অধিকার সীমিত হয়ে যায় এবং আমাদের আইন সভার ক্ষমতা অন্যান্য আইনসভার মত সীমাহীন থাকে না। অন্য কথায়, আমাদের আইনসভা আল্লাহর নির্দেশ থেকে বেপরোয়া হয়ে আইন রচনার কাজ করতে পারে না। যে আইন আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, তাকে হুবহু নির্বিবাদে গ্রহণ করা এবং পাকিস্তানের মৌলিক আইন হিসেবে চালু করা শাসনতান্ত্রিকভাবে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। তবে যেসব আইনের একাধিক ব্যাখা সম্ভব তার বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্য থেকে কোন একটা বেছে নেয়ার অধিকার কেবল কুরআন ও হাদীসে অভিজ্ঞ লোকদেরই থাকবে। তারপর যেসব বিষয়ে আল্লাহ্ ও রসূল কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেননি, সেখানে সুস্পষ্ট বিধি জারী না করে আল্লাহ্ ও রসূল এ কথাই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এ সব ব্যাপারে মুসলমানদের সংগঠন স্বাধীন। নিজেদের প্রয়োজনমত আইন ও বিধি রচনার অধিকার তাদের রয়েছে। তবে মুসলমান জনগণ এ কাজে শুধুমাত্র তাদেরকেই নিয়োগ করবে, যারা ইজতিহাদ তথা কুরআন ও হাদীসের মৌলিক শিক্ষার আলোকে আইন রচনার যোগ্যতা সম্পন্ন।

তৃতীয় দফার ব্যাখ্যা ঃ

ইসলামী শরীয়াতের পুণরুজ্জীবন

এ দফাটা দ্বিতীয় দফার যৌক্তিক উত্তরণ। এর বক্তব্য ও লক্ষ্য এই যে, যে শরীয়াতকে বাতিল করে ইংরেজরা নিজস্ব আইন-কানুন চালু করেছিল। এখন সেই শরীয়াতকে আবার চালু করতে হবে এবং ইংরেজের তৈরী "কুফরী ধাচের আইন-কানুন" সম্পূর্ণরূপে বিলোপ ও বাতিল করতে হবে। এখন থেকে এ দেশের প্রতিটি আইন হবে ইসলামী শরীয়াত সম্মত। শরীয়াত বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করার অধিকার কারোই থাকবে না। এখন যদি এখানকার জাতীয় সংসদে শরীয়াত বিরোধী কোন খসড়া আইন উপস্থাপিত হয়, তাহলে সংবিধানের আলোকে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আর যদি কখনো তা পাশ হয়েই যায় তাহলে তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করে উক্ত পাশ হওয়া আইনকে বাতিল করানো যাবে।

চতুর্থ দফার ব্যাখ্যা ঃ

ইসলামী সরকারের সাধারণ নীতিমালা

কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা কেবলমাত্র আইনের সাহায্যেই টিকে থাকতে পারে না বরং শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার সাধারণ নীতিমালার সাহায্যেই তা টিকে থাকতে পারে। সরকারকে একটা শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য একটা নীতি অবলম্বন করতে হবে, অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটা কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে, যুদ্ধ ও সন্ধি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের জন্য কোন বিশেষ আচরণভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। তবে আমাদের প্রত্যাশা এই যে, ইসলাম যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, সরকার যেন তার যাবতীয় কাজ ঐ সীমার আওতাধীন থেকেই সম্পন্ন করে। অন্যথায় আমাদের সরকার যদি নিজের ক্ষমতা বিভিন্ন আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বিষয়ে ইসলামের বিধানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, তা হলে ইসলামী আইনের প্রচলন নিরর্থক হয়ে যাবে। এ জন্য আমরা এ দফাটাও আমাদের দাবীর অর্ন্তভূক্ত করেছি। যাতে করে ইসলামের সীমার বাইরে

কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করে পাল্টে দেয়া যেতে পারে।

পরিবর্তনের সূচনা বিন্দু

আমার মতে, এ ব্যাখ্যার পর উপরোক্ত "দাবীনামা"র সঠিক তাৎপর্য বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কোন রাষ্ট্রকে সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য পয়লা পদক্ষেপ এটাই হতে পারে, যা এ দাবীনামায় কামনা করা হয়েছে। সুতরাং আমরা যদি দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করতে চাই তাহলে সর্বপ্রথম আমাদেরকে সরকারের কাছ থেকে এ দাবী আদায় করে নিতে হবে। এ দাবী মেনে নেয়া হলে দ্বিতীয় পদক্ষেপ হবে এমন আলেমদের একটি কমিটি গঠন করা, যারা কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি শাসনতন্ত্র (Constitution) এবং আইন (Law) দু'টোই ভালভাবে বুঝেন। তাঁরা পরামর্শ করে স্থির করবেন যে, কুরআন ও হাদীসের আলোকে কোন্ কোন্ মূলনীতিকে পাকিস্তানের মৌলিক আইন হিসেবে নির্ধারণ করা উচিত এবং খেলাফতে রাশেদা থেকে কি কি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু এ ব্যাপারটা তো অনেক পরের। প্রয়োজনের সময় তা ঠিকই হবে। কিন্তু এ মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরী কাজ এই যে, পাকিস্তান সরকারকে সাংবিধানিক ভাষায় নিজের মুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করতে হবে। পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থা ইসলামী হোক–এটা যদি এ দেশের জনগণ সত্যি সত্যিই চায়, তাহলে এ দাবী তাদের সকলের দাবী হওয়া চাই। এটা আমার বা কোন দল বিশেষের দাবী নয়। কোন ব্যক্তিকে "শায়খুল ইসলাম" বানানো, কোন বিশেষ ফের্কার আলেমদেরকে চাকরী দেয়া অথবা কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের অধিকার বাগানোর প্রশ্ন এর সাথে জড়িত নয়। বরঞ্চ এ দাবী সমগ্র উম্মতের একটা সাধারণ সামষ্টিক দাবী।

দাবীর কারণ

এ দাবী তোলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এ জন্য যে, এখানে একটা কৃত্রিম বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। এ বিপ্লব যদি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত হতো, তাহলে এ দাবী তোলার প্রয়োজনই হতো না। বরং বিপ্লবের সাথে সাথেই আপনা–আপনি এ দেশে ইসলামী শাসন কায়েম হয়ে যেত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় একটা কৃত্রিম বিপ্লবের

পর এখানে ইসলামী শাসন কায়েম হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি একটা অনৈসলামী শাসন জেঁকে বসাও অসম্ভব নয়। কাজেই এখন ইসলামী শাসন কায়েম করতে হলে একটা সুসংগঠিত ও জোরদার দাবীর মাধ্যমেই তা করা সম্ভব। এ দাবীর জন্য আন্দোলন করার প্রয়োজন এ জন্যও যে, আমরা যাঁদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছি, তাঁরা দীর্ঘদিন যাবত পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা বলে আসছেন। তাঁরা কখনো বলেন যে, ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা না করলে আমাদের পাকিস্তান অর্জনের কোন অর্থই হয় না। আবার কখনো বলেন যে, এখানে একটা ধর্মহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। কখনো তাঁরা বলেন যে, এখানে কুরআনের শাসন কায়েম হবে। আবার কখনো এ কথাও বলেন যে, এখানে রাজনৈতিকভাবে হিন্দুও হিন্দু থাকবে না, মুসলমানও মুসলমান থাকবে না। সকলের একমাত্র পরিচয় হবে পাকিস্তানী। তাছাড়া ইসলামী শাসনেরও রকমারী ব্যাখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। কখনো এর এরূপ ব্যাখ্যা দেয়া হয় যে, এর অর্থ হলো ন্যায়বিচার, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব। আবার "ইসলামী সমাজতন্ত্র" শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বুঝি না এ "ইসলামী সমাজতন্ত্র" জিনিসটা কি? আমার মনে হয়, যারা এটা উচ্চারণ করেন তারা নিজেরাও এর অর্থ জানেন না। কখনো তাঁরা ইসলামী গণতন্ত্রের ধুয়াও তোলেন। আমি তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলছি বর্তমান শাসন ব্যবস্থা যদি গণতান্ত্রিক হয়ে থাকে এবং আপনারা এখানে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত থেকে থাকেন, তাহলে জনগণ যে অর্থে ইসলামী শাসন চায়, সে অর্থেই ওটা কায়েম করা আপনাদের কর্তব্য। এ ছাড়া অন্য কিছু করার অধিকার আপনাদের নেই।

দাবীর আরো একটা কারণ

এ দাবী জানানোর আরো একটা কারণ এই যে, আমরা যাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেছি, তাদের কেউ কেউ এ ক্ষমতাকে অনৈসলামিক পন্থায় প্রয়োগ করে জাতিকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে অনৈসলামিক রীতিনীতির দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক একটা গোষ্ঠী প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসই করে না। তারা পাশ্চাত্য রীতিনীতিকে নিজেদের জন্য ও নিজেদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য মনোনীত করেছে এবং নিজেদের পারিবারিক

পরিবেশকেও তদনুযায়ী গঠন করে নিয়েছে। তারা নিজেরা যতখানি পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত হয়েছে, পুরো জাতিটাকেও ততখানি বিপথগামী করতে ইচ্ছুক। আর এ কাজটি করার জন্য তারা মুসলিম জনগণ কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে চলেছে। এতদসংক্রান্ত কার্যকলাপের অগণিত উদাহরণ দিনরাত আমরা প্রত্যক্ষ করছি। আমি এর শুধু একটি উদাহরণ পেশ করছি। এটি আমাদের এক সৈনিক ভাই এর চিঠি। করাচীর 'জাহানে নও' পত্রিকার ৯ই এপ্রিল ১৯৪৮ এবং লাহোরে সাপ্তাহিক 'কওসারের' ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ সংখ্যায় এ চিঠি ছাপা হয়েছে। (চিঠিটি পড়ে শোনানো হয়। এতে সামরিক কর্মকর্তাদের একটি বিনোদমূলক অনুষ্ঠানের দুঃখজনক বিবরণ ছিল। সম্রাট জর্জ ও কায়েদে আযমের সুস্বাস্থ্য কামনা করে মদ্যপান এবং অধিনস্থ অফিসারদের স্ত্রীদের পর্দা পালনের উপদেশ প্রদান করে এটিকে তাদের পদোন্নতির অপরিহার্য শর্তরূপে বর্ণনা করা হয়। সামরিক দায়িত্ব পালনের বেলায় নামাযকে বিলম্বিত করার পক্ষেও মন্তব্য করা হয়।)

এ হলো একটি উদাহরণ। এ ধরনের বহু উদাহরণ প্রতিদিন আমাদের গোচরে আসছে। এক জায়গায় একজন চাপরাশী নামায পড়তে গেলে তাকে ধমক দেয়া হয়। লুধিয়ানার একজন ছাত্র ঈমানী আবেগের বশে দাড়ি রেখে লাহোর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য গেলে প্রিন্সিপাল সাহেব তাকে বলেন যে, "তুমি এ দাড়ি নিয়ে কলেজে কি করতে এসেছ? কোন মসজিদে গিয়ে মোল্লা হয়ে যাও।" জাহানে নও এর ৯ই এপ্রিল সংখ্যায় একটি চিটি ছাপা হয়। তা থেকে জানা যায় যে, সেনাবাহিনীতে দাড়ি রাখা নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। আমি জানতে চাই যে, আমাদের সেনাবাহিনীর এ সব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কি কখনো কোন শিখ ছাত্রের ওপর এ ধরনের আপত্তি জানানোর বা নিষেধাজ্ঞা জারী করার সাহস দেখিয়েছেন? আমাদের উক্ত সৈনিক ভাইয়ের চিঠি যে পত্রিকাটিতে ছাপানো হয়েছিল সেটি আমি করাচীতে গণপরিষদের সদস্যদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলাম এবং এটা সরকারের নীতি না সামরিক অফিসারদের ব্যক্তিগত অভিরুচী তা জিজ্ঞাসা করতে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু কোন ব্যক্তি এ প্রশ্ন তুলতেই প্রস্তুত হতে পারলো না। এ থেকে বুঝা গেল যে, হয় তারা এর কোন গুরুত্ব অনুভব করেননি অথবা অন্তত পক্ষে ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করতে চেয়েছেন।

যুক্তির সাথে শক্তির আবশ্যকতা

এ দাবী তোলার প্রয়োজন এ জন্যও দেখা দিয়েছে যে, আমাদের এ নেতৃবৃন্দ ইংরেজদের শিষ্য। তারা যদি শুধুমাত্র যুক্তিতেই মেনে নিতেন তা হলে একজন মানুষ বলে দিলেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু তারা এভাবে মেনে নেয়া লোক নন। কোন কথাই তারা ততক্ষণ মানেন না যতক্ষণ তার পেছনে শক্তি না থাকে। আমরা স্বয়ং এ দাবীকেও গণপরিষদের সদস্যাদের কাছে পাঠিয়ে পরিস্থিতি অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমাদেরকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, তারা এ দাবীকে গুরুত্ব দেননি এবং কোন সদস্য তা গণপরিষদের আলোচনা ও বিবেচনার জন্য পেশ করতে উদ্বুদ্ধ হননি। এ জন্য আমরা এ দাবী নিয়ে এখন সরাসরি জনগণের কাছে এসেছি। এখন আপনাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আপনাদের ইসলামী শাসন প্রয়োজন না কুফরী শাসন।

সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ দাবী

আমি মুসলমানদের সকল শ্রেণী ও গোষ্ঠীকে বলছি যে, এখানে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর প্রশ্ন নেই বরং আমরা সকলে আল্লাহর কাছে দায়ী। আমাদের হাতে অথবা আমাদের চোখের সামনে এখানে যদি অনৈসলামিক শাসন চালু হয়ে যায়, তা হলে আল্লাহর আদালতে আমাদের সকলকেই পাকড়াও করা হবে। তাই আপনারা সকল মতবিরোধ ভুলে যান। আপনারা যদি নিচেষ্ট হয়ে বসে থাকেন তা হলে এ কাজ হবে না। এ দাবী আদায়ের জন্য সকল জরুরী কৌশল গ্রহণ করুন। দাবী আদায়ের জন্য সাধারণত কি কি কৌশল অবলম্বন করতে হয় সেটা আপনাদের ভালোভাবেই জানা আছে। পাকিস্তান দাবী আদায়ের মাধ্যমে আপনাদের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, তা কাজে লাগান এবং যেসব নির্ভুল ও অব্যর্থ কৌশল আপনারা দাবী আদায়ে প্রয়োগ করেছেন সেগুলো ইসলামী শাসন কায়েমের দাবী আদায়েও প্রয়োগ করুন। এ দাবীও নিষ্ঠাপূর্ণ চেষ্টা, সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ শক্তি এবং সময়, অর্থ ও আরাম-আয়েশের কুরবানী চায়। এ সব চাহিদা পূরণ করে আপনারা যদি প্রমাণ করে দেন এ দাবী জাতির সর্বসম্মত দাবী, তা হলে নেতৃবৃন্দ কিভাবে এর বিরোধিতা করতে পারেন? আপনারা এর জন্য জনসভা করুন, প্রস্তাব পাশ করুন, পোষ্টার লাগান। রেলগাড়ী ও বাসে লিখুন।

চিঠি লেখার কার্ড ও ইনভেলাপে ছাপান, যাতে এ চার দফা দাবী আপনাদের শিশুদেরও মুখস্থ হয়ে যায়।

মুসলিম লীগভুক্ত ভাইদের দায়ীত্ব

আমার মুসলিম লীগভুক্ত ভাইদের কাছে আমার বক্তব্য এই যে, আপনারা ইসলামী হুকুমাত কায়েমের উদ্দেশ্যেই পাকিস্তান চেয়েছিলেন। আপনারা ইসলামের নামেই সব কিছু করেছিলেন। এখন আপনারা পরীক্ষার সম্মুখীন। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চাইলে এ দাবীকে নিজের দাবীতে পরিণত করুন। এ দাবীকে মুসলিম লীগের নিম্ন সংগঠন থেকে পাশ করিয়ে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সামনে পেশ করুন। যারা এ দাবীর সাথে একমত হবে না তাদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করুন। সমাজতন্ত্রী ও নাস্তিক ধরনের লোকদের মুসলিম লীগে থাকার এখন আর কোন কারণ নেই। এ দু'টো কাজ যদি করা হয়। (ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন ও দলীয় পর্যায়ে গ্রহণ) তা হলে মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীতে কোন মতভেদ অবশিষ্ট থাকে না বরং উভয় দল প্রায় একই রকম হয়ে যায়।

শিক্ষিত লোকদের দায়িত্ব

আমি এ দেশের শিক্ষিত শ্রেণীকেও আবেদন জানাই যে, সময়ের নাজুকতা তারা যেন উপলব্দি করেন। এ ব্যাপারে তাদের ওপর গুরুতর দায়িত্ব বর্তেছে। একটি দেশের শক্তি বলতে লোহা ও কয়লাকে বুঝায় না, বরং চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান জনশক্তিই তার আসল শক্তি। আপনারা জাতির মেরুদন্ড। আপনারা নিজেদের শক্তিকে কোন্ পাল্লায় ফেলবেন, সে ফায়সালা আপনাদেরকেই করতে হবে। আপনাদের মনের সন্তুষ্টির জন্য যদি যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন থেকে থাকে, তবে আমরা আপনাদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় নিরসন করতে প্রস্তুত। ইসলামী শাসন কায়েমের মাধ্যমেই যে আপনাদের, আপনাদের জনগণের, এমনকি গোটা দুনিয়াবাসীর কল্যাণ নিহিত, সে সম্পর্কে আপনাদেরকে পুরোপুরি আশ্বস্ত করতে আমরা সক্ষম। এ ব্যাপারে আপনারা যদি আশ্বস্ত হয়ে গিয়ে থাকেন, তা হলে আপনাদের সকল ক্ষমতা ও যোগ্যতা এর সমর্থনে ব্যয়িত হওয়া উচিত। আপনারা সকল শক্তি নিয়োগ না করা পর্যন্ত

পাকিস্তানও অর্জিত হয়নি এখন আবার সর্বশক্তি নিয়োগ করলেও আপনারা ইসলামী শাসনও কায়েম করতে পারবেন।

আলেম ও পীর মাশায়েখগণের খেদমতে আবেদন

আমি আলেম ও পীর সাহেবগণকেও অনুরোধ জানাচ্ছি যে, অনুগ্রহপূর্বক খুঁটিনাটি মতভেদ বাদ দিন এবং এ কাজের ওপরই সকল চেষ্টা নিয়োজিত করুন। শাসন ব্যবস্থার এ সংস্কারটা সম্পন্ন হলে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আপনাদের তো জানাই আছে যে, কোন দেশে অনৈসলামিক শাসন চালু হয়ে গেলে সেখান থেকে ইসলামের চিহ্নগুলো এক এক করে খতম করা হয়। আপনারা এও জানেন যে, দুনিয়ায় এমন একটি দেশও আছে, যা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও বহু বছর পর্যন্ত হজ্জ নিষিদ্ধ করে রেখেছিল। কুরআনের আইনগুলো বাতিল করে তার পরিবর্তে অন্যান্য আইন চালু করেছিল। কুরআনে নারীর উত্তরাধিকার পুরুষের অর্ধেক নির্ধারণ করেছে। কিন্তু সেই দেশটি আইন জারী করে নারীকে পুরুষের সমান অংশ দিয়েছিল। আমাদের দেশে এ যাবত ইসলামের ব্যাপারে যে উদারতা দেখানো হয়েছে, তার কারণ ছিল এই যে, এখানে একটি ভিন্ন জাতির শাসন চালু ছিল এবং ধর্মের ব্যাপারে উদার আচরণ করতেই তার স্বার্থ নিহিত ছিল। কিন্তু আপনাদের ভোটের জোরেই যদি এখানে অনৈসলামিক শাসন চালু হয়ে যায়, তা হলে এখানে ইসলামের চিহ্নও রাখা হবে না। কেননা আপনাদের জানা আছে যে, দুনিয়ার একটি মুসলিম দেশের সরকার এমনও রয়েছে, যা ধর্মহীন শাসন প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় শিক্ষাকে আইনের জোরে অবৈধ করেছে। এ জন্য আপনারা খুঁটিনাটি বিষয়গুলো ভুলে যান এবং এখানকার শাসন ব্যবস্থাটা মৌলিক প্রকৃতির দিক থেকে যথার্থভাবে ইসলামিক হোক–এ মূলনীতি কার্যকরী করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করুন।

মদ নিষিদ্ধ করা, বেশ্যালয় বন্ধ করা ইত্যাদির যে আশ্বাস মাঝে মাঝে দেয়া হয়, সে কাজটা তো কংগ্রেস সরকারও করতো। এগুলো করলেই কি একটি সরকার ইসলামী সরকার হয়ে যাবে? কখনো কখনো এরূপ আশ্বাসও দেয়া হয় যে, মুসলমানদের একটা বাইতুলমাল থাকবে এবং তার মাধ্যমে যাকাত আদায় ও ব্যয় করা হবে। এ সব

অধিকার আমরা এক সময় ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন অমুসলিমদেরকেও দিয়েছিলাম এবং আমেরিকা, রুমানিয়া, যুগোশ্লোভিয়া, এমন কি রুশ দখলীকৃত তুর্কিস্তানের সরকারও স্বীয় মুসলিম নাগরিকদেরকে দিয়েছে। এ সব বন্দোবস্ত দ্বারা কি একটি রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে?

আংশিক দাবী পরিত্যাগ করুন

আমারা এমন একটা রাষ্ট্র চাই যার আইনসভা, মন্ত্রীসভা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা এবং সমগ্র অর্থনৈতিক অবকাঠামো সম্পূর্ণরূপে ইসলামী মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবে। বাইতুলমাল আলেমদের হাতে আর অর্থনৈতিক অবকাঠামো ইসলামী আদর্শ বর্জিত লোকদের হাতে থাকবে–এটা আমরা চাই না। আমরা চাই দেশের গোটা অর্থভান্ডার ইসলামী বাইতুলমালে রূপান্তরিত হোক। সুতরাং অনুগ্রহ পূর্বক আপনারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের দাবী তুলবেন না। তা হলে এ ধরনের দু' একটা জিনিস দিয়েই আপনাদেরকে শান্ত করে দেয়া হবে। এরপর যদি আপনারা আরো কতকগুলো খুঁটিনাটি দাবী তোলেন, তা হলে বলা হবে যে, এ মোল্লারা একেবারেই যুক্তিবিবর্জিত। ওদের দাবী–দাওয়ার কোন শেষ নেই। দেশের উন্নতি ও স্থীতিশীলতার পথে ওরা খামাখা বাধার সৃষ্টি করতেই থাকবে। কাজেই যে মৌলিক দাবীটিতে আপনাদের সকল দাবীই নিহিত রয়েছে, তা আদায় করার কাজেই সর্বশক্তি নিয়োগ করুন।

পুঁজিপতি ও বৃহৎ ভূ—স্বামীগণের প্রতি হুশিয়ারী

এবার আমি আমাদের দেশের পুঁজিপতি ও বৃহৎ ভূ–স্বামীগণকে সম্বোধন করে দু'চারটে কথা বলতে চাই। আপনারা অবৈধ উপায়ে যে সম্পদ সঞ্চয় করেছেন, সেটা তো এখন পরিত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। পুঁজিবাদী ভাবধারাকে চালু রাখার যুগ আর নেই। টাকার জোরে জেকে বসা প্রভুত্বের গদি এখন টলটলায়মান। অন্যের শ্রমের অবৈধ শোষণ এবং শুধুমাত্র পুঁজির বলে বলিয়ান হয়ে অপচয় ও বিলাসিতার উচ্ছল জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়ার জন্য অন্যের উপার্জন থেকে নিজের প্রাপ্যের চেয়ে বেশী আদায় করার প্রবণতা এখন অবশ্যই বন্ধ হওয়া চাই। এ অনাচারগুলো বন্ধ করতে আপনাদেরকে দু'টো হাতের একটা বেছে নিতে হবে। একটা হাত আপনাদের স্বনির্ধারিত অধিকার, সুযোগ–সুবিধা

ও মান-মর্যদার সাথে সাথে স্বয়ং আপনাদেরকেও নিশ্চিহ্ন করে দেবে। অপর হাতটি যখনই উদ্যত হবে, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের জন্য নয় বরং ইনসাফ কায়েমের জন্যই উদ্যত হবে। এ হাত শুধু আপনাদের অবৈধভাবে সঞ্চিত সম্পদটুকুই ছিনিয়ে নেবে। আপনারা যদি ইনসাফ কায়েম করার প্রয়াসী, আল্লাহর অনুগত হাতকে পসন্দ না করেন, তা হলে এখানে অপর প্রতিশোধকামী হাত আগ্রাসী থাবা বিস্তার করার জন্য অবশ্যই প্রস্তুত রয়েছে এবং তা তার ইপ্সিত কাজ সমাধা করেই ছাড়বে।

শ্রমিক ও কৃষকদের কাছে আবেদন

অনুরূপভাবে আমি আমার দেশের শ্রমিক ও কৃষকদেরকেও কিছু বলতে চাই। আমার বক্তব্য এই যে, মানুষ শুধু খাদ্য ও বস্ত্রের জন্যই বেঁচে থাকে না। মানুষের জন্য সবচেয়ে জরুরী জিনিস হলো মনুষ্যত্ব। আপনাদের খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করে কিন্তু আপনাদের মনুষ্যত্বকে খতম করে-এমন কোন ব্যবস্থা যদি আপনারা পান তা হলে তা কখনো গ্রহণ করবেন না। একটা ব্যবস্থা এমনও আছে যা আপনাদেরকে খাদ্যও দেয় আবার আপনাদের মনুষ্যত্বেরও বিকাশ সাধন করে। সে ব্যবস্থা আপনাদের সমস্যারও সমাধান করে, সেই সাথে আপনাদেরকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক ও মানবিক স্তরেও উন্নীত করে।

মুসলিম জনগণের উদ্দেশে

এখন আমি সাধারণ মুসলমানদের উদ্দেশেও কয়েকটি কথা বলতে চাই। আপনাদেরকে জানতে হবে যে, ইসলাম কি জিনিস। আপনারা যদি ইসলামের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন, তা হলে বিচিত্র নয় যে, ইসলামের নামে আপনাদেরকে কুফরীর দিকে ঠেলে দেয়া হবে। মদের বোতলে শরবতের লেবেল এঁটে দিয়ে তা হয়তো আপনার কাছে বিক্রি করা হবে এবং আপনারা তা পরম আগ্রহে নিয়ে নেবেন। এখানে একটা অনৈসলামিক শাসন চালু করা এবং সেই সাথে কিছু লোক দেখানো ইসলামী বিষয়াদি কার্যকরী করা হতে পারে। আর অজ্ঞতা বশত আপনারা ঐ লোক দেখানো জিনিসগুলো দেখেই ধোঁকা খেয়ে আশ্বস্ত হতে পারেন যে, এই তো ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেছে।

দেশের জনগণের মধ্যে সঠিক ইসলামী জ্ঞান ও চেতনার বিস্তার ঘটানোর কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে আমরা বদ্ধপরিকর। পতাকা, মিছিল ও আবেগোদ্দীপ্ত শ্লোগান দ্বারা জনগণকে একটা অন্তসারশূন্য উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনায় মাতোয়ারা করে দেয়াকে আমরা সঠিক কর্মপন্থা মনে করি না। তারা একটা লক্ষ্যহীন অন্ধ আবেগের গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাক, তাও আমরা কামনা করি না। আমরা চাই, তাদের মধ্যে ইসলামের জন্য বাঁচা ও মরার সচেতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের দেশের সরকারের জন্য যদি শতকরা একশো ভাগ ইসলামী শাসনতন্ত্রও তৈরী করে দেয়া হয়, অথচ তার পেছনে একটা ইসলামী সমাজ সক্রিয় না থাকে, তা হলে সেই ইসলামী সংবিধানে কোনই কাজ হবে না এবং তার সাহায্যে ইসলামী শাসনও চালু হওয়া সম্ভব নয়। কেবল কাগজে লিখে দিলেই কোন শাসনতন্ত্র চালু হয় না। দেশের জনগণের কি পরিমাণ সংঘবদ্ধ শক্তি সেই শাসনতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করার সংকল্প পোষণ করে, তার ওপরই নির্ভর করে ঐ শাসনতন্ত্র তৈরী কার্যকরী হবে কিনা। এ জন্যই আমাদের কামনা এই যে, যারা ইসলামকে ধর্ম হিসেবে এবং জীবন যাপনের প্রণালী হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা আমাদের সহযোগী হোন এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠিত হোন।

এখন যে মহলটি ইসলামী শাসন পসন্দ করে না এবং তার বাস্তবায়নের বিরোধী, তাদের পেশকৃত কতিপয় ওজর বাহানার আমি জবাব দিতে চেষ্টা করবো।

পাকিস্তানের স্থিতিশীলতার বাহানা

আমাদেরকে বলা হয় যে, এটা একটা সদ্যপ্রসূত শিশু রাষ্ট্র এবং এখনো তা শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সীমান্তে চারিদিক থেকে হুমকির সম্মুখীন। এমতাবস্থায় ইসলামী শাসনের ভিত্তি স্থাপনের কাজটা স্থগিত রেখে সমগ্র শক্তি পাকিস্তানকে মজবুত ও শক্তিশালী করার কাজে নিয়োজিত হওয়া উচিত।

আমার কথা হলো, পাকিস্তানকে মজবুত করার চেষ্টা করা প্রত্যেক পাকিস্তানী নাগরিকের কর্তব্য। তবে দেখতে হবে যে, পাকিস্তানের আসল বিপদাশংকা কোন্ দিকে? এর ভেতরে না বাইরে? আমি বলতে চাই

যে, আসল হুমকি বাইরে নয়-ভেতরে। কেননা, এ নৌকার চালকরা দিবারাত এতে ছিদ্র করে চলেছে। তাদের ঘুষ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি পাকিস্তানকে ক্রমাগত দুর্বল করে দিচ্ছে। পাকিস্তানের নাজুক অবস্থার কথা বলে তারা দিনরাত নিজেরাই কাঁদে। অথচ তাঁদের কার্যকলাপ দেখে অধিকাংশ মুসলমানদেরকে এরূপ বলতে শোনা যায় যে, পাকিস্তানেও যদি এ সব চলতে থাকে, তাহলে আমাদের ভারতে থাকতে অসুবিধা কি ছিল? বহু নির্যাতিত মোহাজেরকে এরূপ প্রশ্ন তুলতে দেখা গেছে যে, এ সব অনাচারের জন্যই কি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? এ সবের দরুন আমাদের জনগণের মন ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং তাদের আবেগ-উৎসাহে ভাটা পড়ছে।

বস্তুত পাকিস্তানকে মজবুত করতে হলে তার প্রতিটি তরুণ ও প্রতিটি সৈনিকের মনে এ কথা বদ্ধমূল করা জরুরী যে, সে যখন সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে, তখন শুধু জমীর জন্য নয়, বরং আল্লাহর জন্য সংগ্রাম করবে। সে যদি প্রাণ বিসর্জন দেয় তবে তা জাতির কতিপয় নেতা ও কর্মকর্তার জন্য নয় বরং আল্লাহর দীনের খাতিরে দেবে। আপনি যদি প্রত্যেকটি সৈনিককে এই বলে আশ্বস্ত করতে পারেন যে, তোমাকে শুধুমাত্র ইসলামের জন্য লড়াই করতে আনা হয়েছে, তা হলে দেখতে পাবেন যে, সে কি সাহস ও বীরত্বের সাথে লড়াই করে। বস্তুত পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েমের সুস্পষ্ট সাংবিধানিক ঘোষণা দেয়া ছাড়া আমাদের তরুণদের ও সৈনিকদেরকে আশ্বস্ত করার আর কোন কার্যকর উপায় নেই, সুতরাং আমরা যে দাওয়াত ও কর্মসূচী পেশ করছি, তা যে পাকিস্তানকে মজবুত করার অব্যর্থ উপায় এবং পাকিস্তানকে মজবুত করার উদ্দেশ্যেই আমাদের এ দাওয়াত ও কর্মসূচীকে সফল করা প্রয়োজন, সে কথা কোন কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ অস্বীকার করতে পারে না।

বিভেদাত্মক গোষ্ঠীবিদ্বেষ ও গোষ্ঠীপ্রীতি

পাকিস্তানের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও প্রদেশসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে শিশাঢালা প্রাচীরের মত গড়ে তোলা যায় কিভাবে সেটাই পাকিস্তানকে মজবুত করার ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কিন্তু আমরা এ যাবত যেসব নীতির ভিত্তিতে কাজ করে এসেছি, তার স্বাভাবিক ফল এ

দাঁড়াচ্ছে যে, প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজস্ব স্বতন্ত্র স্বার্থের ভিত্তিতে-পৃথক গোষ্ঠীপ্রীতি প্রদর্শন করছে। আজ পাকিস্তানে একটিমাত্র মুসলিম জাতি সৃষ্টির পরিবর্তে পাঁচটা আঞ্চলিক জাতি সিন্ধী, বেলুচি, পাঞ্জাবী, পাঠান ও বাঙ্গালীর উদ্ভব হয়েছে। এটা নীতিবিবর্জিত জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিকারী পশ্চিমা রাজনীতিরই বিষময় ফল। এ সমস্ত জাতিসত্তাকে ঐক্যবদ্ধ করে শিশাঢালা প্রাচীর বানানো একমাত্র ইসলাম দ্বারাই সম্ভব।

এ ছাড়া এখানে 'আনসার' ও 'মোহাজেরীন'[১] এর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের দরুন তাদের দুটো আলাদা-আলাদা সমাজ গড়ে উঠছে এবং দু'টো পৃথক রাষ্ট্রের উদ্ভব হচ্ছে। পরিস্থিতি যদি এভাবেই চলতে থাকে এবং তার যদি প্রতিরোধ না করা হয়, তা হলে এ সমস্যাও পাকিস্তানের জন্য একটা আলাদা হুমকি হয়ে বিরাজ করবে। এ হুমকিটা কিরূপ তা একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে। পূর্ব পাঞ্জাব থেকে আগত একটি পরিবারকে যখন পশ্চিম পঞ্জাবের সীমান্তে পুনর্বাসিত করা হয়, তখন স্থানীয় অধিবাসীরা শিখদেরকে দাওয়াত দিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করায়। এ সব পরস্পর বিরোধী লোকজন যতক্ষণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ও প্রতিহিংসাপরায়ণ থাকবে, ততক্ষণ তারা পাকিস্তানের জন্য বিপজ্জনকই থেকে যাবে। তাদেরকে যদি ঐক্যবদ্ধ করতে হয়, তবে ইসলামী শাসনের আওতাধীন পরিবেশে ইসলামী আদর্শের মাধ্যমেই তা করা সম্ভব। অন্যথায় তাদের যে কোন সময় সংঘর্ষে লিপ্ত হবার সম্ভবনা রয়েছে।

মোহাজের সমস্যার একমাত্র সমাধান

পাকিস্তান গঠিত হওয়ার আগেই যদি আমাদের নেতারা মুসলিম জনগণের চরিত্র গঠনের কাজটা ইসলামী আদর্শ মোতাবেক সম্পন্ন করতেন, তাহলে 'মোহাজেররা' যথার্থ মোহাজের এবং 'আনসাররা' যথার্থ আনসার হতো। তাদের সমস্যা সমাধানে আজ আমাদেরকে

১. এ শব্দ দুটো বিদ্রূপাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী পরিভাষা অনুসারে এ দুটো শব্দের যে তাৎপর্য, তার আলোকে বিবেচনা করলে স্থানীয়রাও কখনো 'আনসার' সুলভ আচরণ করেনি, আর ভারত থেকে যারা এসেছে তারাও 'মোহাজের' সুলভ ব্যবহার করেনি। অবশ্য আল্লাহর অনুগ্রহে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটতেও দেখা গেছে।। (নতুন)

দিবারাত যে জটীলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তা হতে হতো না জনগণের মধ্যে যদি ইসলামী অনুভূতি ও চেতনা জাগ্রত থাকতো, তা হলে এখানকার অধিবাসীরা নিজ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে পূর্ব পাঞ্জাবের নির্যাতিত মোহাজেরদেরকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসতো। নিজেরা মাটিতে শুয়ে বিছানা ও খাটপালংক মেহমানদেরকে দিয়ে দিত। আমাদের জাতির সামনে এটা কোন নতুন সমস্যা নয়। এর আগেও এ সমস্যা দেখা দিয়েছে। মদিনার ক্ষুদ্র জনপদটি মক্কা ও আরবের বিভিন্ন গোত্র থেকে আগত বিপুল সংখ্যক মোহাজেরকে এমন নীরবে ও ধৈর্যের সাথে নিজেদের মধ্যে একাকার করে নিল যে, মদিনাবাসীর সামনে কোন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে বলে কেউ টেরও পেল না। অথচ সে যুগে পৌর জীবনের উপায় উকরণ অত্যন্ত প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। ইসলামী চেতনা ও ইসলামী চরিত্রই সেখানে এ সমস্যার সমাধান করেছিল। অনুরূপভাবে আমাদের এখানেও ইসলামী চেতনা ও চরিত্রই এ সমস্যার একমাত্র সমাধান।

এ প্রেক্ষাপটে প্রতিটি ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত যে, আমরা যে জিনিসের দাওয়াত দিচ্ছি সেটাই কি পাকিস্তানকে দুর্বল করবে—না এর বিরুদ্ধে যা করা হচ্ছে তার দ্বারাই পাকিস্তান দুর্বল হবে।

ভারতে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার আশংকা

আর একটা ছুতা পেশ করা হয় এই যে, এখানে যদি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, তা হলে ভারতে হিন্দুরাজ কায়েম হবে। আমার কথা হলো ভারতে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার কি কিছু বাকী আছে? কাগজে ঘোষণায় অবশ্য বলা হচ্ছে যে, ভারতীয় ইউনিয়নের সরকারের কোন ধর্ম নেই এবং সেখানে সকল সম্প্রদায়ের সমানাধিকার রয়েছে। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার এই যে, সেখানে মুসলমানদের যমীনের ওপরে চলাফেরার অধিকার নেই। সুতরাং আপনারা সেখানকার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। সেখানে যা হবার তাতো হয়েছেই। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, এ যাবত আমাদের যা কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তা শুধু এ জন্য হয়েছে যে, আমরা কেবল মুখেই ইসলামের বুলি আওড়াই। কিন্তু তাকে আমরা নিজেদের জীবনের কার্যকর বিধানে পরিণত করি না। একবার যদি এখানে ইসলামী বিধান কায়েম হয়ে যায়, নিখুঁত ইনসাফের

ভিত্তিতে যদি এখানকার শাসন চলে, এখানকার সরকার যদি প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার রক্ষাকারী হয় এবং তার সকল কর্মকাণ্ড যে ন্যায়নীতি, সুবিচার, সততা ও সত্যবাদিতার অনুগামী তা যদি সে আপন কার্যক্রম দ্বারা প্রমাণ করে দেখিয়ে দেয়, তা হলে আমি বলতে পারি যে, ভারতের মুসলমানদের ভাগ্যই শুধু উন্নত হবে না, বরং খোদ্ ভারতের ভাগ্যও পাল্টে যেতে পারে। আমাদের ভাবতে হবে যে, প্রথমে ভারতের এত মুসলমান কোথা থেকে এসেছিল। এখানকার হিন্দুরাই তো বেশীর ভাগ মুসলমান হয়েছিল। তা হলে আজ যদি আমরা দেখিয়ে দেই যে, ইসলাম দ্বারা দেশের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কত নিখুঁত ও সুষ্ঠু হয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা কতখানি সততামন্ডিত হয় এবং দেশ পরিচালনার নীতি কত আপোষহীন হয়। তাহলে ভারতের লোকেরা চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করবে যে, আমরাও এ বিধান কেন অবলম্বন করি না। তারা আমাদের দুশমন অবশ্যই হতে পারে কিন্তু তাই বলে নিজেদেরও দুমশন হবে—এটা সম্ভব নয়। বস্তুত আমাদের অধুনালুপ্ত আটশো বছরের ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করার এটাই একমাত্র পথ।

হিন্দু সংখ্যালঘু বাহানা

বলা হয়ে থাকে যে, ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে হিন্দু সংখ্যালঘুরা কিভাবে মেনে নেবে? এটাও একটা খোড়া ও অচল যুক্তি। সম্প্রতি সীমান্ত প্রদেশের আইন সভায় কুটুরাম নামক এক সদস্য একটি প্রস্তাব পেশ করেছেন। এতে সীমান্ত প্রাদেশিক পরিষদের কাছে এই মর্মে অনুরোধ জানানো হয়েছে যে, "সীমান্ত প্রদেশের জনগণ যে কুরআনী আইন ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থাকে যত দ্রুত সম্ভব পাকিস্তানে চালু করাতে ইচ্ছুক, তা যেন গণপরিষদকে জানানো হয়। এ বিধান যে সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য একটা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

অল্প ক'দিন আগে আমার কাছে মাদ্রাজ থেকে একটা চিঠি এসেছে। তাতে বলা হয়েছে যে, আমার লেখা দু'খানা বই "ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ" এবং "অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান" অধ্যয়নের পর জনৈক শিক্ষিত হিন্দু বলেছেন যে, আমাদের কাছে কখনো এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, পাকিস্তানে এ ধরনের সততাপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা

কায়েম করা হবে। জিন্নাহ্ সাহেব যদি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন, তা হলে কোন বুদ্ধিমান লোক এর বিরোধিতা করতো না।

অমুসলিম সংখ্যালঘুদের কাছে আবেদন

এতদসত্ত্বেও আমি জানি যে, আমাদের দেশের বহু অমুসলিম ব্যক্তি এ কথা ভেবে দিশেহারা হচ্ছে যে, একটি বিশেষ ধর্মের অনুগত সরকারের তাবেদারী তারা কিভাবে করবে। আসল ব্যাপার এই যে, আমাদের অমুসলিম ভাইয়েরা একটি জিনিসকে নিছক না জানার কারণে তার বিরোধিতা করছেন। অথচ এটা সঠিক অর্থে সেই জিনিস, যাকে গান্ধীজী "রামরাজ্য" এবং আমাদের খৃষ্টান ভাইয়েরা "স্বর্গীয় সাম্রাজ্য" বলে অভিহিত করে থাকেন। ভারতের হিন্দু ভাইয়েরা যদি ভারতে সত্যিকার রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে দেন, তা হলে আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। কেননা বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের তুলনায় এ রামরাজ্যে মৌলিক মানবীয় অধিকারের নিরাপত্তা আরো ভালোভাবে সংরক্ষিত হবে। আমি আমার অমুসলিম ভাইদেরকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, পাকিস্তানে যদি ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে তাদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হবে এবং তাদেরকে যে মৌলিক অধিকার কাগজের পৃষ্ঠায় দেয়া হবে, বাস্তবেও তাই দেয়া হবে। পক্ষান্তরে এখানে যদি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম হয়, তা হলে তা হবে মুসলমানদের "জাতীয় রাষ্ট্র"। সে রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী নিজেদের যাবতীয় জাত্যাভিমান ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সহকারে সেচ্ছাচারমূলক আচরণ করবে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলামে আপনাদের জন্য যেসব অধিকার নির্ধারিত রয়েছে, মুসলমানরা ও তাদের সরকার তাতে বিন্দুমাত্র কমবেশী করতে পারবে না। এখানকার মুসলমানরা ভারত কিংবা দুনিয়ার অপরাপর অমুসলিম জাতি বা সরকারের আচরণ দেখে নিজেদের নৈতিক আচরণবিধি পাল্টাবে না। তাদের চিন্তাভঙ্গী হবে এই যে, অন্যান্য জাতি ও সরকার নিজেদের চুক্তি ভঙ্গ করে তো করুক। আমি মুসলমান হয়ে কেমন করে চুক্তি ভঙ্গ করতে পারি।

এ কথা আপনাদের বিলক্ষণ জানা আছে যে, বিগত দাঙ্গার সময় কেউ যদি এ দেশে নিরীহ অমুসলিমদেরকে রক্ষা করার জন্য নিস্বার্থভাবে চেষ্টা করে থাকে, তবে তা ধার্মিক লোকেরাই করেছে।

ভারতে তাদের স্বধর্মীয় ভাইদের সাথে কি আচরণ করা হচ্ছে, তা তারা জানতো। তথাপি আল্লাহর ভয় ও মানবিক সহানুভূতির কারণে তারা যুলুম ও বাড়াবাড়ি থেকে নিবৃত্ত থেকেছে। এমনকি তারা আপন অমুসলিম ভাইদেরকে যথাসম্ভব আশ্রয় দিয়েছে এবং নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। এ কাজ করতে গিয়ে তারা নিজেদের জানমালেরও একটুও পরোয়া করেনি। আমাদের কাছে এমন বহু ঘটনার রেকর্ড শুধু নয়, বরং খোদ অমুসলিম ব্যক্তিবর্গের স্বীকৃতিযুক্ত বহুসংখ্যক চিঠিও রয়েছে। ভারতে গমনকারী হাজারো অমুসলিম এর সাক্ষ্য দেবে।

ইসলামী সরকার প্রদত্ত রক্ষাকবচ

ইসলামী সরকার কায়েম হলে যে নিরাপত্তা দেয়া হবে, সেটা আমাদের পক্ষ থেকে নয় বরং খোদ আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে দেয়া হবে। রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, কোন অমুসলিমকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে ব্যক্তি তা ভঙ্গ করবে, কেয়ামতের দিন আমি স্বয়ং তার বিচারপ্রার্থী হব এবং সে বেহেস্তের ঘ্রাণও পাবে না। তা ছাড়া তার শেষ অছিয়তে যেখানে নামায ও নারী জাতির অধিকারের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, সেখানে সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রদানের ব্যাপারেও সাবধান করা হয়েছে।

হযরত ওমর (রা)-এর আমলের ঘটনা এই যে, একবার মুসলিম সেনাবাহিনী যখন একটি এলাকা থেকে পশ্চাদাপসরণে বাধ্য হলো, তখন তারা অমুসলিমদের ডেকে তাদের কাছ থেকে নেয়া কর ফেরত দিল। তারা বললো যে, আমরা এ কর আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনের আবশ্যকীয় ব্যয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এখন যেহেতু আমরা আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনে অক্ষম তাই, রক্ষণাবেক্ষণের বাবদে গৃহীত এ অর্থ আমাদের প্রাপ্য নয়। অমুসলিম ভাইদের আমি বলবো যে, এ মহান আদর্শবাদী রাষ্ট্র আপনাদের জন্য করুণা স্বরূপ হবে। এটি কায়েম করার ব্যাপারে আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করুন। পাশ্চাত্য ধাচের ধর্মহীন গণতন্ত্রের তুলনায় ইসলামী রাষ্ট্রে আপনাদের জন্য এত কল্যাণ নিহিত রয়েছে যে, সে সম্পর্কে যদি আপনাদের সঠিক ধারণা জন্মে তা হলে আপনারা পাশ্চত্য গণতন্ত্রের

বিরোধিতায় এবং ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমে মুসলমানদের চেয়েও বেশী সচেষ্ট হবেন।

বিশ্বজনমত বিগড়ে যাওয়ার আতংক

আরো একটা বাহানা তোলা হয় যে, আমরা যদি ধর্মীয় রাষ্ট্র কায়েম করি, তা হলে আমাদের সম্পর্কে বিশ্বজনমত খারাপ হয়ে যাবে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, লোকে কি বলবে এ ভয়ে আমাদের ইসলাম সম্পর্কে লজ্জা পাওয়া উচিত। আমি বলি যে, ইসলামের ওপর আমাদের অতটুকু ঈমানও নেই, যতটুকু ১৯১৭ সালে রাশিয়ার কম্যুনিষ্টদের ঈমান ছিল কমুনিজমে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে এখন তাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে উপনীত। সমগ্র প্রশাসন ভেঙ্গে পড়েছে। দেশ চারদিক থেকে শত্রুদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছে। সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত এবং শিল্প ও বাণিজ্য বিপর্যস্ত। তখন এও সবার কাছে স্পষ্ট ছিল যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার সাথে সাথেই বিশ্বের সকল পুঁজিবাদী শক্তি তার বিরোধী হয়ে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ঐ রাষ্ট্র কায়েম করলো। আর আজ অবস্থা এই যে, প্রতিটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তার ভয়ে কম্পমান। আমাদের অন্যদের কথা ভাবলে চলবে না নিজেদের কথা ভাবতে হবে যে, আমাদের মুসলমান হওয়ার দাবী কি কি। সে দাবী আমাদের পূরণ করতে হবে। ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে বিশ্বজনমত খারাপ হয়েছেই এই জন্য যে, আমরা ইসলামকে বাস্তব কর্মক্ষেত্র থেকে বাইরে রেখে নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচিত করেছি। এর ফলে ইসলাম এবং মুসলমান উভয়ই হাস্যাস্পদ হয়েছে। কিন্তু এখন যদি আমরা ইসলামকে কর্মক্ষেত্রে পুনপ্রতিষ্ঠিত করি এবং তার হাতে পূর্ণ ক্ষমতা সমর্পণ করি তা হলে বিশ্বজনমত ইসলাম ও মুসলমান উভয়ের সম্পর্কেই স্থায়ীভাবে ভালো হয়ে যাবে। দু' এক বছর পর্যন্ত লোকেরা হয়তোবা কিছু ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত থাকতেও পারে। কিন্তু দু' চার বছর পর তারা আমাদের সম্পর্কে মত না পাল্টিয়ে পারবে না। বরঞ্চ তারা এ কথাও স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, এরা তো আমাদের নেতা হবার যোগ্য। কেননা, তাদের কাছে একটা বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের উপাদান রয়েছে। পাকিস্তানে

ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা দেখে দুনিয়ার মানুষের মন যে আপনাদের দিকে আকৃষ্ট হতে শুরু করবে এটা সুনিশ্চিত।

মোল্লাদের শাসন কায়েম হবার সন্দেহ

এরূপ একটা অজুহাতও দাঁড় করানো হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র তো আসলে মোল্লাদেরই রাষ্ট্র হবে। আর মোল্লা মৌলভীরা দুনিয়ার ব্যাপার স্যাপার কিইবা বুঝবে? যারা এ অজুহাত দাঁড় করিয়েছে, তাদেরকে আমি বলে দিতে চাই যে, আমরা আপনাদের এই 'ফানুসেরও' বাতাস বের করে দিয়েছি। পাকিস্তানে যারা ইসলামী শাসনের দাবী তুলেছে তারা 'মোল্লা' নয় বরং তারা আপনাদের মতই একদিকে যেমন দুনিয়াবিশারদ, তেমনি কুরআন হাদীস সম্পর্কেও অভিজ্ঞ। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীদাররা আধুনিক দর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানও আপনাদের চেয়ে ভালোভাবে জানে, আবার কুরআনের দর্শন ও রাজনীতির ব্যাপারেও অজ্ঞ নয়। এ কথা সুবিদিত যে, ইসলামী রাষ্ট্র যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তার পরিচালনার জন্য সে এমন লোকই উপস্থিত করবে যারা বর্তমান যুগে ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে কাজ করতে সক্ষম হবে। ইসলামী সরকারের জন্য কি ধরনের লোক নির্বাচন করতে হবে, তা দেশবাসী ও ভোটারদেরকে আমাদের বলতে হবে এবং সে ব্যাপারে তাদের মানসিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। কোথাও যদি মন্দির পরিচালনার জন্য লোকের প্রয়োজন পড়ে তবে লোকেরা সেই ধরনের লোকই খুঁজে যোগাড় করে দেবে। আর যদি মসজিদ পরিচালনাকারী কর্মী আবশ্যক হয় তা হলে তার উপযোগী লোকই সরবরাহ করা হবে। আর যদি কোন ব্যাংক প্রশাসনের জন্য লোকের দরকার হয় তা হলে সেই যোগ্যতার অধিকারী লোকদেরকে বাছাই করা হবে। অনুরূপভাবে ইসলামী সরকার পরিচালনার জন্য যদি কর্মচারীর প্রয়োজন পড়ে, তা হলে যারা এ কাজের যোগ্যতা সম্পন্ন জনমত তাদেরকেই সামনে এগিয়ে দিতে থাকবে। এরূপ ধারণা করা মোটেই ঠিক নয় যে, আমাদের দেশে ইসলামী শাসন পরিচালনা করার উপযোগী লোকদের আকাল পড়ে গেছে। এ ধরনের লোকজন প্রচুর রয়েছে এবং জনসাধারণের মধ্যেই রয়েছে। এমনকি স্বয়ং আমাদের বর্তমান সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যেই এ মানের একটি সুবৃহৎ গোষ্ঠী বিদ্যমান।

অনৈসলামিক প্রশাসনে ইসলামী আইন

কেউ কেউ এ কথাও বলছেন যে, প্রশাসনটা না হয় প্রচলিত অনৈসলামিক কাঠামো অনুসারেই থাকুক, কেবল আদালতী আইন-কানুন ইসলামের চালু করা হোক। আমি বলি যে, তা হলে একজন শিখকে মসজিদের ইমাম বানিয়ে দিলে ক্ষতি কি? একটি রাষ্ট্র নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবী করতে থাকবে আর আইন চালাবে ধর্মের, এটা কি করে সম্ভব? এরূপ মত যারা ব্যক্ত করে তাদের বুদ্ধি দেখে আমার করুণা হয়। একটি অনৈসলামিক প্রশাসনের অধীন ইসলামী আইনের যথার্থ বিকাশ আদৌ সম্ভব নয়। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সামজিক পরিবেশের ইসলামীকরণ ছাড়া ইসলামী আইন চালু করাতে কোনই লাভ হয় না। ইসলামের আইন ব্যবস্থা তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড ও বিধি-ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং অন্য কোনো ব্যবস্থার অংশ হয়ে বিকাশ লাভও করতে পারে না, ইপ্সিত সুফলও ফলাতে পারে না। আম গাছের একটি ডালকে নিয়ে নিম গাছের কান্ডের সাথে যুক্ত করে দিলে যেমন সেই ডাল থেকে আম পাওয়ার আশা করা যায় না, এমনকি সে ডালের সবুজ ও সজীব থাকাটাই কষ্টকর, উপরোক্ত প্রক্রিয়াটাও তেমনি। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এ দেশের প্রশাসন পরিচালনায় নিয়োজিত বহু উচ্চ শিক্ষিত লোকজনও এ ধরনের নিরর্থক কথা বলে থাকেন। সোজা কথা এই যে, এ দেশকে ইসলামী আদর্শ অনুসারে চালাতে হলে তার শাসনতন্ত্রকে অবশ্যই ইসলামীকরণ করতে হবে।

উল্লিখিত ওজর বাহানা ছাড়া আর কোন অজুহাত যদি থেকে থাকে তবে আমরা তাও শুনতে চাই। তার জবাবে আমাদের কাছে যা কিছু যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে তা পেশ করে ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের চেষ্টা করবো। কেননা, একমাত্র ইসলামী শাসন কায়েমেই যে এদেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিহিত, সে ব্যাপারে দেশের জনমত পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত হোক এবং জনগণ তা ভালোভাবে উপলব্দি করুক এটাই আমাদের কামনা ও প্রত্যাশা।

—ঃ(সমাপ্ত)ঃ—